একাদশ সংস্করণ.

# অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল

[ RESOURCES AND UTILIZATION IN DETAIL ]

[ কলিকাতা, উত্তর বঙ্গ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক
বি. কম. পাঠ্যক্রম পরিপূরিত ]

সাধারণ সম্পাদক ঃ

**শ্রীসুদিনকুমার ভট্টাচার্য** এম. এ. ( জিয়োগ্রাফি )

উমেশচন্দ্র কলেজের ( প্রাতঃ বিভাগ ) বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক, সিটি কলেজ
অব কমার্স এণ্ড বিজিনেস এডমিনিষ্ট্রেশন ( সান্ধ্য বিভাগ )

বিক্রয় কেন্দ্র

**বৈকুণ্ঠ বুক হাউস**

১৮৩, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ফোন: ৫৫-৪০২৮

প্রকাশনায়—

সুরেন্দ্রনাথ সাহা,

ম্যাঃ ডাইরেক্টার, বৈকুণ্ঠ বুক হাউস প্রাঃ লিঃ

১৮৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ— ডিসেম্বর, ১৯৫৮

দ্বিতীয় " —জুলাই, ১৯৫৯

তৃতীয় —নভেম্বর, ১৯৫৯

চতুর্থ " —সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

ব্রাঞ্চঃ

বৈকুণ্ঠ বুক হাউস

৭৫/১/১, মহাত্মা গা[redacted] রোড

( টেমার [redacted])

কলিকাতা-৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

এই গ্রন্থে সর্বত্রই 'টন' বলিতে মেট্রিক টন বা "টনে" বুঝিতে হইবে।
আমরা ক্রমশঃ মেট্রিক ওজন বা মাপ ব্যবহার করছি।

মুদ্রণে—

শ্রীতুলসী চরণ বক্সী, ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৩ডি, মদন মিত্র লেন, এবং সুবোধ মণ্ডল কল্পনা প্রেস (প্রাঃ লিঃ), ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬।

আমাদের প্রকাশিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই পুস্তক উত্তর বঙ্গ, বর্ধমান ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক বি. কম. পরীক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল সংক্রান্ত যে কোন সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ। এই সংস্করণে বইটিকে সময়োপযোগী তথ্যদ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এই সংস্করণের মধ্যে ত্রৈবার্ষিক বি. কম. (Part 1 এবং final) পরীক্ষার প্রশ্নগুলির (১৯৬৯ পর্যন্ত) যথাযথ উত্তর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এবারেও কয়েকটি নূতন নূতন মানচিত্র যোগ করা হ'ল। এই বইখানির সুনামের সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে এমনভাবে কয়েকখানা বই বাজারে বের হয়েছে ও হচ্ছে (বিশেষ করে সংস্কৃতের ডাঃ কালিকুমার দত্ত—ওরফে কে. কে. দত্ত ভূতপূর্ব অধ্যাঃ সিটি কলেজ লিখিত, "Original দত্ত ও গুহ"র বইখানি) যে বিশেষ সতর্ক না হলে বঞ্চনার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এগুলি থেকে সাবধানতা অবশ্য অবলম্বনীয়।

কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি সত্ত্বেও ছাত্র সাধারণের সুবিধার জন্য এই সংস্করণের বিক্রয়মূল্য মাত্র পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি করা হ'ল। অর্থনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধীয় সর্বোৎকৃষ্ট এই বইখানির উপর নির্ভর করে ভাল মার্ক পাবার চেষ্টা করার জন্য ত্রৈবার্ষিক বি. কম. পাঠ্যক্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ জানাই এবং এই সংস্করণের বহুল প্রচারের জন্য ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের সহযোগিতা কামনা করি।

বিনীত—প্রকাশক

## প্রথম (বি. কম.) সংস্করণের ভূমিকা

বি. কম. ছাত্র-ছাত্রীদের উপর্যুপরি অনুরোধে আমাদের সর্বাধিক বিক্রীত (বছরে ১২ হাজার) ইণ্টারমিডিয়েট "অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের" একাদশ সংস্করণের সহিত গত ৫ বছরের বি. কম. বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তর ও বি. কম. পাঠ্যক্রমের জন্য কয়েকটি অধ্যায় সংযোজনের পর প্রথম বি. কম. সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল।

এই সংস্করণের কলেবর ইণ্টারমিডিয়েট সংস্করণের চাইতে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও মাত্র চার আনা বাড়িয়ে পাঁচ টাকা ধার্য করা হল।

আশা করি, আমাদের জনপ্রিয় ইণ্টারমিডিয়েট সংস্করণের মত এই বি. কম. সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকার সাধনে সমর্থ হবে।

ডিসেম্বর—১৯৫৮ বিনীত—প্রকাশক

# সূচীপত্র

## ২য় খণ্ড—আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ভুগোল



## তৃতীয় খণ্ড

## নক্সা ও মানচিত্রাদির তালিকা

### ১ম খণ্ড

## ২য় খণ্ড

## ৩য় খণ্ড

# পরিচিতি

## Definition and Scope

1. Discuss in what respect Economic Geography may be considered to be a dynamic science. (C. U 1968)

[ কি কি অর্থে অর্থনৈতিক ভূগোলকে গতিশীল বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে তাহা আলোচনা কর। ]

অর্থনৈতিক ভূগোলকে গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয়। এক অর্থে প্রায় সকল বিজ্ঞানই গতিশীল বা প্রগতিশীল। যে সকল বিজ্ঞানে নূতন গবেষণা চলিতেছে এবং নিত্য নূতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাদের গতিশীল বলা চলে। আর এক অর্থে কোন কোন বিজ্ঞানের অংশ বিশেষকে স্থির বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে, যথা— গণিত। গণিতের মৌল সিদ্ধান্তগুলির পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোল নানাভাবে গতিশীল। প্রথমতঃ, ভূগোল শাস্ত্রের ধারাই আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা ছিল কেবল মাত্র কতকগুলি স্থানের নামের তালিকা বা দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাস তাহা আজ কত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কত নূতন দিকে জ্ঞানের আলো ছড়াইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভূগোল শাস্ত্রের মূল উপজীব্য দুটি, যথা—পৃথিবী ও মানুষ। এবং এ দুটিই পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর বুকে প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিত্যই হইতেছে। নদী-ভাঙ্গে গড়ে—নদীর ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়াই তো গতিশীলতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। এবং এই গতিশীলতার সংগে তাল রাখিয়া দেশের বিশেষতঃ নদী-মাতৃক অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। ইহা অর্থনৈতিক ভূগোলেরও বিষয়বস্তু। মানুষের আর্থিক জীবনের উপরে প্রাকৃতিক প্রভাবের বিচার এবং বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান কার্য। সবচেয়ে গতিশীল মানুষ নিজে। কেবল যে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বা সে দেশান্তরে যাইয়া উপনিবেশ গঠন করে তাহাই নয়; পরন্তু—সবচেয়ে বড় কথা ইহাই—যে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে; যাহা ছিল অকেজো তাহা হইয়াছে বহুমূল্য।

সবচেয়ে বৈপ্লবিক গতিশীলতা রহিয়াছে মানুষের সম্পদ ভাবনার মধ্যে। একই প্রাকৃতিক সম্পদকে বিজ্ঞানের আলোকে মানুষ নূতন ভাবে দেখিতেছে। ইহার ফলে অর্থনৈতিক ভূগোলের ধারণাসমূহের আমূল পরিবর্তন ঘটিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ জাপানের ইস্পাত শিল্পে অসাধারণ উন্নতির কথা বলা যায়। জাপানে ভাল লোহা বা ভাল কয়লা নাই। কিন্তু লৌহ আকরিকের ব্যবহারের এবং বাণিজ্য

জাহাজের অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনের ফলে জাপানের ইস্পাত শিল্প আজ পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম।

পরমাণু শক্তির ব্যবহারও এইরূপ গতিশীলতার ইঙ্গিত করে। এই সকল পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক ভূগোলের স্রোত নিত্য নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছে। এই জন্যই অর্থনৈতিক ভূগোল বিষয়টি অতি প্রাণচঞ্চল এবং গতিশীল।

**Q. 2 Define and analyse the scope of Economic Geography.**

**[ অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা কি এবং উহার কার্যকারিতাই বা কি তাহা উল্লেখ কর। ]**

**অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ( Definition ) :**

এই পৃথিবীতে মানুষ সর্বদাই উৎপাদন, বণ্টন বা ভোগমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত। তাহার অর্থনৈতিক বৃত্তি নানা প্রকার। এই সকল বৃত্তি স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন জাতীয় হইয়া থাকে। এই বিভিন্নতার অবশ্যই বিশেষ কারণ আছে। আমরা যদি এই কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই তবে দেখিব যে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবেই সাধারণতঃ বৃত্তির বা পেশার এই বিভিন্নতা। **যে শাস্ত্রে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সংগে পারিপার্শ্বিকতার কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় ও আলোচনা করা হয় তাহাকেই 'অর্থনৈতিক ভূগোল' বলে।** বাণিজ্যিক ভূগোলকে অর্থনৈতিক ভূগোলের পূরক ( complementary ) বিষয় বলা হয়—বস্তুতঃ উভয়ের উদ্দেশ্য মূলতঃ একই এবং একত্রেই উহাদের পঠন-পাঠন হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক ভূগোলের লেখকগণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বাণিজ্যিক ভূগোল মূলতঃ বর্ণনামূলক এবং তথ্যাশ্রয়ী।

**উৎপত্তি, ক্ষেত্র এবং কার্যকারিতা ( origin, field and function ) :**

বিখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত জর্জ চিস্‌হল্ম্ ( George Chisholm ) বাণিজ্যিক ভূগোল শাস্ত্রের পথিকৃত। তাঁহার মতে "যে মহান্ ভৌগোলিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে তাহা হইল এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানা প্রকার সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে বহুপ্রকার পণ্য উৎপন্ন হইতেছে।" সুতরাং, উচ্চমানের জীবনধারণ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে বাণিজ্য অনিবার্য।

আধুনিক যুগের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভৌগোলিক আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিমারম্যান অর্থনৈতিক ভূগোলের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া

বলেন—"একথা ধরিয়া লওয়া যায় যে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কোন কোন ভৌগোলিক তাঁহাদের শাস্ত্রের সংগে অর্থ-শাস্ত্রের অতি নিকট সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিয়া দুই বিষয়ের সীমান্ত অঞ্চলে গবেষণা চালান।" ইহার ফলেই অর্থনৈতিক ভূগোলের উৎপত্তি। তাহার মতে অর্থনৈতিক ভূগোলকারগণ প্রকৃতির মৌলিক বিষয়বস্তু হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত মানব সংস্কৃতির যে বিরাট সৌধ তাহাতে আরোহণ করেন। আর অর্থনীতিবিদ্‌গণ ইহার বিপরীত মুখে তাঁহাদের গবেষণা চালাইয়া যান।

অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু হইল প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ এবং উহাদের ব্যবহারের সম্ভাব্যতা ও কার্যকারণ সম্পর্কে আলোচনা করা। পৃথিবীর নানাস্থানে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় কেমনভাবে মানুষ প্রকৃতির সংগে বসবাস করিতেছে। কোথাও দেখা যায় পশুপালন মানুষের প্রধান বৃত্তি। কোথাও মৎস্য শিকার, কোথাও কৃষিকার্য, আবার কোথাও বা শিল্পই প্রধান বৃত্তি। জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাব নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। কিভাবে এই আর্থিক দুনিয়ার কার্যকলাপ সংঘটিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোল-শাস্ত্রের কার্য।

ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়গুলি শিক্ষার সংগে সংগে অর্থনৈতিক ভূগোল শিক্ষার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই বিরাট পৃথিবীর ব্যাপকতা, বিভিন্নতা ও ইহার বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে 'অর্থনৈতিক ভূগোল' পাঠ ছাড়া গত্যন্তর নাই। বর্তমান বিশ্বে মানুষের জীবন সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় না সত্য কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষের জীবন সর্বত্রই প্রকৃতির উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল।

যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিপুষ্ট ভারতের বোম্বাই মহানগরী নানা যান্ত্রিক উপায়ে স্বাবলম্বী হইলেও বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জন্য ১৯৫১ সালে বোম্বাই শহরে জলতড়িৎ শক্তির অভাব দেখা দেয় এবং বস্ত্রশিল্পগুলি কতক পরিমাণে বন্ধ রাখিতে হয়। এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, নানাপ্রকার কৃত্রিমতার মধ্যে বাস করিলেও বর্তমান সভ্য মানুষ প্রকৃতি হইতে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। অরণ্যবাসী অসভ্য ও অর্ধসভ্য মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব যেমন প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট, সভ্যমানবের জীবনে তেমনটি না হইলেও সভ্য মানবজীবনও পরোক্ষভাবে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধের মূল কারণ সমূহ অনুসন্ধান

করিতে গেলে প্রথমেই ঐ সকল দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয় আলোচনা করিতে হয়। অরণ্যজ, প্রাণিজ, কৃষিজ এবং শিল্পজ সম্পদ সমস্তই প্রধানতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। খনিজ সম্পদের উৎপত্তির সংগে বর্তমান যুগের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক না থাকিলেও উহাকে কাজে লাগানোর জন্য জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উৎপত্তির ও উন্নতির জন্য একদিকে মানুষ ভালভাবে বাঁচিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন প্রেরণা দান করে অপরদিকে জলবায়ু, মাটি প্রভৃতি ভৌগোলিক পরিবেশের উপাদানগুলিও তেমনি সাহায্য করে। কৃষিপ্রধান দেশকে তাহার কতকগুলি প্রয়োজনের জন্য শিল্পপ্রধান দেশগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। আবার শিল্পের অধিকাংশ উপকরণই আসে কৃষিপ্রধান দেশ হইতে। বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন রকম খাদ্য, পানীয় এবং কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। ঐগুলির বাজার সমগ্র বিশ্বেই বিদ্যমান। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনিবার্য। অবশ্য মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহসের উপর প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার সম্পূর্ণ ব্যবহার অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বিভিন্ন জাতির শক্তি, সাহস ও উদ্যোগ অনেক পরিমাণে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি ভৌগোলিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, 'অর্থনৈতিক ভূগোল' পাঠ করিলে আর্থিক জগতের যাবতীয় কার্যকারণের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হয়।

## ভূতত্ত্ব, ভূগোল শাস্ত্র, 'অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল' এবং অর্থনীতির পরস্পর নির্ভরশীলতা—

'অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল' সাধারণ 'ভূগোল শাস্ত্রের' এক বিশিষ্ট অংশ। ইহাতে যদিও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণের উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়, তবু একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর ভূ প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকিলে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। ভূ-প্রকৃতির বিষয় বিশদভাবে জানিতে হইলে ভূ-তত্ত্ব ( Geology ) সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। জলবায়ু সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে প্রতিদিনের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং আবহবিদ্যা ( Climatology ) আয়ত্ত করা দরকার। অপর পক্ষে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃত অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্বন্ধে জানিতে হইলে অর্থনীতির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। ফলিত অর্থনীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের অনেক বিষয়ে সম্পর্ক আছে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের কার্যকারণ বিশ্লেষণে অর্থনীতির বহু সুপরিচিত সংজ্ঞারও প্রয়োজন হয়। আবার বহু অর্থনৈতিক

মানচিত্র, যাহা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের অপরিহার্য অঙ্গ তাহাও ফলিত অর্থনীতির বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয়।

**প্রয়োজনীয়তা**—বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষও ক্রমশঃ পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক-ঘটনাগুলি সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হইতে হইলে আজ ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের যে নাগরিক ভাক্রা অথবা ভিলাই সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নহেন তাহার প্রকৃত কর্তব্যনিষ্ঠ ও সচেতন নাগরিক হইবার যোগ্যতা যথেষ্ট নহে। সমগ্র পৃথিবীতে আজ নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। কত নূতন স্বাধীন রাজ্যের জন্ম হইতেছে। এই চলমান জগতকে বুঝিতে হইলে 'অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল' পাঠ করা প্রয়োজন।

# সম্পদ চর্চা

[ RESOURCE ASPECTS—NATURAL, HUMAN, CULTURAL ]

## Q. 3. Define and classify resource.

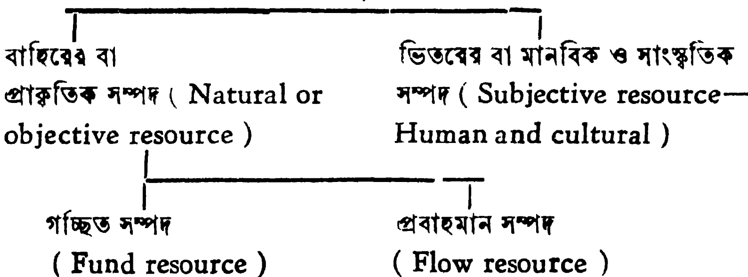
**[ সম্পদের সংজ্ঞা দাও এবং উহার শ্রেণীবিভাগ কর। ]**

**সম্পদ কি ও কয় প্রকার**—ব্যাপক অর্থে সম্পদ ( resource ) বলিতে আমরা কোন বস্তু বা কোন গুণকে অথবা উভয়ের সমন্বয়কে বুঝি অর্থাৎ সম্পদ এমন কিছু যাহার দ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হয় অথবা কোন চাহিদা মিটানো যায়। অধ্যাপক জিমারম্যানের ( Zimmermann ) মতে, সম্পদ কোন একটা বস্তুবিশেষ নহে। বস্তুতঃ উহার কার্যকারিতাই হইল সম্পদ। অর্থনীতিতে যেমন বলা হয় যে অর্থ কি—না অর্থ যাহা করে অর্থাৎ যে কার্য করে তাহাই হইল অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। খনির মধ্যের কয়লা অথবা নদীতে প্রবাহিত জল যতক্ষণ না মানুষের কাজে লাগিতেছে, যতক্ষণ না তাহার দ্বারা কোন অভাব মিটিতেছে বা উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে বড় জোর "সম্ভাব্য সম্পদ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—সম্পদ বলা চলে না।

সম্পদ তিন প্রকার—প্রাকৃতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক। জল, বায়ু, সূর্যকিরণ, নদী, খনিজ, অরণ্য সম্পদ, মাটি প্রভৃতি হইল প্রাকৃতিক সম্পদ। তেমনই জনসংখ্যা, মানুষের গুণাগুণ ও ঘনবসতি হইল মানবিক সম্পদের মাপকাঠি। আর সাংস্কৃতিক সম্পদ এই দুইয়ের সহযোগিতায় গড়িয়া উঠে ( culture is a joint product of man and nature )। যথা—রানীগঞ্জে মাটির নীচে কয়লা ছিল ; ইহা প্রাকৃতিক সম্পদ। কাছেই বনে জঙ্গলে বাস করিত আদিবাসীরা ; ইহা মানবিক সম্পদ। আর এই দুইয়ের সহযোগিতায় গড়িয়া উঠিল রেলপথ, রাস্তা, বড় বড় শহর, কলকারখানা, সভ্যতা, আধুনিকতা। ইহাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক সম্পদ।

সাধারণ অর্থে সম্পদকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করিতে পারি—

*সম্পদ ( Resource )




* জিমারম্যানের মতে অবশ্য "সম্পদ" কোন বস্তু নহে, বস্তুর কার্যকারিতা মাত্র।

মানুষের কার্যকারিতার ফলেই সম্পদের সৃষ্টি হয়, রক্ষা হয় এবং ক্ষয় হয়। তাই সংরক্ষণের ( conservation ) দৃষ্টি লইয়া সম্পদ ( সম্ভাব্য ) ব্যবহার করা উচিত।

**Q. 4. Analyse the functional theory of resource and indicate the modern trends in resource development.**

( Burdwan B. Com 1965 & C. U. B. Com Part I 1962 )

**[ সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর এবং সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক ধারা বর্ণনা কর। ]**

**সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব** ( Functional or Operational theory of resource )—সভ্য মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত মৌলিক। মৌল সম্পদ দুই প্রকার; যথা—প্রাকৃতিক ও মানবিক। সংস্কৃতিকে উদ্ভূত সম্পদ বলা যাইতে পারে। মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ তাহার জ্ঞানবুদ্ধি। বিখ্যাত দার্শনিক মিচেল বলেন—"জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ; কারণ ইহা অপর সকল সম্পদের জন্মদাতা।" প্রকৃত পক্ষে সম্পদ কিভাবে সৃষ্ট হয়? মানুষ তাহার জ্ঞানবুদ্ধি আদি গুণাবলীর দ্বারা নিজের ভালোভাবে বাঁচিবার আকাংখা পূরণ করিতে চায় এবং সে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারকে নিজের কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং সম্পদের ব্যবহারিক বা কার্যকারিতা তত্ত্ব বুঝিতে হইলে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে সে বিষয় জানা দরকার।

আজ হইতে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানুষ পশুর পর্যায়ভুক্ত ছিল। মানুষ ও পশুর মধ্যে একমাত্র মৌলিক প্রভেদ এই ছিল যে মানুষের বুদ্ধি ছিল অনেক বেশি। মানুষ যখন পশুর পর্যায়ে ছিল তখন তাহার জিনিসপত্রের প্রয়োজন ছিল খুব কম এবং সেই জিনিসের চাহিদা মিটাইবার ক্ষমতাও ছিল খুব কম। তখন মানুষ প্রকৃতির বিপুল সম্পদের অতি সামান্যই ব্যবহার করিতে পারিত। খনিজ তৈলের ঝর্ণা বহিয়া যাইত। মাটির উপরেই কয়লা এবং প্রায় খাঁটি তামা পাওয়া যাইত। কিন্তু এই সম্পদ মানুষ তখন ব্যবহার করিবার বিষয় কিছুই জানিত না। সুতরাং তখনকার মানুষ কোনক্রমে জীবনধারণ করিত মাত্র।

তাহার পর ক্রমশঃ মানুষ তাহার উর্বর মস্তিষ্ককে কাজে লাগাইয়া প্রথমে অন্যান্য প্রাণীর উপরে এবং পরে প্রায় সমগ্র প্রকৃতির উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিল। তাহার নিকট প্রাকৃতিক সম্পদের তাৎপর্য সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। প্রাকৃতিক সম্পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভৌগোলিক অধ্যাপক জিমারম্যান বলিয়াছেন—"প্রকৃতিদত্ত যে সকল জিনিস হইতে তাহারা প্রাণী-অস্তিত্ব মাত্র রক্ষা

করিয়া থাকে ( অর্থাৎ যাহা মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন করে ) সেইগুলিকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা যাইতে পারে।" এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল শক্তি মানুষের সম্পদ ব্যবহারের পথে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলিকে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা ( natural resistance ) বলা যায়।

আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি যে কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ হইতেই আমরা আমাদের অভাব মিটাইয়া থাকি; কিন্তু জিমারম্যান বলেন যে, আমাদের চাহিদা কতটা পূর্ণ হইবে তাহা নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক বাধা এই উভয়ের উপরে। অর্থাৎ কোন অঞ্চলের অধিবাসিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়া কতটা উন্নতি করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের কতটা প্রাকৃতিক সম্পদ আছে এবং সেই সম্পদের সম্যক্ ব্যবহারের পথে কতটা বাধা আছে তাহার উপরে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিদের তুলনায় মালভূমির অধিবাসিদের খনিজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করিবার সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি। মরুঅঞ্চলের অধিবাসদের তুলনায় নদী উপত্যকার অধিবাসিরা মৃত্তিকা সম্পদকে কাজে লাগাইবার সুযোগ পায় অনেক বেশি।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্ত্যদেশগুলিতে মানুষ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। মানুষের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, তাহার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও বাড়িয়াছে এবং তাহার কৃষ্টিও খুব উন্নত হইয়াছে। সে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে জল, স্থল এবং বাতাসকে যথাযথরূপে আপনার প্রয়োজন মিটাইবার কাজে নিয়োগ করিয়াছে। ইহার ফলে মানব সভ্যতা খুব আগাইয়া গিয়াছে একথা যেমন সত্য, তেমন মানুষ প্রকৃতির অনেক ক্ষতিসাধন করিয়াছে ইহাও সত্য। মানুষের কার্যকারিতার ফলে কোথাও তৃণভূমির স্থানে নগরী ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে, আবার কোথাও মরুপ্রায় ভূমিরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে যুগে যুগে সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর সম্পদের সম্যক্ ব্যবহারের দৃষ্টিতে দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ক্রমশঃই ত্বরান্বিত হইতেছে।

**Q. 5. Write a note on Flow and Fund resources. Give suitable examples.**

**[ প্রবাহমান ও গচ্ছিত সম্পদ সম্পর্কে লিখ। উপযুক্ত উদাহরণ দাও। ]**

**প্রবাহমান ও গচ্ছিত সম্পদ**—মানুষ সম্পদকে কাজে লাগাইয়া তাহার কৃষ্টির ( culture ) উন্নতি বিধান করিতে সর্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু তাহার অসুবিধা অনেক; কতকটা অসুবিধা তাহার বুদ্ধির দোষে হয় আবার কতকটা অসুবিধা প্রকৃতির নিয়মে হয়। যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ কাজে লাগাইতে চায়

তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সরবরাহ কখনও শেষ হইবার নহে ; যথা—সূর্যকিরণ, জলপ্রপাতের জল, কিংবা বৃষ্টির ধারা। এগুলিকে আমরা **প্রবাহমান সম্পদ** ( Flow resource ) বলিতে পারি। আবার কতকগুলি সম্পদ আছে যেগুলি সহজেই শেষ হইয়া যায় বটে, কিন্তু শীঘ্রই আবার তাহাদের পাওয়া যায় (renewable at short interval )—এগুলিও প্রবাহমান সম্পদ ( যথা—গাছ, মাটি ) ; তবে এগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া দরকার। গাছ কাটিয়া ফেলিলে বৃষ্টির জলে মাটি ধুইয়া যায় ; সে মাটি আর ২।৪ হাজার বছরের আগে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং মাটি ও অরণ্য সংরক্ষণ করা ( conservation ) খুব দরকার।

কতকগুলি সম্পদ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় ; যথা—কয়লা, খনিজ তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস প্রভৃতি। এবং এগুলি কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে আবার পাওয়া যাইবে না। কোটি কোটি বৎসরে কয়লা সঞ্চিত ও অঙ্গারীভূত হয়। সুতরাং এগুলি যেন ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকার মত—তুলিলেই শেষ হইয়া যায়। তাই ঐগুলিকে **গচ্ছিত সম্পদ** ( Fund resource ) বলা হয়। এগুলিকে ব্যবহারের সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যেন এগুলি—(১) অপ্রয়োজনীয়ভাবে অথবা বিকল্প ব্যবহার যোগ্য উপযুক্ত দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও খরচ করা হয় না ; (২) অপচয় না হয় ; (৩) ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খরচ করা হয়।

আবার কতকগুলি সম্পদ আছে যেগুলি খনি হইতে আর পাওয়া না গেলেও পৃথিবী হইতে নিঃশেষ হইয়া যায় না ; যথা—লৌহ ও তাম্র। এগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে গালাইয়া আবার ব্যবহার করা যায়। ইহাদের ব্যবহার আবর্তমানের নিয়মানুসারে চলে। ইহাদের ক্ষয় খুব কম। পারমাণবিক ইন্ধনগুলি ধাতুজাত বটে তবু উহাদের যোগান অফুরন্ত। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও প্রয়োগ বিদ্যার ফলে ক্রমশঃ সকল প্রকার পরমাণুই শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

**√Q. 6. Explain fully, the concept of conservation of resources** ( C. U. 1962 )

**[ সম্পদের সংরক্ষণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। ]**

**Or,……"the fundamental issue of conservation is the proper rate of exploitation and utilization of resources"**

( Burdwan B. Com. 1965 )

**সম্পদের সম্যক ব্যবহার ও সংরক্ষণ**—বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ও ভৌগোলিক ক্রেগ ডানকান "সংরক্ষণকে" ( conservation ) এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সম্পদকে এমন ভাবে ব্যবস্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহার দ্বারা মানুষের চাহিদা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মিটিতে পারে।" সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণ ( resource

conservation ) বলিতে আমরা এই বুঝি যে এমন কি বর্তমানের চাহিদার ( wants ) কিছুটা অপূর্ণ রাখিয়াও ভবিষ্যতের জন্য সাবধানে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন কিছু কিছু যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিল তখন ঐ সকল যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতে লাগিল। কুঠার দ্বারা অরণ্য ছেদন করিয়া—এমনকি পাহাড়ের গায়েও লাঙ্গল চালাইয়া সে ফসল উৎপন্ন করিল। ইহাতে সাময়িক ভাবে পণ্যের চাহিদা কিছু পরিমাণে মিটিল বটে কিন্তু পরবর্তীকালে অরণ্য ও মৃত্তিকার ক্ষয়ের ফলে বহুদেশে বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কুফল দেখা যাইতে লাগিল। বুদ্ধিমান মানুষ তখন বুঝিল কি ভুল সে করিয়াছে। সুতরাং, সে সম্পদ সংরক্ষণের জন্য আইন করিল, শিক্ষার ব্যবস্থা করিল এবং সম্পদের ক্ষয় নিবারণের জন্য সাধ্যমত সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিল।

সংরক্ষণের কথা আলোচনা করিলে মনে হয় যে ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং জাতীয় তথা মানবিক স্বার্থের মধ্যে একটা মূলগত সংঘাত রহিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে বর্তমান জগতে বড় বড় কোম্পানীগুলি ( যাহাদের কোন সম্পদ ব্যবহারের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ইজারার ব্যবস্থা পাওয়া আছে ) সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু পরিমাণে যত্নবান ; কিন্তু ইহা ঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা নয়, কারণ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কোম্পানী সুলভ মুনাফা-লাভের স্থান নাই। সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণ কেবল রাষ্ট্রই ভালভাবে করিতে পারে, অবশ্য এই রাষ্ট্র যদি প্রকৃত কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র হয় এবং সেই রাষ্ট্রের লোকেরা যদি প্রকৃত সম্পদ সচেতন হয় তবেই।

## প্রাকৃতিক সম্পদ ( Natural Resource )

**Q. 7. What is conservation of resource? Write brief notes on conservation of forest, soil, water and coal.**

**[ সম্পদের সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝ? অরণ্য, মাটি, জল এবং কয়লা সংরক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ। ]**

প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান অনেকক্ষেত্রেই অফুরন্ত নহে। তাই উহাদের ব্যবহার সাবধানে করা উচিত যাহাতে—অপচয় না হয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া বর্তমানে বরং একটু অসুবিধাও সহ্য করা হয় এবং ঠিক যেটুকু দরকার তাহার বেশি যেন সম্পদের ক্ষয় না হয়। এজন্য সকল উন্নত দেশের সরকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু আইনে সকল কাজ হয় না। এজন্য সম্পদ সংরক্ষণের চেতনাবোধ ও শিক্ষার প্রয়োজন।

(১) **অরণ্য সংরক্ষণ**—অরণ্য এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যাহার ক্ষয় নাই ;

কিন্তু মানুষের হঠকারিতার ফলে এই অরণ্যও শেষ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়। ভূমিক্ষয়, বন্যা, অনাবৃষ্টি এ সকলই অরণ্যনাশের পরোক্ষ ফল। বর্তমান যুগের মানুষ অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকটা সচেতন হইয়াছে বলা চলে। অরণ্য সংরক্ষণের দুটি দিক যথা—(ক) অরণ্য ছেদন বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অরণ্য রক্ষার জন্য দাবানল নির্বাপক বাহিনী গঠন করা এবং (২) অরণ্যরোপণ করিয়া নূতন অরণ্য সৃষ্টি করা এবং ক্ষয়িষ্ণু অরণ্যের উন্নতি বিধান করা। এই দুইই রাষ্ট্রের কর্তব্য। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশে অরণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা খুব সুন্দর। ভারতে এখনও অরণ্যরোপণ অপেক্ষা ছেদন দ্রুততর এবং রক্ষণের ব্যবস্থাও তেমন ভাল নহে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও যথেষ্ট আশাপ্রদ নহে।

(২) **মাটি সংরক্ষণ**—মাটি প্রকৃতির একটি মৌলিক দান। কিন্তু এই মাটি যাহা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফলে মাত্র কয়েক বৎসরে জলের সঙ্গে ধুইয়া যাইতে পারে বা হাওয়ায় উড়িয়া যাইতে পারে। ইহার নাম ভূমিক্ষয় ( Soil erosion )। এই ভূমিক্ষয় রোধ করা মোটেই সহজ নয়। প্রধানতঃ ঢালভূমিতেই ভূমিক্ষয় অধিক হয়। উপরের মাটি সবচেয়ে উর্বর। উহা জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ কিন্তু এই মাটি বর্ষার জলে ধুইয়া খাল নালা দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। ভূমি সংরক্ষণের দুটি দিক আছে—প্রথমতঃ, গুড়ির বাঁধ বা ঢাল দিয়া অথবা বৃক্ষরোপণ করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। এবং দ্বিতীয়তঃ, ভূমির উর্বরতা রক্ষণ করার জন্য শস্যাবর্তন প্রথার প্রচলন এবং প্রচুর পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার দেওয়া প্রয়োজন। ইহা ছাড়া সেচের জল হইতে মাটিতে যে ক্ষার জমে তাহাও ধুইয়া বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৩) **জল সংরক্ষণ**—পৃথিবীর সকল দেশে বৃষ্টিপাত সমান নহে। আসামে এবং উত্তর ব্রেজিলে সুপ্রচুর বৃষ্টি হয় কিন্তু আরব দেশে বৃষ্টি খুব কম। যে সকল দেশে বৃষ্টি খুব কম অথবা বৃষ্টির অনিশ্চয়তা খুব বেশি বা বৃষ্টি মাত্র কোন একটি ঋতুতেই হয়, বৎসরের অন্য সময় হয় না—সে সকল দেশে বৃষ্টির জল, নদীর জল, ভূনিম্নের জল, এমন কি প্রতিটি শিশির বিন্দুর সদ্ব্যবহার করার প্রয়োজন হইতে পারে। জল সংরক্ষণের বিষয়ে ইস্রায়েল একটি আদর্শ দেশ। এই অনাবৃষ্টির দেশে ইসরায়েলীরা জমিতে সোনা ফলাইয়াছে। জল সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা সাধারণতঃ উন্নত দেশগুলিতে করা হয় তাহা হইল—(ক) নদীর উচ্চপ্রবাহে বাঁধ দিয়া বর্ষার বাড়তি জল হ্রদের আকারে ধরিয়া এবং তাহা হইতে বিদ্যুৎ, সেচ, নৌবাহনাদির ব্যবস্থা করা (খ) খালের পরিবর্তে নলের সাহায্যে জমিতে সেচ দেওয়া ( Sprinkler irrigation )—ইহাতে অনেক বেশি জমিতে সেচ দেওয়া

যায় কারণ জলের অপচয় খুব কম হয়। (গ) ভূনিম্নে যাহাতে অধিক জল প্রবেশ করে তাহার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

(৪) **কয়লা সংরক্ষণ**— কয়লা শিল্পসভ্যতার নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু অথচ পৃথিবীর খুব কম দেশেই যথেষ্ট কয়লা আছে এবং খনির কয়লা তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইবারও সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া ভারত, জাপান প্রভৃতি যে সকল দেশে ভাল কয়লার যোগান খুব কম সে সকল দেশে সংরক্ষণ ব্যবস্থা খুব জোরদার করা দরকার। কয়লা সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে, যথা—

(ক) কয়লার খনিতে যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা কাটা এবং বালিদ্বারা গর্ত ভরাট করা। (খ) নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীর কয়লা ধুইয়া অনেকটা ছাইমুক্ত করিয়া ভাল কয়লার সংগে মিশাইয়া ধাতু শিল্পে কাজে লাগানো। (গ) রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ করা। ইহার ফলে কয়লা হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কাজে লাগে এবং কয়লার অপচয় কম হয়। (ঘ) উপজাত দ্রব্য কাজে লাগানো।

**Q. 8. Give a brief account of the growing resource consciousness in modern world.**

**[ আধুনিক জগতে সম্পদ-চেতনা বিকাশের বর্ণনা দাও। ]**

আমাদের এই পৃথিবী প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা। এই সম্পদ আহরণ করিয়া এবং তাহা শিল্পে কাজে লাগাইয়া আজ মানুষ বস্তুবাদী জগতে অতি উচ্চ স্থানের অধিকারী হইতে পারিয়াছে। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। আদিম যুগে বন্য মানুষ অরণ্যের অন্যান্য পশুর মতই দুর্গত জীবন যাপন করিত। ক্রমশঃ সভ্যতার বিকাশের ফলে এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান লোকের অনেক সুখ-সুবিধা হইল। তাহারা ক্রীতদাস বা সার্ফদের জমিতে খাটাইয়া নিজেরা প্রচুর ফসল ঘরে তুলিত কিন্তু দরিদ্রের কষ্টের সীমা ছিল না। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যযুগে এইরূপ অবস্থা ছিল।

ইহার পরের যুগ দেশ আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ। কলম্বস এবং আমেরিগো ভেসপুচি দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। ট্যাসম্যান ও কুক খুঁজিয়া বাহির করিলেন অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ। নূতন পৃথিবীতে সস্তায় উর্বর জমি এবং প্রচুর খনিজ সম্পদ মিলিল। কিছুকাল পরে একের পর এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সুরু হইল। কাপড় বোনার কল, লৌহ গলাইবার চুল্লী, ষ্টিম ইন্‌জিন এবং বিদ্যুতের প্রবর্তনে মনুষ্য সমাজের রূপ বদলাইয়া গেল।

যে সকল জিনিস পূর্বে অবহেলিত হইত তা সম্পদের মর্যাদা লাভ করিল। ভয়াবহ ও সুন্দর জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইল, মাটির বহু নীচে হইতে প্রাণদায়িনী সেচের জল, গ্যাস এবং খনিজ তৈল বাহির করা হইল। দেশে দেশে স্বাধীন ব্যবসার প্রসার হইতে লাগিল। সমৃদ্ধির বান ডাকিল।

ইতোমধ্যে ১৯১৪—১৮ এবং ১৯৩৯—৪৫ সালে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল। এই দুই যুদ্ধে সাবমেরিণের উৎপাতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা খুবই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ফলে মানুষ আরও সম্পদ সচেতন হয়। যুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্পদের যত ব্যাপক এবং নিবিড় ব্যবহার হয় অন্য সময় তাহা হয় না। কারণ, আধুনিক যুদ্ধে অসংখ্য প্রকার কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। খাদ্য উৎপাদন নিবিড়তর করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। সিরিয়ার মরুপ্রান্তরে লক্ষ লক্ষ বৃটিশ, মার্কিন, ভারতীয়, অষ্ট্রেলিয় ও নিউজিলণ্ডীয় সৈন্যদের জন্য তাজা সবজী ফলানো হইল। হাইড্রোপনিক্স বা মাটি বিনা চাষ-প্রথা প্রবর্তন হইল। জাপানীরা মালয় ও ইন্দোনেশিয়া অধিকার করিয়া লওয়ার ফলে ভারতে ও অন্যত্র টিন এবং রবারের অভাব দেখা দিল। তখন কৃত্রিম বস্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের পরের যুগে কৃত্রিম রবারের ব্যবহার স্বাভাবিক বৃক্ষজ রবারের ব্যবহার অপেক্ষা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইল।

আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রেও সম্পদ চেতনা নূতনভাবে দেখা দিল। ধনবাদী অর্থব্যবস্থার মধ্যেও মার্শাল, পিগু এবং কীনস রাষ্ট্রকর্তৃক সম্পদ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত দিলেন। মার্কসবাদী দেশগুলিতে সকল শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসিল। কারণ সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু। অত্যন্ত সাবধানতার সংগে জল সম্পদ, বনসম্পদ, কয়লা, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি সম্পদ ব্যবহার করা দরকার। নচেৎ প্রয়োজনের সময় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ঘটিতে পারে। আবার অনেক সম্পদ; যথা—বন, মাটি ও পশুপাখী পরস্পর নির্ভরশীল। অত্যন্ত সূক্ষ্ম উহাদের ভারসাম্য। মানুষের অতিমুনাফাবাজীর জন্য বা লোভের জন্য একটি জাতির ভবিষ্যৎ হয়ত অন্ধকার হইয়া যাইতে পারে। অনেক দেশেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা অপচয় হইয়াছে—ভারতের উৎকৃষ্ট কয়লা এইভাবে অনেক অপচয় হইয়াছে। তাই আজ সকল দেশের মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান যুগে উন্নতিশীল দেশগুলিকে পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত করার প্রয়াস দেখা দিয়াছে। এই পরিকল্পনার পূর্বে সম্পদের মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোন দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে তবে তাহা রপ্তানি করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। ভারত এখন তাহাই করিতেছে। ভারতে বর্তমানে ২১০০ কোটি টনে উৎকৃষ্ট এবং সর্বপ্রকার ধরিলে ৮৫০০ কোটি টনে আকরিক লৌহ আছে। অথচ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মাত্র বৎসরে দেড় কোটি টনে। বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের এইরূপ সুযোগ অনেক দেশেরই আছে। এই সকল সম্পদকে কাজে লাগাইয়া মানুষ জীবনধারণের মান উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

**Q. 9. What is "new attitude to resources"? Give the historical background of this new resource consciousness.**

**[ "সম্পদের প্রতি নূতন আচরণ" কাহাকে বলে? নূতন সম্পদ চেতনাবোধের ঐতিহাসিক ধারার ব্যাখ্যা কর। ]**

মানুষের সম্পদ চেতনা—পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যখন কম ছিল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল সেই তুলনায় অফুরন্ত তখন সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষ তেমন সচেতন ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ক্রমশঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। সম্পদ সংরক্ষণের ( conservation ) প্রয়োজনীয়তাও তাই দেখা দিয়াছে। এই সম্পদ চেতনার কারণ হইল—

(১) পৃথিবীতে নূতন উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা এখন খুব কম। মধ্য আফ্রিকা, রাশিয়া, কানাডা, ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি দেশ ছাড়া আর কোথাও এখন আবাদযোগ্য পতিত জমি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং, ভূমিসম্পদের যাহাতে অপচয় না হয়, যাহাতে উহার আরও নিবিড় ব্যবহার হয় সে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

(২) তিরিশ দশকের মন্দা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক বেকার সমস্যার ফলে সমগ্র বিশ্বে সম্পদ ব্যবহারের বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ অনুভূত হইতে থাকে।

(৩) বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগে সম্পদ চেতনা যুক্ত হয়। বর্তমানে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে ও সম্পদ চেতনা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের সংগে যুক্ত হইয়াছে।

(৪) সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে সরকার দেশের সম্পদ কাজে লাগাইবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এমনকি ধনবাদী দেশগুলিতেও মৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারগুলি সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও ক্রমশঃ সম্পদ-সচেতন হইতেছেন।

**Q. 10. What is the difference between physical presence and actual availabilities of resource? Is the distribution of natural endowment uniform all over the world?**

**[ সম্পদের অবস্থিতি এবং প্রাপ্তিযোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি? সারা পৃথিবীতে প্রকৃতির দান কি এক রকম? ]**

সমস্ত প্রকার সম্পদ, তাহা প্রাকৃতিক বা মানবিক যাহাই হউক, সকলই প্রকৃতির দান। প্রকৃতি যেখানে যাহা দিয়াছে তাহাই মানুষ ভোগ করে। কোথায় ভাল জমি বা কয়লার খনি বা জলশক্তি পাওয়া যাইবে তাহা প্রকৃতিই ঠিক করে,

মানুষ নহে। যে সকল অঞ্চলে জলবায়ু এবং ভূপ্রকৃতি সুবিধাজনক কেবল সেই সকল স্থানেই প্রচুর কর্মী বা শ্রমিক পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাকৃতিক সম্পদ একপ্রকার নহে। কোথাও কম, কোথাও বেশি। কোনখানে জমি বেশি উর্বর, কোথাও জলবায়ু ফসল চাষের পক্ষে ভাল, কোথাও বা ভাল নহে। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশি মাত্র চাষের যোগ্য। ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া অনুর্বর বালুকাময় বা প্রস্তরময় মরুপ্রান্তর বা বরফে ঢাকা জমি অথবা সুউচ্চ পর্বতমালা বিরাজমান। কোথাও একটু ভাল চাষের জমি নাই; আবার কোন দেশে লক্ষ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ব্যাপিয়া সুন্দর সবুজ মাঠ, উর্বর প্রান্তর, নাব্য নদী, বড় বড় কয়লার খনি ইত্যাদি আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে লোকবসতির যে তারতম্য দেখা যায় তাহা প্রাকৃতিক সম্পদের এই অসম বন্টনের জন্যই। এই জন্যই এক দেশের অধিবাসীদের জীবনধারণের মান উচ্চ এবং আর একদেশের অধিবাসীদের জীবনধারণের মান নিম্ন।

তাহা ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ এবং সমন্বয়ও সর্বত্র সুবিধাজনক হয় না। কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ (natural endowment) পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়, যথা—হাওয়া ও সূর্যের আলো। কিন্তু কোন কোন সম্পদ মাত্র দুএকটি দেশে পাওয়া যায়, যথা—নিকেল প্রধানতঃ কানাডায়; গন্ধক বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে এবং এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতু ক্রায়োলাইট একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। দুই বা ততোধিক খনিজ সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ একত্র পাওয়া গেলে শিল্প গঠনের পক্ষে সুবিধা হয়, যথা—লোহা ও কয়লা, বক্সাইট এবং জলশক্তি। এগুলির অবস্থান নির্ভর করে প্রকৃতির দানের উপর।

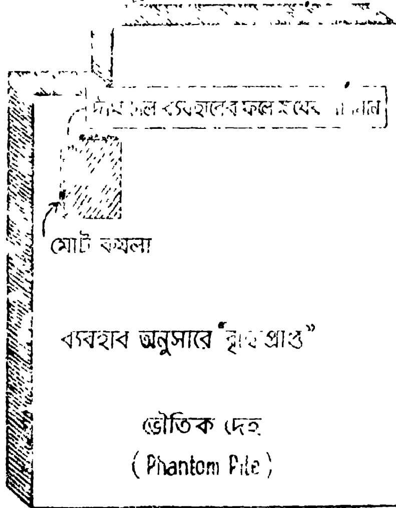
প্রাকৃতিক সম্পদ কেবল কোথাও থাকিলেই হইবে না পরন্তু তাহা অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে কাজে লাগানোর উপযুক্ত হওয়া চাই। লৌহ আকরিকে বেশি ফসফরাস অথবা কয়লায় বেশি গন্ধক (যথা—আসামে) থাকিলে তাহা অর্থনৈতিক দিক হইতে কাজে লাগানো সহজ হয় না।

পৃথিবীর নানা স্থানে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির যে তারতম্য দেখা যায় তাহা মূলতঃ প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টনের বৈশিষ্ট্য ও তারতম্যের জন্যই হয়।

**Q. 11. What are the poradoxes of nature? Why is it said that nature is constant and changing? What do you know of the concept of phantom resource?**

**[ প্রকৃতির প্রহেলিকা কি? প্রকৃতি কেন স্থির আবার পরিবর্তনশীল? ভৌতিক সম্পদ সম্পর্কে কি জান? ]**

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বন্ধন খুবই নিবিড়। ঠিক যেমন মাতা পুত্রকে স্নেহদান করেন, আবার শাসনও করেন, কুপুত্রের প্রতি বিরূপ হন; প্রকৃতিও সেইরূপ। প্রকৃতি মানুষকে জীবনধারণ করিতে সাহায্য করে। আলো, বাতাস, উর্বর জমি, জলপ্রপাত, কয়লাখান—এসকলই প্রকৃতির দান। আবার বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিও প্রকৃতির দান। আমরা প্রকৃতির এই পরস্পর বিরোধীরূপ সব সময় বুঝিতে পারি না। আমাদের কাছে উহা প্রহেলিকার ( paradox ) মত মনে হয়। বস্তুতঃ মানুষের কর্মক্ষমতার উপর প্রকৃতির দানের তাৎপর্য নির্ভর করে। মানুষ যদি উদ্যমশীল হয় তবে সে তাহার পরিবেশকে কাজে লাগাইয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে। আর সে যদি অকর্মণ্য হয় তবে পৃথিবীতে সে কোনক্রমে টিকিয়া থাকিতে পারে মাত্র।




প্রকৃতি মানুষকে অনেক সম্পদ দিয়াছে, অনেক বাধাও দিয়াছে। মানুষ যদি কর্মঠ ও বুদ্ধিমান হয় তবে বাধা অপসারিত হয় এবং সম্পদ কার্যকরী হয়। প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন নিত্যই চলিয়াছে—যদিও এই দুনিয়ার মোট জল, বায়ু, উত্তাপ প্রভৃতি একই আছে তবু স্থান ও কাল অনুসারে উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমাগতই ঘটিতেছে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে প্রকৃতির এ সকল দিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাহাদের প্রধান আকর্ষণ সম্পদের প্রতি। মানুষ সম্পদকে ক্রমশঃ নিবিড়ভাবে (intensively) কাজে লাগাইতেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়ণের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করিতেছে। সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ইহাই বড় কথা।

সম্পদ যদিও বাড়িতেছে না; বরং মানুষের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; ( পৃথিবীতে অবশ্য কোন সম্পদের শেষ হয় না। কোনটি; যথা—গাছ, দ্রুত আবার কোনটি, যথা—কয়লা বহুযুগ পরে পুনরায় সঞ্চিত হয় ) তবু সম্পদের কার্যকারিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অধ্যাপক জিমারম্যান দেখাইয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে যেখানে প্রতি কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার

জন্য ৭ পাউণ্ড কয়লা লাগিত এখন (১৯৫০ এর পরে) সেখানে লাগে মাত্র এক পাউণ্ড। সুতরাং, ব্যবহারের দৃষ্টি হইতে বলা চলে যে সম্পদের ভৌতিক দেহ ( phantom pile ) অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবহারের ফলে ক্ষয় যেটুকু হইয়াছে তাহা খুবই অল্প।

সুতরাং যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান খুবই সীমাবদ্ধ সেগুলি সম্পর্কেও চিন্তার কারণ নাই। মানুষ যদি তাহার যান্ত্রিক কর্মকুশলতা ক্রমশঃ বাড়াইয়া যায় তবে প্রকৃতির কৃপণতা সত্ত্বেও তাহার উন্নতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

**Q. 12. Give an account of the important uses and the sources of animate and inanimate energy.**

**[ জৈব ও অজৈব শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ]**

**জৈব ও অজৈব শক্তি**—কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞানীরা বস্তু ( matter ) ও শক্তির ( energy ) উৎসকে আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতেন। কিন্তু পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন ক্রমশঃ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যে কোন বস্তু হইতেই শক্তি উৎপন্ন হইবে। তবু ব্যবহারিক অর্থে এখনও শক্তি উৎপাদক দ্রব্য বলিতে আমরা জানি—(১) জান্তব ও উদ্ভিজ্জ শক্তি; যথা—মানুষ ও জন্তুদের পেশী হইতে উৎপন্ন শক্তি এবং বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত দাহিকা শক্তি। মানুষ, জন্তু এবং বৃক্ষের প্রাণ আছে। তাই এগুলি হইতে উৎপন্ন শক্তিকে জৈবশক্তি বা প্রাণশক্তি ( Animate energy ) বলা হয়।

(২) কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ শক্তি উৎপন্ন হয় কয়লা, খনিজ তৈল, স্বাভাবিক গ্যাস ও জলপ্রপাত হইতে। এগুলির জীবন নাই। তাই এই শক্তির উৎসগুলিকে অজৈব শক্তির উৎস ( Inanimate energy ) বলা হয়।

ব্যবহারের দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে আজকের জগতে অজৈব শক্তিরই প্রাধান্য। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য উন্নতিশীল দেশে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, ট্রাম, বিমানপোত, পাখা, কল-কারখানা, বিদ্যুৎচালিত নলকূপ ইত্যাদি চলে কয়লা, খনিজতৈল, জলশক্তি অথবা গ্যাসের সাহায্যে। কিন্তু এগুলি চালাইবার জন্য কেবল মানুষের বুদ্ধি শক্তিই যথেষ্ট নয়; তাহার পেশীশক্তিরও প্রয়োজন আছে। যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয় হউক না কেন তবু চালক না থাকিলে যন্ত্র চলে না।

শক্তি উৎপাদনের কাজে পশুদের আজও লাগানো হয়। তাহারা গাড়ি টানে, চাষের কাজে ও সেচের জল তুলিতে সাহায্য করে, তেলের ঘানি চালায় ইত্যাদি। বৃক্ষের কাঠ হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়, প্রয়োজন হইলে রেলইঞ্জিনও চালানো যায়। কাঠ কয়লার সাহায্যে আজও মহীশূরের ভদ্রাবতীতে ইস্পাত উৎপন্ন হয়। তবে উৎকৃষ্টতর শক্তির প্রবর্তনের ফলে ক্রমশঃ জৈবশক্তির

ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে এবং নিষ্প্রাণ বা অজৈব শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

পৃথিবীতে জৈব ও অজৈব কোন শক্তিরই অভাব নাই। এক সময় পণ্ডিতদের ধারণা হইয়াছিল বুঝি বা কয়লা শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু নূতন আবিষ্কার এবং কম কয়লার বেশি শক্তি উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করায় এ ভয় দূর হইয়াছে। সৌরশক্তি ও পরমাণুশক্তি অফুরন্ত। সুতরাং এবিষয়ে সভ্য মানুষ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

**Q. 13. What do you mean by the terms (a) Two-dimensional and (b) Three-dimensional land ?**

**[ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি বলিতে কি বুঝ ? ]**

**দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি-ব্যবহার**—মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ভূমি-ব্যবহারের ধারার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইতেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ অরণ্য হইতে ফল ও মূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহার পরের যুগে মানুষ বন্যজন্তু ও মৎস্য শিকার আরম্ভ করিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উৎপাদনের ভূমিকা গৌণ, আহরণ ও ধ্বংস করার ভূমিকাই মুখ্য। মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে প্রকৃতির অরণ্য, জীবজন্তু ও মৃত্তিকা ক্ষয় হইতে লাগিল। তবে ঐ যুগে লোকসংখ্যা ছিল নগণ্য ; তাই উহাতে জগতের খুব বেশি ক্ষতি হয় নাই।

মানব সভ্যতায় সর্বপ্রথম বিপ্লব আগুনের ব্যবহার এবং তাহার পরেই ফসল চাষ ও জীবজন্তু পালন করা। প্রথম দিকে মানুষের কাছে ভূমির ব্যবহার কেবল মাত্র কৃষিকার্য এবং গবাদি পশুপালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ সময় কেবল ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই ছিল মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইহাকে দুইদিক-সম্পন্ন জমি-ব্যবহার ( Two-dimensional land-use ) বলা হয়।

কিছুকাল পরে মানুষ জানিতে পারিল যে ভূমির নিম্নে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। তাই দৈর্ঘ্য প্রস্থের সঙ্গে ভূমির গভীরতাও যোগ হইল। কাজেই ভূমির তিনদিক কাজে লাগিল। ইহাকে তিনদিকসম্পন্ন ( Three-dimensional ) জমি ব্যবহার বলা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেখানেই থামিয়া থাকে নাই। আজ জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব তো বটেই, তাহা ছাড়া আবার উপরের বায়ুস্তরও শিল্পের কাজে অর্থাৎ নাইট্রোজেন আদি প্রস্তুতের কাজে লাগিতেছে। তাই আজ জমির ব্যবহারকে তিনদিক-সম্পন্ন বা ত্রিমাত্রিক ব্যবহার ( Three-dimensional use ) বলা হয়।

**Q. 14. What are the physical, human and cultural limitations of the cultivability of land ? How is culttivability of land determined in an exchange economy ?** ( B. Com. 1969 )

[ জমির কর্ষণযোগ্যতার প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক সীমারেখা কোথায় ? বিনিময় অর্থনীতিতে ভূমির কর্ষণযোগ্যতা কিরূপে নিরূপিত হয় ? ]

**Evaluate the land-use potentials in different parts of the world and discuss in this connection the agricultural limitation in terms of climate, soil, natural vegetation and landform.** ( B. Com. Part I 1963 )

কোন জমি কৃষিকার্যের উপযুক্ত কি না তাহা দেশ, কাল ও লোকবসতির পরিপ্রেক্ষিতে নিরূপণ করিতে হয় ; উহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। ভারতে যে রকম কম উর্বর জমিতে চাষ-আবাদ হয় আমেরিকায় সে ধরণের জমি চাষ করার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। আবার কঙ্গোতে যে সকল অত্যন্ত উর্বর জমি অকর্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে তাহা অন্য যে কোন দেশের লোক চাষ-আবাদের জন্য সাগ্রহে গ্রহণ করিবে।

মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশি জমি আবাদযোগ্য। আবাদের সম্পূর্ণ অযোগ্য জমিতেও হয়ত ভবিষ্যতে ফসল ফলিবে। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে কত পরিবর্তন সাধিত হইবে কে বলিতে পারে ?

পৃথিবীর যে সকল দেশে এখনও বহু কর্ষণযোগ্য জমি লোকাভাবে বা অর্থাভাবে অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেগুলি হইল—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ব্রেজিল, কঙ্গো, পূর্ব-আফ্রিকার দেশগুলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র। অপরপক্ষে, যে সকল দেশে ঘনবসতির চাপে কর্ষণের প্রায় অযোগ্য পাথুরে, পার্বত্য, বালুকাময় ও জলাভূমিতে মানুষ চাষ-আবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেগুলি হইল—ভারত, চীন, জাপান, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, পাকিস্তান, মিশর প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত দেশগুলিতে আরও জমিতে আবাদ করিয়া এবং একরপ্রতি ফলন আরও বৃদ্ধি করিয়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিতে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত করিয়া উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অপরাপর দেশগুলিতে বর্তমান

সভ্যতার মান অনুসারে জমির উৎপাদিকা-শক্তির প্রায় সর্বোচ্চ ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

**ভুমির কর্ষণযোগ্যতা** ( cultivability of land )—ভূমি প্রকৃতির দান। ইহার যোগান খুবই সীমাবদ্ধ; তাই উন্নত ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলিতে ইহার মূল্য খুব বেশি। কিন্তু সকল জমি তো সমান গুণসম্পন্ন নয়। পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ জমি কৃষির সম্পূর্ণ অযোগ্য। বস্তুতঃ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে উষ্ণ ও শীতলমরু, পার্বত্যভূমি এবং জলাভূমিগুলি কৃষির অযোগ্য হওয়ায় পৃথিবীর মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি জমি মাত্র চাষের যোগ্য। অবশ্য শহর ও শিল্পাঞ্চলে অনুর্বর জমিরও দাম অনেক।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্ষণ ও অকর্ষণযোগ্য জমির অনুপাত বিভিন্ন। ভারতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে শতকরা ৮০ ভাগের মত জমি কৃষিযোগ্য, যদিও উহার মধ্যে অনেক জমি ঠিক ভাল জমি নয় ( sub-marginal land )। কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশে যেখানে আবহাওয়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অথবা বৃষ্টির খুব অভাব এবং পাথুরে মাটি ব্যাপকস্থান জুড়িয়া আছে সেখানে মোট জমির ৪ অথবা ৫ ভাগ মাত্র কৃষিযোগ্য। জমি চাষ আবাদের জন্য যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে ভাল হয় সেগুলি হইল নিম্নরূপ :

(ক) **জলবায়ু**—ইহার মধ্যে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত, বৃষ্টির তীব্রতা ও ঋতুভেদে হ্রাসবৃদ্ধি, আকাশে মেঘের আবরণ, বায়ুতে জলকণার পরিমাণ, রৌদ্র বা সূর্যালোকের পরিমাণ ও তীব্রতা তুহিণ, কুয়াশা, তুষারপাত, উত্তাপের দৈনিক ও বার্ষিক তারতম্য ইত্যাদি বিচার্য। এগুলি অনুকূল হওয়া দরকার।

(খ) **মৃত্তিকা**—মৃত্তিকার গুণাগুণ বলিতে বুঝায় জমির খনিজ ও জৈব সম্পদ ( অর্থাৎ জমিতে নাইট্রোজেন, পটাশ, চুণ, পাতাপচা সার ইত্যাদির পরিমাণ ), মাটির জলধারণ ক্ষমতা বা প্রবেশ্যতা, জমি সহজে চাষ করা যায় কিনা, জমির ঢাল ইত্যাদি।

(গ) **ভুমির অবস্থান ও বন্ধুরতা**—জমির নিকটে নদী আছে কিনা; জমির কোনদিকে পাহাড় এবং কোনদিকে সমুদ্র ইত্যাদিও জমির উৎপাদিকা-শক্তি নির্ধারণ করে।

ভূমির কর্ষণযোগ্যতা কেবলমাত্র উপরিউক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির উপরেই নির্ভর করে না। বস্তুতঃ মানুষের বুদ্ধি ও কৃষ্টি এবং তাঁহার কর্মদক্ষতার উপরেও জমির কর্ষণযোগ্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে। যে ধরণের মাটিকে ভারতে আমরা চাষের অনুপযুক্ত মনে করি জার্মানী ও রাশিয়াতে মানুষ বিজ্ঞানের ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে হয়ত তাহা হইতেই সোনা ফলায়। আবার জমি কেবল উর্বর এবং

জলবায়ু সুবিধাজনক হইলেই জমি খুব চাষের কাজে লাগে না—প্রধান বিষয় হইল পণ্যের চাহিদা অর্থাৎ বাজার জাত করিবার সুবিধা। পণ্যের চাহিদা থাকিলে তবে জমি চাষ করা হয়; নচেৎ উহা কৃষিযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অনাবাদি পড়িয়া থাকে।

আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চাষ-আবাদের ভৌগোলিক সীমা বহুবিস্তৃত হইয়াছে। জলসেচ, জলনিষ্কাশন, পাহাড়ের গায়ে সোপান-কৃষির (terracing ব্যবস্থা, প্রচুর রাসায়নিক সার এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের আধুনিক নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে বর্তমানে এমন লক্ষ লক্ষ একর জমি কর্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়েছে, যাহা আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট আবাদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বিজ্ঞানের উন্নতি ক্রমশ: চলিতে থাকিলে আরও বহু জমি ক্রমশ: কৃষিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষের নির্বুদ্ধিতার ফলে ভূমিক্ষয় আদি নানা কারণে পৃথিবীতে অনেক কৃষিযোগ্য জমিও বর্তমানে এবং হয়ত চিরকালের জন্য অকৃষিযোগ্য হইয়াছে। তবে যে পরিমাণ আকর্ষণযোগ্য জমিতে মানুষ ফসল ফলাইয়াছে তাহার তুলনায় ঐ জমির পরিমাণ কম। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের পরিবর্তে সহযোগিতা করিয়া ভূমি-ব্যবহার সম্পর্কে মানুষ অনেক লাভবান হইতে পারে।

মানবিক সম্পদ ( Human resource )

**Q 15. Discuss cultivability of land with reference to conditions in exchange economy. (Burdwan 1968)**

[ বিনিময় নির্ভর অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভুমির কর্ষণযোগ্যতার বিষয় আলোচনা কর। ]

( Read answer to Q. 14 and also )

**বিনিময় অর্থনীতি ও জমি**—আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার সম্পদগুলি মানুষের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতেছে। জমি প্রকৃতির দেওয়া অমূল্য সম্পদ। জমির ব্যবহার খুব সাবধানে করা দরকার কারণ ইহার যোগান অফুরন্ত নয়। জমি চাষ করিয়া মানুষ তাহার খাদ্য ও পরিধেয় লাভ করে। কিন্তু পৃথিবীতে যত জমি আছে তাহার সকলই চাষ-আবাদ হয় না। বস্তুত: অর্ধেক জমিও আবাদ হয় না। ভারতে শতকরা ৪০ ভাগের মত জমি চাষ হয়, জাপানে ১২ ভাগ, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডায় ৩ ভাগেরও কম। মিশরে দশভাগের একভাগ জমি মাত্র চাষযোগ্য। আবার প্রাকৃতিক গুণগত দিক হইতে চাষযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বহু কোটি একর জমি অরণ্য বা তৃণভূমিতে ঢাকা বলিয়া চাষ হয় না। কেবলমাত্র ব্রেজিলের আমাজন

নদীর অববাহিকাতে যত উর্বর জমি আছে তাহা যদি চাষ করা হয় তবে ভারতের মত একটি জনবহুল দেশের খাদ্যের চাহিদা অনায়াসে মিটিতে পারে।

কিন্তু পৃথিবীর বহু স্থানে উর্বর জমিও চাষ হয় না কেন? অপর পক্ষে জাপানে এবং হল্যাণ্ডে নিবিড় কৃষিপদ্ধতির সাহায্যে একই জমি হইতে বছরে ৩।৪ বার বিপুল পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা হয়। কারণ অনেক, তবে প্রধান কারণ এই যে বর্তমান পৃথিবী বাণিজ্যপ্রধান। যেখানে কৃষিপণ্যের চাহিদা বেশি সেখানে বেশি খরচ করিয়াও জমি হইতে প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন করা হয়। আবার যেখানে কৃষিপণ্যের চাহিদা নাই অথবা উৎপন্ন করিলেও বাজারজাত করিবার খরচ অত্যধিক পড়ে সেখানে উর্বর জমিতেও চাষ হয় না।

বাণিজ্যপ্রধান কৃষির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উৎপাদনের এবং পরিবহণের ব্যয় কম হওয়া দরকার এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা থাকা চাই। আমাজন উপত্যকায় শ্রমিক খুব কম, বৃষ্টি খুব বেশি, রেলপথ নাই, রাস্তা নাই। সেখানে চাষ করিলে ধান, কোকো, ইক্ষু, রবার প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু এক হাজার মাইলের মধ্যে কোন বাজার নাই যেখানে ঐ সকল কৃষিপণ্য বিক্রয় হইতে পারে। দূর দেশে পাঠাইতে খরচ অনেক তাই সেখানে উর্বর জমিও অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। অপর পক্ষে ভারত, চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে অনুর্বর জমিতে চাষ করিলেও লোকসান হয় না, কারণ এই সকল দেশে পণ্যের ভাল দাম পাওয়া যায়।

**Q. 16. "In one sense land is fixed, in another it is not"—Discuss.**

**[ "এক অর্থে জমি সীমিত, অন্য অর্থে নহে"—আলোচনা কর। ]**

পৃথিবীতে মোট যত জমি আছে তাহার কিছু অংশ আবাদযোগ্য, কিছু অংশ চেষ্টা করিলে আবাদযোগ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ স্থানই চাষ-আবাদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কোথাও অতি উচ্চ পর্বতমালা, কোথাও পাথর আর বালিভরা জমি, কোথাও মাটি খুব উর্বর কিন্তু বৃষ্টি এতকম অথবা শীত এত বেশি যে চাষ-আবাদ করা সম্ভব নহে। সুতরাং, কি পরিমাণ জমি চাষের জন্য কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা প্রায় নির্দিষ্ট। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বড়জোর এই জমি সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কিন্তু অপরপক্ষে জমির ব্যবহারের দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইলেও উৎপাদিকা শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট নহে। কারণ, একই জমিতে অধিক শ্রমিক, কৃষিযন্ত্র, সার, সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে ফসলের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে;

পরন্তু বর্তমানে পৃথিবীর বহুস্থানে প্রচুর পরিমাণে উর্বর জমি রহিয়াছে কিন্তু তাহা চাষ-আবাদ হয় না। ইহার কারণ হয় শ্রমিকের নতুবা মূলধনের অভাব। উত্তর ব্রেজিল এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতে কোটি কোটি একর জমি রহিয়াছে যাহা খুবই উর্বর এবং বৃষ্টিরও অভাব নাই কিন্তু অন্যান্য কারণে ঐ সকল জমিতে আবাদ করা হয় না। যদি ঐ সকল স্থানে লোকবসতি বৃদ্ধি পায়, খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে ঐ সকল জমিতে আবাদ হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাপকভাবে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারের ফলে কানাডা এবং সাইবেরিয়ার বসতিবিরল অঞ্চলেও আজকাল চাষ আবাদ সম্ভব হইতেছে। একজন মাত্র লোক যন্ত্রের সাহায্যে একহাজার একর জমি আবাদ করিতেছে কানাডাতে এদৃষ্টান্ত খুব বিরল নহে। অষ্ট্রেলিয়াতে একজন মাত্র রাখাল শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে ৫০০০ ভেড়া অনায়াসে দেখাশুনা করে এবং শত শত মাইল তৃণভূমি পর্যটন করে। সুতরাং, মানুষের বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে জমির ব্যবহার নিবিড়তর করিবার এবং উৎপাদন বাড়াইবার অনেক সুযোগ রহিয়াছে। আসল কথা মানুষের উদ্যোগ। মানুষ যদি উদ্যমশীল হয় তবে সে সীমিত জমি হইতেও অনেক বেশি উৎপাদন বাড়াইতে পারে। একবিঘা জমি চারবিঘা জমির সমান কার্যকর হইতে পারে।

**Q. 17. Define optimum population. Discuss the factors which determine this with specific examples. (B. Com. Part I 1965)**

[ কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা কি? কি কি বিষয় ইহা নির্ধারণ করে? উদাহরণ দাও। ]

কাম্য জনসংখ্যা বলিতে আদর্শ ঘনবসতিকে বুঝায়। যে জনবসতি কোন একসময়ে কোন দেশে সুস্থ জীবনযাত্রা ও ভালো জীবনমান রক্ষণের পক্ষে সহায়ক তাহাকে কাম্য ( optimum ) জনবসতি বলা হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইহার পরিবর্তন হইতে পারে। বর্তমানে ব্রেজিলের লোকসংখ্যা ৮২ কোটি ( ১৯৬৯ )—মোটামুটি বৃহৎ জনসংখ্যা বলা চলে। কিন্তু ঐ দেশের বিশাল আয়তন, বিপুল খনিজ সম্পদ ও উর্বর ভূমি সম্পদের তুলনায় ঐ জনসংখ্যা খুব কম। যদি ঐ দেশটি আরও উন্নত হয় তবে সেখানে অনায়াসে ৪০ কোটি লোক ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা যায়। কাম্য জনসংখ্যা একটা কাম্য অবস্থা যাহা পরিবর্তনশীল। একদা ম্যালথাসের তত্ত্বের প্রচারের ফলে পৃথিবীতে যে নিরাশার সৃষ্টি হইয়াছিল কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব তাহাকে খণ্ডন করিতে কতকটা সফল হয়। কিন্তু ম্যালথাসের তত্ত্বের মত এই তত্ত্ব বাস্তব ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

( পূর্ববর্তী অংশের জন্য পরবর্তী প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য )

Q. 18. **Explain fully the concept of man-land ratio and indicate how far population optima can be explained in terms of ideal man-land ratios.**
**( Burdwan 1965 & C. U. B. Com. Part I. 1962 )**

**[ মানুষ ও জমির অনুপাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর এবং দেখাও কেমনভাবে আদর্শ মানুষ জমি-অনুপাত দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা ব্যাখ্যা করা যায় ? ]**

**মানুষ ও জমির অনুপাত**—পৃথিবীতে মানুষের বাস সর্বত্র সমান নহে ; কোথাও এক বর্গমাইলে এক হাজারের বেশি লোক বাস করে এবং তাহারা বেশ উচ্চমানের জীবনযাপন করে। যথা—হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম। আবার কোথাও ঐ একই প্রকার ঘনবসতিযুক্ত এলাকায় মানুষ দু'বেলা খাইতে পায় না ; যথা—কেরালা, জাভা ও দঃ চীন। কম বসতিযুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যেও ঠিক এই একই তারতম্য দেখা যায় ; যথা—নিউজিল্যাণ্ডের উচ্চমান জীবনযাত্রা এবং ট্যাঙ্গানিকার নিম্নমান জীবনযাত্রা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের ঘনবসতি ও ভৌগোলিক আয়তনের বিষয় জানিলেই সে দেশের লোকবসতি কাম্য স্তরে পৌঁছিয়াছে কিনা বুঝা যায় না। মানুষ ও জমির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে হইলে অর্থাৎ কত জমি (জমি বলিতে ত্রিমাত্রিক জমি—three-dimensional land বুঝিতে হইবে ) হইতে কত লোকের ভালভাবে চলিতে পারে ( optima ) তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে মানুষের দৈহিক ও বুদ্ধিগত সকল গুণাবলী এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইবার পথে যত প্রকার প্রাকৃতিক সুবিধা ও বাধা থাকা সম্ভব এবং মোট প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ—ইত্যাদির সমস্ত বিষয় লইয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। মানুষ ও জমির অনুপাত সম্পর্ক বলিতে ইহাই বুঝায়। এই তত্ত্ব কেবল জমির পরিমাণ ও মানুষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত নয় বরং উভয়েরই গুণের উপর—অর্থাৎ জমির কৃষিযোগ্যতা ও জনসংখ্যা পোষণের ক্ষমতার এবং মানুষের বুদ্ধি ও উদ্যমের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাই রচিত। ইহার দ্বারা লোকবসতির ঘনত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়।

ঘনবসতি কোথায় অতিরিক্ত তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে অনেক বিষয় অনুসন্ধান করা দরকার। কেবলমাত্র কোন দেশের আয়তন নয় ; এমন কি কোন দেশের কোন উর্বর অংশের আয়তন ও লোকসংখ্যাও ( যথা—ইটালির পো উপত্যকা ) সেই দেশের জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। আবার শুধু কোন জমির লোকসংখ্যা পোষণ করিবার ক্ষমতাই (carrying capacity ) দেশের সম্পদ নির্ধারণে যথেষ্ট নয় ; পরন্তু ঐ দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের উপার্জন এবং বৈদেশিক উপনিবেশের সম্পদের পরিমাণও ধরিতে হয়।

হল্যাণ্ড ও ব্রিটেন স্বদেশের জমির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। নরওয়ের তো জমির উর্বরতা ও অন্যান্য সম্পদ নগণ্য ; তবু ঐ দেশের জীবনযাত্রার মান এত উচ্চ কেন ? ইহার কারণ বাণিজ্য। পূর্বে এ কথা মনে করা হইত যে ঔপনিবেশিক দেশগুলি বুঝি বা প্রধানতঃ উপনিবেশগুলিকে শোষণ করিয়াই তাহাদের সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু উপনিবেশবাদ তো শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ভূতপূর্ব ঔপনিবেশিক ( colonial ) দেশগুলিতে সমৃদ্ধির জোয়ার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং কোন দেশে জনবসতির ঘনত্ব কত হওয়া উচিত তাহা মানবিক ও বৈজ্ঞানিক গুণগুলির বিকাশের উপর যত নির্ভরশীল প্রাকৃতিক সম্পদের সহজ লভ্যতার উপরেও প্রায় সেই পরিমাণেই নির্ভরশীল।

## কয়েকটি দেশের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি সাম্প্রতিক হিসাব

**Mid-year Estimate**

**( U. N. O Monthly Bulletin of Statistics : Feb. 1969 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| চীন | ৭০ কোটি | ব্রেজিল | ৮ কোটি |
| ভারত | ৪৬ „ | ব্রিটেন | ৫'৪ „ |
| সোভিয়েট রাশিয়া | ২৩ কোটি | পঃ জার্মানী | ৫'৬ কোটি |
| আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র | ১৯ „ | ফ্রান্স | ৪.৮ „ |
| জাপান | ৯.৬ „ | ব্রহ্মদেশ | ২'৪ „ |
| পাকিস্তান | ১০ „ | কানাডা | ১'৯ „ |
| ইন্দোনেশিয়া | ১১ „ | অষ্ট্রেলিয়া | ১'০ „ |

**Q. 19 Where do the great masses of population live in the world ? How do you account for their concentration ?**

**( C U. 1954 )**

[ পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক লোক কোথায় কোথায় বাস করে ? এই জনবসতির একদেশতার কারণ কি ? ]

পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫০ কোটির মত। এই বিপুল জনসমষ্টি পৃথিবীর সকল স্থানে সমানভাবে বাস করে না। কোথাও লোকবসতি খুব ঘন, আবার কোথাও শত শত বর্গমাইল স্থানেও লোকবসতি নাই। পৃথিবীর নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মানুষের বাস সবচেয়ে বেশি ঘন—(১) যবদ্বীপ, (২) চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং উপত্যকা, (৩) ভারতের গঙ্গা উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের তটভাগ (৪) দক্ষিণ ও মধ্য জাপান, (৫) বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও পশ্চিম-জার্মানী, (৬) উত্তর ইটালি, (৭) গ্রেটব্রিটেন, (৮) আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউইয়র্ক অঞ্চল এবং

(৯) মিশরের নীল-নদের উপত্যকা। এই সীমাবদ্ধ স্থানগুলি বাদে পৃথিবীর অন্যত্র লোকবসতি কম। সাইবেরিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিলের অনেক স্থানেই লোকের বাস নাই। সাহারা প্রভৃতি মরু অঞ্চল প্রায় জনহীন বলিলেই হয়।

মানুষ সাধারণতঃ সুবিধাজনক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া বাস করে। যে সকল স্থানে (ক) **মাটি উর্বর** ও যথেষ্ট **বারিপাত** হয়, অথবা নদী হইতে যথেষ্ট **জলসেচ** পাওয়া সম্ভব হয়, অথবা (খ) মালভূমি অঞ্চলে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি প্রচুর **খনিজ** ও যথেষ্ট **জলশক্তি** পাওয়া যায়, অথবা (গ) **যাতায়াত ব্যবস্থা** খুব সুন্দর অর্থাৎ তটরেখা বন্দর গঠনের উপযুক্ত, নদীগুলি বারমাস নাব্য এবং রেলপথ প্রস্তুতের সুযোগ রহিয়াছে, অথবা (ঘ) **জলবায়ু** মন্দোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর—সেই সকল স্থানেই লোকের বাস অধিক। এই সকল সুবিধার একত্র সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে সুযোগ-সুবিধা অধিক সেইখানেই মানুষের বাস অধিক হয়।

যবদ্বীপে লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে সহস্রাধিক। এখানকার আগ্নেয় মৃত্তিকা অসাধারণ উর্বর এবং বৃষ্টিপাত বারমাসই পরিমিতভাবে হয়। ইক্ষু, চা, রবার, ধান প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। খাদ্য যেখানে সহজে পাওয়া যায় স্বভাবতঃই মানুষ সেখানে যাইয়া বাস করে। তাহাছাড়া, উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে যবদ্বীপে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইয়াংসি, সিকিয়াং ও গঙ্গানদীর অববাহিকা খুব উর্বর এবং জলবায়ু কৃষিকার্যের উপযুক্ত হওয়ায় লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছে। চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদীর তীরে লোকবসতি এত বেশি যে উর্বর কৃষি জমিকে বাঁচাইবার জন্য মানুষকে নদীর জলের উপরেও (নৌকায়) বাস করিতে হয়। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের জলপথের সুবিধা, খনিজের বিশেষতঃ কয়লার প্রাচুর্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর প্রভাবে অভাবনীয় শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে। ফলে, লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এই অঞ্চলে অধিকাংশ লোকই শহরে বাস করে। কারণ কলকারখানাই এখনে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। উত্তর ইটালি (লম্বার্ডি) ও মিশরের নীলনদের উপত্যকা কৃষিপ্রধান দেশ; উভয় স্থানেই জলসেচের সুবিধা আছে এবং মাটিও খুব উর্বর। জাপানে লোকবসতি অত্যধিক হইবার কারণ নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখা ও বড় বড় শিল্পকারখানা গঠনের সুযোগ-সুবিধা। বন্দর গঠনের সুবিধা ও জলশক্তির নৈকট্যের জন্য নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউইয়র্ক শিল্প ও বাণিজ্যে খুব উন্নত হইয়াছে।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি অতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্য মানুষের বাসভূমি। এখানে সিন্ধু নদের বাম তটের পাঁচটি উপনদীর জলের প্রাচুর্য মানব সভ্যতার প্রথম হইতে নানা জাতির লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। গঙ্গা ও বামতটের (হিমালয় পর্বতজাত)

উপনদীগুলিও বারমাস প্রচুর জলবহন করে। ঐ জল পান করার জন্য, নৌবাহনের জন্য এবং জলসেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। বর্ষাকালে সমগ্র অঞ্চলের উপর দিয়া যখন মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় তখন নদীগুলি কূল ছাপাইয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে। বন্যার জলের সঙ্গে উর্বর মাটি নদীতটের জমিগুলিতে সঞ্চিত হয়। ঐ মাটির উর্বরতা অসাধারণ। সুতরাং, ঐ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই প্রতি বৎসর জমি হইতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। জীবনধারণের নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধার ফলে মৃত্যুহারও হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং বংশবৃদ্ধিও দ্রুত হইয়াছে। ভারত-পাকিস্তান উপ-মহাদেশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান, উত্তর বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, হুগলী নদীর অববাহিকা এবং উত্তর ভারতের সেচখালযুক্ত অঞ্চলগুলিতে লোকসংখ্যা অত্যধিক ঘন (প্রতি বর্গমাইলে প্রায় হাজার জন)। হুগলী নদীর অববাহিকায় লোকবসতি প্রধানতঃ শিল্প সমৃদ্ধির জন্য অধিক হইয়াছে, অন্যত্র কৃষিই জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণ। সুতরাং অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। মাত্র ২০ ভাগ লোক শহরে বাস করে।

**লোকবসতির বিন্যাস ( Settlement Patterns )**—কৃষি অঞ্চলে গ্রাম-গুলি নদীর তীর বরাবর অধিক দেখা যায়। অন্যত্রও সর্বত্রই ছোট ছোট গ্রাম ও নগর আছে। কিন্তু শিল্পাঞ্চলে বড় বড় শহর এবং তাহার নিকট পতিত জমি ও মনুষ্যবসতিহীন জলাভূমি দেখা যায়। কারণ প্রথমতঃ, কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত জলাভূমি ও অনুর্বর ভূমিতেই সাধারণতঃ কারখানা গঠন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, শহরে কল-কারখানা স্থাপিত হইলে নিকটস্থ গ্রামগুলির মানুষ কাজের জন্য, নিজেদের গ্রামগুলি ছাড়িয়া শহরে বসতি স্থাপন করে ; তাই গ্রামগুলি জনহীন হইয়া পড়ে। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশগুলির জনবসতি মানচিত্র লক্ষ্য করিলে ইহাই দেখা যায়।

### সাংস্কৃতিক সম্পদ ( Cultural resource )

**Q. 20. What do you know of the three worlds of space, people and industry ?**

**[ পৃথিবীর তিনটি রূপ—আয়তন, জনসংখ্যা ও শিল্পোন্নতি, এই সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ]**

অর্থনৈতিক ভূগোলের পাঠকদের কাছে আমাদের এই পৃথিবীর মূলতঃ তিনটি পরিচয় আছে। এই পরিচয় হল—(১) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক আয়তন ও আকার, (২) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট জনসংখ্যা এবং (৩) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতি।

যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানচিত্র একটি পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে আয়তন,

লোকসংখ্যা এবং শিল্পের গুরুত্ব অনুসারে স্থাপন করা হয় তবে পৃথিবীর চেহারাটা খুবই অদ্ভুত দেখাবে। পৃথিবীর মানচিত্র নানাভাবে আঁকা যায়। পৃথিবী তো সমতল নয় গোলীয়; সুতরাং সমতল ক্ষেত্রের উপরে তার সকল অংশের, বিশেষতঃ মেরুদ্বয় সন্নিহিত অংশের মানচিত্র আকার এবং আয়তন বজায় রাখিয়া আঁকা যায় না। ইদানিং উপগ্রহ (মানুষের তৈরী) হইতে ফটো তুলিয়া বিভিন্নদেশের ঠিক আকার আয়তনযুক্ত মানচিত্র হইতেছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর হইতেছে না। যাহা হউক মোটামুটিভাবে ঠিক আকার এবং আয়তনযুক্ত দেশগুলি পৃথিবীর একটি মানচিত্রে স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নে লোকসংখ্যা অনুসারে আকার ঠিক রাখিয়া এবং আয়তনের তারতম্য ঘটাইয়া যদি একটি মানচিত্র আঁকা যায় তবে তাহা বড় বিচিত্র দেখিতে হইবে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র বেলজিয়াম এবং জাপান বিরাট বড় হইবে, কারণ আয়তনের তুলনায় উহাদের লোকসংখ্যা খুব বেশী. অপরপক্ষে বিশাল অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং সাইবেরিয়া হইবে অতিক্ষুদ্র বিন্দুতে পর্যবসিত কারণ উহাদের জনসংখ্যা নগণ্য। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ হইবে পাকিস্তান অপেক্ষা একটু বড।

আবার শিল্প প্রগতি অনুসারে যদি পৃথিবীর দেশগুলির মানচিত্র আঁকা যায় তবে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি হইবে খুব ছোট; কারণ উহাদের শিল্প প্রগতি খুব কম। অপরপক্ষে ইওরোপের খুব ছোট দেশ; যথা—লাক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়াম হইবে বিরাট বড। ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার তুলনায় ভারত ও চীন হইবে অনেক ছোট। এমন কি ফ্রান্স এবং ইটালিও ভারত ও চীন অপেক্ষা বড় হইবে।

অর্থনৈতিক ভূগোলে পৃথিবীর আকার জনসংখ্যা এবং শিল্প প্রগতি ই মূল বিষয়বস্তু সুতরাং উহাদের তুলনামূলক আলোচনা ও মানচিত্র খুবই প্রয়োজন।

**• Q 21 What is the difference between demographic pattern and settlement pattern? How does demographic pattern affect the utilisation of natural resources?**

**[জনসংখ্যার এবং লোকবসতির রূপের মধ্যে পার্থক্য কি? জনসংখ্যার রূপ কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে তাহা উল্লেখ কর।]**

কোন দেশের জনসংখ্যার রূপ বলিতে সে দেশের মোট জনসংখ্যা, প্রতিবর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি, জন্মহার, সংখ্যাবৃদ্ধির হার এবং বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিগণের অনুপাতকে বুঝায়। অপরপক্ষে, লোকবসতির রূপ বলিতে মোট জনসংখ্যা, ঘনবসতি, গ্রাম ও শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা, উর্বর ও অনুর্বর অঞ্চলে বসতির তারতম্যের কার্যকারণ, বসতিবিস্তারের স্বরূপ ইত্যাদি বুঝায়।

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে লোকবসতি খুব কম ছিল। তখন মানুষ অরণ্যে বা তৃণভূমিতে দলবদ্ধভাবে পশুর মত বাস করিত। তাহাদের কোন ঘরবাড়ি ছিল না। পশুদের মতই তাহাদের জন্মহার ছিল অত্যন্ত বেশি এবং মৃত্যুহারও ছিল খুব বেশি—তাই মোট সংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হইত না। কিন্তু ক্রমশঃ মানুষ সভ্য হইল, চাষ-আবাদ আরম্ভ করিয়া গ্রামে গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিল। খাদ্যের সরবরাহ ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাবৃদ্ধি ক্রমশঃ দ্রুততর হইতে লাগিল। বর্তমানযুগে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অসাধারণ বৃদ্ধির ফলে মৃত্যুহার পৃথিবীর কোনদেশেই শতকরা ১০।১২ এর অধিক নহে। তাই কৃত্রিমভাবে জন্মহারও কমাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

জন্মহার কমার ফলে একদিকে যেমন অল্পবয়স্কদের সংখ্যা অনেক উন্নত দেশেই খুব কম হইতেছে অপরদিকে মানুষের পরমায়ুবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই বৃদ্ধ। তাহারা কাজকর্ম খুব কমই করিতে পারে। ইহার ফলে শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়াছে এবং সম্পদের ব্যবহার ব্যাহত হইতেছে। এইজন্য পশ্চিমের দেশগুলিতে কৃষি এবং শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য সকল দেশেই যে জন্মহার খুব কমিয়াছে তাহা নহে। অনেক অনুন্নত দেশে জন্মহার না কমার ফলে এবং মৃত্যুহার অনেক কমিয়া যাওয়ার ফলে Population explosion বা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ দেখা দিয়াছে। ভারতে গড়ে প্রতি বৎসরে শতকরা ২.৫ জন বাড়িতেছে। সিংহল, পাকিস্তান, মিশর এবং মধ্য আমেরিকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও অনেক বেশি। অপরপক্ষে ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপানে অনেক কম। উন্নত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড এবং আর্জেন্টিনার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত দ্রুত। কারণ ঐ দেশগুলিতে প্রচুর জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকায় ঐ সকল সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট শ্রমিক পাওয়া যায় না। তাই উহাদের জন্মহার কমাইবার প্রয়োজন হয় নাই।

লোকবসতির রূপ কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগোলিক পরিবেশের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। কোন দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক হয়; যথা—অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব ভাগে। এই লোকবসতির ঘনত্ব নিরূপিত হয় বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরতা, যাতায়াতের ব্যবস্থার সুবিধা ইত্যাদি কারণে।

লোকবসতির রূপ শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে একধরণের হয় আবার কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অন্য রকম হয়। শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে বড় বড় শিল্পকেন্দ্র ও শহরের আশেপাশে লোকের বাস অধিক হয়। অপরপক্ষে, গ্রামাঞ্চলগুলি সাধারণতঃ জনশূন্য

হয়। গ্রাম বলিয়া কিছু থাকেই না, বিচ্ছিন্ন দু'একখানি খামারবাড়ি এবং বাজার-শহর থাকে। অপর পক্ষে, উর্বর কৃষিপ্রধান সমভূমিগুলিতে; যথা—ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমিতে মোটামুটি সর্বত্রই গ্রাম দেখা যায়। তবে সেখানেও কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন যে সকল নদীতে বন্যা বেশি হয় তাহাদের নিকটে লোকবসতি কম হয়; অপর পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকাগুলি ঘনবসতিযুক্ত হয়। জল-সেচব্যবস্থার প্রসারের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের লোক জলসেচযুক্ত অঞ্চলে গিয়া বাস করে। ইহার ফলে ঐ অঞ্চলগুলি অধিক ঘনবসতিপূর্ণ হয়। মানুষ সেই কবে প্রাচীন যুগে তাহার যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের দেশ-ত্যাগ বন্ধ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর এক দেশ হইতে স্বাভাবিকভাবেই অন্য দেশে চলিয়া যায় প্রধানতঃ আর্থিক সুবিধার আশায়। এইভাবে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড ক্রমশঃ ইউরোপীয়দের বাসভূমি হইয়াছে। সুদূর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়রা বসতি স্থাপন করিয়াছে। মানুষের এই গতিশীলতা চিরদিন চলিতে থাকিবে।

**Q. 22. "Human culture is a composite reaction of mankind to its environment" Do you support this view? Do you think cultural transfer can be beneficial to a community? Give examples.**

**["মানব সংস্কৃতি মানুষের বাতাবরণের উপর জটিল প্রভাবের ফল-শ্রুতি"। সংস্কৃতির দেশান্তর কি একটি জনসমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে? উদাহরণ দাও।]**

মানুষের সংস্কৃতি (বা কৃষ্টি) তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে গড়িয়া উঠে। কোন সমাজের আচার-বিচার, আহার-বিহার, শিল্প-সভ্যতা, সুরুচি-কুরুচি, সবকিছুই জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূপ্রকৃতি, ধর্ম, সমাজগঠন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এমনকি একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে ধর্মের অনুশাসনও জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন কোন বিশেষ প্রকার মৃত্তিকা হইতে কোন বিশেষপ্রকার বৃক্ষের জন্ম হয়; তেমনই বিভিন্ন প্রকার পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার সংস্কৃতির জন্ম হয়।

প্রাচীনকালে যখন যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা ছিল না তখন মানুষ তাহার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিত। কিন্তু বর্তমান যুগে যানবাহন ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতি হওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক জাতি আর এক জাতির অনুকরণ করিতেছে, ভাল জিনিস গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এই আদান-প্রদানের একটা সীমা আছে এবং উহা

ছাড়াইয়া গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে।

**সংস্কৃতির স্থানান্তর ( Cultural transfer )**—আমেরিকার-যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর একটি উন্নতিশীল দেশ। তাহারই প্রভাবাধীন দেশ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র দ্বীপ পোর্টোরিকো। এই পোর্টোরিকো অনুন্নত দেশ। যুক্তরাষ্ট্র বদান্যতার সহিত এই দেশকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি এই দেশে প্রয়োগ করিল। ফলে পোর্টোরিকোর অর্থনৈতিক তথা সমাজ-ব্যবস্থাই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও পোর্টোরিকোর জলবায়ু বিভিন্ন, জনশক্তিও এক প্রকার নয়, ফসলও আলাদা—সুতরাং এই দুই দেশে জীবন-ধারণের, বা ব্যবসা-বাণিজ্যের এক নিয়ম চলিতে পারে না*

ভারতেও প্রাচীনকালে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আর্যগণের প্রভাবে আসিয়া পার্বত্যভূমির সাঁওতাল, ভীল আদি আদিবাসিগণ চাষ-আবাদ আরম্ভ করে। কিন্তু মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলি চাষ-আবাদের উপযুক্ত স্থান নহে। তাই কয়েক বৎসরের মধ্যেই-ভূমি-ক্ষয়ের ফলে বিপর্যয় দেখা দিল। অস্ট্রেলিয়ার "বুশম্যানদের" সভ্য করার ইতিহাসও এইরূপ করুণ। সুতরাং সংস্কৃতির স্থানান্তর সহজসাধ্য কাজ নহে। খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া এ কাজে হাত দেওয়া উচিত।

**Q. 23. What is the relation between culture and agriculture ? Give some examples of migration of flora and faune.**

**[ সংস্কৃতি এবং কৃষির মধ্যে সম্পর্ক কি? উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর দেশান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দাও। ]**

সংস্কৃতি এবং কৃষিকার্যের মধ্যে যোগসূত্র অতি নিবিড়। প্রাচীনকালে মানুষ যখন কৃষিকার্য শিখে নাই তখন তাহার জীবনযাত্রা ছিল কৃষ্টিহীন, বন্য, বর্বর। কৃষিকার্যই সভ্যতার প্রথম সোপান। চাষআবাদ করার ফলে মানুষের যাযাবরত্ব, এবং খাদ্য আহরণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা অনেক পরিমাণে দূর হইল। সে গ্রামে ও শহরে সামাজিক জীবন গঠনের সুযোগ পাইল, চিন্তা করিবার, কলাবিদ্যা চর্চার অবসর পাইল। এইভাবে মানব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। কৃষিকার্য বর্তমান সমাজেও সুস্থ সবল জীবনধারার ধারক ও বাহক।

মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে তাহার বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পাইল এবং এইভাবে

---

*. সম্প্রতি পোর্টোরিকোর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। এ সম্পর্কে ১৯৬২ সালের শেষের দিকে Readers Digest পত্রিকায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষিকার্যের উন্নতি হইতে লাগিল। একদেশের শস্য, বনস্পতি আর এক দেশে প্রবর্তিত হইতে লাগিল। একদেশের গোরু-ভেড়া আর এক দেশে লাইয়া যাইয়া পশুচারণ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করা হইল। এইভাবে আজ সারা দুনিয়াতে সবকিছু একাকার হইয়া গিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমেরিকা হইতে এদেশে আসিয়াছে ভুট্টা, তামাক, টমেটো। আর ইওরোপ হইতে আমেরিকায় গিয়াছে গম, যব, গোরু, ভেড়া ইত্যাদি। ভারতীয় গরু গিয়াছে ব্রেজিলে। স্পেনের মেষ গিয়াছে অষ্ট্রেলিয়াতে। এক দেশের জীবজন্তু ( fauna ) ও গাছপালা ( flora ) অন্য দেশে আজও চালান যাইতেছে। সংস্কৃতির অগ্রগতির বিরাম নাই।

**Q. 24. What is the relation between culture and machine ?**
**[ সংস্কৃতি এবং যন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কি ? ]**

বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ বা যন্ত্রসভ্যতার যুগ। আধুনিক যন্ত্রের প্রবর্তনের আগেও পৃথিবীতে সংস্কৃতি ছিল। বস্তুতঃ যখনই মানুষ দলবদ্ধভাবে ঘর বেঁধে গ্রাম সভ্যতা গড়ে তুললো তখনই তার জীবনের স্থূল কার্যকলাপের উপরে সূক্ষ্মতর অনুভূতির জন্ম হল, তার সংস্কৃতির সূত্রপাত হ'ল। প্রাচীনকালে যেসকল গ্রাম ছিল সেগুলি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। মানুষ নদীর তীরে ঘর বাঁধিত, সে ঘরও প্রস্তুত হইত বাঁশ, তালপাতা ইত্যাদি বৃক্ষজ উপকরণ হইতে। পথঘাটও ছিল প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। তাহার পরে উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে দেশে শক্তিচালিত যন্ত্রের প্রবর্তন হইল। কারখানার চিমনির ধূম্রজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রারও পরিবর্তন হইতে লাগিল।

বর্তমানে আমরা যে যন্ত্রযুগে বাস করিতেছি তাহা আমাদের প্রকৃতি হইতে বহুদূরে ঠেলিয়া দিতেছে। আজ মানুষ তাহার বলবিদ্যার বলে প্রকৃতির চেহারাই বদলাইয়া দিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের দামোদর উপত্যকায় আজ যদি কেহ যায় তবে সে বিশ্বাসই করিতে পারিবে না যে এ সেই একই স্থান। বড় বড় বাঁধ এবং কৃত্রিম হ্রদ, বিরাট বিরাট শিল্প নগর, শত শত মাইল পাকারাস্তা আর রেলপথ। যেন অন্য দেশ।

নিত্য নূতন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মানুষের সমাজজীবনে এক বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। ক্রমাগত নূতন ধরনের আরও উন্নত যন্ত্রাদির ব্যবহারে সমাজে ভাঙ্গাগড়ার তরঙ্গ প্রতিনিয়ত চলিয়াছে। যে জমি কখনও চাষ হইবে কেহ ভাবে নাই তাহাও আবাদ হইতেছে। মরুভূমি শস্যশ্যামল হইতেছে। পৃথিবীর উপরের এবং মনুষ্য সমাজের ভিতরের চেহারা বদলাইতেছে। বর্তমান সভ্যতার উপরে যন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। মানুষ আজ অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রের দাস হইয়াছে। মানুষের ঐহিক

সুখ-সুবিধাও প্রত্যেকটি উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের ফলে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার সামাজিক চেতনারও পরিবর্তন হইতেছে। ইহাই মানুষের সংস্কৃতিতে যন্ত্রের অবদান বলা যাইতে পারে।

**Q. 25. "Man is a product of the earth's surface." Do you agree with this statement? Give illustrations from India to show that man's life is influenced by the physical environment.**

**Or, Describe with suitable examples, the influence of geographical environment on the economic and commercial activities of man. (C. U. 1959)**

**[ উপযুক্ত উদাহরণ সহকারে দেখাও কেমন করিয়া ভৌগোলিক বাতাবরণ ( পরিবেশ ) মানুষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে। ]**

**মানুষ ও তাহার পরিবেশ**—মানব সভ্যতার আজ অসাধারণ অগ্রগতি হইয়াছে, মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আজ তাহাকে অমেয় শক্তির অধিকারী করিয়াছে। পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া তাহার যাত্রা সুরু হইয়াছে অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে। কিন্তু তবুও মানুষ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারে নাই—বোধ হয় কোনদিন পারিবেও না। মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া কিংবা হয়ত পরিবেশের সামান্য পরিবর্তন ঘটাইয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইতে পারে ; কিন্তু পরিবেশের প্রভাবকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

মানুষের জীবন সর্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে অথবা সমভূমিতে, স্থলভাগে অথবা মহাসাগরে, সভ্যতার চরম শিখরে অথবা আদিম যুগের গহণ অন্ধকারে মানুষ সর্বত্রই এবং সর্বদাই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ; তবে অসভ্য অরণ্যচারী মানুষ যেমন প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে, সভ্য মানুষের নির্ভরশীলতা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু সভ্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও প্রকৃতির প্রভাব অনিবার্য। মানুষের জীবন যে সকল* প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় সেগুলি হইল :—

* প্রাকৃতিক পরিবেশ ( Physical environment ) এবং ভৌগোলিক পরিবেশ ( Geographical environment )—এই দুইটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভৌগোলিক পরিবেশ বলিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ তো বটেই তাহা ছাড়াও মানব সভ্যতার পরিবেশের ( Cultural environment ) কয়েকটি বিষয়ও ( যথা : পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নগর জীবনের প্রভাব ) ধরিতে হইবে।

(১) ভূ-প্রকৃতি, (২) অবস্থান, (৩) জলবায়ু, (৪) মাটি, (৫) উদ্ভিজ্জ, (৬) জীবজন্তু প্রভৃতি। মানুষের জীবনের উপর ইহাদের প্রত্যেকটিরই যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান।




মানুষ ও তাহার পরিবেশ

(১) **ভূ-প্রকৃতি**—মানব জীবনের উপর স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব আছে। ভূ-প্রকৃতি বহুপ্রকার হইতে পারে; যথা—পার্বত্য-ভূমি, সমভূমি, মালভূমি ইত্যাদি।

যেখানে ভূ-প্রকৃতি **পর্বতময়** সেখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ অনগ্রসর। কারণ ঐ সকল অঞ্চলে চলাফেরা করা শ্রমসাধ্য। পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত না হইলে সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয়। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কর্মঠ ও দুঃসাহসী হয়। সেইজন্য নেপাল ও স্কটিশ হাইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। অবশ্য উন্নতিশীল পার্বত্য দেশ যে নাই তাহা নহে। পার্বত্য দেশ হইলেও সুইজার-ল্যাণ্ড খুব উন্নতিশীল দেশ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সুইস্ জাতির জীবনধারণ পদ্ধতির উপর এবং তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যের উপর পার্বত্য প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। পার্বত্য দেশে ভারী জিনিস বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং সুইজারল্যাণ্ডে ক্ষুদ্রাকার শিল্পই অধিক। ঘড়ি প্রস্তুত করিতে সামান্য ইস্পাত লাগে, কিন্তু দক্ষতার প্রয়োজন খুব বেশি। পার্বত্য ভূমিতে পশুচারণ সম্ভব। **মালভূমির** মাটি সাধারণতঃ অনুর্বর এবং পরিবহণ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। সুতরাং পশুচারণ, অরণ্য হইতে কাঠ সরবরাহ ও খনিজসম্পদের ব্যবহার মালভূমির অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজই মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়, কারণ পার্বত্যভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া মালভূমির সৃষ্টি হয়। এই ক্ষয়ের ফলে অভ্যন্তর ভাগের খনিজ ভাণ্ডার

মাটির নিকটে বা উপরে আসে। তখন উহা আহরণ করা সহজ হয়। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি ও যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাপালাশিয়ান মালভূমি খনিজ সমৃদ্ধ।

**সমভূমি** সাধারণতঃ উর্বর হয়, সুতরাং সেখানে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া, সমভূমিতে পরিবহণ ব্যবস্থা খুব উন্নত হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলির বিকাশ নদীমাতৃক সমভূমিতেই সংঘটিত হইয়াছিল। [ বিস্তারিত বিবরণের জন্য Q. 29. দ্রষ্টব্য। ]

**তটভাগের** প্রভাবও মানুষের জীবনের উপর কম নহে। ভগ্ন তটভাগ বন্দর গঠনে সাহায্য করে। সমুদ্র দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন হয় এবং অধিবাসীরা ভাল নাবিক হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে ও জাপানের তটভাগ ভগ্ন বলিয়া ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা ব্যবসাবাণিজ্য, নৌ-নির্মাণ ও মৎস্য ব্যবসায় খুব নিপুণ। অপরপক্ষে, আফ্রিকাস্থিত ঘানার তটভাগ সরল ও উপকূলের জল অগভীর হওয়ায় বন্দর গঠন সহজ নহে। কৃত্রিম বন্দর গঠন ব্যয়সাধ্য। তাই ঐ দেশের বাণিজ্যিক উন্নতি সম্ভব হয় নাই। নদীমুখের গভীরতা ও প্রসারতা বন্দর গঠনে সাহায্য করে। ইংল্যাণ্ডে এরূপ নদী অনেক আছে।

(২) **অবস্থান**—কোন দেশ যদি জনবহুল অঞ্চলে, সমুদ্র-তটে বা প্রধান বাণিজ্যপথের সন্নিকটে অবস্থিত হয় তবে ঐ দেশের উন্নতি হওয়া সহজ। অবস্থান নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে, (১) দ্বৈপ, (২) উপদ্বৈপ, (৩) তটসংলগ্ন ও (৪) মহাদেশীয়। ইংল্যাণ্ড উত্তর সাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপ। সুতরাং ইহার জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন এবং তটভাগ পোতাশ্রয় নির্মাণের উপযোগী। ইউরোপ মহাদেশ নিকটে হওয়ায় ইহা জনবহুল অঞ্চলের প্রতিবেশী। আটলাণ্টিকের অপর পারে শিল্পোন্নত এবং কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তর আমেরিকা মহাদেশ। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের উন্নতি সহজেই সম্ভব। কিন্তু পৃথিবীর একপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান মোটেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল নহে; সেইজন্যই সেখানে এখনও ব্যবসা-বাণিজ্য খুব উন্নতি লাভ করে নাই। তবে মানুষের যান্ত্রিক প্রগতি এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছে। উপদ্বৈপ অবস্থান (যথা—দক্ষিণ ভারত) স্থল-বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য উভয়েরই অনুকূল। তটসংলগ্ন স্থানগুলির অধিবাসীরা ভাল নাবিক হয়। নরওয়ে এইরূপ তটসংলগ্ন দেশ। তিব্বত বা মঙ্গোলিয়ার মত যে সকল দেশ মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত সে সকল দেশে বৃষ্টি কম হয় এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই প্রখর হওয়ায় কৃষিকার্য ভাল হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও নানা অসুবিধা থাকে। এইরূপ অবস্থান বাণিজ্যের পক্ষে অসুবিধাজনক।

(৩) **জলবায়ু**—জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনধারণে সহায়তা অথবা প্রতিকূলতা করে। মৃদুশীতল জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর; এবং উহা কর্মে উৎসাহ যোগায়। গ্রীষ্ম-প্রধান জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এখানকার অধিবাসীদের কর্মে উৎসাহ কম। আবার অতিরিক্ত শীতেও কাজ করা যায় না। জমি বরফে ঢাকিয়া থাকায় চাষবাস অসম্ভব হয়। নদী ও সমুদ্রে বরফ জমিয়া যাওয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থাও গড়িয়া তোলা যায় না। বৃষ্টিপাত মানুষের জীবনকে যত বেশি প্রভাবিত করিয়াছে অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা তত বেশি প্রভাবিত করে নাই। গ্রীষ্মপ্রধানদেশে ৫০° সেন্টিমিটারের কম এবং ২৫০° সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হইলে ঐ উভয় অঞ্চলই মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ প্রথমোক্ত অঞ্চলে মরুভূমি ও শেষোক্ত অঞ্চলে দুর্ভেদ্য অরণ্যভূমি বা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি গড়িয়া উঠে। যে দেশ শীতপ্রধান সেখানে ৪০° সেন্টিমিটার হইতে ১০০° সেন্টিমিটার বারিপাতযুক্ত স্থানগুলিই কৃষিকার্য প্রভৃতি উপজীবিকার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। [ বিশদ বিবরণের জন্য জলবায়ু অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ]

(৪) **মাটি**—জমির উর্বরতার উপর অনেকাংশে কৃষিকার্যের সাফল্য নির্ভর করে। এবং কৃষিকার্যের সাফল্যের উপর নির্ভর করে লোকবসতি। অনেক স্থানের মাটি মৃৎশিল্প গঠনেও সাহায্য করে। [ বিশদ বিবরণের জন্য মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ]।

(৫) **উদ্ভিজ্জ**—জলবায়ু এবং মাটির প্রভাবেই উদ্ভিদের জন্ম। উদ্ভিদও আবার বারিপাতের পরিমাণ এবং মাটির উর্বরতা রক্ষণে সাহায্য করে। মানুষের প্রধান খাদ্যগুলি এই উদ্ভিদ জগৎ হইতে পাওয়া যায়। উত্তাপ ও বারিপাতের তারতম্য হিসাবে নানা স্থানে নানারকম গাছপালা জন্মে। শীতপ্রধান অঞ্চলে সরলবর্গীয়, গ্রীষ্মপ্রধান ও অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ; কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে পাতাঝরা বা পর্ণমোচীবৃক্ষ এবং অত্যল্পবারিপাতযুক্ত অঞ্চলে কাঁটাগাছ ও তৃণভূমি দেখা যায়। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠন ও সভ্যতাও দেখা যায়; যথা—অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, মানুষের আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য।

(৬) **জীবজন্তু**—মানুষের নানাপ্রকার খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় জীবজন্তু হইতে পাওয়া যায়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, চামড়া, রেশম প্রভৃতিকে বাদ দিয়া মানব-সভ্যতার কথা চিন্তা করা যায় না। যে সকল প্রাণী মানুষের প্রয়োজনে আসে তাহাদের অধিকাংশই তৃণভুক। সুতরাং তৃণভূমিগুলিতেই বন্য অথবা গৃহপালিত অবস্থায়, উহাদিগকে অধিক দেখা যায়। তৃণভূমিবাসী মানুষের জীবনের প্রায় সকল প্রয়োজনই প্রাণিজগৎ হইতে মিটানো হয়। উত্তর আমেরিকার বিভার

( Beaver ) নামক জন্তু মাটি কাটিয়া বাঁধ নির্মাণ করে এবং ভূ-প্রকৃতির নানাপ্রকার পরিবর্তন সাধন করে, আমাদের দেশে কেঁচো ( earthworm ) জমির উর্বরতা রক্ষা করিতে সাহায্য করে।

প্রাচীনকালে প্রকৃতির উপর মানুষ যেমন সোজাসুজি নির্ভর করিত, বর্তমান সভ্য মানুষ তেমন করে না সত্য ; কিন্তু মানুষের জীবন এখনও প্রকৃতির উপর নানা দিক দিয়া নির্ভরশীল ; আর এই নির্ভরশীলতা বোধহয় চিরদিনই থাকিবে।

*মানবজীবনের উপর **সাংস্কৃতিক পরিবেশ** যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নগর জীবনের প্রভাবও আমাদের জীবনে কম উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমান যুগে রেলপথ, খাল এবং পাকারাস্তাগুলি প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশেরই অঙ্গীভূত হইয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাপনে পরিবহণের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া বাণিজ্য-ভিত্তিক কৃষি অথবা শিল্পগঠন সম্ভব নয়। বর্তমান নগর জীবনও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সম্ভব হইয়াছে। নগরের সুখ-সুবিধা এবং অসুবিধা সর্বত্রই ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইওরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে সর্বত্রই রেলপথ ও পাকারাস্তার ঘন জাল বিস্তৃত হইয়াছে। এইগুলির মাধ্যমে গ্রাম ও নগরজীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

**Q. 26. Critically examine the correlation between nature and human economic activities. (Burdwan 1968)**

**[ প্রকৃতি এবং মানুষের অর্থনৈতিক বৃত্তি এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের বিষয় সমালোচনা কর। ]**

কোন বিখ্যাত ভৌগোলিক বলিয়াছেন Man is the product of the earth's surface. কিন্তু সত্যই কি তাই ; সত্যই কি মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য জড় ও জৈব পদার্থের মত কেবল পৃথিবীজাত মাত্র ? এই পৃথিবীর সম্পদের ব্যবহারে তাহার কিছু ভূমিকা আছে বই কি ? এ কথা সত্য যে ইতিহাসের বিবর্তনে পৃথিবীর বুকে প্রথমে জন্মলাভ করে গাছপালা, জীবজন্তু এবং সকলের শেষে মানবজাতি। কিন্তু আজ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া উঠিয়া তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার লইয়াছে।

বস্তুতঃ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্তুই হইল (ক) মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপরে প্রকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ এবং (খ) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য মানুষের অবিরাম প্রগতির পর্যালোচনা করা।

* এই অংশ Physical factors of environment নহে।

**প্রকৃতির প্রভাব**—মানুষের জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব অনিবার্য। কারণ মানুষ প্রকৃতির সন্তান। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান এবং পরিধেয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। যদিও বর্তমান যুগের সুসভ্য বিজ্ঞান-সচেতন মানুষ প্রকৃতির উপরে আর প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশী নির্ভর করে না, তবুও তাহার জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। শীতপ্রধান দেশে পশমবস্ত্র দরকার তাই সেখানে পশম শিল্পের বিকাশ দেখা যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু রবার ও ইক্ষু চাষের উপযুক্ত। পার্বত্য অঞ্চলেই জলবৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। সমুদ্র তটভাগে মৎস্য শিল্প গড়িয়া উঠে। এই সকল প্রাকৃতিক প্রভাব মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাইয়া মানুষ তাহার অর্থনৈতিক প্রগতির পথ তৈয়ারি করিয়া লয়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সহযোগিতার ফলেই সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।

মানুষের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায়। ভূ প্রকৃতির প্রভাব, জলবায়ুর প্রভাব, নদীর প্রভাব, সৈকতরেখার প্রভাব, অরণ্যের ও খনিজ সম্পদের প্রভাব মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ভূ-প্রকৃতির প্রভাবের ফলে পর্বতবাসী মানুষ নির্ভর করে গোচারণ, ক্ষুদ্রশিল্প, ভ্রমণ শিল্প ও অরণ্য সম্পদের উপর; অপরপক্ষে, নদী উপত্যকাবাসী মানুষ নির্ভর করে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। আবার মালভূমিতে খনিজ সম্পদই প্রধান। ভগ্নতটরেখা বন্দর গঠনের অনুকূল বলিয়া মানুষ সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া তোলে। অরণ্যের অবস্থানের ফলে কাঠ চেরাই, দেশলাই ও কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠে। সুতরাং দেখা যায় যে মানুষ সর্বত্রই প্রকৃতির সহায়তার উপরে নির্ভর করে।

প্রকৃতির উপরে নির্ভর করিলেও মানুষ অনেক সময় প্রাকৃতিক অসুবিধাগুলি দূর করিতেও সক্ষম হয়। অনেক মরুভূমি অঞ্চলে এখন জলসেচের সাহায্যে চাষ-আবাদ করা হইতেছে। অনেক তৃণভূমিতেও এখন পশুচারণের স্থানে গম চাষ করা হইতেছে। যে সকল ঠাণ্ডা দেশে পূর্বে চাষ-আবাদ করা যাইত না বর্তমানে দ্রুত ফলনক্ষম ফসল আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন সে সকল স্থানে চাষ-আবাদ এবং লোকবসতি সম্ভব হইয়াছে। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ মানুষের আর এক কীর্তি। মানুষ অনেক স্থানে জলাভূমির জলনিকাশ করিয়া চাষ-আবাদ ও নগর নির্মাণ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। হল্যাণ্ডে অগভীর সমুদ্রের জল নিকাশ করিয়া ওলন্দাজেরা উর্বর পোল্ডার ভূমি উদ্ধার করিয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনা সত্ত্বে একথা স্বীকার্য যে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রকৃতির উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল।

**Q. 27. Discuss the influence of non-physical environment on the economic activities of the world.**

[ পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর অপ্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। ]

**সামাজিক পরিবেশ** ( Non-physical or Cultural environment )—মানুষের জীবনের উপর, বিশেষতঃ উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার উপর ধর্ম, সরকার, জাতি, ভাষা, শিক্ষা প্রভৃতির প্রভাব অনুভূত হয়।

বর্তমান যুগেও পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর ধর্ম কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। রোমান ক্যাথলিক দেশে মাছের চাহিদা কিছু বেশি হয়। বৌদ্ধরা ধর্মসংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠানে রেশম বস্ত্র অধিক ব্যবহার করে। তাই চীন ও জাপানে রেশম উৎপাদন বেশি ( এই সকল দেশে রেশম উৎপাদনের অন্যান্য বহু কারণও অবশ্য আছে )। ভারতে মাছ-মাংস উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম, কারণ ভারতবাসী হিন্দুগণের অনেকে মাছ-মাংস খান না। এরূপ উদাহরণ হয়ত আরও পাওয়া যাইতে পারে।

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য **সরকারের** সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতার ফলে জাপান ও রাশিয়া শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ভারত যতদিন ব্রিটিশ শাসনে ছিল ততদিন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকার কোন চেষ্টাই করেন নাই। চীনের সরকার পূর্বে একান্ত দুর্বল ছিল তাই ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিলম্বে ( অর্থাৎ বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ) হইয়াছে।

কোন **জাতি** কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তবে এক জাতি বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে অপর জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা বলা চলে না। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কোন জাতি হয়ত অধিক কর্মঠ ও দক্ষ হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা বলা যায় না যে নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কোন দিক দিয়া অযোগ্য। কোন কোন জাতি কোন কোন দিক দিয়া বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছে একথা ঠিক। যথা—ইউরোপের নর্ডিকরা নৌদক্ষ, ভূমধ্যসাগরীয়েরা কলাবিদ্যায় দক্ষ এবং অ্যাল্পাইনরা অত্যন্ত কর্মঠ।

**ভাষা** অনেক সময় জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হইয়া অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে। **শিক্ষার** প্রসার আর্থিক উন্নতির পক্ষে এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ধর্ম, জাতি প্রভৃতি সামাজিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে সাহায্য করিয়াছে বা অন্তরায় হইয়াছে একথা বলা সর্বত্র যুক্তিসঙ্গত

নহে। তবে সরকারের কার্যকারিতা, জীবনধারণের মান প্রভৃতি সামাজিক অবস্থা কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

**Q. 28. What is the influence of river on the economic life of man? Illustrate your answer with Indian examples.**

**[ মানুষের অর্থনৈতিক বৃত্তির উপরে নদীর প্রভাব কতদূর? ভারতীয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ]**

**নদী**—প্রাচীন যুগে নদীতটেই মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়। মিশরীয় সভ্যতা নীল নদের তটে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার সূতিকাগার গঙ্গা ও সিন্ধুনদের তীরে। চীনের সভ্যতা হোয়াংহো এবং উই-হো নদীদ্বয়ের এবং ব্যাবিলনের সভ্যতা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার কারণ নদী হইতে পানীয় জল ও সেচের জলের সংস্থান, নদীবাহিত পলিমাটির উর্বরতা এবং সর্বোপরি নদীপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা। সে যুগে নদী পথই ছিল দূর দেশে যাইবার একমাত্র নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। নদীপথেই হইত বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয় এবং এইভাবে সমৃদ্ধ সভ্যতার উৎপত্তি। বর্তমান যুগে রেলপথ ও বিমান পথের প্রসার হওয়া সত্ত্বেও নদীপথের গুরুত্ব মোটেই কমে নাই, বরং কাঁচামাল সরবরাহের ব্যাপারে উহা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। নদীর প্রধান প্রধান কার্যকারিতা হইল—**(১) পানীয় জল ও শিল্পের জল সরবরাহ**—পৃথিবীর সকল দেশে নদীই মানুষের অধিকাংশ পানীয় জল সরবরাহ করে। কলিকাতার পানীয় জল হুগলী নদী হইতে পলতার শোধনাগার মারফৎ সরবরাহ করা হয়। এমন কি আরবের মরু-অঞ্চলে যেখানে প্রবাহমান নদী নাই সেখানেও শুষ্ক নদীখাত বা "ওয়াদি" হইতে বেদুইনরা পানীয় জল সংগ্রহ করে। নানা প্রকার শিল্পেও ( যথা—ইস্পাত, কার্পাস ও পাট শিল্পে ) প্রচুর জল দরকার হয়। **(২) অরণ্যাঞ্চল হইতে কাঠ ভাসাইয়া আনা**—দুর্গম অরণ্য অঞ্চল হইতে নানা দেশে খরস্রোতা নদীর সাহায্যে নানা প্রকার হাল্কা কাঠ ( যথা—পাইন, ফার প্রভৃতি ) ও বাঁশ ভাসাইয়া শত শত মাইল দূরে নগর ও শিল্পাঞ্চলে লইয়া যাওয়া হয়। এই সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা না থাকিলে কানাডা, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও রাশিয়ার কাগজ, মণ্ড ও দেশলাই শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত না। কাশ্মীরে ঝিলাম প্রভৃতি নদীতেও প্রচুর কাঠ ভাসাইয়া অনেক দূরে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কাগজের কলের জন্য হাজার হাজার টন বাঁশ কর্ণফুলি নদীতে ভাসাইয়া লইয়া আসা হয়। **(৩) নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য**—নদীপথগুলি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথ।

জার্মানী, ফ্রান্স, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নদী-পথগুলি সবচেয়ে ভাল। পূর্বপাকিস্তানেও নদী-পথই সর্বপ্রধান বাণিজ্যপথ। নদীপথে ভারী এবং কম দামী কাঁচামাল কম খরচে কারখানায় সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু নদীকে খাল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতের নদী-পথগুলি তেমন ভাল নহে। তবে ব্রহ্মপুত্র নদীপথে যথেষ্ট ব্যবসাবাণিজ্য চলে। (৪) **জলসেচ ব্যবস্থা**—জলসেচ ব্যবস্থাকে সভ্যতার ধারক ও বাহক বলা হয়। বড় বড় নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চাষবাস করা হয়। সিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, নীল, ইউফ্রেটিস, কলোরাডো প্রভৃতি নদী হইতে প্রচুর জলসেচ দেওয়া হয়। আধুনিককালে বাঁধ ও জলাধারের সাহায্যে বর্ষার বাড়তি জল আটকাইয়া তাহা হইতে বিস্তৃত অঞ্চলে বারমাস জল সরবরাহ করা হয়। (৫) **জলবৈদ্যুতিক শক্তি**—পৃথিবীতে যত প্রকার শক্তির উৎস আছে জল হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সস্তা এবং স্থায়ী ব্যবস্থা। ইহা রেলগাড়ি, কারখানা প্রভৃতি চালাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। পার্বত্য ও বৃষ্টিবহুল দেশে যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে এই বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সহজ ও সুবিধাজনক। এবিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, ইটালী, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী অগ্রগণ্য। ভারতে এখন প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের নদীগুলির সাহায্যে বড বড় জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় সকল দেশেই নদী আছে, পাহাড়ও বিরল নহে; সুতরাং এই শক্তি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

নদী সময় সময় বন্যা ও ভাঙ্গনের দ্বারা মানব সভ্যতাকে বিপন্নও করিয়া থাকে। চীনের হোয়াংহো এবং ইয়াংসি, ভারতের কুশী, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী ও শতদ্রু মানুষের জীবনকে মাঝে মাঝে বিপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু বন্যা ও ভাঙ্গনের প্রতিকার করা মানুষের অসাধ্য নহে।

**Q. 29. "Man has been most active in the river valleys." Discuss the statement in the light of agricultural development of the river valleys.**

**[ "মানুষ নদী-উপত্যকায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হইয়াছে।" নদী-উপত্যকায় কৃষির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত মন্তব্য ব্যাখ্যা কর। ]**

নদীর তটে প্রাচীন মানব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। কারণ নদীর বিপুল জল সরবরাহ মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিশেষতঃ মিশরের মরুপ্রান্তে নীলনদ, আরবের মরুভূমির মধ্যে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদী এবং অল্পবৃষ্টিযুক্ত পাঞ্জাবের সিন্ধু নদের তটে মানুষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখানে মানুষ চাষ-আবাদ শিক্ষা

করে এবং নদীর জল সেচের কাজে ব্যবহার করিতে শিখে। নদীমাতৃক সভ্যতাগুলি নদীপথের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সুযোগ পাইত। এইভাবে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যমেই উন্নততর সভ্যতার উৎপত্তি হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে উর্বর নদী-উপত্যকাগুলিতেই লোকের বাস সর্বাপেক্ষা বেশি। সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা, ইয়াংসি-কিয়াং উপত্যকা, রাইন উপত্যকা প্রভৃতি এইরূপ জনবহুল সমৃদ্ধিশালী উপত্যকা। ভূগোলের ভাষাতে উপত্যকা বলিতে নদীর উভয় পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত অপরিসর সমতল ভূমিকেই বুঝায়। নদী প্রবাহের তিনটি অংশ; যথা—নদীর ব-দ্বীপ, সমভূমি ও পার্বত্য প্রবাহ অঞ্চল। এই শেষোক্ত অবস্থায় নদী খরস্রোতা এবং উহার উপত্যকা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়। এই সংকীর্ণ নদী উপত্যকায় উর্বর জমি কমই থাকে এবং কৃষিকার্যও তেমন উন্নতি লাভ করে না। নদী যখন পার্বত্য অঞ্চল পার হইয়া এবং বহু উপনদীর জলে পুষ্ট হইয়া সমতল ভূমিতে অবতরণ করে—কিংবা ইহাও বলা যায় যে নদী যখন তাহার দুইপার্শ্বে পলিমাটি বিছাইয়া উর্বর সমভূমি সৃষ্টি করে—তখন হইতে ব-দ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত নদী উপত্যকা কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত উর্বর স্থান।

নদী উপত্যকায় উর্বর মাটি এবং সেচের জলের প্রাচুর্যের ফলে কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। নদীতটে বড় বড় বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং নদীপথে বহু জলযান যাতায়াত করে। নদীতটের অধিবাসী মানুষের জীবনে দুইটি সমস্যা দেখা যায়—(১) নদীর জলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহা জলসেচের কাজে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার সমস্যা এবং (২) নদীর ধ্বংস ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা। নদী বন্যার সৃষ্টি করে এবং উর্বর জমি ভাঙ্গিয়া লইয়া অপর তট গঠন করে। ইহাই নদীর স্বাভাবিক কার্য।

সমভূমি অঞ্চলে নদী ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তন করে এবং মাঝে মাঝে গতিপথও পরিবর্তন করে। নদীতটের কৃষিব্যবস্থারও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। নদীর বন্যার হাত হইতে শস্যকে রক্ষা করার জন্য মানুষ আদি যুগ হইতে নদীর দুই তীর বরাবর বাঁধ দিয়াছে—বিশেষতঃ যে সকল দেশে জনসংখ্যার চাপ বেশি সেই সকল স্থানেই এই প্রকার বাঁধ দেখা যায়। বাঁধ দ্বারা নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উর্বর পলিমাটি না পড়ায় ফলে জমি উচ্চ হইতে পারে না। নদীর বুকে পলিমাটি জমিয়া নদীর তল ভরাট হইয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করার অনেক অসুবিধাও আছে। এই সকল অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আধুনিক প্রথামত নদী উপত্যকার উন্নয়ন কার্য করা হয়। ইহাকে বহু উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা বলা হয়। এইরূপ

পরিকল্পনার সাহায্যে নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং বারমাস জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যান্য অনেক সুবিধাও পাওয়া যায়। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলিও সম্পূর্ণ নিখুঁত নহে। নদীর উপত্যকায় বাঁধ দেওয়ার ফলে যে কৃত্রিম জলাশয়ের সৃষ্টি হয় তাহা ক্রমশঃ পলিমাটি জমিয়া ভরাট হইয়া যায় এবং নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তবু কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি এবং শিল্পের প্রসারের জন্য এই প্রকার নদী পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন।

**Q. 30 Show that the industrial development and commercial activities of a country are greatly influenced by the nature and shape of its coastline. Illustrate your answer with two suitable examples. ( C. U. 1960 )**

[ উপকূলরেখার প্রকৃতি এবং আকার কোন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কার্যকলাপের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করে দেখাও। দুটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। ]

**সমুদ্র তটভাগ** ( Coastline )—সমুদ্রতটবাসী মানুষের জীবনের উপর তটভাগ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তটভাগ নানা প্রকারের হয়। কোন কোন স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গমালার আক্রমণে তটভাগের শৈলমালা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আবার কোন কোন স্থানে নদীবাহিত পলিমাটিতে বা বৃষ্টির জলের সাহায্যে ধৌত বালি, পাথর ও মাটিতে তটভাগের সন্নিহিত সাগর ভরাট হইয়া নূতন জমির সৃষ্টি হইতেছে। প্রথমোক্ত কার্যকলাপ চলিতে থাকিলে তটভাগ ভাঙ্গিয়া উপসাগর ও খাঁড়ি সৃষ্টি হয়—ইহাকে **ভগ্নতট** বলে। অনেক স্থানে ভূমিকম্পের ফলে পর্বতময় তটভাগ বসিয়া যাওয়ায় ( subsidence ) ভগ্নতট-ভাগের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার অঞ্চলে অধিকাংশ স্থানেই গভীর জল দেখা যায়। ফলে প্রয়োজনীয় আড়ালযুক্ত পোতাশ্রয়ের অভাব হয় না। প্রধানতঃ এই কারণেই ব্রিটেন এবং জাপানে সামুদ্রিক বাণিজ্যের এত উন্নতি হইয়াছে। হনসু, কিউসু, ও শিকোকু দ্বীপত্রয়ের মধ্যবর্তী ভগ্নতটযুক্ত আভ্যন্তরীণ সমুদ্রে সুন্দর জলপথের জন্যই জাপানের শিল্পগুলি এত উন্নত হইয়াছে। বিদেশজাত কাঁচামাল অল্পমূল্যে জাপানের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা সম্ভব। ব্রিটেনের শিল্পগুলিও প্রশস্ত নদীমুখ ও ভগ্নতটভাগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ব্রিটেনের বেশির ভাগ কয়লাখনি সমুদ্রতটে অবস্থিত। তাই ব্রিটেনের কারখানাগুলি অল্পমূল্যে কয়লা ও অন্যান্য কাঁচামাল পায়। যে সকল দেশে তটভাগ ভগ্ন সেই সকল দেশের অধিবাসীরা ভাল নাবিক হয়। উহারা নৌ-ব্যবসায় খ্যাতিলাভ করে ; উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী হয় এবং মৎস্য ব্যবসায় খুব উন্নতি লাভ করে। নরওয়ের তটভাগ ভগ্ন কিন্তু ভারতের তটভাগ ভগ্ন নহে। এই দুই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা করিলেই মানুষের জীবনের উপর

তটরেখার প্রভাব কতকটা বুঝা যাইবে। নরওয়ের লোকসংখ্যা মোটামুটি বৃহত্তর কলিকাতার লোকসংখ্যার সমান, কিন্তু ঐ দেশের বাণিজ্য নৌবহরের পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টন। সে তুলনায় ভারতের বাণিজ্য নৌ-বহর মাত্র ২২ লক্ষ টন ১৯৬৯। নরওয়ের বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন প্রায় ১৮ লক্ষ টন; আর ভারতের মাত্র ১৪ লক্ষ টন। ভারত যদি দীর্ঘকাল পরাধীন না থাকিত তবে হয়ত তাহার নৌ-বহর আরও কিছু বড় হইত; কিন্তু নরওয়ের লোকসংখ্যার অনুপাতে সেখানে যে পরিমাণ জাহাজ আছে, ভারতে সে অনুপাতে জাহাজ থাকা সম্ভব নহে। নরওয়ের সমুদ্রতটে শুধু অনুর্বর পাহাড়; তাই সেখানকার লোকেরা অনেকটা বাধ্য হইয়াই সমুদ্র-জীবনকে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের তটরেখার সকল স্থানেই উচ্চ সমভূমি। তাই খুব কম লোকই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকা ভাসাইয়া জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ব্রিটেন এবং জাপান জাহাজ ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা দেশের তটভাগ সরল হওয়ায় সেখানে মৎস্য শিকার বা ব্যবসা-বাণিজ্য খুব উন্নতি লাভ করে নাই। অবশ্য মানুষ কৃত্রিম উপায়ে তটভাগের অসুবিধাগুলি ক্রমশঃ দূর করিতেছে। অভগ্ন তট সত্ত্বেও পেরু দেশে এখন প্রচুর মৎস্য ধরা হয়।

যে সকল অঞ্চলে নদী ব-দ্বীপ গঠন করিতেছে সে সকল স্থানে তটভাগ অগভীর, কর্দমাক্ত এবং নৌ-চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়। গঙ্গা, মিসিসিপি প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে বন্দর গঠন করা ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ভগ্ন হইয়াও ব-দ্বীপময় তটভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক নয়। সরল তটভাগে বন্দর গঠনের উপযুক্ত স্থান থাকে না। ভারতের সুদীর্ঘ পূর্বতটে কেবলমাত্র বিশাখাপত্তনমে স্বাভাবিক বন্দর গঠনের সুবিধা আছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের তটভাগ অভগ্ন হওয়ায় ঐ সকল স্থানে বন্দর গঠন করা সহজ নহে। সুতরাং, ঐ সকল অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণতঃ কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের সাহায্যে পরিচালনা করিতে হয়।

**Q. 31. Do you think the position, shape and size of a country may influence its economic activities. Give suitable examples.**

**[ কোন্ দেশের অবস্থান, আকার ও আয়তন কি উহার অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপরে প্রভাব বিস্তার করে? উদাহরণ দাও। ]**

প্রাকৃতিক পরিবেশ নানাভাবে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কোন দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঐ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবেশের প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে দেশের অবস্থান, আকার, আয়তন, তটভাগ, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি অন্যতম।

ইংল্যাণ্ড ও নিউগিনির অবস্থান লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইংল্যাণ্ডের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির অনেকটাই তাহার অবস্থানের জন্য। নিকটেই ইউরোপের মত সম্পদ-সমৃদ্ধ মহাদেশ। আটলান্টিক পারে উপনিবেশ গড়িবার রম্য স্থান আমেরিকা, সুয়েজ পথে এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারের প্রবেশের সুবিধা ইংল্যাণ্ডের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে নিউগিনি দ্বীপ পৃথিবীর অস্বাস্থ্যকর ও অনুন্নত অংশে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে লোকবসতি কম।

দেশের আকার নানাপ্রকার হইতে পারে, যথা—(১) নরওয়ের মত সমুদ্র-তট সংলগ্ন ( littoral ) দীর্ঘ ও শীর্ণ আকার যাহা সমুদ্র-সান্নিধ্য ঘটাইয়া জাতির জীবনে দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাস সৃষ্টির সুযোগ দেয়। জাতিকে নৌ-দক্ষ, মৎস্য-শিকার ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। (২) গ্রীসের মত পার্বত্য অতিভগ্ন তটরেখা সমন্বিত উপদ্বীপ ; যেখানে ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের আধিক্য জাতীয় জীবনে ঐক্য আনিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়াছে। অধিবাসিরা নৌ-দক্ষ কিন্তু স্থলভাগে যাতায়াত ব্যবস্থা গাড়িয়া উঠে নাই বলিয়া শিল্প ও কৃষি উভয় ব্যবস্থাই পশ্চাৎপদ। (৩) সাইবেরিয়া ও ব্রেজিলের মত বৃহৎ দেশগুলির মহাদেশীয় অভ্যন্তর ভাগের জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন ও পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় আর্থিক উন্নতির বিলম্ব ঘটিয়াছে।

দেশের আয়তন বৃহৎ হইলে সাধারণতঃ প্রায় সকল প্রকার সম্পদই সেখানে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কথা বলা যায়। ভারত ও চীনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কি কৃষিজ, কি বনজ, কি খনিজ সকল সম্পদেই দেশ দুইটি সমৃদ্ধ ; তাহা ছাড়া দেশের আয়তন বড় ও লোকসংখ্যা বেশি হইলে বহিঃশত্রুর ভয়ও কম থাকে। লাক্সেমবার্গ ও বেলজিয়ামের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সর্বদাই শত্রুর ভয়ে ত্রস্ত থাকে। ফলে বৃহৎ শক্তির দ্বারা তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হইয়া থাকে। দেশের আয়তন বৃহৎ হইলে পরিবহণ সমস্যা দুরূহ হইয়া উঠে ; অবশ্য যদি বৃহৎ নাব্য নদী ও ভগ্ন তটরেখা থাকে তবেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

দেশের আকার ও আয়তন অবশ্য দেশের ভাগ্যকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ; তবে অপরাপর ঘটনার প্রভাবও কম নয়। উপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইল, ক্ষেত্রবিশেষে উহাদের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, খনিজ সম্পদের অবস্থান প্রভৃতি দেশের আকার ও আয়তনের আওতায় পড়ে না। অথচ সমাজ জীবন গঠনে উহাদের প্রভাব মোটেই কম নহে।

**Q. 32. How do the ocean currents of the world affect human life in the different parts of the world? Give examples.**

[ পৃথিবীর সমুদ্রস্রোতগুলি কিভাবে দুনিয়ার নানা স্থানে মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে উদাহরণসহকারে তাহা বিবৃত কর। ]

মানবজীবনের উপর সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের প্রভাব—

মহাসমুদ্রের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কতকগুলি জলপ্রবাহ ঘোরাফেরা করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশালকায় ও মন্থরগতি এবং কতকগুলি বায়ুপ্রবাহ দ্বারা তাড়িত বলিয়া বেশ দ্রুতগতি সম্পন্ন। সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতির অনেক কারণ আছে। বিষুবরেখার নিকট উত্তাপের ফলে জলের লবণাক্ততা এবং ঘনত্বের পার্থক্য, অয়নবায়ু, প্রত্যয়নবায়ু ও মেরুবায়ুর প্রভাব, দেশের অবস্থান প্রভৃতির উপর সমুদ্রস্রোতের গতি নির্ভর করে। সমুদ্রস্রোত দুই প্রকার হয়। কোন কোনটি উষ্ণ স্রোত, আবার কোন কোনটি শীতল স্রোত। যে সকল সমুদ্রস্রোত বিষুবরেখার উত্তরে বা দক্ষিণে ( প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরে বা দক্ষিণে বিষুবীয় স্রোত আছে, কিন্তু ভারত মহাসাগরের উত্তর-বিষুবীয় স্রোত আফ্রিকা ও ভারতের অবস্থানের জন্য এবং পরিবর্তনশীল মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ) সৃষ্ট হয় সেগুলি উষ্ণ স্রোত, কিন্তু ঐগুলির কতকাংশ যখন উপবৃত্তাকারে ঘুরিয়া আবার বিষুব রেখার দিকে ফিরিতে থাকে, তখন উহারা অপেক্ষাকৃত শীতল স্রোতে পরিণত হয়। মেরু অঞ্চল হইতে যে সকল স্রোত আসে সেগুলি শীতল স্রোত।

মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব প্রধানতঃ তিনভাগে দেখা যায়, যথা—(১) সমুদ্রস্রোত তাহার উষ্ণতা বা শৈত্যের দ্বারা নিকটস্থ দেশগুলির জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। আটলান্টিক মহাসাগরের গালফ ষ্ট্রীম এবং নর্থ আটলান্টিক ড্রিফট ও প্রশান্ত মহাসাগরের কুরোশিও স্রোতের প্রভাবে যথাক্রমে পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের জলবায়ু অধিক শীতল হয় নাই। এই সকল স্থানের তটভাগ ও নদী মুখে বরফ জমে না। বন্দরগুলি সর্বদাই বরফমুক্ত থাকে। অতিরিক্ত শীত না থাকায় ঐ সকল অঞ্চলে প্রায় বারমাসই কৃষিকার্য সম্ভব হয়। (২) সমুদ্রস্রোত মৎস্য ব্যবসার সহায়ক। যেখানে উষ্ণ ও শীতল স্রোত একত্র হয় সেখানে হিমশৈল-গলিত কর্দম সমুদ্রে জমা হয়। ফলে এই সকল স্থানে মগ্ন চড়ার সৃষ্টি হয়। অগভীর জলে মৎস্য ডিম ছাড়ে এবং মৎস্যখাদ্য প্ল্যাঙ্কটন জন্মে। নিউফাউন্ল্যাণ্ড ও হোক্কাইডোর নিকট এরূপ বহু মগ্ন চড়া আছে। তাহা ছাড়া, মৎস্য সমুদ্রের স্রোতে গা ভাসাইয়া শীতের দেশে চলাফেরা করে বলিয়া মাঝ সমুদ্রেও মাছ ধরা সহজ হইয়াছে। (৩) প্রাচীনকালে বাণিজ্য জাহাজগুলি সমুদ্র স্রোতের এবং বায়ুপ্রবাহের সাহায্য লইয়া যাতায়াত

করিত। বর্তমানে এরূপ সুবিধা লওয়ার বড় একটা দরকার হয় না। তবে এখনও পালতোলা জাহাজ আছে; সেগুলি সমুদ্রস্রোতের সুযোগ লয়।

আরও নানাভাবে সমুদ্রস্রোত ও সামুদ্রিক বায়ু মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সাহায্য করে বা বাধার সৃষ্টি করে। বাধার মধ্যে সমুদ্রপথে (বিশেষতঃ উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে) হিমশৈলের ভয় এবং শীতল স্রোতের প্রভাবে কালাহারি ও আটাকামা মরুঅঞ্চলে বৃষ্টির অভাবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* Q. 33. **Describe and account for the factors of climate. "No factor of his environment exercises a wider influence on man and his economy than climate.—Discuss."**

[জলবায়ুর আনুসঙ্গিকগুলির বর্ণনা ও কারণ নির্ণয় কর। মানুষের জীবনের উপরে জলবায়ু যত প্রভাব বিস্তার করে অন্য কোন পরিবেশের উপাদানই তাহা করে না।]

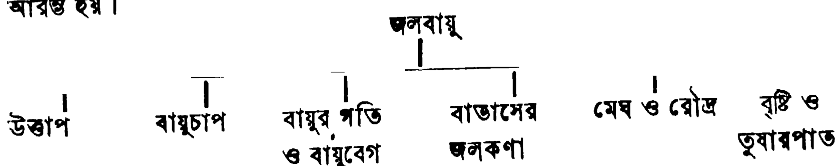
**জলবায়ু ও মানব জীবনের উপর ইহার প্রভাব—**

জলবায়ু বলিতে দৈনিক বা বাৎসরিক গড় উত্তাপ, বায়ুচাপের তারতম্য ও বায়ুপ্রবাহ, মেঘ ও বৃষ্টি প্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাবকে বুঝায়। মানুষের প্রায় সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। বিখ্যাত ভৌগোলিক এল্‌স্‌ওয়ার্থ হান্টিংটন (Ellsworth Huntington) মানব সভ্যতার উপর জলবায়ুর অনিবার্য প্রভাব সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন (Civilization & Climate —Yale University Press, U. S. A.)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। সূর্যের উত্তাপ পৃথিবীর সকল স্থান সমানভাবে পায় না। বিভিন্ন ঋতুতে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের কিছু তারতম্য ঘটে—অবশ্য এজন্য তাপের পার্থক্য তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্যের দিকে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পরিমাণে হেলিতে থাকে। ফলে কোন সময় পৃথিবীর কোন অংশ অধিক বা অল্প উত্তাপ লাভ করে। তাহা ছাড়া, সূর্যরশ্মি কোথায় কতটা বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে তাহার উপর উত্তাপ নির্ভর করে। উত্তাপের তারতম্যের ফলেই প্রধানতঃ বায়ুচাপের তারতম্য ঘটে এবং বায়ুপ্রবাহের সূত্রপাত হয়। এই বায়ুপ্রবাহ আবার অনেক স্থলে বৃষ্টির জন্য দায়ী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উত্তাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর কোন অংশ উষ্ণ হইলে সেখানকার বায়ু হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিকের হাওয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে। সাধারণতঃ

* কোন কোন ছাত্রের মনে হয়ত এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে এই ধরণের ভূগোল ঘটিত প্রশ্ন পরীক্ষায় হয়ত আসিবে না। না আসুক, তবু এই প্রশ্নোত্তরটি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। ইহার মধ্যে অর্থনৈতিক ভূগোলের "মৌলিক জ্ঞান" এর সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই জ্ঞান না থাকিলে কৃষি, অরণ্য ও অন্যান্য অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সম্যক উপলব্ধি কোনক্রমেই সম্ভব নহে। কেবল মুখস্থ করিয়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে মারাত্মক ভুলের সম্ভাবনা খুব বেশি।

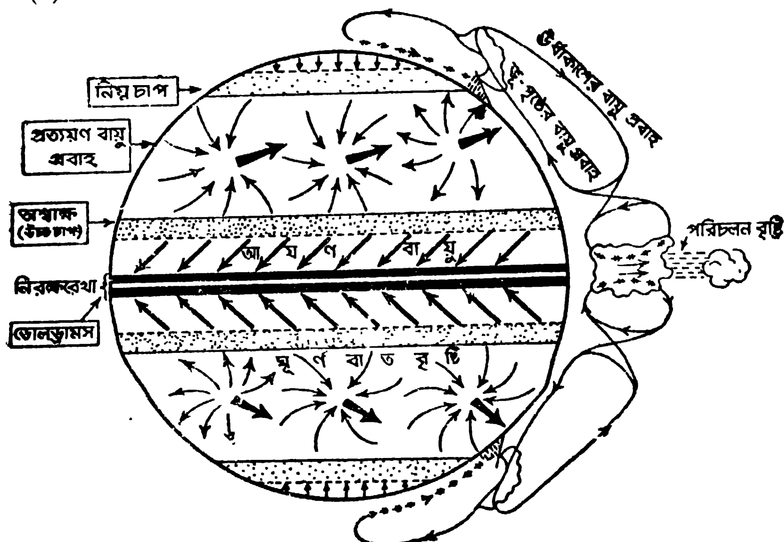
এইভাবে নিম্নচাপ কেন্দ্র ( Low pressure centre ) সৃষ্টি হয় এবং বায়ুচলাচল আরম্ভ হয়।




**পৃথিবীর বায়ুচাপ ও বায়ুচাপ মণ্ডল—**

পৃথিবীতে তিনপ্রকার বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়; যথা—(১) নিয়ত বায়ুপ্রবাহ ( planetary winds ), (২) সাময়িক বায়ুপ্রবাহ ( seasonal winds ) এবং (৩) আকস্মিক বায়ুপ্রবাহ ( variable winds )। অয়ন বায়ু, প্রত্যয়ণ বায়ু ও মেরু বায়ু বৎসরের বারোমাস বহে বলিয়া ঐগুলিকে নিয়তবায়ু বলা হয়। মৌসুমী বায়ু সাময়িক বায়ুপ্রবাহ। উহা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে প্রবাহিত হয়। আকস্মিক বায়ু বলিতে ব্লিজার্ড, মিষ্ট্রাল, চিনুক প্রভৃতি অত্যন্ত স্বল্পকালস্থায়ী বায়ুপ্রবাহকে বুঝায়; ঐগুলির প্রভাবে সাময়িকভাবে অকস্মাৎ উত্তাপের যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে। নিম্নে পৃথিবীর **নিয়ত বায়ুপ্রবাহ** সম্পর্কে আলোচনা করা হইল :—

(১) নিরক্ষরেখার নিকট সূর্যের উত্তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়।




**ভূ-পৃষ্ঠের ও ঊর্ধ্বাকাশের [redacted]**

এখানকার হাওয়া [redacted]

এই স্থানে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ কেন্দ্র বা "ডোলড্রাম" সৃষ্টি হয়। এখানে বায়ু চলাচল কম।

(২) উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের উপক্রান্তীয় অঞ্চল হইতে বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে বহিতে থাকে ( জল যেমন উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমির দিকে বহে, বায়ুও তেমনই উচ্চচাপ কেন্দ্র হইতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে বহে—চাপের অধিক বা অল্প তারতম্যের ফলে বায়ুর বেগ অধিক বা অল্প হইয়া থাকে )। এই বায়ুকে **অয়ণবায়ু** ( trade wind ) বলে।

(৩) উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে মেরু অভিমুখে ( কিন্তু মেরু পর্যন্ত নহে ) যে বায়ু ধাবিত হয় তাহাকে "পশ্চিমা বায়ু" ( westerly wind ) বা **প্রত্যয়ণ বায়ু** বলে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে মেরুবৃত্তের নিকট নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় ( যথা—আইসল্যাণ্ড ও অ্যালিউশন নিম্নচাপ কেন্দ্র )। পশ্চিমাবায়ু ও মেরুবায়ু এই নিম্নচাপের দিকেই বহিতে থাকে।

(৪) মেরু অঞ্চলে বিশেষতঃ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। ঐ স্থান হইতে উষ্ণ মণ্ডল অভিমুখে যে বায়ু বহে তাহাকে মেরুবায়ু বলে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর উপর নিম্নলিখিত চাপবলয় ও বায়ুবলয়গুলি রহিয়াছে।

**চাপবলয়**—(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বা ডোলড্রাম, (২) উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় বা অশ্বাক্ষ ( horse latitude ), (৩) মেরুবৃত্ত সন্নিহিত নিম্নচাপ বলয় ও (৪) মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়।

**বায়ুবলয়**—(১) অয়ণ বায়ু ( trade wind )। (২) প্রত্যয়ণ বায়ু ( anti-trade or westerly wind )। (৩) মেরু বায়ু ( polar wind )।

উপরিউক্ত চাপবলয় ও বায়ুবলয়গুলি মহাসমুদ্রের উপর মোটামুটি ঠিক থাকিলেও স্থলভাগের নিকট ঐগুলি নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে গ্রীষ্মকালে উত্তাপের প্রভাবে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়, সুতরাং সাময়িক ভাবে মৌসুমী বায়ু বহে। মৌসুমী বায়ু বা ঐ প্রকার কোন বায়ু যাহা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে প্রবাহিত হয় তাহাকে সাময়িক বায়ু ( seasonal wind ) বলে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আকস্মিক বায়ু অধিক দেখা যায়। ঐগুলির প্রভাবে হঠাৎ তুষারপাত হয় বা গরম বায়ুপ্রবাহ বহিতে থাকে। আমাদের দেশের সাইক্লোনগুলিও এই জাতীয় বায়ুপ্রবাহ।

**বায়ুবলয়ের স্থানান্তর**—পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উহার মেরুদণ্ড ( axis ) যখন সূর্যের দিকে বিভিন্ন ভাবে হেলিয়া থাকে, তখন আমরা দেখি যে সূর্য আমাদের মাথার উপর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে বা দক্ষিণে সরিয়া যাইয়া উদয় হইতেছে ও অস্ত যাইতেছে।

সূর্যের উত্তরায়ণের সময় অয়ন বায়ু, প্রত্যয়ন বায়ু প্রভৃতি কিছু পরিমাণে উত্তরে সরিয়া আসিয়া বহিতে থাকে। আবার দক্ষিণায়নের সময় দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়; ঐ সকল বায়ুপ্রবাহ বিভিন্ন দেশের উত্তাপ ও বারিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। উহাদের স্থানান্তরের ফলে কোথাও কোন ঋতুতে বৃষ্টি হয়, আবার কোথাও হয় না।

**বৃষ্টিপাতের কারণ ও মানব সভ্যতার উপর উহার প্রভাব—**

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বৃষ্টিপাতের মূল কারণ বায়ুমধ্যস্থ জলকণা ঘনীভূত হওয়া—অর্থাৎ বায়ু যখন তাহার মধ্যে জলকণা ধারণ করিতে অক্ষম হয় ( হঠাৎ বায়ুর উত্তাপ হ্রাস হইলে এরূপ হয় ) তখন অতিরিক্ত জলকণা ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। বায়ু যখন কোন কারণে ভূ পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া যায় তখন তাহার উত্তাপ কমিয়া যায়। ঐ বায়ু যদি জলকণা সংপৃক্ত (saturated) হয় তবে বৃষ্টি হয়। এরূপ প্রক্রিয়া প্রধানতঃ তিনভাবে হয়; যথা—(১) পরিচলন বৃষ্টি ( convection rain ), (২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি ( relief rain ) ও (৩) ঘূর্ণবাতবৃষ্টি ( cyclonic rain )।

(১) **পরিচলন বৃষ্টি** ( convectional rain )—ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে উপরস্থ বায়ুস্তর হাল্কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। ঐ অঞ্চলে যদি জলাশয়, সমুদ্র প্রভৃতি থাকে তবে প্রচুর বাষ্পীভবন ( evaporation ) হইয়া বায়ুমধ্যস্থ জলকণার ভাগ বৃদ্ধি পায়। ঐ বায়ু যখন ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়া শীতল হয়, তখন তাহার বাড়তি জলকণা বৃষ্টির আকারে মেঘ হইতে ঝরিয়া পড়ে। এই বৃষ্টি অল্পস্থান জুড়িয়া হয় এবং বিকালের দিকেই হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলেই প্রধানতঃ এই প্রকার বৃষ্টি হয়।

(২) **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** ( relief rain )—জলকণাপূর্ণ সমুদ্র বায়ু যদি উচ্চ পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে পর্বতের গা বাহিয়া উপরে উঠিতে থাকে। ফলে উহার উত্তাপ হ্রাস পায় এবং বায়ুমধ্যস্থ জলকণা ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। এই বৃষ্টি প্রধানতঃ পার্বত্য অঞ্চলেই হয়।

(৩) **ঘূর্ণবাত বৃষ্টি** ( cyclonic rain )—ঘূর্ণবাত অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দ্র। ঘূর্ণবাতের ফলে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে বর্ষাকালে মাঝে মাঝে একটানা কয়েকদিন ধরিয়া বাদলা বৃষ্টি ও ঝড় হয়। উহা মৌসুমী বায়ুদ্বারা বাহিত বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণবাত। পশ্চিম ইউরোপে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে আগত ঘূর্ণবাতের ফলে বৃষ্টি হয়। উষ্ণমণ্ডলের ঘূর্ণবাত ক্ষুদ্রাকার এবং অত্যন্ত ভয়ংকর হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উহা ব্যাপক ও মৃদু হয়। ক্ষুদ্র ও প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতকে নানা দেশে টর্নেডো, হ্যারিকেন, টাইফুন, সাইক্লোন প্রভৃতি বলে। বৃহদাকার মৃদুভাবাপন্ন ঘূর্ণবাতকে ডিপ্রেশন ( depression ) বলা হয়।

**বৃষ্টি ও মানব জীবন**—মানুষের জীবন বৃষ্টির দ্বারা কতদূর নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা

পৃথিবীর বৃষ্টিপাত মানচিত্র ও লোকবসতি মানচিত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলেই বুঝা যায়। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৫০ সেঃ মিটারের কম বা ২০০ সেঃ মিঃর বেশি সে সকল অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। বৃক্ষলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় জীবজগৎ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। এই বৃষ্টির অভাব হইতে পরিত্রাণের জন্য মানুষ জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। পর্বতের তুষার মেঘ হইতে আসে, নদীর জলের সংস্থানও বৃষ্টি হইতে, এমন কি মাটির নীচে যে জল তাহাও বৃষ্টির জল।

**Q. 34. What are the main factors of climate? Discuss the effect of climate on the agricultural crops of the world.**

**[ জলবায়ুর মুখ্য উপাদান কোন্‌গুলি? পৃথিবীর কৃষিজ শস্যগুলির উপরে জলবায়ুর প্রভাব কতটা? ]**

[ প্রথম অংশের জন্য উপরের আলোচনা দ্রষ্টব্য ]

**জলবায়ু ও কৃষিকার্য**—পৃথিবীর সকল উদ্ভিদই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল কারণ উদ্ভিদ জলের সাহায্যে মাটি হইতে খনিজ পদার্থ দ্রব্য করিয়া তাহা শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। তবে কোন কোন উদ্ভিদ অধিক বৃষ্টি পছন্দ করে আবার কোন কোন উদ্ভিদ অল্প বৃষ্টিতেই বৃদ্ধি পায়—এই শেষোক্ত শ্রেণীর উদ্ভিদের কাণ্ডে, বল্কলে, পত্রে অথবা শিকড়ে জল সঞ্চিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকে। অনেক গাছ মাটির নিম্নে বহুদূর পর্যন্ত শিকড় চালাইয়া জল সংগ্রহ করে।

যে সকল কৃষিজ দ্রব্য অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পাওয়া যায় তাহা হইল—ধান, পাট, ইক্ষু, চা, কফি, কোকো, রবার, কলা, আনারস, সাগু, নারিকেল, ওট প্রভৃতি। ঐগুলির মধ্যে আবার কোন কোনটি জলা জায়গায় ভাল হয়; যথা—ধান, পাট প্রভৃতি। আবার কোন কোন গাছের গোড়ায় জল জমিলে গাছের ক্ষতি হয়; যথা—চা, কফি, ইক্ষু, প্রভৃতি। কোন কোন গাছ বারমাস বৃষ্টি পছন্দ করে; যথা—রবার, কোকো, সাগু প্রভৃতি। সুতরাং নিরক্ষীয় অঞ্চলে ( বার মাস বৃষ্টি ) রবার ও কোকো উৎপন্ন হয়। মৌসুমী অঞ্চলে স্থানে স্থানে প্রবল বৃষ্টি হইলেও উহা গ্রীষ্মকালেই হয়। ঐ সকল স্থান ধান ও পাটের পক্ষে ভাল।

যে সকল কৃষিজ উদ্ভিদ মধ্যম বা অল্প বৃষ্টি পছন্দ করে সেগুলি হইল—যব, গম, রাই, চীনাবাদাম, জোয়ার, বাজরা, আলু, সয়াবীন ও অন্যান্য ডাল জাতীয় ফসল, আপেল, জলপাই, আঙুর প্রভৃতি। কার্পাস তুলা মধ্যম বৃষ্টিপাতে ভাল জন্মে। গম ও কার্পাস গাছ অধিক সূর্যালোক এবং নির্মল আকাশ পছন্দ করে। যব, গম, ওট ও রাই কিছু পরিমাণে তুষারপাত সহ্য করিতে পারে।

যে সকল কৃষিজ পণ্য কেবলমাত্র উষ্ণমণ্ডলে জন্মে তাহা হইল রবার, চা, কফি, কোকো, ইক্ষু, ধান, পাট, চীনাবাদাম, নারিকেল, কার্পাস, তুলা, আম,

আনারস, কলা ইত্যাদি। উপরিউক্ত গাছগুলির মধ্যে চা, কার্পাস ও চীনাবাদাম কিছু শীত সহ্য করিতে পারে। ভুট্টা উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ হইলেও শীতপ্রধান অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত মৃদু জলবায়ুযুক্ত স্থানগুলিতে ভালই জন্মে। আবার যব শীতপ্রধান দেশের ফসল হইলেও উষ্ণমণ্ডলে শীতকালে উৎপন্ন হয়। আলু ও গম শীতকালে উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। তামাক প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দেখা যায়। গম, যব, ওট, রাই, আলু, মিষ্ট বীট, শণ, ফ্লাক্স, আপেল প্রভৃতি ঠাণ্ডাদেশের ফসল। উপরিউক্ত ফসলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী তুষারপাত ও মেঘলা জলবায়ু সহ্য করিতে পারে ওট। উহা ফিনল্যাণ্ড এবং সাইবেরিয়াতেও জন্মে। রাই গাছ অধিক শীত, কম বৃষ্টি এবং অনুর্বর মাটি সত্ত্বেও মধ্য রাশিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে জন্মে। অধিক শীতপ্রধান দেশে বাসন্তিক গম উৎপন্ন হয়।

**Q 35. Describe the influence of climate on the manufacturing industries. Illustrate your answer with suitable examples.**

**[ শ্রম-শিল্পের উপরে জলবায়ুর প্রভাবের কথা বর্ণনা কর। ভাল ভাল উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ]**

**শিল্প ও জলবায়ু**—জলবায়ু বলিতে, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে বুঝায়। এগুলির অবস্থা সর্বত্র সমান নহে। কোন দেশের জলবায়ু উষ্ণ আবার কোন দেশের জলবায়ু তুহিনশীতল। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক সকল শিল্পই কম-বেশি দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

শিল্পের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাবই অধিক দেখা যায়। জলবায়ু যাতায়াত ব্যবস্থাকে, কৃষিজ ও অরণ্যজ কাঁচামালের সরবরাহকে, শ্রমিকের নৈপুণ্যকে এবং সর্বোপরি বাজারের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জলবায়ু শিল্পগঠনকেও প্রভাবিত করে।

মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উপরে পরিবহণ ব্যবস্থা ও শ্রম-শক্তির নৈপুণ্যের প্রভাব অপরিসীম। পরিবহণ ব্যবস্থা আবার অনেকটা প্রত্যক্ষ-ভাবে জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অত্যধিক তুষারপাত বা বন্যা অথবা বন্দরে বরফ জমিয়া যাওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা অসুবিধা হইয়া থাকে। ইহার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, খনিজশিল্প, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি মানুষের যে সকল প্রচেষ্টা পরিবহণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে তাহাদের সকলের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাব আসিয়া পড়ে। এইরূপে শ্রমশক্তির নৈপুণ্য প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক Ellsworth Huntington তাহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Civilization and Climate'-এর মধ্যে এই কথা বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় বিশ্লেষণ

করিয়াছেন। মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাই শ্রমশক্তির নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং পরোক্ষভাবে জলবায়ু মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে।

যে সমস্ত স্থানে যে ধরণের কৃষিজ কাঁচামাল উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত স্থানে সেই ধরণের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্প ও বাণিজ্য গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে, পরোক্ষভাবে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা কিছু পরিমাণে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—বাংলায় যে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকটা জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাবে। পশ্চিম বাংলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫ সেন্টিমিটারেরও বেশি। এখানকার জলবায়ু পাট উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তাই বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে; আর এই পাটকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলাদেশে হুগলী নদীর তীরে বহু পাটকল গড়িয়া উঠিয়াছে।

ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি যে সকল দেশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু প্রবাহিত, সেই সমস্ত দেশে প্রচুর পরিমাণে আঙুর প্রভৃতি ফল জন্মে। এইজন্য এই সমস্ত স্থানে মদ্য প্রস্তুত করা একটি প্রধান শিল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের মহারাষ্ট্র-গুজরাট ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিনা রাজ্যে কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠার প্রধান কারণ স্থানীয় কার্পাসের কম দাম, কম পরিবহণ ব্যয় ও সহজ লভ্যতা।

কানাডা ও সুইডেনের কাগজ ও দেশলাই শিল্প স্থানীয় সরলবর্গীয় অরণ্যের স্প্রুস, ফার প্রভৃতি গাছের নরম কাঠের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি অধিক দূর লইয়া যাইতে খরচ বেশি পড়ে। সুতরাং অরণ্যের নিকটেই কারখানা গড়িয়া উঠে। অরণ্য সম্পূর্ণভাবেই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং শিল্পও পরোক্ষভাবে জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে।

যন্ত্রশিল্পের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাব সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষের চাহিদার ( demand ) উপরে ইহার প্রভাব খুবই বেশি। শিল্প প্রচেষ্টা প্রধানতঃ নির্ভর করে চাহিদার উপরে। যেমন, শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রধানতঃ পশমজাত দ্রব্যের চাহিদাই বেশি হয়। সুতরাং সেই সকল অঞ্চলের শিল্পপ্রচেষ্টা সাধারণতঃ এই পশমজাত দ্রব্যের চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক। সেইরূপ উষ্ণ অঞ্চলের তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য ঐ অঞ্চলে তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদক শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, কাশ্মীরে শীতল জলবায়ুর প্রভাবে পশমশিল্প এবং বোম্বাইয়ে উষ্ণ জলবায়ুর ফলে সূতি কাপড়ের চাহিদা বেশি থাকায় সেখানে কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, যন্ত্রশিল্প অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। ল্যাঙ্কাশায়ার, জাপান, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের জলবায়ু সমুদ্রের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে অপেক্ষাকৃত আর্দ্র। এইরূপ জলবায়ু বস্ত্রশিল্পের পক্ষে খুবই উপযোগী। সুতরাং এই সমস্ত স্থানে বস্ত্রশিল্প সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ময়দাশিল্পের জন্য শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন। সেইজন্য করাচী, বুদাপেস্ত মিনিয়াপোলিস প্রভৃতি শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত স্থানে ময়দাশিল্প খুব সমৃদ্ধ। সিনেমাশিল্পের জন্য সূর্য-করোজ্জ্বল আবহাওয়ার প্রয়োজন; তাই ইটালি, ক্যালিফোর্ণিয়া ( হলিউড ) প্রভৃতি স্থান উহার প্রধান কেন্দ্র। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব খুব বেশি। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ এখন অনেক ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাবকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই, করিবার আশাও খুব কম।

**Q. 36 Examine the correlation between the physical and cultural environment on the one hand and man's economic activity and living standard on the other. (B. Com 1964)**

**[ প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাব এবং অপরদিকে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং জীবনধারণের মান—এই সকলের পরস্পর সম্পর্ক কি ? ]**

**মানবজীবন ও প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ**—আমাদের চারিদিকে যাহা দেখি, যথা—নদী, পাহাড়, বন, মেঘ, রৌদ্র, রাস্তা, মানুষ, ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজ এসব কিছুই আমাদের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক বস্তু। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে জলবায়ু, ভূমির প্রকৃতি, মাটি ইত্যাদিকে বুঝায়। আর সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ( cultural ) পরিবেশ বলিতে বুঝায় জাতি, ধর্ম, সামাজিক ও আর্থিক বিকাশ, ভাষা, সরকার ইত্যাদি।

মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় পরিবেশেরই প্রভাব দেখা যায়। কেবল তাহাই নয় প্রাকৃতিক পরিবেশ আবার সামাজিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার সভ্য মানুষ তাহার সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে প্রকৃতির উপরেও নিজের প্রভাব বিস্তার করে; যথা—নদীতে বাঁধ দেয়, মরুভূমিতে খাল কাটে, পাহাড়ের উপর রেল ও রাস্তা নির্মাণ করে। এইভাবে সে প্রকৃতির চেহারাই বদলাইয়া দেয়। অবশ্য প্রকৃতির প্রভাব অনেক বেশি সুদূর-প্রসারী। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নাই যাহার উপর প্রকৃতির প্রভাব দেখা না যায়। তাই বলা হয় যে মানুষ প্রকৃতির সন্তান।

বর্তমান জগতের প্রগতিশীল মানব সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই কথাই

মনে হয় যে মানুষ কেমন নিপুণভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কাজে লাগাইয়া জীবন ধারণের মান উন্নত করিয়াছে। মানুষ যখন তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল তখন সে দেখিল যে এই দুনিয়াতে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগসূত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম না করিয়া বরং একটা আপোষ করিয়া লওয়াই ভাল। প্রকৃতির সহায়তায় মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিতেছে। তাহার এ জয়যাত্রার শেষ নাই।

উপরে যে আলোচনা করা হইল এখন কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করা যাক। কৃষিকার্য মানুষের সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক বৃত্তি। এই কৃষির উপরে জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাব খুব বেশি; আবার কৃষির উন্নতির জন্য চাই শ্রম, মূলধন, যাতায়াতের ব্যবস্থা, বাজার প্রভৃতি। শ্রমের উপর, যাতায়াতের ব্যবস্থার উপর এবং বাজারের চাহিদার উপর জলবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট। আবার মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের ( conservation ) জন্য এবং উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য দরকার হয় প্রচুর মূলধনের—কারখানা হইতে আসে রাসায়নিক সার, মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিতেও অর্থ দরকার হয়। কিন্তু যতই মূলধন ঢালা হউক অনুপযুক্ত জমিতে ফসল ফলিবে না। জমির মৌলিক গুণগুলি থাকা চাই। জমির অবস্থান ও পরিবেশগত অন্যান্য সুবিধা থাকা চাই।

পাহাড়ী দেশের মানুষ জীবনধারণের জন্য পশুচারণ এবং অরণ্যসম্পদ সংগ্রহের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। কারণ সেখানে ঐ প্রকার অর্থনৈতিক বৃত্তি স্বাভাবিক। সেখানে মানুষের জীবন ধারণের মান উচ্চ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ইহা নির্ভর করে জলবায়ু ও দেশের অবস্থানের উপর। সুইজারল্যাণ্ডের মানুষের জীবন ধারণের মান খুব উচ্চ। আবার তিব্বতে উহা খুব নিচু। উভয় দেশই পর্বতময়। সুইজারল্যাণ্ডের জলবায়ু ও দৃশ্যাবলী মনোরম এবং উহা ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর তিব্বতের জলবায়ু অতি শীতল, বৃষ্টিহীন, মাটি অনুর্বর। আর উহার উত্তরে মরুভূমি, দক্ষিণে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়। নিকটে কোথাও উন্নত দেশ নাই। কাজেই তিব্বত অনুন্নত। সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-ধারণের মানও শোচনীয়।

# পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ ও অরণ্যভিত্তিক শিল্প

[ FOREST RESOURCES OF THE WORLD AND LUMBERING ]

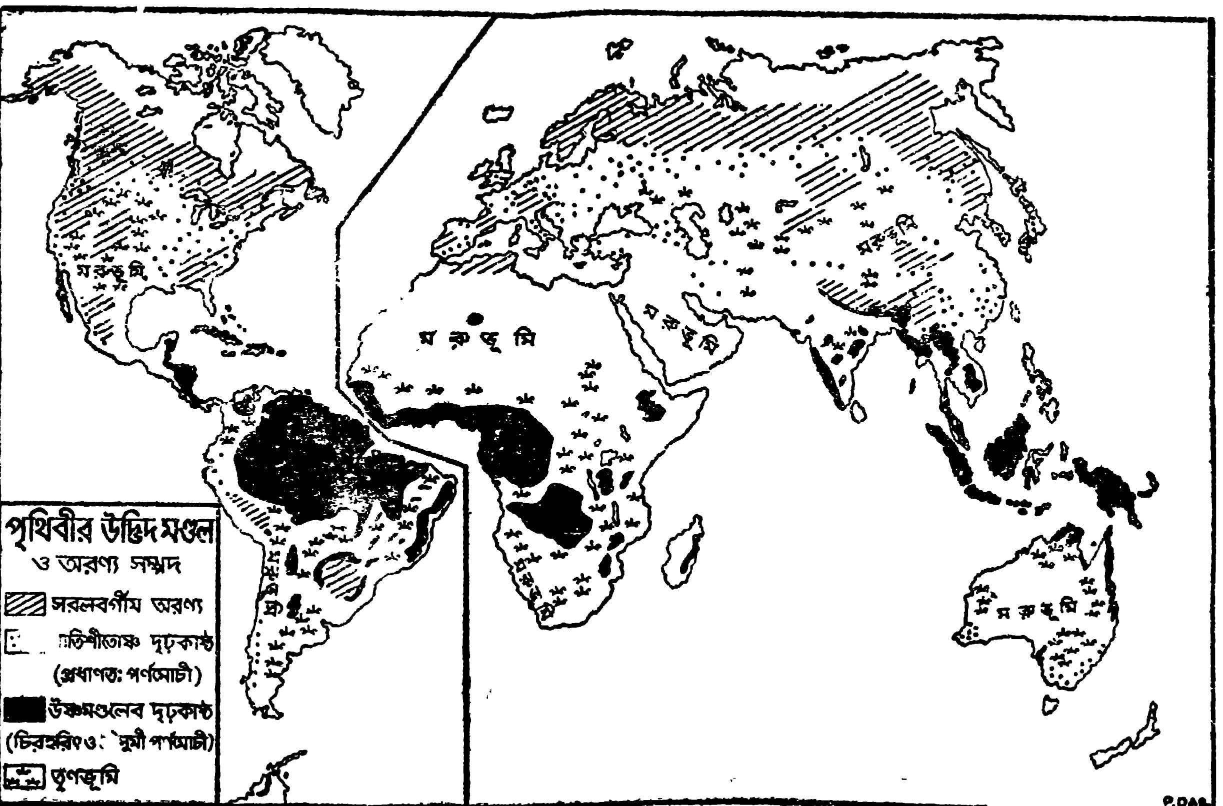
**Q. 37. Classify forests on the basis of climate and give their world distribution Narrate the commercial uses of the products of *temperate forests.** (B. Com Part. I 1965)

**[ জলবায়ু অনুসারে অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ কর এবং পৃথিবীর কোথায় সেগুলির অবস্থান লিখ। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অরণ্যগুলির বাণিজ্যিক মূল্য কতদূর লিখ। ]**

**অরণ্য ও জলবায়ু**—সকল বৃক্ষই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল, কারণ বৃক্ষের প্রধান খাদ্যগুলি মাটি ও বায়ু হইতে পাওয়া যায়। বৃক্ষের শিকড় মাটির মধ্যস্থ নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ; যথা—চুন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, পটাশ, লৌহ, লবণ প্রভৃতি জলের সাহায্যে গলিত করিয়া গ্রহণ করে। সুতরাং বৃষ্টিপাতের উপর বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ নির্ভর করে। শীতকালে যখন জলের অভাব হয়, আমাদের দেশের অনেক গাছ তখন পত্র ত্যাগ করিয়া জলের খরচ বাঁচায়। যেখানে বারমাস বৃষ্টি হয় সেখানে বৃক্ষের পত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। শীতের দেশে যেখানে অতিরিক্ত তুষারপাত হয় সেখানে মাথা সরু সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। গাছের মাথা সরু হওয়ায় তুষার জমিতে পারে না এবং ডালগুলিও বরফের চাপে ভাঙিয়া পড়ে না। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যেখানে মাত্র শীতকালে অল্পবৃষ্টি হয় সেখানে গাছের ছাল, পাতা ও শিকড়ের মধ্যে জল সঞ্চয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। এইজন্যই কর্ক-ওক গাছের ছাল এত পুরু। বাষ্পীভবনের ( evaporation ) ফলে জল যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্য বিভিন্ন গাছের পাতার উপর লোমের মত সূক্ষ্ম নরম আবরণ এবং এই কারণেই গাছের পাতায় তৈলাক্ত আবরণ দেখা যায়। মরুভূমি অঞ্চলে কাঁটা গাছ অধিক দেখা যায়। এখানকার গাছগুলির শিকড় বেশ মোটা হয়; কারণ উহাতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়। ক্যাক্‌টাস গাছের মোটা শাঁসালো দেহেও জল সঞ্চিত থাকে। সুন্দরবন প্রভৃতি নোনাজলা অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের শিকড় মাটির উপর জড় হইয়া থাকে কারণ ঐ অঞ্চলে জোয়ারের জল প্রবেশ করে। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় জলবায়ুই প্রধানতঃ অরণ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিম্নে পৃথিবীর কয়েক প্রকার অরণ্যাঞ্চলের বিষয় আলোচনা করা হইল:

(১) **উষ্ণমণ্ডলের চিরহরিৎ অরণ্য** ( Tropical Evergreen Forests ) —নিরক্ষরেখা অঞ্চলে ও মৌসুমী অঞ্চলে অতিবৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানগুলিতে এই জাতীয় বড় বড় চিরহরিৎ বৃক্ষ শোভিত বনভূমি দেখা যায়। এই বৃক্ষগুলি খুব লম্বা ও পত্রবহুল এবং ইহাদের নিম্নে লতাপাতার ঘন আবরণ থাকে। এই অঞ্চলের জলবায়ু বার মাস উষ্ণ থাকে এবং বার মাস বৃষ্টি হয়। এই অরণ্যকে **সেল্‌ভা** অথবা Tropical Evergreen Hardwood বলে।

*Temperate forests বলিতে কেবল মাত্র (২) (৪) ও (৫) এর বর্ণনা দিতে হইবে।


পৃথিবীর উদ্ভিদ মণ্ডল
ও অরণ্য সম্পদ
সরলবর্গীয় অরণ্য
নাতিশীতোষ্ণ দৃঢ়কাষ্ঠ
(প্রধানতঃ পর্ণমোচী)
উষ্ণমণ্ডলের দৃঢ়কাষ্ঠ
(চিরহরিৎ ও মৌসুমী পর্ণমোচী)
তৃণভূমি
মরুভূমি
P. DAS

এই অরণ্য ব্রেজিলের সমগ্র আমাজন অববাহিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য আমেরিকার কতকাংশ, কঙ্গো অববাহিকা, ঘানা এবং নাইজিরিয়া রাজ্য, মালয়, ব্রহ্মদেশের কতকাংশ, সুমাত্রা এবং বোর্ণিও দ্বীপ, নিউগিনি প্রভৃতি বহুস্থানে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থিত। এই অরণ্যের অধিকাংশ কাঠই খুব শক্ত এবং ভারী। অরণ্য হইতে কাঠ কাটিয়া বাহির করা ব্যয়সাধ্য। এই অরণ্যের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য এখানে শ্রমিক সহজলভ্য নয়। গাছগুলি বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় এক জাতীয় গাছ একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মেহগনি কাঠ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানের আবলুস, সেগুণ প্রভৃতি কাঠ এই অরণ্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ। বন্য রবার গাছ, তৈল উৎপাদনকারী পাম গাছ প্রভৃতিও এই অরণ্যে জন্মে। পৃথিবীর মোট কাষ্ঠ বাণিজ্যের মধ্যে এই অরণ্যের আবদান খুব কম। ইহার অধিকাংশ সম্পদ এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

(২) **নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের পর্ণমোচী অরণ্য** (Temperate Deciduous Forests)—এই অরণ্য উত্তর গোলার্ধে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে, মধ্য চীন ও জাপান এবং আমেরিকার-যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার স্থানে স্থানে দেখা যায়। দক্ষিণ গোলার্ধে কেবল অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণভাগে এই অরণ্য রহিয়াছে। যে সকল স্থানের জলবায়ু নাতিশীতল অর্থাৎ যেখানে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা ১০° সেঃ মিঃ বা কিছু বেশি এবং শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০° সেঃ মিঃ অপেক্ষা কিছু কম সেই সকল স্থানে বিশেষতঃ মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ( ৬০° সেঃ মিঃ হইতে ১২০° সেঃ মিঃ ) এই প্রকার চওড়া-পাতা ( broad leaved ) পাতাঝরা গাছ দেখা যায়। এই অরণ্য অবশ্য মানুষের হাতে বেশির ভাগ স্থানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে ইউরোপের অনেক দেশেই পার্বত্য অঞ্চলে সযত্নে বনসৃজন করা হইয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী অরণ্যে প্রধানতঃ ওক, এলম, ম্যাপল, এ্যাশ, বার্চ, উইলো, রেডউড্ এবং নানাজাতীয় ইউক্যালিপ্টাস গাছ দেখা যায়। অধিকাংশ গাছের কাঠ বেশ শক্ত এবং এই সকল কাঠ জাহাজ নির্মাণ এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতের উপযোগী। রেলগাড়ীর কামরা, স্লিপার, তার বহন করিবার থাম প্রভৃতিও এই সকল কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। ম্যাপল গাছের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এই চিনি প্রচুর উৎপন্ন হয়। জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানেও পর্ণমোচী অরণ্য প্রচুর দেখা যায়।

(৩) **উষ্ণমণ্ডলের মৌসুমী পর্ণমোচী অরণ্য** ( Tropical Monsoon Deciduous Forest )—ভারত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ চীনে মৌসুমী জলবায়ুর জন্য বৎসরে প্রায় অর্ধেক সময় বৃষ্টি হয় না এবং কয়েক মাস খুব বেশি বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ উত্তাপ গ্রীষ্মকালে ৪০° সেঃ গ্রেঃ-এর অধিক হয়। এই

অঞ্চলে পাতাঝরা গাছ বেশি দেখা যায়। অবশ্য দু'চারটি চিরহরিৎ গাছও এখানে দেখা যায়। এই অরণ্যে সেগুণ, শাল, শিশু, শিরিষ, তুং, পিংকাডো প্রভৃতি নানা জাতীয় গাছ দেখা যায়। অধিকাংশ গাছের কাঠ খুব শক্ত। এই সকল কাঠ হইতে রেলওয়ে স্লিপার, নৌকা, জাহাজ, আসবাবপত্র এবং বহু প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশ এবং থাইল্যাণ্ড প্রধানতঃ সেগুণ কাঠ রপ্তানি করে।

(৪) **সরলবর্গীয় অরণ্য** ( Coniferous Forest )—এই অরণ্য শীত-প্রধান স্থানে দেখা যায়। কানাডা, রাশিয়ার উত্তর ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র এবং উষ্ণমণ্ডলের অতি উচ্চ পর্বতগাত্রে এই অরণ্য দেখা যায়। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, তুষারপাত বেশি এবং গ্রীষ্ম স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। [ বিশদ বিবরণ ৩৯ নং প্রশ্নোত্তরে দ্রষ্টব্য। ]

(৫) **ভূমধ্যসাগরীয় চিরহরিৎ অরণ্য** ( Mediterranean Evergreen Forest )—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে শীতকালে অল্প বৃষ্টি হয় বলিয়া অধিকাংশ স্থানেই কাঁটাগাছ ও ঝোপ দেখা যায়। তবে যেখানে বৃষ্টি ১০০ সেন্টিমিটারের বেশি সেখানে পুরু ছাল ও শিকড়যুক্ত গাছ দেখা যায়। এগুলি চিরহরিৎ গাছ। জল বাঁচাইবার জন্য গাছগুলির পাতা তৈলাক্ত এবং লোমশও হয়। কর্ক-ওক এবং লরেল এই অরণ্যের গাছ।

(৬) **মরু অঞ্চলের কাঁটাবন** ( Tropical Thorn Forest )—এই অঞ্চলে উত্তাপ অত্যন্ত বেশি এবং বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই হয়। ক্যাক্‌টাস জাতীয় কাঁটাগাছ এবং সেজবুশ ও ব্লুবুশ জাতীয় ঝোপ এখানে দেখা যায়। এই জাতীয় গাছগুলির শিকড় খুব মোটা এবং দীর্ঘ, কারণ মাটির বহু নিম্ন হইতে জলগ্রহণ করিয়া এই অঞ্চলের গাছগুলিকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়।

উপরিউক্ত নানাপ্রকার অরণ্য ছাড়াও উষ্ণমণ্ডলের নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে **ম্যানগ্রোভ** বা নোনাজলার অরণ্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া নিরক্ষরেখার উত্তরে অল্পবৃষ্টি অঞ্চলে **সাভানা** অরণ্য বা দীর্ঘ তৃণ ও বৃক্ষময় ভূমি দেখা যায় এবং শীতপ্রধান অঞ্চলে মহাদেশের মধ্যভাগে শুষ্ক অঞ্চলে স্তেপ জাতীয় বৃক্ষহীন বিস্তৃত তৃণভূমি দেখা যায়। বৃষ্টির অভাবে এবং শীতগ্রীষ্মের উত্তাপের অত্যধিক পার্থক্যের ফলে এই অঞ্চলে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। জন্মিলেও ঝড়ের বেগে উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

**Q. 38 Give a brief account of the different forest regions of the world and discuss the nature of their economic exploitation.** ( Burdwan B. Com. 1965 )

[ উপরের প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ]

**Q. 39 Indicate the geographical location of the coniferous forest of the world and describe the commercial uses of the products of thees forests.** ( B. Com. 1969 )

**[পৃথিবীর সরলবর্গীয় অরণ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের এবং ঐ সকল অরণ্যে বাণিজ্যিক দ্রব্যগুলির বর্ণনা দাও।]**

**সরলবর্গীয় অরণ্য**—পৃথিবীর উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিস্তৃত অরণ্য রহিয়াছে। এই অরণ্যের গাছগুলি সরল ও খুব লম্বা হয়। বিভিন্ন প্রকার সরলবর্গীয় গাছের পাতা বেশ সরু—অনেকটা হাতের আঙ্গুলের মত গোল বা সূচের মত সরু এবং গাছের মাথা ও ফল মন্দিরের মত সরু চূড়াযুক্ত ( cone ; hence coniferous trees )। সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল—প্রায় মনুষ্য বাসের অযোগ্য। এখানে প্রচুর তুষারপাত হয় এবং নদীগুলি বৎসরে আট নয় মাস বরফে জমিয়া থাকে। এই অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। গ্রীষ্মকালে চাষ-আবাদ করা হয়। শীতকালে চাষীরাই অরণ্যে কাঠ কাটিতে যায়। অরণ্য খুব ঘন নয়। এক ধরণের গাছ একস্থানে অনেক দেখা যায়। কোন স্থানে শুধু পাইন গাছ, কোথাও ফার বা স্প্রুস, আবার কোথাও হয়ত লার্চ কিংবা হেমলক গাছের বিস্তৃত অরণ্য। এই সকল গাছের কাঠ নরম ও হাল্কা; সুতরাং কাটা এবং বহন করা সহজ। নদীতে ভাসাইয়া এই কাঠ বহুদূরে লইয়া যাওয়া যায়। ডগলাস ফার গাছ খুব লম্বা হয়। এই কাঠ বেশ শক্ত। পাইন কাঠ হাল্কা ও নরম হইলেও আসবাব প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা যায়। ফার, স্প্রুস, হেমলক প্রভৃতি গাছের কাঠ হইতে মণ্ড ও কাগজ, তক্তা, নৌকা, কৃত্রিম রেশম, প্লাইউড প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যত কাঠ আমদানি-রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে ৮০ ভাগের মত সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাঠ। এই কাঠ সহজে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার দাম কম। উষ্ণমণ্ডলের অরণ্যে যেমন কাঠ কাটিয়া বাহির করা ব্যয়সাধ্য, সরলবর্গীয় অরণ্যে তেমন নহে; সুতরাং সমগ্র পৃথিবীতে এই কাঠ রপ্তানি করা যায়।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে, বিশেষতঃ উত্তর গোলার্ধে এশিয়া, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা মহাদেশের ৫০° হইতে ৭০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়। সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ও ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়ার উত্তরভাগ, কানাডার মধ্য-উত্তর ভাগ এবং আলাস্কার দক্ষিণভাগ এই অরণ্যে আবৃত। সর্বত্র এই অরণ্য সমান ঘন নহে। অনুর্বর স্থানগুলিতে এই অরণ্য কম। উত্তর ভাগে তুন্দ্রাঞ্চলের নিকট বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রাকার।

পৃথিবীতে সরলবর্গীয় অরণ্যের কাষ্ঠ উৎপাদনে বর্তমানে রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। যদিও কানাডার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে সরলবর্গীয় অরণ্যের পরিমাণ কম, তবুও এখানে কাঠের ব্যবহার বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে, বিশেষতঃ কলাম্বিয়া মালভূমিতে এবং রকি পর্বতের উপর

অধিক অরণ্য রহিয়াছে। পূর্বতটে নিউ ইংল্যাংণ্ডও অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বভাগে অ্যাপালাশিয়ান পর্বতেও প্রচুর সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়। কানাডার অরণ্য সম্পদ প্রধানতঃ কুইবেক, অন্টারিও এবং কলম্বিয়া অঞ্চলে অধিক কাজে লাগানো হইয়াছে। কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনে কানাডা পৃথিবীতে উচ্চস্থান অধিকার করে। সরলবর্গীয় অরণ্যের কাঠ হইতে উৎপন্ন নিউজপ্রিণ্ট কাগজ কানাডাই সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি করে।

ইউরোপের মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের অর্থনীতি অরণ্য সম্পদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরশীল। সুইডেনও প্রচুর কাঠ রপ্তানি করে। রাশিয়া বিপুল পরিমাণে নরম কাঠ উৎপাদন করে। বহু কাগজের কল প্রভৃতি এই কাঠ ব্যবহার করে। ইউরোপের মধ্যভাগে আল্পস, কার্পেথিয়ান ও ডিনারিক পর্বতেও সরলবর্গীয় অরণ্য রহিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালি সরলবর্গীয় অরণ্যের কাঠের সাহায্যে কাগজ, পেন্সিল, দেওয়াল ঘড়ি, কৃত্রিম রেশম, দেশলাই প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রপ্তানি করে।

এশিয়ার মধ্যে সাইবেরিয়াতে বিপুল সরলবর্গীয় অরণ্য রহিয়াছে। জাপানের উত্তর ভাগে, মাঞ্চুরিয়া ও মধ্য চীনের উচ্চ পর্বতগাত্রে এবং ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের হিমালয় পর্বতমালায় এই অরণ্য দেখা যায়। জাপানে নরম কাঠের সাহায্যে কাগজ প্রভৃতি শিল্পের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে। অবশ্য জাপান কানাডা হইতে কাঠ আমদানিও করে।

দক্ষিণ গোলার্ধে মাত্র দুটি স্থানে সরলবর্গীয় অরণ্য অধিক পরিমাণে দেখা যায়; ব্রেজিলের দক্ষিণভাগে প্যারাণা পাইন অরণ্য। আমেরিকার মূলধনের সাহায্যে এই নরম কাঠ এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে। নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপেও কাউরি পাইন বন উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকার এ্যাণ্ডিজ পর্বতে, বিশেষতঃ চিলির দক্ষিণভাগে সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়।

সরলবর্গীয় অরণ্যের কাঠ রপ্তানির ক্ষেত্রে কানাডা, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ব্রেজিল উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানি দুইই করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ প্রচুর নরম কাঠ আমদানি করে।

**Q. 40. What do you know of *lumbering and the associated industries? Account for the location of the paper industry of the world near the Northern Coniferous Forest.**

**[ কাঠ কাজে লাগানো এবং ঐ সম্পর্কিত শিল্পগুলির বিষয় যাহা জান লিখ। পৃথিবীর কাগজ শিল্প প্রধানতঃ উত্তরের সরলবগায় অরণ্যাঞ্চলে গড়িয়া উঠার কারণ কি ? ]**

*Lumbering কথার অর্থ হইল কাঠকাটা, চেরাই প্রভৃতি যাবতীয় কাঠশিল্প।

বৃক্ষ মানুষের নানা কাজে আসে। বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে নানাপ্রকার আসবাব, কাগজ, কৃত্রিম রেশম, ঘরবাড়ী, রেলওয়ে স্লিপার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ; যথা—**নরম ও কঠিন**। পাইন, ফার, স্প্রুস, শিমুল প্রভৃতি নরম কাঠ ভারসহ ও টেকসই নহে, কিন্তু আবলুস, মেহগনি, সেগুণ, শাল প্রভৃতি ভারী ও কঠিন কাঠ ভারসহ ও টেকসই।

পৃথিবীতে যত কাঠ মানুষের কাজে লাগে তাহার অধিকাংশই নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের বিশাল সরলবর্গীয় অরণ্য হইতে পাওয়া যায়। এই অরণ্য কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তর ভাগ জুড়িয়া বিরাজমান। যেখানে অরণ্যাঞ্চল-গুলি সমুদ্র, রেলপথ বা জনপদের নিকট অবস্থিত সেখানেই উহার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে। এই অরণ্য তেমন গভীর নহে এবং শীতকালে তুষারপাতের সুযোগ লইয়া সদ্য কাটা গাছগুলি জন্তু বা যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে টানিয়া বাহির করা যায়। হাল্কা বলিয়া ঐ কাঠ বহন করা ও কলে চেরাই করা সহজ। নরম কাঠ দিয়া কানাডায় কাগজের মণ্ড ও কাগজ এবং সুইডেন ও জাপানে কাগজ ও দেশলাই প্রস্তুত করা হয়। ঐ সকল দ্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

অধিকাংশ দেশের উচ্চ পর্বতগাত্রে পাইন, ফার প্রভৃতি গাছের সমাবেশ দেখা যায়। ভারতে হিমালয়ের ৫।৬ হাজার ফুটের উপর সরলবর্গীয় বৃক্ষের গভীর অরণ্য রহিয়াছে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সামুদ্রিক অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানগুলির অরণ্যের ওক, এল্‌ম প্রভৃতি দৃঢ় কাষ্ঠ হইতে জাহাজ ও আঁসবাবপত্র প্রস্তুত হয়।

যদিও পৃথিবীর বাজারে আমাজন উপত্যকা, কঙ্গো, ঘানা, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের সেগুণ, আবলুস, রোজউড্, মেহগনি প্রভৃতি দৃঢ় কাষ্ঠের অভাব নাই, তবু এ কথা সত্য যে উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অরণ্যে গাছগুলি প্রায় কোথাও একত্র থাকে না। এবং উহাদের আশেপাশের গাছের সঙ্গে লতাগুল্মের সহিত এমন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যে, গাছ কাটিয়া বাহির করা কঠিন ; তাই হাতীর সাহায্যে টানিয়া বাহির করিতে হয়। অধিকাংশ গাছই এত ভারী যে নদীর জলে উহা ভাসে না। উপরিউক্ত অসুবিধাগুলির জন্য উষ্ণ-মণ্ডলের বিপুল অরণ্য সম্পদ বিশেষতঃ কঙ্গো এবং উত্তর ব্রেজিল অঞ্চলের বিপুল অরণ্য-সম্পদের সম্যক ব্যবহার আজও সম্ভব হয় নাই। আসবাবপত্রাদি প্রস্তুতের জন্য আবলুস ( কৃষ্ণবর্ণ ), মেহগনি, রোজউড প্রভৃতি দৃঢ় কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট।

পৃথিবীর অরণ্য-সম্পদ যেমন বিচিত্র তেমনই মূল্যবান। ভালভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে উহা ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

**কাগজ শিল্পের অবস্থান**—কাগজ শিল্প বনজ সম্পদের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল।

ভারতে প্রধানতঃ বাঁশ এবং সাবাই ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এদেশের কাগজ উৎপাদন খুবই সামান্য। পৃথিবীতে কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল দেশ অগ্রগণ্য সেই সকল দেশে প্রধানতঃ নরম কাঠ হইতে কাগজ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই কাগজ শিল্প প্রধানতঃ সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। কানাডা, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং জাপানে কাগজ শিল্প খুব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ ফার, স্প্রুস এবং হেমলক গাছের কাঠ হইতেই কাগজ উৎপন্ন হয়; পাইন কাঠ হইতেও শক্ত কাগজ প্রস্তুত করা হয়। অধিক রজন থাকায় পাইন কাঠ কাগজ প্রস্তুতের খুব ভাল কাঁচা মাল নহে। বর্তমানে অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে শক্ত কাঠ হইতেও বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করা হইতেছে।

কাগজ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি থাকা দরকার—(১) কাঁচা মালের সহজলভ্যতা। যে সকল অরণ্য অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ, ঘাস ও নরম কাঠ পাওয়া যায় সেই সকল স্থানে কাগজ শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও কাগজ শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজন। (২) ইন্ধন দ্রব্যের প্রাচুর্য। কয়লা, খনিজ তৈল অথবা জলবৈদ্যুতিক শক্তি নিকটে এবং সস্তায় পাওয়া গেলে তবে কাগজ শিল্প গঠন করা যায়। (৩) বাজারের নৈকট্য। কাগজ প্রয়োজন হয় শিক্ষিত সমাজে। সুতরাং অগ্রসর দেশগুলিতে কাগজ শিল্প গড়িয়া ওঠে। ঐ সকল দেশ প্রয়োজন মত কাঁচামাল আমদানিও করে। (৪) মূলধনের প্রাচুর্য। কাগজ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন দরকার। বড় বড় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে অনেক টাকা লাগে।

ভারত কাগজ শিল্পের দিক দিয়া তেমন উন্নত নয়। এদেশে কাগজ প্রস্তুত করার উপযুক্ত সস্তা কাঁচামাল সুপ্রচুর নয়। ভারতে বর্তমানে অনেকগুলি কাগজের কল আছে বটে তবে ঐগুলির উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

পৃথিবীর মধ্যে কানাডা সর্বাপেক্ষা বেশি কাগজ ও মণ্ড রপ্তানি করে। অন্যান্য দেশের মধ্যে ব্রিটেন, জাপান, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড কাগজ শিল্পে বেশ উন্নতিশীল। ভারত নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি নানা প্রকার কাগজ আমদানি করে।

# মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জ

[ SOIL AND VEGETATION ]

**Q. 41. What are the different types of soil ? How do they influence the utilisation of land in different parts of the world ?**

**[ মাটি কয় প্রকার ? পৃথিবীর নানা স্থানে জমির ব্যবহারে মাটির ভূমিকা কি ? ]**

যে স্থান হইতে বৃক্ষলতাদি জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতে পারে তাহাকেই মাটি বলা চলে। পর্বতগাত্রেও মাটি আছে, তবে উহার উর্বরতা কম। ধরাপৃষ্ঠের উপর জলবায়ুর ক্ষয়কার্যের ( weathering ) ফলে মাটির সৃষ্টি হয়। আদি যুগের আগ্নেয়শিলা হইতে প্রথমে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানগুলির উপর প্রস্তর চূর্ণিত হইয়া দেখা দেয় মাটি। ইহার সহিত ক্রমশঃ জৈব-পদার্থ মিশ্রিত হইতে থাকিলে উর্বর মাটির সৃষ্টি হয়। বারিবর্ষণে, রৌদ্রে ও শীতে ফাটল ধরিয়া বালুকার ও জলতরঙ্গমালার ক্ষয় কার্যের ফলে অথবা হিমবাহের চাপে পিষ্ট হইয়া শিলা চূর্ণ হইতে থাকে। বহুযুগ ধরিয়া এইরূপ কার্যক্রম চলিতে থাকিলে সামান্য মাটির সৃষ্টি হয়।

*সুতরাং মাটিকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়—(১) উহার উৎপত্তি হিসাবে ; যেমন—**বাহিত মাটি** ও **স্থিতিশীল মাটি**, (২) উহার বাহিরের গঠন হিসাবে ; যেমন—**বালি, কাঁকর, দোআঁশ মাটি, পলি** ও **কাদা মাটি** এবং (৩) উহার রাসায়নিক গঠন অনুসারে ; যথা—(ক) **চুন-প্রধান পেডক্যাল** ( Pedocal ) মাটি এবং (খ) **লৌহপ্রধান পেডালফার** ( Pedalfer ) মাটি। নানাপ্রকার খনিজ ও জৈব পদার্থ এবং নানা প্রকার জলবায়ুর প্রভাবে **ল্যাটারাইট মাটি, কৃষ্ণমৃত্তিকা, বেলে মাটি, চুনা মাটি** অরণ্য অঞ্চলের **'পডলস'** ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে মাত্র কয়েক প্রকার মাটির বিষয় আলোচনা করা হইল।

---

* বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ রঙ হিসাবেও মাটির বিভাগ করেন ; যথা—

(১) Dark brown পড্‌সল ( শীতল জলবায়ু অঞ্চলে )

(২) Grey-brown পড্‌লস জাতীয় মাটি ( অরণ্যাঞ্চলের মোটামুটি উর্বর মাটি )

(৩) হলুদ ও লাল মেশানো মাটি ( পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চলে দেখা যায় )

(৪) ল্যাটারাইট জাতীয় মাটি ( উষ্ণমণ্ডলে দেখা যায়—অনুর্বর লাল মাটি )

(৫) প্রেয়ারী ভূমির মাটি ও সার্ণোজেম ( Chernozems ) কৃষ্ণবর্ণ মাটি, ইহার উর্বরতা খুব বেশী। তৃণভূমি অঞ্চলে দেখা যায়।

(৬) Chestnut and brown soil—অল্পবৃষ্টি অঞ্চলের শুষ্ক মাটি।

(৭) মরুঅঞ্চলের বালুকা—জৈব পদার্থের অভাব কিন্তু উর্বরতা কম নয়। জলসেচ পাইলে বেশ ফসল ফলানো যায়।

**পৃথিবীর মৃত্তিকা বলয় ( Soil zones of the world )**—রুশ মৃত্তিকাবিদগণ পৃথিবীকে কতকগুলি মৃত্তিকা অঞ্চলে ভাগ করেন। অন্যান্য দেশের মৃত্তিকাবিদগণও ( Pedologists ) মোটামুটি এই পথই অনুসরণ করিয়াছেন। এই বিভাগ ব্যবস্থায় মাটির গঠন, উপরকার রঙ ও আকৃতির উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পৃথিবীকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি মৃত্তিকা বলয়ে ভাগ করা যায়—

(১) **তুন্দ্রা অঞ্চলের মাটি**—এই মৃত্তিকার মধ্যস্থ জলকণা জমিয়া থাকায় এই মাটি অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে। উপরিভাগে পীট জাতীয় ভেষজ পদার্থ দেখা যায়।

(২) **পড্‌সল এবং গ্রে-ব্রাউন মাটি**—শীতপ্রধান দেশে সরলবর্গীয় ও মিশ্র পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চলে এই অনুর্বর মাটি দেখা যায়। এই মাটির উপরিভাগের জৈব পদার্থ হইতে সার সৃষ্টি হয় নাই এবং নিম্নের মাটিও উর্বরতাবিহীন। গ্রে-ব্রাউন রঙের মাটি কিছুটা উর্বর কিন্তু পড্‌সল অত্যন্ত অম্লময় ( acidic ) এবং অনুর্বর।

(৩) **পীত ও লোহিত মৃত্তিকা**—আর্দ্র ও ঈষদুষ্ণ নাতিশীতল জলবায়ু এবং পর্ণমোচী অরণ্যের প্রভাবে এই মাটি সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা তেমন উর্বর নয়। মধ্য ইউরোপ ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় অনেকস্থানে এই মাটি দেখা যায়।

(৪) **ল্যাটারাইট জাতীয় মাটি**—এই ঘোর লালরঙের মাটি উষ্ণমণ্ডলের আর্দ্র স্থানগুলিতে, যথা—দক্ষিণ ভারত, ব্রেজিল, মধ্য আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। এই মাটিতে জৈব পদার্থ খুব কম এবং লৌহ ও এ্যালুমিনিয়ম অত্যধিক। ইহা তেমন উর্বর নহে।

(৫) **প্রেয়ারী অঞ্চলের মাটি**—এই মাটির রঙ ঘন বাদামী এবং সাধারণতঃ তৃণভূমি অঞ্চলে যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অধিক নয় সেই সকল স্থানে এই মাটি দেখা যায়। ইহাতে অম্ল বা চুন কোনটাই অধিক নয়। ইহা অত্যন্ত উর্বর মাটি।

(৬) **সার্ণোজেম মাটি**—এই মাটিও তৃণভূমির মাটি, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত শীতল ও মধ্যমবারিপাতযুক্ত স্থানেই অধিক দেখা যায়। এই মাটির রঙ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহা খুব উর্বর। তবে কোথাও কোথাও এই মাটির মধ্যে জলকণার অভাব দেখা যায়। এই মাটি এশিয়ার মধ্যভাগে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে ও ইউক্রেণে দেখা যায়।

(৭) **চেষ্টনাট ও বাদামী রঙের মাটি**—এই বাদামী রঙের মাটিও তৃণভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা বেশ উর্বর তবে মাটির নিম্নভাগে চুনের আধিক্য দেখা যায়।

(৮) **সিয়েরোজেম ও মরুমৃত্তিকা**—এই মাটি মরু অঞ্চলে দেখা যায়। এই মাটিতে জৈব পদার্থ কম। মাটির নিম্নভাগে চুন অধিক। এই মাটিতে ফসল ভালই হয়, তবে জলসেচ একান্ত প্রয়োজন।

উদ্ভিদ জীবন প্রধানতঃ মাটির উপর নির্ভরশীল। মাটিকে শিকড় দ্বারা অবলম্বন করিয়া বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। মাটির মধ্যস্থ নাইট্রোজেন, চুন, লবণ, লৌহ, ফসফরাস, গন্ধক, পটাস প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ এবং উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ ( organic matter or humus ) জলের সাহায্যে দ্রব করিয়া শিকড় মারফত খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকে। মাটির মধ্যস্থ বায়ুও বৃক্ষাদি গ্রহণ করে। সুতরাং মাটির উর্বরতা বলিতে বুঝায়—(ক) মাটি রাসায়নিক পদার্থে সমৃদ্ধ কিনা অর্থাৎ সকল প্রকার খনিজ প্রয়োজন মত আছে কিনা। অবশ্য বিভিন্ন গাছের প্রয়োজন কিছু স্বতন্ত্র ; ( যথা—ধান গাছ অধিক নাইট্রোজেন পছন্দ করে, নারিকেল গাছ অধিক লবণ পছন্দ করে, কফিগাছ অধিক লৌহ হইলে ভাল জন্মে )। (খ) মাটি জল ধারণক্ষম অথবা উহার মধ্য দিয়া জল সহজে নিকাশ হয় কিনা। (গ) মাটি শুকাইলে ফাটে কিনা। মাটি ফাটিলে গাছের শিকড় ছিঁড়িয়া যায়। (ঘ) মাটি সহজে চাষ করা যায় কিনা। এবং (ঙ) মাটির মধ্যে জৈব-পদার্থ, জল, বায়ু প্রভৃতি আছে কিনা। উপরিউক্ত অবস্থাগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই জমির উর্বরতা এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের পক্ষে জমির উপযুক্ততা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা দ্বারা ফসল-চাষের জন্য জমি নির্বাচন করিতে পারেন।

জমি ব্যবহার ব্যবস্থা ( Land utilization )—এই কথাটির অর্থ জমির ব্যবহার কি প্রকার অর্থাৎ কোন জমিতে কি প্রকার চাষ-আবাদ বিজ্ঞানসম্মত তাহা জানা ও সেইমত চাষের ব্যবস্থা করা। উন্নতিশীল দেশে জমির ব্যবহার সুপরিকল্পিত-ভাবে করা হয়। চাষের জমি, বাসের জমি, অরণ্য ও পশুচারণ ভূমির জন্য ভূখণ্ড নির্বাচনে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনে প্রথম বহু জমির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার চালু করা হয়। ঐ সময় জার্মান সাবমেরিণের উপদ্রবের ফলে ইংল্যাণ্ডে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রকারে জমি ব্যবহারের ফলে অধিক ফসল উৎপন্ন হওয়ায় এই সংকটের সমাধান হইয়া যায়। ব্রিটেনের বিরাট সাফল্য হইতে আজ সমগ্র সভ্য জগৎ এই শিক্ষালাভ করিয়াছে যে প্রত্যেকটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশেই খাদ্য প্রভৃতি উৎপাদন বাড়াইতে হইলে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় নিবারণ করিতে হইলে ভূমির উপযোগিতা নির্ধারণ সমীক্ষা ( land utilization survey ) হওয়া একান্ত ভাবেই প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার ফলে জমির উর্বরতা ও অবস্থান হিসাবে প্রত্যেক জমির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার জানা যাইবে। বিভিন্ন প্রকার মাটিযুক্ত অঞ্চলকে আলাদা করিয়া তাহার প্রকৃত ব্যবহার নিরূপিত করিতে পারিলে কৃষি উৎপাদন সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া যাইবে।

**Q. 42. What are the causes and evil effects of soil erosion ? Suggest remedies.**

**[ ভূমিক্ষয়ের কারণ এবং কুফলসহ নিরোধের উপায় বিবৃত কর। ]**

**ভূমি ক্ষয় ( soil erosion )**—ভূমি ক্ষয় কৃষিকার্যের প্রধান শত্রু। মানুষের অমনোযোগিতা ও প্রকৃতির খেয়াল উভয়ই ভূমি ক্ষয়ের জন্য দায়ী। জমির উপরের কয়েক ইঞ্চি মাটিই সর্বাপেক্ষা উর্বর। কিন্তু ঐ মাটি বর্ষার জলের সঙ্গে অথবা ধূলি-ঝড়ের সঙ্গে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে ( balance of nature ) মাটির সৃষ্টি এবং ক্ষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে অর্থাৎ যতটুকু মাটি সৃষ্টি হইতেছে মোটামুটি ভাবে ততটুকু মাটিই বর্ষার জলের সঙ্গে বা ধূলি ঝড়ের ফলে ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু মানুষ যখন অরণ্য কাটিয়া জমি "উদ্ধার" করে এবং ভূমিক্ষয় রোধের জন্য কোন প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিয়া চাষ-আবাদ করিতে থাকে তখন ভূমির উপরস্থ উর্বর মাটি ( top soil ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উর্বর ভূমি অনুর্বর হয়। ভূমিতে ফসল থাকিলে গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। ক্ষেত্রের চারিদিকে ভাল 'আল' থাকিলে অথবা বড় বড় গাছ থাকিলে বৃষ্টির জল অধিক মাটি বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। গরুর গাড়ি যাইবার খাদ অথবা পায়ে-চলা পথগুলি দিয়া মাঠের উর্বর মাটি ধুইয়া নিকটস্থ নদী-নালাতে জমা হয়। গাছের গুঁড়ি দিয়া ঐ পথগুলিতে বাঁধ দিলে জমির মাটি জমিতেই থাকিয়া যাইবে এবং নির্মল জল নিষ্কাশিত হইবে। পার্বত্য অঞ্চলে মাটি ক্ষয় হইয়া যখন পাথর বাহির হয়, তখন আর চাষ করা যায় না। এইভাবে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ একর জমি চিরকালের মত বন্ধ্যা হইয়া পড়িয়া আছে। মানুষ চেষ্টা করিলে এই সর্বনাশা ভূমিক্ষয় রোধ করিতে পারে।

**ভূমিক্ষয়ের কারণ**—(১) অরণ্যনাশ, (২) তৃণভূমিতে অত্যধিক চারণ ( বিশেষতঃ ছাগল তৃণের শেষ পর্যন্ত ভক্ষণ করে বলিয়া তৃণের শিকড়ের বাঁধন আল্‌গা হওয়ায় ভূমিক্ষয় হয় ), (৩) কৃষকের অসাবধানতা, (৪) রাস্তা রেলপথ প্রভৃতির জন্য মাটি কাটা।

**ভূমিক্ষয় রোধের উপায়**—(১) অরণ্য সৃষ্টি, (২) বিজ্ঞান সম্মত চাষ-আবাদ ( Cover crops, contour furrowing, strip cropping, rotation of grazing etc. ) (৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির বাঁধ দিয়া নালাগুলি ( gully pluggings ; contour bunding ) আটকাইয়া দিলেও ভূমিক্ষয় বন্ধ হয়।

# পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ

## AGRICULTURAL RESOURCES OF THE WORLD

**Q. 43. What are the geographical circumstances favourable for intensive and extensive agriculture? Illustrate your answer with reference to any particular crop. Indicate the world trade in that crop.** ( C. U. B Com. 1961 & 1969)

[ নিবিড় এবং ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থায় গড়িয়া উঠে? কোন বিশেষ ফসলের উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর। ঐ ফসলটির বাণিজ্যের উল্লেখ কর। ]

**কৃষির শ্রেণী বিভাগ**—জলবায়ুর বিভিন্নতা, অর্থনৈতিক উন্নতির মান এবং জনসংখ্যার তারতম্যের জন্য পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকার কৃষিকার্য-পদ্ধতি বিদ্যমান। অরণ্যের অনগ্রসর মানুষ তাহার জঙ্গলকাটা পর্বত গাত্রে "জুম" চাষ করিয়া থাকে, আবার নদীর তীরে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে মাত্র কোদালের সাহায্যে চাষবাসও করে। মানুষ সভ্য হইয়া প্রথমতঃ গো-অশ্বাদি জীবজন্তুর সাহায্যে তাহার কর্ষণ-প্রণালীর উন্নতি সাধন করে। পরে যান্ত্রিক যুগে বাষ্প, তৈল ও বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় কর্ষণ-প্রণালীর আমূল সংস্কার ও উন্নতি সাধন করে। কিন্তু আজও পৃথিবীর বহু সুসভ্য দেশে কলের লাঙ্গলের বদলে সামান্য কোদালই ব্যবহৃত হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ জমির বদলে ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রেই চাষ করা হইতেছে। অথচ বিঘা প্রতি উৎপাদনের দিক হইতে এই প্রকার কৃষিকার্য আধুনিকতম পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষিকার্য হইতে কোন অংশে হীন নহে। তবে প্রয়োজনের তারতম্য অনুসারে মোট জমির ব্যবহার এবং এক জমির অধিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণ অনুসারেই কৃষিকার্যকে অতি-উৎপাদক বা নিবিড় (Intensive) ও ব্যাপক উৎপাদক (Extensive) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

(a) **অতি-উৎপাদক বা নিবিড় কৃষি** ( Intensive Agriculture ) বলিতে বুঝায় জমিকে যতদূর সম্ভব ভালভাবে ব্যবহার করা অর্থাৎ জমির উৎপাদিকা শক্তির সবটুকুই যাহাতে মানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই প্রকার কৃষি ব্যবস্থাতে জমি কখনও ফেলিয়া রাখা হয় না এবং জমি যাহাতে প্রতিবারেই যথেষ্ট ফসল উৎপাদন করিতে পারে সেজন্য খনিজ ও জান্তব সার, উৎকৃষ্ট লাঙ্গল ও উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করা হয় এবং জমির উর্বরতা সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি

রাখিয়া একটির পর একটি ফসল চাষ করা হয় ( Crop roration )। ইহা ছাড়া, বার মাস জলসেচের ব্যবস্থা থাকে ও খামারের কাজে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয়। জমির মাটি সংরক্ষণের এবং মাটির জল সংরক্ষণেরও নানা ব্যবস্থা করা হয়। ফলে এক একর জমি হইতে গড়ে ৩৫ মণ পর্যন্ত গম এবং ৪০ মণ ধান উৎপাদন করা সহজেই সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া স্বল্পকাল মধ্যে যে সকল ফসল জন্মায় তাহার দুই তিনটি একই জমি হইতে লওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, ভারতের কোন কোন অংশ, জাভা, চীন ও জাপানের কথা বলা যাইতে পারে। এই সকল দেশে প্রত্যেক খণ্ড জমিতে তাহার উপযুক্ত ফসল চাষ করা হয়। এক জমি হইতে বৎসরে তিন চারিটি ফসল লওয়া জাপানে খুবই প্রচলিত ; এমন কি একই সময় একই জমি হইতে দুইটি ফসল লইবার সুদক্ষ পদ্ধতিও জাপানীরা জানে। উহারা প্রত্যেক খণ্ড জমিকে ফুলের বাগানের মত করিয়া সযত্নে চাষ করে এবং প্রচুর জনশক্তি উহাতে নিয়োগ করে। ফলে ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশ জাপান তার নয় কোটি লোকের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয়।

জাপান এবং চীনে ধান চাষ নিবিড় প্রথায় করা হয়। ভারতেও গোদাবরী ও গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চলে নিবিড় (Intensive) প্রথায় ধান চাষ করা হয়। একই বৎসরে আউস এবং আমন ধান একই জমিতে উৎপন্ন করা হয়।

ফ্রান্স এবং জার্মানীতে নিবিড় প্রথায় গম উৎপন্ন করা হয়। জমিতে খুব বেশি পরিমাণে রাসায়নিক এবং জৈব সার ব্যবহার করিয়া একর প্রতি উৎপাদন খুব বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। তাই ক্ষুদ্র দেশ ফ্রান্সের গম উৎপাদন প্রায় ভারতের সমান।

কিন্তু যেখানে লোক সংখ্যা কম অথবা বৎসরে মাত্র একবার বারিপাত হয় এবং জলসেচ ব্যবস্থাও তেমন ভাল নহে সেখানে ঐরূপ অতি উৎপাদক অথবা নিবিড় ( Intensive ) কৃষি সম্ভব নহে। বিশেষতঃ যে সমস্ত দেশ নূতন মনুষ্য বসতির জন্য ব্যবহৃত হইতেছে ( যেমন—কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ) সেই সমস্ত দেশে শ্রমশক্তির অভাবে বিজ্ঞানের উপর অতিনির্ভরতা অনিবার্য হইয়া উঠে।

(d) ব্যাপক উৎপাদক কৃষি ( Extensive Agriculture ) ব্যবস্থায় বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া ট্রাক্টর, রিপার, কমবাইন-হারভেষ্টার প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্য পরিচালিত হয়। ইহাতে জনশক্তি কম লাগে এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে প্রচুর ফসল উৎপাদন করা হয়। এই প্রথায় চাষ করার ফলে মাথাপিছু ফসল উৎপাদন খুব বেশি হয় এবং প্রচুর কৃষিপণ্য রপ্তানি করা যায়। এইরূপ প্রণালীতে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদন দ্রুত বাড়িতেছে। কারণ বর্তমানে শস্যাবর্তন

( crop-rotation ), মাটি সংরক্ষণ, জলসেচ, খনিজসার ব্যবহার ও বীজ নির্বাচনের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। ফলে কানাডায় একর প্রতি ১২ মণ গমের স্থলে ২৪ মণ গম উৎপাদিত হইতেছে। বিশাল কৃষিক্ষেত্রে মাটির ক্ষয় নিবারণ করা কঠিন, তাই বারমাসই কোন না কোন ফসলে জমির মাটিকে বদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু শীত-প্রধান দেশে তুষারের জন্য শীতকালে ফসল হয় না ; সুতরাং এই সময় বার্লি ও রাই জমিতে বুনিয়া রাখা যায়। গাছ বড় হইলে ( ফসল হয় না ) উহার উপর কলের লাঙ্গল দিয়া উহাকে জমির সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রকার উৎকৃষ্ট সবুজ সার ( green manure ) প্রস্তুত করা হয়। ইতোমধ্যে শীতকাল অতীত হইয়া গেলে গম, বার্লি, ওট, রাই প্রভৃতি চাষ করা হয়। কানাডা ও উত্তর যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে। যেখানে জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর সেখানে অধিক পরিমাণে সুপারফসফেট, পটাস, নাইট্রেট, চুন প্রভৃতি খনিজ সার ব্যবহার করিয়া উহাকে উর্বর করা হয়। যেখানে জমি বালুকাময় সেখানে বীট, আলু ও অন্যান্য শিকড় জাতীয় ফসল ( root crops ) চাষ করা হয়। চাষের কাজ যন্ত্রের সাহায্যেই করা হয়, সুতরাং কয়েকজন মাত্র লোকেই অনেক ফসল উৎপাদন করিতে পারে। ইহার ফলেই কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মধ্যে গম রপ্তানিতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনাতেও ব্যাপক কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ব্যাপক কৃষিকার্যের সাহায্যে যে সকল ফসল সাধারণতঃ উৎপন্ন করা হয় তাহাদের মধ্যে গম সর্বপ্রধান। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি জনবিরল দেশে ব্যাপক পদ্ধতিতেই গম চাষ করা হয়।

[ গম আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে 47 প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ]।

**Q. 44. What are the characteristics of (a) Commercial Farming (b) Subsistance Agriculture and (c) Mixed Farming ? Give suitable examples of each.**

**[ (ক) বাণিজ্যিক কৃষি (খ) স্বয়ংভর কৃষি এবং (গ) মিশ্র কৃষির বৈশিষ্ট্য কি ? উপযুক্ত উদাহরণ দাও। ]**

(a) **বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থা** ( Commercial Farming ) : আধুনিক যুগে, বিশেষতঃ ধনবাদী দেশগুলিতে কৃষিকার্য লাভের উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়। সেই অর্থে প্রায় সকল প্রকার কৃষিকার্যই বাণিজ্য ভিত্তিক এবং ফসলগুলিকে অর্থকরী ফসল বলা যায়। তবে "বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি" বলিতে আমরা কেবল সেই কৃষির কথাই বলিব যাহার উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো—অর্থাৎ বাণিজ্যই

যাহার অনুপ্রেরণা, স্বয়ংপূর্ণতা নহে। এই প্রকার কৃষিব্যবস্থা অনেক দেশেই প্রচলিত হইয়াছে। ব্যবসায় ভিত্তিতে চাষ-আবাদ করিতে হইলে প্রচুর মূলধন ও ব্যবসায় বুদ্ধি দরকার। নানাপ্রকার অর্থকরী ফসল ( cash crop ) পৃথিবীর নানাদেশে চাষ করা হয়। ভারতে কার্পাস, পাট, শণ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু ও তামাক প্রধান অর্থকরী ফসল। এগুলি যদিও প্রধানতঃ ক্ষুদ্রাকার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন করা হয় তবু ইহাদের জন্য যথেষ্ট মূলধন দরকার হয়। গ্রামের মহাজন বা সমবায় ব্যাঙ্ক এই কৃষিমূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন। আবার অনেক দেশে বড় বড় ব্যবসায়ী বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া বড় বড় বাগিচা গঠন করেন এবং বাণিজ্যফসল উৎপন্ন করেন। এই শ্রেণীর চাষ-আবাদকে **বাগিচা আবাদ** বা Plantation farming বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিউবা, হাওয়াই ও ফিজি দ্বীপে ইক্ষু চাষ, ব্রেজিলে কফি চাষ, দার্জিলিং ও আসামে চা আবাদ, ভার্জিনিয়ায় তামাক আবাদ প্রভৃতির কথা বলা যায়। সাধারণতঃ কোন স্থানের জলবায়ু, মাটি, শ্রমশক্তি এবং দেশবিদেশের বাজারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া এই প্রকার বাগিচা আবাদ বা শিল্প গড়িয়া তোলা হয়। খাদ্য ফসল এবং মাংস দুধ প্রভৃতিও নানা দেশে ( যথা—অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে ) ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্নদ্রব্যের অনেকখানিই রপ্তানি করা হয়। বাগিচা চাষের সঙ্গে রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

কোন কোন দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে **এক-ফসল কৃষি-ব্যবস্থা** ( one crop-agirculture ) গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ কুইন্সল্যাণ্ডের ইক্ষু চাষ এবং কানাডার প্রেয়ারী অঞ্চলে গম চাষের কথা বলা যাইতে পারে। **এককসল কৃষি ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা** এই যে, কৃষকরা ক্রমশঃ একটি ফসল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে এবং ইহাতে উৎপাদনের খরচও কম হয়।—বিশ্বশান্তি বজায় থাকিলে এবং উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা থাকিলে এই কৃষি-ব্যবস্থায় খুব লাভ হয়। একই প্রকার যন্ত্রাদি, সার ও যানবাহন ব্যবহার করা যায়। সুতরাং উৎপাদনের ব্যয় কম হয়। **এই ব্যবস্থার অসুবিধাও আছে** ; যথা—পৃথিবীর বাজারের উপর কৃষকদের অত্যধিক নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্য ব্যাহত হইলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে। তাহা ছাড়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একটা ফসল চাষ করিলে জমিতে অধিক সার দিতে হয়। শস্যাবর্তন ( crop rotation ) করিলে সারের প্রয়োজন কম হয়। পৃথিবীতে যদি কোন বৎসর একটি ফসল প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয় তবে উহার দাম পড়িয়া যায়। ব্রেজিলের দক্ষিণ ভাগে যেখানে কৃষকগণ কেবল কফির উপর নির্ভর করে সেখানে অনেক সময় ফসলের মূল্যের অধগতি প্রতিরোধ করার জন্য কফি নষ্ট করা হয় বা উহা হইতে প্লাষ্টিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা

হয়। উহাকে ভ্যালোরাইজেশন ( valorization ) বলে। মালয়ে যেখানে কেবল মাত্র রবার চাষ করা হয়, সেখানেও পূর্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। সুতরাং, এক ফসল কৃষি-ব্যবস্থার অনেক অসুবিধাও আছে।

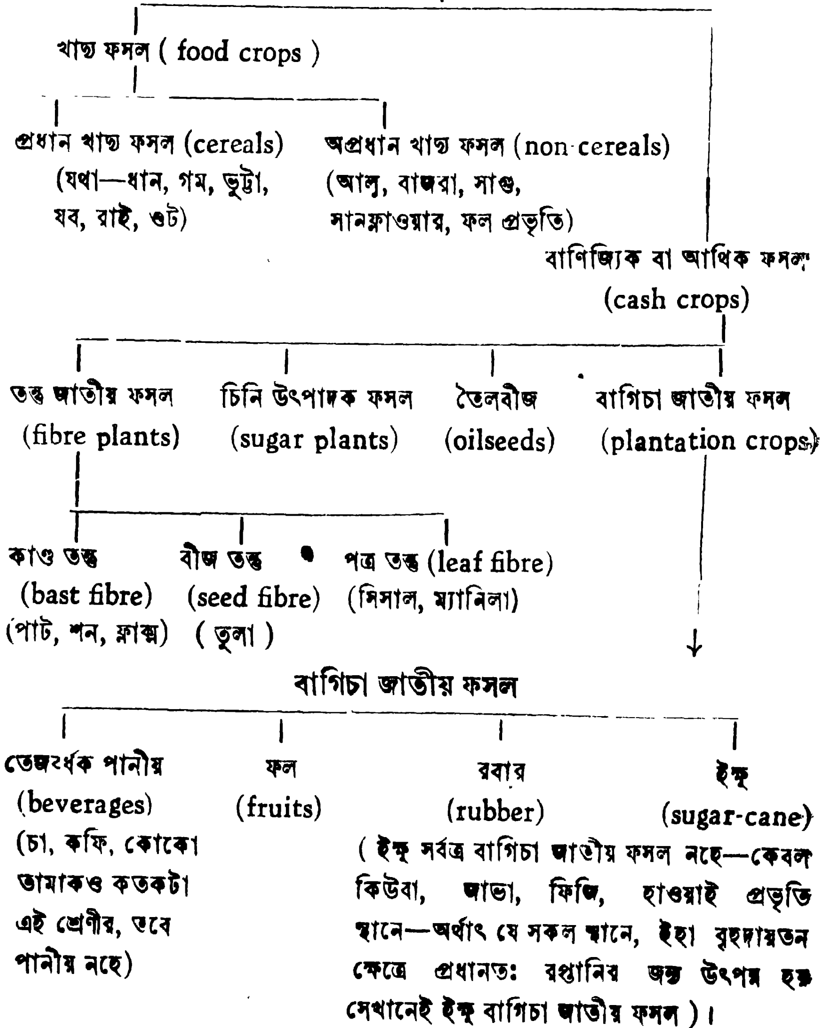
(b) স্বাবলম্বন-ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা ( Subsistance Agriculture )—স্বয়ংপূর্ণ কৃষিব্যবস্থা পূর্বে প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। যে সকল দেশ অনগ্রসর, যেখানে যানবাহন ব্যবস্থা অনুন্নত এবং যেখানে ব্যবসাবাণিজ্য ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই, সেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন দেশের জলবায়ু ও মাটি সকল প্রকার ফসলের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল কৃষিব্যবস্থায় উৎপাদন কম হয়। ভারত, চীন, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অনেক স্থানে এখনও এই কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

বর্তমান যুগে অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে অনেক দেশ নাগরিকগণের ভরণপোষণ সম্পর্কে যথাসাধ্য স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে। এমন কি নানা প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াও ফসল উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

(c) মিশ্র কৃষি (Mixed Farming)—অনেক কৃষক জমিতে ফসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ নগর ও শিল্পাঞ্চলের নিকটেই এই ধরণের মিশ্র কৃষিব্যবস্থা দেখা যায়। ইহার জন্য ভাল বাজার, সুন্দর জলবায়ু, প্রচুর মূলধন ও দক্ষতার প্রয়োজন। শস্যাবর্তন ( crop rotation ) সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। জমিতে প্রচুর সার দিতে হয়, কারণ বারবার মানুষ ও পশুর খাদ্য উৎপাদনের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যায়। মিশ্র কৃষির সঙ্গে মোটর পরিবহণ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সকল বড় বড় শহরের নিকট কৃষকেরা শাক-সব্জি, ফল, দুধ প্রভৃতি মোটর ট্রাকে করিয়া টাট্‌কা অবস্থায় দ্রুত বাজারে পাঠায়। এইরূপ সব্জি উৎপাদনকে ট্রাক ফারমিংও ( truck farming ) বলা হয়।

কলিকাতার আশেপাশে বহু মিশ্র কৃষিখামার আছে। এই সকল খামারে গো-মহিষ পালন, দুগ্ধ ও মাখন উৎপাদন, হাঁস-মুরগী পালন, নানাপ্রকার শাকসব্জি ও ফলমূল এবং ফুল উৎপন্ন করা হয়। এই সমস্ত জিনিস মোটর ট্রাকে বোঝাই হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে কলিকাতার বাজারে পৌছায় এবং ভাল দামে বিক্রয় হয়।

**Q. 45. Classify agricultural crops.**
**[ কৃষিজ ফসলগুলির শ্রেণীবিভাগ কর। ]**



**খাদ্য ফসল** ( Cereals or Grain Crops )—

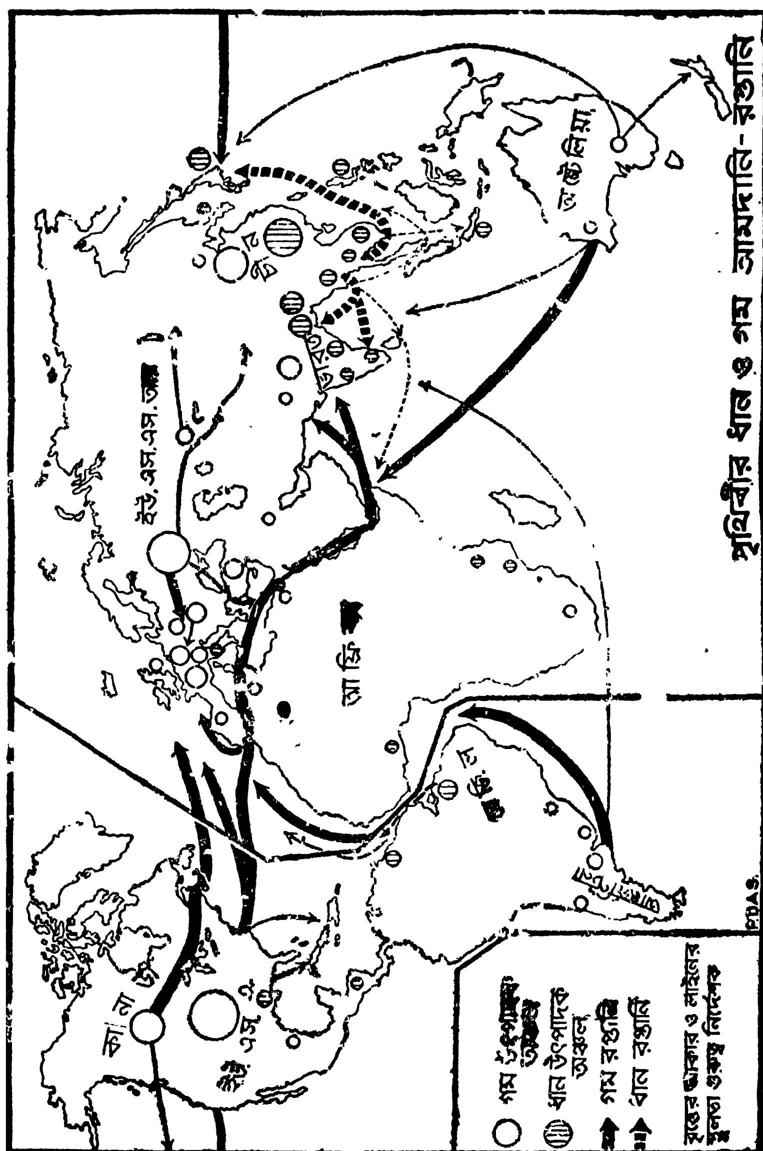
**Q. 46. What physical conditions are required for the cultivation of rice ? Name the countries which produce and export rice.** ( C. U. 1950 )

**[ ধান চাষের জন্য কি প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা দরকার ? যে দেশগুলিতে ধান উৎপন্ন হয় এবং যাহারা ধান রপ্তানি করে তাহাদের নাম দাও। ]**

**ধান** ( rice )—ধান প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান মণ্ডলে মৌসুমবায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের ফসল। ইহার জন্য পলিমাটির জমি, ( নদী উপত্যকার দোঁ-আঁশ মাটিযুক্ত জমিতে ধান ভাল হয় ) বার্ষিক ১০০ সেঃ মিঃ-এর বেশি বৃষ্টি এবং ২৫° সেঃ বা ততোধিক তাপের প্রয়োজন হয়। জমিতে জল না দাঁড়াইলে ধান ভাল জন্মে না। দো-আঁশ মাটির নিম্নে কাদামাটি থাকিলে জল সহজে শুকায় না। বদ্ধ কাদা জলার উপরে ধানের চারাগুলি হাতে করিয়া রোপণ করিতে হয়। তাই প্রচুর শ্রমিক দরকার হয়। বেশির ভাগ ধান সমভূমিতে হয় ; কিন্তু কিছু পরিমাণ ধান পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ( terraced cultivation ) চাষ করা হয়। ধান চাষের ক্ষেত্রে নিবড় কৃষি-ব্যবস্থা ( intensive farming ) অনুসরণ করা উচিত।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী অসংখ্য প্রকার ধানের আবাদ দেখা যায়। ঐ সকল ধানকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—(১) পার্বত্য ধান এবং (২) সমতল ভূমির ধান। নানাপ্রকার পার্বত্য ধান পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পর্বত গাত্রে জন্মে। এগুলি সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহাদের উৎপাদন নগণ্য। সমতলভূমির ( ভারতের ) ধান প্রধানতঃ তিন প্রকার, যথা—আউস, আমন ও বোরো। কেবল ভারতেই ইহাদের আবার সহস্রাধিক শ্রেণী আছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জাতীয় ধান চাষ হয়। আউস ধানের জন্য প্রথম দিকে কম এবং পরে অধিক বৃষ্টি দরকার হয়। আমনের জন্য অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। জমিতে জল দাঁড়াইলে আমন ও আউস ধান রোপণ করা হয়। যেখানে জলসেচের সুব্যবস্থা আছে ( যেমন—সিন্ধু ও মিশর ) সেখানে সামান্য বৃষ্টিতেই ধান উৎপন্ন হয় ; পূর্ব ভারতের জলাভূমিগুলিতে শীতকালে বোরো ধান চাষ করা হয়। দক্ষিণ জাপানেও শীতকালে ধান জন্মে। নানা স্থানে নানা প্রকার ধান চাষ হয়। স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির প্রকার ভেদের জন্যই এই পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ভারতের বেশির ভাগ লোক ভাত খায় ; তাহা ছাড়া অন্যান্য নানারূপ খাদ্যও চাউলের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। ভারত, চীন ও জাপানে ধান হইতে নানাপ্রকার


পৃথিবীর ধান ও গম আমদানি-রপ্তানি
কানাডা
ইউ.এস.এ.
ইউ.এস.এস.আর.
অস্ট্রেলিয়া
গম উৎপাদক অঞ্চল
ধান উৎপাদক অঞ্চল
গম রপ্তানি
ধান রপ্তানি
বৃত্তের আকার ও লাইনের স্থূলতা গুরুত্ব নির্দেশক
P.DAS.

মন্ডও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাকা ধানগাছ (খড়) দিয়া ঘর ছাওয়া হয়। গো-মহিষাদি পশু প্রধানতঃ খড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। ভাতের মাড় তাঁতবস্ত্রের জন্য অপরিহার্য। **পৃথিবীর অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য চাউল।**

**চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড,** কাম্বোডিয়া, দুই ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ফরমোজা, কোরিয়া, ফিলিপাইন, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, গিয়ানা, মিশর, স্পেন, ইটালি, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে প্রধানতঃ ধান জন্মে।

**চীনেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা** অধিক পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। তাহার পরেই ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান।

**চীনদেশের** সমগ্র দক্ষিণ ভাগে বিশেষতঃ সিকিয়াং নদীর উপত্যকা, ইয়াংসি অববাহিকা এবং লোহিত পর্যন্ত অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। চীনের মধ্যভাগের সমুদ্রতট সংলগ্ন অংশগুলিতেও প্রচুর ধান জন্মে। এমনকি মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ উপকূলেও অল্প পরিমাণে ধান চাষ হয়। ভাত চীনদেশের জাতীয় খাদ্য বলা চলে। চীনদেশে প্রতি একর জমিতে ভারত অপেক্ষা অনেক বেশি ধান উৎপন্ন হয়।

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মালাবার তট প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক ধান উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী ব-দ্বীপ, কাম্বোডিয়া ও লোহিত নদীর ব-দ্বীপ, থাইল্যাণ্ডের মেনাম নদীর সমভূমি, জাপানের মধ্য ও দক্ষিণভাগ, কোরিয়ার দক্ষিণাংশ, ফিলিপাইনের লুজন-দ্বীপ, ফরমোজা, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানও ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ইটালিতে পো নদীর অববাহিকা বা লম্বার্ডি সমভূমিতে ধান চাষ হয়। এখানে জলসেচ দরকার হয়, কারণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল গ্রীষ্মকাল শুষ্ক থাকে। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে মিসিসিপি নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার কোন কোন স্থানে ধান চাষ হয়। সোভিয়েট এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার দু'এক স্থানেও ধান চাষ হয়; অবশ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় ঐ সকল দেশের ধান উৎপাদন নগণ্য।

একর প্রতি ধান উৎপাদনে স্পেন ও ইটালি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রতি একরে ভারতে গড়ে মাত্র ১২।১৫ মণ ধান উৎপন্ন হয়। চীনে প্রতি একরে প্রায় ৩০ মণ, জাপানে ৩০ মণের বেশি ও সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে ১৮ মণ ধান উৎপন্ন হয়। সাম্প্রতিক কালে ভারতে ফরমোজার ধান তুইচুং এবং এদেশের বৈজ্ঞানিকদের তৈরী ধান আই, আর, এইট প্রভৃতি খুব ব্যাপক ভাবে চাষ সুরু হইয়াছে। এই সকল ধানের ফলন সাধারণ ধান অপেক্ষা চার-পাঁচ গুণ বেশি। এবং এগুলি শীতগ্রীষ্ম বারোমাসই চাষ করা যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালের পর হইতে এই সকল নতুন ধানবীজ ব্যবহারের ফলে কেবল ভারতে নহে সারা বিশ্বে ধান সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৭

শালের পর হইতেই ভারত প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতে শুরু করে। মৌসুমী বায়ুর তারতম্য অনুসারে ভারত ও চীনে চাউলের উৎপাদন প্রতি বৎসর কমবেশি হইয়া থাকে। **ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড,** কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি যে সকল দেশের জনসংখ্যা কম অথচ উৎপাদন বেশি, সাধারণতঃ সেই সকল দেশ হইতেই প্রচুর চাউল বিদেশে রপ্তানি হয়।

ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ফরমোজা, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রেজিল চাউল রপ্তানি ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। প্রধান আমদানি-কারক দেশগুলির মধ্যে **ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল ও মালয়েশিয়া** বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**আমদানি-রপ্তানি বন্দর**—পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধান রপ্তানি-বন্দরগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, বেসিন ও আকিয়াব, থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক, এবং আমদানি-বন্দরগুলির মধ্যে জাপানের কোবে ও ইয়াকোহামা, সিংহলের কলম্বো, ভারতের কলিকাতা ও মাদ্রাজ, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম উল্লেখযোগ্য।

**Q 47. What geographical conditions are necessary for the cultivation of Wheat ? Describe its world distribution and trade.**

[ গম চাষের জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজন ? উহার চাষের এলাকা এবং বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ। ]

**গম ( Wheat )**—গম চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও একটু উঁচু জমি চাই। গাছের গোড়ায় জল দাড়ানো ভাল নয়। তাই গম চাষের জমিগুলি হয় বড় বড় আর জলনিকাশের ব্যবস্থাও থাকে। ব্যাপক আকারে যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করার পক্ষে গম আদর্শ ফসল। সুতরাং শ্রমিক কম লাগে। জলসেচ হইলে ভাল হয়।

গম একটি প্রধান খাদ্যফসল। ইহার প্রচলন অতি প্রাচীন কালেও ছিল। দীর্ঘকাল চাষ হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও মাটির উপযুক্ত বহুপ্রকার গমের প্রচলন হইয়াছে। প্রাধানতঃ ইহা দুই প্রকার; যথা—**বাসন্তিক গম ও শীতকালীন গম**। যে সকল দেশ অধিক শীতল ( যেমন—কানাডা ) অর্থাৎ যেখানে শীতকালে অত্যধিক তুষারপাত হয়, সেই সকল দেশে বাসন্তিক গমের চাষ হয়। আবার ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি যে সকল দেশের জলবায়ু উষ্ণ ভাবাপন্ন সেখানে কেবল মাত্র শীত ঋতুতেই গম চাষ করা সম্ভব। গম চাষ করিবার জন্যনিম্নলিখিত ভৌগোলিক পরিবেশের প্রয়োজন—(ক) গড় উষ্ণতা প্রায় ১০° সেঃ গ্রে. (খ) বৃষ্টিপাত যদি গ্রীষ্মকালে হয় তবে ৫০ হইতে ১০০ সেন্টিমিটার, আর যদি শীতকালে হয় তবে ৩৫ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ (গ) নিয়মিত জলসেচ, (ঙ) ফসল কাটার সময়

কিছুকাল শুষ্ক জলবায়ু, রৌদ্রকরোজ্জ্বল ও সম্পূর্ণ মেঘহীন আকাশ এবং (ঙ) উর্বরহাল্কা দোঁআশ পলিমাটি ও একটু ঢেউ-খেলানো জমি।

আধুনিককালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউক্রেণ, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের বিশাল ক্ষেত্রে নানাপ্রকার কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে গম চাষ করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে একর প্রতি গম উৎপাদন হল্যাণ্ড, জার্মানী ও ডেনমার্কে অধিক (৪০ বুশেল বা ততোধিক)। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালিতেও একর প্রতি ৩০ হইতে ৫০ বুশেলের মত এবং যুক্তরাষ্ট্রে একর প্রতি ২৫ বুশেল গম জন্মে। ভারতের গড়ে ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত প্রতি একরে মাত্র ১২ বুশেল উৎপন্ন হইত (এক বুশেল গম ৩০ সেরের মত)। পৃথিবীর প্রধান প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চলগুলি হইল:—যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অভ্যন্তরভাগের সুবিস্তৃত প্রেয়ারী সমভূমি ও মিসিসিপি নদীর অববাহিকা, (২) সোভিয়েট রাশিয়ার ডন, নীপার ও নীষ্টার নদীবিধৌত বিশাল সমভূমি বা ইউক্রেণ, (৩) উত্তর চীনের সমভূমি, (৪) ভারত পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা ও গঙ্গা নদীর উর্ধ্বপ্রবাহ অঞ্চল, (৫) অষ্ট্রেলিয়ার মারে ও ডার্লিং নদীর সমভূমি, (৬) আর্জেন্টিনার পম্পাস সমভূমি, (৭) ফ্রান্সের পশ্চিমভাগের সমভূমি (৮) হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া, (৯) উত্তর ইটালি এবং (১০) তুরস্ক।

পৃথিবীর গম রপ্তানি বাণিজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির মারফৎ সম্পন্ন হয়। প্রধান প্রধান গম রপ্তানিকারী দেশ হইল কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও *রাশিয়া এবং আমদানিকারী দেশ ব্রিটেন, জার্মানী, ভারত, জাপান, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি। পৃথিবীর প্রধান গম রপ্তানি বন্দরগুলির মধ্যে কানাডার মন্ট্রিল, হ্যালিফ্যাক্স, চার্চিল, ফোর্ট উইলিয়ম ও ভ্যাঙ্কুভার, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, গ্যালভষ্টোন, হাউস্টন ও লেকবন্দরগুলি অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্ণ, এবং আর্জেন্টিনার বুয়েনাস আয়ারেস উল্লেখযোগ্য।

**Q. 48. What geographical conditions are suitable for (a) Barley (b) Rye (c) Oat ; Where are they produced ?**

**[(ক) যব, (খ) রাই ও (গ) জই এর জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজন। কোথায় এগুলি উৎপন্ন হয়? ]**

(b) যব (Barley)—যব বর্তমানে একটি প্রধান খাদ্যফসল না হইলেও এক সময় ইহা স্কটল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের একটি প্রধান খাদ্য ছিল। বর্তমানে ইহার প্রধান ব্যবহার বিস্কুট, মদ, শিশুর খাদ্য ও পশুর খাদ্য হিসাব। ইহা পুষ্টিকর ও

* বর্তমানে রাশিয়ার গম রপ্তানি বন্ধ আছে। ১৯৬৪ সালে এবং ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর গম ক্রয় করে। এখন ক্রয়ের পরিমাণ কম।

লঘুপাক ; কিন্তু ইহা হইতে রুটি প্রস্তুত করা কঠিন ; কারণ আঠাল পদার্থের অভাব। ইহার মত জলবায়ু অগ্রাহ্যকারী ফসল আর নাই। নরওয়ে হইতে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়িয়া প্রায় সর্বত্রই ইহার চাষ হইতে পারে। মৃদুশীতল জলবায়ু, কম বৃষ্টিপাত এবং উর্বর হাল্কা মাটি ইহা চাষ করিবার উপযুক্ত অবস্থা। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার দক্ষিণভাগ যব উৎপাদনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহা ছাড়া, যে সকল দেশে গম উৎপন্ন হয় সে সকল দেশে গমের পাশাপাশি একটু খারাপ মাটিতে বা কখনও কখনও একত্রে যবের চাষ হয়। ফসল ভাল হইলেও যব হাল্কা বলিয়া ওজনে বেশি হয় না। প্রধান যব উৎপাদক দেশগুলি রাশিয়া, চীন, কানাডা, তুরস্ক, জাপান, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। ইহার বহির্বাণিজ্য তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

(c) রাই ( Rye )—ইহাকে গমের এক অতি নিকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ সংস্করণ ( গম নহে, গাছও সম্পূর্ণ অন্য প্রকার ) বলা যাইতে পারে। তৈলবীজ রাই ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার চাষ হয় শীতপ্রধান মহাদেশীয় জলবায়ুতে এবং অনুর্বর জমিতে। ফসল ভালই হয়, দামও গমের তুলনায় কম, সুতরাং মধ্য ইউরোপের সর্বত্র ইহা দরিদ্র লোকের অন্যতম খাদ্য ফসল। রাই বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। যে সকল দেশের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, (যথা—যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন) সেই সকল দেশে ইহার চাষ কম। ইহা একটি পুষ্টিকর পশুখাদ্যও বটে। রাশিয়া রাই উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় স্থান পূর্ব জার্মানীর এবং তাহার পর পোল্যাণ্ড। ইহা কেবল মাত্র শীত প্রধান দেশেই উৎপন্ন হয়। ইহার বহির্বাণিজ্য খুব কম।

(d) জই (Oat)—ইহা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের একটি প্রধান খাদ্য ফসল। জই গম অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। জই মানুষের খাদ্য হইলেও পশুখাদ্য হিসাবে ইহার প্রচলন অধিক। শূকর, গরু, মেষ প্রভৃতি যে সকল প্রাণী মাংসের জন্য প্রতিপালিত হয় তাহাদিগকে মাংসল করিবার জন্য ওট খাওয়ানো হয়। সুতরাং, পশুচারণ অঞ্চলেই ইহার চাষ অধিক। অত্যন্ত শীতল স্থানে এবং ভিজা জলবায়ুতেও ইহা ভালই জন্মে। সমগ্র ইউরোপে, এমন কি ফিনল্যাণ্ড ও উত্তর রাশিয়াতেও ইহার যথেষ্ট চাষ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলে ইহার চাষ আছে। কানাডা, জার্মানী, ব্রিটেন, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়।

**Q. 49 What geographical conditions are necessary for the cultivation of Maize ? Name the producing regions.**

[ ভুট্টাচাষের জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থা দরকার ? উৎপাদন স্থানগুলির নাম দাও। ]

ভুট্টা ( Maize )—ভুট্টা আমেরিকার ফসল। প্রাচীনকালে রেড ইণ্ডিয়ানরা এই ফসলের চাষ করিত। বর্তমানে ইহা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের সর্বত্রই চাষ করা হয়।

ভুট্টা নানাভাবে খাওয়া চলে, ইহাতে আঠাল পদার্থের অভাব থাকায় রুটি প্রভৃতি সুখাদ্য প্রস্তুত করা অসুবিধাজনক। ইহা হইতে মাড় ও চিনি ( গ্লুকোজ ) প্রস্তুত করা যায়। পশুখাদ্য হিসাবেই ইহার সর্বাধিক চাহিদা।

ভুট্টা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। প্রায় ২৫° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপ ১০০ হইতে ১৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এই ফসল চাষের জন্য প্রয়োজন। মাটি উর্বর ও গভীর হওয়া দরকার। ভুট্টার ফলন খুব বেশি হয়। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ভুট্টার গাছও পশুর খাদ্য। গাছের গোড়া কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

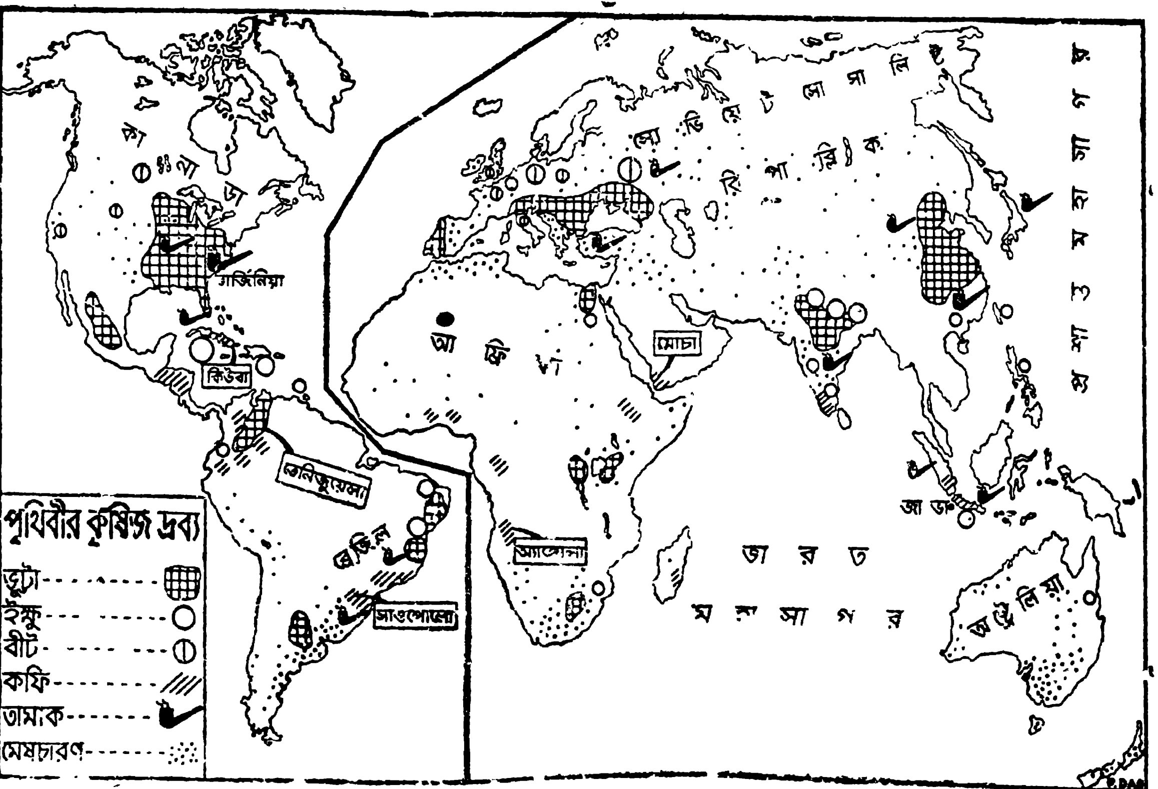
ভুট্টা উষ্ণমণ্ডলের ফসল হইলেও বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ ভুট্টা নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের দক্ষিণপ্রান্তবর্তী অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর $\frac{2}{3}$ অংশ ভুট্টা উৎপন্ন করিয়া থাকে ( বৎসরে প্রায় ৮$\frac{1}{2}$ কোটি টন ভুট্টা উৎপন্ন হয় ); সেখানে ইহাকে Indian Corn বলা হয়। ইহা নিগ্রোদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। দক্ষিণাঞ্চলে তূলা বলয় পর্যন্ত ইহাই সর্বপ্রধান ফসল। শূকর, গরু ও অশ্বের খাদ্য হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুট্টা ব্যবহৃত হয়। নানা শিল্পেও ( যথা— মাড় প্রস্তুত, গ্লুকোজ শিল্প ও অ্যালকোহল শিল্প ) ইহার চাহিদা আছে। উত্তর চীনে প্রচুর ভুট্টা জন্মে। ইউরোপের দক্ষিণে ও পূর্ব-মধ্যভাগে ভুট্টার চাষ আছে। ইটালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও ইউক্রেনে ইহার চাষ হয়। সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসিদের ভুট্টাই প্রধান খাদ্য ফসল। ব্রেজিল, ভেনিজুয়েলা ও মধ্য আমেরিকায় প্রচুর ভুট্টা উৎপন্ন হয়। ভারতে উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসিদের ভুট্টা একটি প্রধান খাদ্য। অন্যত্রও ইহার চাষ আছে। খাদ্য হিসাবে ভুট্টা অত্যন্ত পুষ্টিকর; সুতরাং ভবিষ্যতে নানা দেশে ইহার চাষ বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইদানিং ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ভুট্টা, ক্যাসাভা ও চীনাবাদাম হইতে কৃত্রিম চাউল প্রস্তুত করা হইতেছে।

## চিনি উৎপাদক ফসল Sugar plants )

**Q. 50. Describe the geographical conditions which favour the growth of sugarbeet. Name the countries which produce beetsugar.**

**[ বীট চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক অবস্থা উল্লেখ কর। যে দেশগুলি বীট উৎপন্ন করে তাহাদের নাম দাও। ]**

বীট ( Beet )—পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ বীট চিনি। মিষ্টি বীট সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। উর্বর এবং দো-আঁশ জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দিয়া ইহার জমি প্রস্তুত


কানাডা
ভার্জিনিয়া
কিউবা
ভেনিজুয়েলা
ব্রেজিল
সাওপোলো
আফ্রিকা
মোচা
অ্যাঙ্গোলা
ভারত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
জাভা
অষ্ট্রেলিয়া
পৃথিবীর কৃষিজ দ্রব্য
ভুট্টা
ইক্ষু
বীট
কফি
তামাক
মেষচারণ
P. DAS

করিতে হয়। এই জমিতে কিছু পরিমাণ চুন জাতীয় পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন। মহাদেশীয় জলবায়ু সম্পন্ন ( Continental type of climate ) যে সমস্ত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম নহে সেই সমস্ত অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার পক্ষে প্রচুর সূর্যকিরণ, গ্রীষ্মকালে মৃদু উষ্ণতা এবং শীতকালে শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। ইক্ষু অপেক্ষা বীট উৎপাদনে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। বীট হইতে চিনি উৎপাদন শুরু হয় নেপোলিয়নের সময় হইতে। বর্তমানে নানা প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বারা বীটমূলের ( এখানে বলা প্রয়োজন যে বীট মাটির নীচে জন্মে ) চিনির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বীট ইক্ষুর সংগে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। ইউরোপের অনেক দেশেই বীট এবং উহা হইতে চিনি উৎপাদন শিল্প সরকারের সংরক্ষণ লাভ করিয়াছে। রাশিয়া বীট উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা ছাড়া জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, কানাডা, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ সুইডেন, ডেনমার্ক এবং ইটালিতেও ইহা উৎপন্ন হয়। রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ইংল্যাণ্ডেও এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

**Q 50. Describe the geographical bases and other conditions that are responsible for the present world distribution of sugarcane. Describe the world trade in sugar.**

[ বর্তমানে যে সকল স্থানে ইক্ষু উৎপাদন হয় কি প্রকার ভৌগোলিক সুবিধার জন্য তাহা হয় উল্লেখ কর। চিনির বিশ্ব-বাণিজ্য বর্ণনা কর। ]

**ইক্ষু ( Sugarcane )**—ইক্ষু পূর্ব এশিয়ার বিশিষ্ট কৃষিজদ্রব্য। গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং ইন্দোচীনে ইহা প্রাচীনকাল হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু নিরক্ষীয় জলবায়ুতেই ইক্ষু ভাল জন্মে। ইক্ষুগাছ তৃণজাতীয়; ইহা ৩ হইতে ৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চ হয়।

উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ু এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ইক্ষুচাষের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। ইক্ষু চাষের জন্য ১২৫ সেঃ মিঃ হইতে ১৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং গড়ে ২৪° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ প্রয়োজন। ইক্ষু গাছ ৮ হইতে ১২ মাসে কাটিবার উপযুক্ত হয়। সকল দেশেই যে সময় বৃষ্টিপাত কম সেই সময় ইক্ষু কাটা হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে ইহার রসে যথেষ্ট চিনি পাওয়া যায় না। ইক্ষুর জমিতে নালা কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা চাই। চুন এবং লবণ জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত মৃত্তিকা ইক্ষুচাষের পক্ষে অনুকূল। সমুদ্রের বাতাস যদিও ইক্ষুচাষের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, তবুও ইহার প্রভাবে উচ্চাংগের ইক্ষু জন্মে।

ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশ হইলেও ভারতের ইক্ষু

জাভা ও কিউবা অপেক্ষা গড়পড়তা উৎপাদনে অনেক নিকৃষ্ট। পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি উৎপাদনে **কিউবা** প্রথম, **ব্রেজিল** দ্বিতীয় এবং **ভারত** তৃতীয়। কিন্তু ভারতে গুড়ের উৎপাদন চিনি উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি ( চিনি ও গুড়ের মোট উৎপাদন প্রায় ৭০ লক্ষ টন)। ভারতেই ইক্ষুর চাষ সর্বাপেক্ষা বেশি হয় ; কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন কম। হাওয়াই দ্বীপে এক একরে ৬২ টন ও ভারতে মাত্র ১৫ টন ইক্ষু হয়। ইক্ষু উৎপাদনে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার প্রধান উৎপাদন স্থান **কিউবা** ( Cuba )। তাহা ছাড়া, **হাইতি, ডোমিনিকা, পোর্টোরিকো, ত্রিনিদাদ** প্রভৃতি স্থানেও সামুদ্রিক জলবায়ুর প্রভাবে ইক্ষুচাষ খুব উন্নত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল ইক্ষু উৎপাদক স্থানই সমুদ্রের সন্নিকট। ভারতই ইহার ব্যতিক্রম। ভারত মহাসাগরের **মরিসাস, জাভা** ও প্রশান্ত মহাসাগরের **হাওয়াই, লুজন, ফিজি** ও **ফরমোজা** ইক্ষু উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বভাগে এবং অস্ট্রেলিয়ার **কুইন্সল্যাণ্ড** তটে ইক্ষু উৎপাদন দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে।

ইক্ষু উষ্ণমণ্ডলের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে এবং জাভা, কিউবা, লুজন, ফরমোজা প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় দ্বীপেও বাগিচা-প্রথায় ( Plantation industry ) চাষ করা হয়। এক বছর আবাদ করিলে পর পর তিনবছর ইক্ষু পাওয়া যায়। উৎপাদনের সংগে স্থানীয় প্রয়োজনের সম্পর্ক নাই—প্রায় সমস্তই রপ্তানি করা হয় এবং উৎপাদনের জন্য ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়। অনেক স্থানেই যন্ত্রের সাহায্যে ইক্ষু কাটা হয়। চিনির কলগুলি ইক্ষুক্ষেত্রের মাঝখানে এবং কলমালিকই আবাদেরও মালিক। ভারতে কিন্তু এই ব্যবস্থা নাই। তাই উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি এবং চিনির দামও অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্বিগুণ।

বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন চিনির প্রায় ৬৫ **ভাগ ইক্ষু** হইতে, **৩০ ভাগ বীট** হইতে এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ খেজুর, তাল, দ্রাক্ষা, ভুট্টা ও ম্যাপল ( কানাডার গাছ ) গাছ প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়।

**ইক্ষু ও বীট চিনি বাণিজ্য**—কিউবা, জ্যামেইকা, পোর্টোরিকো, জাভা, অস্ট্রেলিয়া, মরিসাস, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু-চিনি জাপান, চীন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে **রপ্তানি হয়।** প্রায় সমস্ত মিষ্ট বীট উৎপাদক দেশ ইক্ষু-চিনি আমদানি করে। কারণ ঐ সকল দেশে উৎপন্ন বীট-চিনি স্থানীয় প্রয়োজনেই নিঃশেষিত হয়। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর চিনি আমদানি করে। চীন, জাপান ও ফরমোজা, জাভা ও ফিলিপাইন হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানি করিয়া থাকে।

বর্তমানে ইক্ষু চিনি রপ্তানির ক্ষেত্রে কিউবা প্রথম, ব্রেজিল দ্বিতীয় এবং হাওয়াই, অষ্ট্রেলিয়া ও পোর্টোরিকো বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতও কিছু চিনি রপ্তানি করিতেছে। রাশিয়া হইতে বীট-চিনি রপ্তানি হয়।

**একর প্রতি ইক্ষু উৎপাদন**—হাওয়াই দ্বীপ ৬২ টন, জাভা বা যবদ্বীপ ৫৬ টন, ফিলিপাইন ২৭ টন, কিউবা ১৭ টন এবং ভারত ১৫ টন।

**Q. 51. What physical and climatic conditions make Cuba the most important producer of the cane sugar ? (C. U. 1958)**

**[ কিরূপ প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর জন্য কিউবা পৃথিবীর প্রধান ইক্ষু উৎপাদক হইয়াছে ? ]**

কিউবা দ্বীপ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। এই দ্বীপের জলবায়ু প্রায় নিরক্ষীয় জলবায়ুর মত। বৃষ্টিপাত পশ্চিম অংশে অত্যধিক। সুতরাং মধ্য ও পূর্ব-ভাগের উর্বর জমিতেই ইক্ষুচাষ অধিক হয়। এখানে বৃষ্টিপাত ১২৫ সেঃ মিঃ মত এবং ইক্ষু এক বৎসরের মধ্যেই পুষ্ট হয়। একবার রোপণ করিলে কয়েক বৎসর ইক্ষু জন্মে। নূতন করিয়া চাষ করিতে হয় না। এখানে প্রচুর শ্রমিক আছে এবং পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন এখানে নিয়োজিত ছিল; কিন্তু এখন এই শিল্প কিউবা সরকারের আয়ত্তে আছে। এখন কিউবার চিনির প্রধান ক্রেতা পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি, চীন ও রাশিয়া। পৃথিবীর বাজারে রপ্তানি যোগ্য ইক্ষু চিনির প্রায় অর্ধেক কিউবা রপ্তানি করে।

[ ইহার পরে ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর হইতে ইক্ষুচাষের প্রয়োজনীয় অবস্থা এবং উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম দেওয়া প্রয়োজন। ]

**Q. 52. Explain why sugarbeet and sugarcane are grown in regions which are mutually exclusive. Give the distribution of sugarcane producing areas of the world. Which are the countries that export sugar ? (C. U. 1962)**

**[ ইক্ষু এবং বীট কেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানগুলিতে আবাদ করা হয় তাহার কারণ দেখাও। পৃথিবীর ইক্ষু উৎপাদক স্থানগুলির বর্ণনা দাও। কোন্ কোন্ দেশ চিনি রপ্তানি করে ? ]**

ইক্ষু উষ্ণ মণ্ডলের ফসল। মিষ্টবীট শীতপ্রধান দেশের ফসল। শুধু তাহাই নয় এই দুইটি ফসল উৎপাদনের ভৌগোলিক ও আর্থিক পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া দরকার। নিম্নের আলোচনায় ইহাই দেখান হইয়াছে।

## ইক্ষু ও বীট চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অবস্থার তুলনা

| ইক্ষু | বীট |
|---|---|
| ১। ইহা উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ। | ১। উহা নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ। |
| ২। ইহা গভীর উর্বর মাটিতে চাষ করা হয়। ইহা মাটির উপরে জন্মে। | ২। বালুকাময় বা হাল্কা মাটিতেও হয়; কারণ ইহা মাটির নিম্নে জন্মে। |
| ৩। ইহা চাষ করিতে দক্ষতার তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয়। | ৩। ইহা উৎপাদনের জন্য প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিক লাগে। |
| ৪। ইক্ষু গাছে চিনির ভাগ খুব বেশি। | ৪। ইহাতে চিনির ভাগ তত বেশি নহে ( উন্নতি সত্ত্বেও )। |
| ৫। ইক্ষু উষ্ণমণ্ডলে চাষ হয়। সেখানে মজুর খুব সস্তা। | ৫। বীট নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে চাষ হয়। সেখানে মজুরদের মজুরিও বেশি। |
| ৬। ইক্ষুর ছিপড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু এখনও পর্যন্ত উহা প্রধানতঃ ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। | ৬। ইহার ছিপড়া ও পাতা গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য। |
| ৭। ইক্ষু চিনিশিল্পের উপজাত দ্রব্য অ্যালকোহল। | ৭। বীট হইতেও উপজাতদ্রব্য পাওয়া যায়। |
| ৮। ইক্ষু অনুন্নত দেশের ফসল। | ৮। বীট উন্নতিশীল দেশের ফসল. |

[ পরবর্তী অংশের জন্য Q. 50. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য ]

### বাগিচাজাতীয় ফসল ( Plantation crops ):

**Q. 53. Describe the conditions under which tea is grown in different countries of the world. Name the producing and exporting countries.**

**[ কি অবস্থার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা আবাদ করা হয় তাহা বর্ণনা কর। উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম দাও। ]**

**চা ( Tea )**—চা গাছ উষ্ণমণ্ডলের একপ্রকার চিরসবুজ গাছ। গাছগুলিকে বাড়িতে দিলে উহারা ১০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ হইতে পারে। কিন্তু অধিক পাতা তুলিবার জন্য গাছগুলিকে দেড় মিটারের অধিক বড় হইতে দেওয়া হয় না; ফলে গাছগুলি এক একটি ঝোপে পরিণত হয়। গাছগুলি রোপণ করিবার কয়েক বৎসর পর হইতেই স্ত্রী-শ্রমিকরা নিপুণভাবে ঐগুলি হইতে মাঝে মাঝে একটি কুঁড়িসহ ( পাতার কোরক ) দুইটি কচি পাতা এক-একটি করিয়া তুলিয়া লইতে থাকে। ঐ পাতা শুষ্ক করিয়া চীন, জাপান ও ফরমোজায় কিছু পরিমাণে

"সবুজ চা" প্রস্তুত হয়। উহাই আবার স্থলপথে রপ্তানির জন্য ইষ্টকের আকারে জমানো হয়। তাহাকে Brick Tea বলে। ভারত, সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারের জন্য "কৃষ্ণ চা" ( Black Tea ) প্রস্তুত হয়। এই চা কারখানায় বিশিষ্ট উপায়ে কম উত্তাপে পাতাগুলিকে সেঁকিয়া প্রস্তুত করা হয়।

চা উৎপাদনের জন্য **উষ্ণ অথচ আর্দ্র জলবায়ুর** প্রয়োজন। চায়ের জমি খুব উর্বর হওয়া দরকার। পাহাড়ের গায়েও বেশ উর্বর মাটি পাওয়া যায়। জমিতে জল দাঁড়াইলে চায়ের চারা নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য ঢালু জমিতে বা পাহাড়ের গায়ে চা ভাল জন্মে। তবে খুব ভাল জলনিকাশের ব্যবস্থা থাকিলে প্রায় সমতল জমিতেও চা জন্মিতে পারে ( যথা—উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে )। চায়ের জন্য বৎসরে ১৫০ হইতে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। রোপণের পর তৃতীয় বৎসর হইতে চায়ের পাতা তোলা হয়। সাধারণতঃ ৩০।৪০ বৎসর পর্যন্ত পাতা তোলা হয়। বেশি বৃষ্টি হইলে চায়ের পাতা অধিকবার তোলা যায়।

চীন দেশেই চা পানীয় হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরে ভারতে উহার আবাদ শুরু হয়। আসামের জংগলেও এক প্রকার চা গাছ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে **ভারত, চীন, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও পাকিস্তান** প্রধান চা-উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। অন্যান্য স্থানের মধ্যে ফরমোজা, পূর্ব-আফ্রিকা, ককেশাস পর্বত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

চা রপ্তানিতে এবং উৎপাদনে বর্তমানে **ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে।** চা-উৎপাদনে ভারতের পরেই সিংহলের স্থান, তাহার পরে চীন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে সিংহল ভারতের প্রধান প্রতিযোগী। নিম্নশ্রেণীর চায়ের বাজারে পূর্ব আফ্রিকার চা ভারতীয় চা অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রয় হওয়ায় ভারতীয় চা-শিল্প গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। চীনদেশের চা উৎপাদনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়েছে। পূর্ব-আফ্রিকার দেশগুলিতে, বিশেষতঃ কেনিয়া মোজাম্বিক ও টানজানিয়ায় সম্প্রতি চা উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, পৃথিবীতে চা-শিল্প অতি উৎপাদনজনিত অসুবিধা ভোগ করিতেছে। আইরিশ, ইংরাজ ও রাশিয়ানরা সবচেয়ে বেশি চা পান করে। ভারত হইতে চা ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

**ভারতের** মোট উৎপন্ন চায়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভারতের **উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে উত্তরবঙ্গ এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়** জন্মিয়া থাকে। বাকী অংশ দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি পর্বতে এবং কেরলে উৎপন্ন হয়। চীনদেশের দক্ষিণ ভাগে, জাপানের দক্ষিণে ও ফরমোজাতে চায়ের চাষ হয়। চীনদেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগিচাই অধিক ছিল। বর্তমানে এই শিল্পটি ব্যাপকভাবে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে।

মাহাংসি নদীর দক্ষিণেই অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত। সিংহলের ( Ceylon ) চা-শিল্প মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এখানে প্রচুর ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে। শ্রমিকরা অধিকাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভব তামিল। এখানে বৎসরে দুইবার—শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রবল বারিপাত হয়। সিংহলের চা খুব উচ্চশ্রেণীর। পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে চায়ের আবাদ আছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া—এই তিনটি প্রধান চা-রপ্তানিকারক দেশের প্রচার কার্যের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের চায়ের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বর্তমানে সেখানে আবার কফির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন চায়ের সবচেয়ে বড় সরবরাহ কেন্দ্র ( Distributing centre )। বর্তমানে কলিকাতার চায়ের নীলাম বাজারও বেশ উল্লেখযোগ্য।

**রপ্তানি বন্দর**—পৃথিবীর প্রধান প্রধান চা রপ্তানি বন্দরগুলির নাম :—(১) ভারতের কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ ; (২) সিংহলের কলম্বো ; (৩) ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা।

**Q. 54. Write a brief account of cacao as a plantation crop.**

**[ বাগিচা-ফসল ক্যাকাও-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ]**

কোকো ( Cacao )—ক্যাকাও গাছ দক্ষিণ আমেরিকায় ইকুয়েডর রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্ভিদ ; কিন্তু আফ্রিকার ঘানা, নাইজিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ইহার উৎপাদন অধিক ( অপর পক্ষে কফি গাছ যদিও আফ্রিকার গাছ তবুও দক্ষিণ আমেরিকাতেই উহার উৎপাদন অধিক )। অত্যন্ত উষ্ণতা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এই গাছ হইতে কোকো উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আর্দ্র জলবায়ু এবং উর্বর জমি কোকো চাষের পক্ষে উপযুক্ত। প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ ও প্রবল বাতাস কোকো গাছের চারার পক্ষে ক্ষতিকর। কোকো চাষের জন্য অত্যন্ত গভীর ও উর্বর মাটির দরকার হয় বলিয়া ইহার চাষ সমতল ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ( কিন্তু চা এবং কফি গাছ পার্বত্য অঞ্চলেই ভাল জন্মে )। নিরক্ষীয় ( Equatorial ) জলবায়ু কোকো উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, ব্রেজিল, নাইজিরিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ত্রিনিদাদ, ঘানা রাজ্য এবং সিংহলে কোকো উৎপন্ন হয়। ভারতের মহীশূর রাজ্যেও সামান্য কোকো চাষ হয়। আফ্রিকার ঘানা কোকোর উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

কোকো সাধারণতঃ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চকোলেট প্রস্তুতের উপাদান হিসাবেও কোকোর যথেষ্ট চাহিদা আছে। ঔষধ হিসাবেও ইহার কিছু কিছু ব্যবহার দেখা যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড,

হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রধানতঃ কোকো আমদানি করিয়া থাকে। কোকো আমদানি ব্যাপারে আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইদানিং চকোলেটের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে বৎসরে মাথাপিছু প্রায় দুই সের কোকো খরচ হয়। এই সকল দেশ চকোলেট প্রভৃতি রপ্তানি করে।

**Q. 55. What are the climatic conditions that favour the growth of (a) Coffee and (b) Tobacco? Name the chief importers and exporters.**

**[ কি প্রকার জলবায়ু (ক) কফি এবং (খ) তামাক চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয়? প্রধান আমদানি ও রপ্তানিকারকদের নাম উল্লেখ কর। ]**

(a) **কফি ( Coffee )**—আফ্রিকার আবিসিনিয়া ( আরাবিকা কফি ) কঙ্গো (রোবাষ্টা) এবং লাইবেরিয়ায় এই গাছ প্রথম দেখা যায়। কফি সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে; উষ্ণ এবং আর্দ্র ( damp ) জলবায়ু এবং বাৎসরিক ১২৫ সেঃ মিটার-এর অধিক বৃষ্টিপাত কফি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সমুদ্র-সান্নিধ্য হেতু আরব দেশের ইয়েমেনে ইহা অপেক্ষা অল্প বৃষ্টিতেও উৎকৃষ্ট কফি জন্মে। কফির চারাগাছ যখন খুব ছোট থাকে তখন সূর্যকিরণ হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কলা প্রভৃতি দীর্ঘপত্রযুক্ত বৃক্ষাদি রোপণ করা হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে এবং উচ্চ জমিতে জন্মে। লাল মাটিতে কফিগাছ ভাল জন্মে। কফিগাছ বড় হইতে সাধারণতঃ তিন হইতে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। তারপর কম-বেশি ৩০ বৎসর কাল এই গাছে ফল ফলে। ফলের বীজ হইতেই কফি প্রস্তুত হয়। সুদক্ষ শ্রমিকগণ কফির বীচিগুলি রৌদ্রে ও ছায়ায় শুকাইয়া উহাকে অল্প আঁচে ভাজিয়া ( curing of coffee ) উৎকৃষ্ট কফি প্রস্তুত করে।

কফি উৎপাদনে, পৃথিবীর মধ্যে **ব্রেজিলের সাওপোলো** অঞ্চলই প্রথম স্থান অধিকার করে। এখানে প্রচুর বারিপাত হয় এবং প্রচুর দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। শ্রমিকরা পোর্তুগীজ, জাপানী প্রভৃতি নানা জাতীয়। এখানে ঘোর লাল রঙের অত্যন্ত উর্বর মাটি দেখা যায়। এই মাটি প্যারানা প্রদেশেও আছে। সেখানেও কফি চাষ হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ একমাত্র ব্রেজিলেই উৎপন্ন হয়। ব্রেজিলের পরে **কলম্বিয়ার** নাম উল্লেখযোগ্য। মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ কফি এখানে জন্মে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, মধ্যআমেরিকা, আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলা, কেনিয়া ও ট্যানজানিয়াতেও কফি জন্মে। এশিয়ার মধ্যে কফি উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়ার স্থান সর্বোচ্চ। লোহিত সাগরের নিকটবর্তী আরবের ইয়েমেন অঞ্চলে যে উৎকৃষ্ট কফি জন্মে তাহা প্রধানতঃ "মোচা" বন্দর হইতে রপ্তানি হয় বলিয়া 'মোচা কফি'

( Mocha Coffee ) নামে প্রসিদ্ধ। ভারতের মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চলে ভাল কফি জন্মে। ভারতের কফি উৎপাদন ও রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রেজিল, উগাণ্ডা, অ্যাঙ্গোলা, কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ হইতে কফি রপ্তানি হইয়া থাকে। কফির ব্যবহার বহুদিনের এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কফি হাউসও আছে বহুদিন হইতে। ইউরোপের মধ্যে হল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা কফিপ্রিয় দেশ। ইহার কারণ হল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিতে কফি হয় এবং ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিতে **চা** উৎপন্ন হয়। কফি আমদানিকারী দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, হল্যাণ্ড ( মাথা পিছু আমদানি ১২ সের ), বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

(b) **তামাক** ( Tobacco )—তামাক প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। আবার দক্ষিণ কানাডা এবং রাশিয়ার ন্যায় অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলেও তামাক জন্মে। উপযুক্ত পরিমাণে চুন ও পটাস জাতীয় সার মিশ্রিত **অত্যন্ত উর্বর পলিমাটিতে** এবং উষ্ণ অথচ আর্দ্র জলবায়ুতে তামাক গাছের চাষ ভাল হয়। তামাক গাছের প্রথম অবস্থায় তুষারপাত প্রভৃত ক্ষতি সাধন করে। বীজ বপন ও চারা হইতে আরম্ভ করিয়া তামাক তৈয়ারি পর্যন্ত প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া ইহার মূল্য অধিক।

তামাক উৎপাদনে **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান সর্বপ্রথম। **ভার্জিনিয়া** এবং ক্যারোলিনার তামাক খুব প্রসিদ্ধ। **চীন** ( দ্বিতীয় ) এবং **ভারতে** ( তৃতীয় ) প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। **কিউবাতে** যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহা গুণে ও গন্ধে উৎকৃষ্ট। এই তামাক হইতেই বিখ্যাত হাভানা-চুরুট প্রস্তুত হয়। **সুমাত্রা, জাভা** ও অন্যান্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও প্রচুর পরিমাণে তামাক জন্মে। ইহা ছাড়া জাপান, **তুরস্ক** এবং **ফিলিপাইন** দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত লুজনে প্রচুর তামাক জন্মে। ব্রেজিলেও অতি চমৎকার তামাক উৎপন্ন হইতেছে। গ্রীস, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীতে প্রচুর তামাক জন্মে। জার্মানীতে কিছু পরিমাণে তামাক জন্মে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জার্মানী প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তামাক বিদেশ হইতে আমদানি করে। ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে তামাক বিদেশে রপ্তানি হয়। এই তামাকের প্রধান ক্রেতা ব্রিটেন। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, কিউবা, সুমাত্রা, তুরস্ক, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ও গ্রীস প্রধানতঃ তামাক রপ্তানি করে এবং জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন ইত্যাদি দেশ প্রধানতঃ তামাক আমদানি করিয়া থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান বিভিন্ন প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ; যথা—জাভার তামাকে চুরুট মোড়ার কাজ ভাল হয়। রংপুর ও জলপাইগুড়ির তামাকে চুরুটের মশলা হয়। হাভানা, ম্যানিলা, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান চুরুট প্রস্তুতের কেন্দ্র।

আমেরিকার ভার্জিনিয়া তামাকে সিগারেট ভাল হয়। ভারতের কৃষ্ণা ও গোদাবরীর ব-দ্বীপে ইহার চাষ হয়।

**তন্তুজাতীয় ফসল ( Fibre Crops ) :**

**Q. 56. Select one of the important natural fibres from the point of view of volume of production. Discuss the geographical conditions necessary for its production and point out two important areas of its cultivation.**

( C. U. B. Com. Part I 1965 )

**[ উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে একটি প্রধান স্বাভাবিক তন্তু-জাতীয় ফসলের নাম উল্লেখ কর। উহার উৎপাদনের উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থার উল্লেখ কর। এবং উহার প্রধান দুটি উৎপাদন স্থানের বর্ণনা কর। ]**

[ প্রধান স্বাভাবিক তন্তুজাতীয় উদ্ভিদ ( natural fibres ) বলিলে কার্পাস তুলা ও পাট বুঝায়। ইহাদের যে কোন একটির বিষয় লিখতে হইবে—পরের প্রশ্নোত্তর তিনটি এই সম্পর্কে। Q. 57 বা 59 এর উত্তর লিখিলেই চলিবে। ]

**Q. 57. What conditions are required for the cultivation of cotton ? Name the principal varieties. Who are the chief growers, importers and exporters ?**

**[ তুলা চাষের জন্য কিরূপ অবস্থা প্রয়োজন ? প্রধান উৎপাদক, আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম দাও। ]**

**তুলা** গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, ২০° হইতে ৩০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং বৎসরে মোট ৬০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলে তুলা জন্মে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত তুলা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন এবং তাহার পরেই শুষ্ক আবহাওয়া এবং সূর্যালোকের প্রয়োজন। তুলার পাঁজ ( Boll ) ফাটিবার পর বৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। আবার এই সময় যদি অত্যধিক গরম পড়ে তবে সমস্ত পাঁজ গাছ হইতে ঝরিয়া যায়। তুলা চাষে শ্রমিকের প্রয়োজন খুব বেশি, কারণ তুলা তুলিতে সময় লাগে। সুতরাং শ্রমশক্তি সস্তা না হইলে তুলাচাষ সম্ভব নয়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে তুলার চাষে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। চুন মিশ্রিত উর্বর জমি তুলা চাষের পক্ষে খুবই সহায়ক। কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ; কারণ, উহাতে উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট থাকে এবং ইহার জলধারণ ক্ষমতা আছে। উর্বর দো-আঁশ পলিমাটিতেও তুলা ভাল জন্মে। আঁশের দৈর্ঘ্য এবং দৃঢ়তার উপরে তুলার উৎকর্ষতা নির্ভর করে। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলাগুলির আঁশ সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি ও অনেকটা রেশমের মত হয়। সাধারণতঃ চার প্রকার তুলা দেখা যায়—(১) সী-আইল্যাণ্ড তুলা

(২) আপল্যাণ্ড তুলা (৩) মিশরীয় তুলা ও (৪) ভারতীয় তুলা। ইহার মধ্যে সী-আইল্যাণ্ড তুলাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ আঁশবিশিষ্ট ও সর্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট। কেবলমাত্র পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এখন প্রচুর পরিমাণে সী-আইল্যাণ্ড তুলার চাষ হয়। মিশরীয় তুলা খুব সূক্ষ্ম, দীর্ঘ আঁশযুক্ত এবং ইহা সর্বাপেক্ষা শুষ্ক জলবায়ুতে উৎপন্ন করা যায়। এই তুলা মিশর, সুদান ও কালিফোর্ণিয়ায় উৎপন্ন হয়। পেরুভিয়ান তুলার আঁশ খুব মোটা ও পশমের মত। কিন্তু পেরুদেশে এখন দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলাই প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। ভারতীয় তুলার আঁশও ছোট। তবে ভারতে এখন বহুস্থানেই আমেরিকান আপল্যাণ্ড তুলা উৎপন্ন হইতেছে। এই তুলার আঁশ মধ্যম শ্রেণীর ( ১" )। আপল্যাণ্ড তুলার ব্যবহার খুব ব্যাপক কারণ উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই তুলা নানা রকমের হয়।

তুলা উৎপাদনে **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রথম আছে, তাহার পরে **চীন, রাশিয়া ও ভারত। পাকিস্তান, ব্রেজিল, মিশর, সুদান, উগাণ্ডা, আর্জেন্টিনা** প্রভৃতি দেশেও প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়।

**আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের** দক্ষিণ পূর্ব ভাগে তুলা বলয়ে টেক্সাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রধানতঃ তুলা জন্মে। কলোরাডো নদীর জলসেচের সাহায্যে দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ায় তুলা চাষ করা হয়। আমেরিকার তুলা খুব উৎকৃষ্ট। **মেক্সিকোতেও** প্রচুর তুলার চাষ হয়। **ভারতে** তুলা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের উর্বর কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে ও পাঞ্জাবে এবং **পাকিস্তানের** তুলা পাঞ্জাবের সিন্ধু উপত্যকায় উৎপন্ন হয়। **চীনের** তুলা প্রধানতঃ ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকায় ও উত্তর চীনের উর্বর সমভূমিতে জন্মে। মিশরের তুলা প্রধানতঃ নীল নদের উপত্যকায় জন্মে। সোভিয়েট রাশিয়ার কজাক, উজবেক, তুর্কোমান প্রভৃতি অঞ্চলে এবং ইউক্রেণে তুলার চাষ হয়।

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে তুলা **রপ্তানি** ব্যাপারে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নিউ-অর্লিয়েন্স ও গ্যালভেষ্টোন বন্দর মারফত ব্রিটেন, ভারত, ইটালি, জাপান প্রভৃতি দেশে তুলা রপ্তানি হয়। ইহার পরেই তুলা রপ্তানি-বাণিজ্যে, ব্রেজিল, মেক্সিকো, পাকিস্তান ও মিশরের স্থান। সুদান ও উগাণ্ডাও বর্তমানে তুলা রপ্তানিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি ও ভারত তুলা আমদানি ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, আরও অনেক দেশই অল্প-বিস্তর তুলা আমদানি করিয়া থাকে। ব্রিটেন সাধারণতঃ আমেরিকা ও আফ্রিকার তুলা, জাপান প্রধানতঃ আমেরিকা, পাকিস্তান ও ভারত হইতে তুলা আমদানি করে। ভারত প্রধানতঃ মিশর, আমেরিকা, উগাণ্ডা ও সুদান হইতে তুলা আমদানি করিয়া থাকে।

**রপ্তানি বন্দর—প্রধান প্রধান কার্পাস তুলা রপ্তানি বন্দরগুলির নাম :—**

(১) যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিয়েন্স ও গ্যালভেষ্টোন (২) মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া (৩) পাকিস্তানের করাচি (৪) ব্রেজিলের স্যানভেন্তর ও রায়ো ডি জেনিরো।

**Q. 58. Compare and contrast the soil and climatic conditions under which cotton is cultivated in the Mississipi and the Nile basin. ( C. U. B. Com. 1962 & B. Com. 1958 )**

**[ যে অবস্থার মধ্যে মিসিসিপি এবং নীল অববাহিকাতে তুলার চাষ হয় তাহার তুলনামূলক বর্ণনা দাও। ]**

**যুক্তরাষ্ট্রের** প্রধান কার্পাস উৎপাদন অঞ্চল বলিতে টেক্সাস, লুইসানিয়া, আলাবামা ও ক্যারোলিনা রাজ্যদ্বয় এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে বুঝায়। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া সুবিশাল মিসিসিপি এবং ইহার উপনদীগুলি প্রবাহিত। যুক্তরাষ্ট্রের এই তুলা বলয়ের জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র। এখানে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চলে ৫০ সেঃ মিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব অঞ্চলে ১১৫ সেঃ মিঃ মত বৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে শীতকাল খুব বেশি শীতল নহে। বৎসরে ১০০ দিনের বেশি এই অঞ্চল তুহিন মুক্ত থাকে। সুতরাং এখানকার জলবায়ু উষ্ণভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ গ্রীষ্মকালে এখানে প্রখর উত্তাপের মধ্যে শ্বেতকায় শ্রমিকগণ মাঠে কাজ করিতে পারেন না। এইজন্য এখানে অধিকাংশ কৃষিশ্রমিক নিগ্রোজাতীয়। কার্পাস বলয়ের মাটি বেশ উর্বর—বিশেষতঃ মিসিসিপি নদীর নিকটে পলিমাটি এবং পশ্চিমভাগের প্রায় কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা খুব উর্বর। ক্যারোলিনার মাটি তেমন উর্বর নহে বলিয়া অধিক সার প্রয়োগ করিতে হয়। মিশরে যেমন নীল নদীর বন্যার ফলে তুলা চাষের সুবিধা হয় যুক্তরাষ্ট্রে তেমন নহে। এখানে মিসিসিপি নদীর ভয়াবহ বন্যা খুবই ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় খামারে ব্যাপক প্রথায় নানাপ্রকার শ্রমনিবারক কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে তুলা চাষ করা হয়; কারণ এখানে শ্রমিক সংখ্যায় কম এবং তাহাদের মজুরী খুব বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন মোট কার্পাসের ( ৩০।৩২ লক্ষ টন ) কিছু অংশ নিউ অর্লিয়েন্স, গ্যালভেষ্টোন, হাউষ্টন, সাভানা প্রভৃতি বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি হয়।

**মিশরে** মরুভূমির পরিবেশে তুলা চাষ হয়। এখানকার তুলা চাষের রীতিপদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র। নীল নদের উপত্যকায় বৎসরে ১০-১৫ সেন্টিমিটার মাত্র বৃষ্টি হয়—দক্ষিণ ভাগে বৃষ্টি আরও কম। এখানকার তুলা চাষ সম্পূর্ণভাবে জলসেচের উপর নির্ভর করে। নীল নদের উপর কয়েকটি সেচ বাঁধ আছে; এগুলির সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে বারমাস সেচ দেওয়া হয়। মিশরের অধিকাংশ কৃষিজমি নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। নদীর খুব নিকটেই মাত্র চাষ হয়—কিছু দূরেই মালভূমি ও মরুভূমি।

মিশরে নীল নদের পলিমাটি খুব উর্বর এবং জমিতে প্রচুর সারও দেওয়া হয়।

তাই একর প্রতি তুলা উৎপাদন খুব বেশি। মিশরে প্রচুর সূর্যালোক সর্বদাই পাওয়া যায়; তাই তুলার পাঁজগুলি খুব সুন্দর হয়—আঁশও দীর্ঘ ও মসৃণ হয়। নীল নদের উপত্যকা অত্যন্ত ঘনবসতি অঞ্চল বলিয়া এখানে শ্রমিক খুব সুলভ। ক্ষেত্রের সমস্ত কাজ শ্রমিকরাই করে—কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। ক্ষেতগুলিও আকারে ছোট। মিশরে উৎপন্ন তুলার অধিকাংশ রপ্তানি হয়। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তুলা রপ্তানি হয়। এখানে অনেকগুলি কাপড়ের কলও আছে। মিশরের তুলা উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। আসুয়ান বাঁধ আরও বড করিয়া গাঁথা হইলে মিশরে নীল নদের সংকীর্ণ উর্বর উপত্যকায় আরও অধিক জমিতে তুলা চাষ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়।

**Q. 59 What type of climate and soil are required for the production of Jute? Why is it grown mainly in the Indo-Pakistan sub-continent? Also write a short note on Flax.**

**[ পাট চাষের জন্য কি ধরনের জলবায়ু এবং মাটি প্রয়োজন? ইহা কেন প্রধানতঃ ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে উৎপন্ন হয়? এই সংগে ফ্লাক্স সম্পর্কেও ক্ষুদ্র টীকা লিখ। ]**

পাট ( Jute )—ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্য। পাট গাছের কাণ্ড হইতে পাটতন্তু পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে bast fibre বলে। পাট চাষের পক্ষে নদীর ধারে সদ্য পতিত নরম ও উর্বর পলিমাটি, প্রচুর উত্তাপ এবং ১৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। পাট গাছ সাধারণতঃ ৬ হইতে ১২ মিটার পর্যন্ত উচ্চ হয়। ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্য; ইহার চাষ পাকিস্তান ও ভারতের নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলেই অধিক হয়। কারণ এই অঞ্চলের জলবায়ু, মাটি ও শ্রমিক পাট চাষের উপযুক্ত। পাটের উৎকর্ষ ও উৎপাদনের পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে চাষের জমি প্রস্তুত ও গাছ হইতে তন্তু নিষ্কাশন করিবার উপর নির্ভর করে। **পূর্ব-পাকিস্তান** পাট উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু বর্তমানে **ভারতেও** পাট উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে ( কোন কোন বৎসর পাকিস্তান অপেক্ষা বেশিও হয়)। পশ্চিমবংগ ও আসামেই অধিকাংশ পাট জন্মে। পূর্ণিয়া, বালেশ্বর এবং কটক জেলাতেও পাট জন্মে।

ভারত ও পাকিস্তান একত্রে পৃথিবীর বেশির ভাগ পাট উৎপন্ন করে। চীন ও থাইল্যাণ্ডে পাটের চাষ ইদানিং খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য উৎপাদক দেশের মধ্যে সিংহল, ফরমোজা এবং মালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রেজিলেও সামান্য পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। বর্তমানে অবশ্য পৃথিবীর সকল উষ্ণ দেশেই পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। রোজেল (rosella) তন্তু বাংলা দেশে ও বিহারে প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে।

রোজেল এবং অন্ত্রের প্রকৃত মেস্তা আঁশ হইতে পাটের পরিবর্ত দ্রব্য ( substitute ) উৎপাদনে ভারত সাফল্যলাভ করিয়াছে।

পাটের চাষের জন্য প্রয়োজন সস্তা এবং সুদক্ষ শ্রমিক। কোন কোন দেশের শ্রমিক এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পাট কাচাকে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় কাজ বলিয়া মনে করে। তাই পাট উৎপাদন ভারত ও পাকিস্তানেই অধিক হয়। সস্তায় এমন সুদক্ষ শ্রমিক কেবল এই দুই দেশেই পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ পাকিস্তান এবং রপ্তানি বন্দর চট্টগ্রাম ও চালনা। ভারত মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণ কাঁচা পাট রপ্তানি করে। প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড জার্মানী, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, ইটালি এবং আর্জেন্টিনা ভারতীয় ও পাকিস্তানী পাট বস্ত্র, থলি প্রভৃতি কিনিয়া থাকে।

চট বা হেসিয়ান, চটের থলি, মোটা কার্পেট এবং দড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাটের চাহিদা আছে। বর্তমানে পাট হইতে একপ্রকার রেশম, লিনোলিয়াম ( মেঝেতে পাতা হয় ) এবং ক্যানভাস প্রস্তুত হইতেছে। পাট শিল্পে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম। কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর দুই ধারেই প্রধানতঃ পাটকলগুলি কেন্দ্রীভূত।

**ফ্লাক্স** ( Flax )—ইহা তিসি জাতীয় গাছ হইতে উৎপন্ন ( bast fibre ) এক প্রকার সুন্দর ও মসৃণ তন্তু। এই তন্তুকে **লিনেন** বলা হয়। ভারতে তিসি জাতীয় গাছ যথেষ্ট জন্মে। কিন্তু কেবলমাত্র তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, তন্তুর উৎপাদন নগণ্য। কিন্তু যে সকল দেশের জলবায়ু শীতল ( যথা—রাশিয়ায় ) সেখানে তৈলবীজ উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হইলেও লিনেন তন্তু উৎপাদন খুব বেশি। রাশিয়া হইতে ফ্লাক্স ও লিনেন বস্ত্র রপ্তানি হয়। বেলজিয়াম, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ফ্লাক্স উৎপন্ন হয়। ইহার জন্য মধ্যম বারিপাত, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও হাল্কা মাটি প্রয়োজন। লিনেন বয়নের প্রধান কেন্দ্র উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলফাষ্ট শহর এবং রাশিয়ার মধ্যে মস্কো ও লেনিনগ্রাড শিল্পাঞ্চল। অন্যান্য কেন্দ্র বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে অবস্থিত।

**স্বাভাবিক রবার ( Natural rubber )**

**Q. 60. Describe the characteristics of tropical plantation farming with reference to rubber cultivation in South-East Asia.** ( B. Com. Part I 1965 )

**[ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার চাষের পরিপ্রেক্ষিতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাগিচা-চাষের বিষয় আলোচনা কর। ]**

উষ্ণ মণ্ডলের নানা স্থানে বাগিচা জাতীয় কৃষিকার্য গড়িয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ

স্বরূপ মালয়েশিয়ার রবার বাগিচা, কিউবার ইক্ষুক্ষেত্র, হাওয়াই দ্বীপে ইক্ষু ও আনারস চাষ, সিংহলে ও ভারতে চা বাগিচা, ব্রেজিলে কফি বাগিচার কথা উল্লেখ করা যায়।

এই বাগিচা শিল্পের (Plantation industry) বৈশিষ্টাগুলি হইল—(১) ব্যাপক আকারে চাষ করা, (২) স্থানীয় চাহিদার সংগে এই আবাদের সম্পর্ক খুব কম, (৩) প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা হয় এবং (৪) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে শ্রমিক এবং মূলধন আমদানি করা হয়। মালয়েশিয়ায় চীনা ও ভারতীয় শ্রমিক, হাওয়াই দ্বীপে চীনা ও জাপানী শ্রমিক, ব্রেজিলে নিগ্রো শ্রমিক, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়, চীনা ও নিগ্রো শ্রমিক নিয়োগের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

( উত্তরের শেষাংশের জন্য পরবর্তী 61 নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য )

**Q. 61. What geographical conditions are necessary for the production of natural rubber ? Name the principal producers and exporters of the world. What is synthetic rubber ?**

**[ রবার উৎপাদনের জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজন ? প্রধান প্রধান উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের নাম দাও। কৃত্রিম রবার কাহাকে বলে ? ]**

রবার ( Rubber )—বিষুবরেখাস্থিত আর্দ্র অঞ্চলের ইহা সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ফসল। এক সময় ছিল যখন শিল্প বা ব্যবসা-বাণিজ্যে রবারের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর শিল্প ও বাণিজ্যে ইহা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্বে রবারের প্রধান ব্যবহার ছিল পেন্সিলের দাগ তোলার জন্য ; তাই এখনও ইহার নাম "রবার" ( rubber )।

বিষুবরেখাস্থিত যে সকল অঞ্চলের বাৎসরিক গড় উত্তাপ প্রায় ৩০° সেঃ থাকে এবং বৎসরে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় সেই সমস্ত অঞ্চল রবার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবহাওয়া বেশিদিন শুষ্ক থাকিলে রবার চাষের প্রভূত ক্ষতি হয়। সারা বৎসরের মধ্যে কোন মাসে ৮ সেঃ মিঃ এর কম বৃষ্টি হইলে রবার উৎপাদন কমিয়া যায়। প্রচুর বারিপাত ও জলনিকাশের সুব্যবস্থাযুক্ত জমি থাকিলে সাধারণতঃ রবারের চাষ ভাল হয়। সমুদ্রের নৈকট্যও ইহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কঙ্গো নদীর ও আমাজন নদীর অববাহিকা ( ইহাদের উৎপাদন নগণ্য ) এবং দক্ষিণ পূঃ এশিয়া যথাক্রমে বন্য ও আবাদী রবার উৎপাদনের কেন্দ্র। বন্যাপ্লাবিত বা অতিবৃষ্টিযুক্ত স্থানে রবার গাছ জন্মিলেও উহার আঠা ( latex ) অত্যন্ত তরল হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ইহার চাষ ভাল হয়।

স্বাভাবিক রবার ( Natural Rubber )

বন্য ( wild rubber )
( ব্রেজিল মধ্য আফ্রিকা )

আবাদী ( plantation rubber )
( মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্যাম, সিংহল )

যে সমস্ত রবার গাছ সযত্নে রোপণ করিয়া কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে আঠা ( latex ) সংগ্রহ করা হয় তাহাকে আবাদী রবার বলে। যে রবার গাছ বনে জন্মে তাহাকে বন্য রবার বলে। আবাদী রবার অপেক্ষা বন্য রবার সংগ্রহ করা কঠিন ; কেন না বন্য রবার সাধারণতঃ দুর্গম অরণ্যে জন্মে ; সেইজন্য ইহা সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। তাহা ছাড়া একবার কোন রবার গাছ আবিষ্কৃত হইলে তাহা অধিক পরিমাণে কাটিয়া অধিক রস ( এই রসকে latex বলে ) বাহির করিয়া লওয়া হয় ; ফলে গাছটি মরিয়া যায়। তাই আজকাল আমাজন উপত্যকায় বন্য রবার গাছ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলের প্যারা রবার গাছই স্বাভাবিক রবারের প্রধান উৎস। প্যারা বা বেলেম বন্দর হইতে এই বন্য রবার রপ্তানি হয় বলিয়া ইহার এই নাম—ইহার প্রকৃত নাম হিবিয়া ( Hevea )। তাহা ছাড়া অন্যান্য বহু গাছ হইতেও (যথা—মধ্য-আমেরিকার পানামা, মধ্য-ব্রেজিলের সিয়েরা, রাশিয়ার কোক-শাঘিজ ও মেক্সিক্যান রবার গাছ ) অল্প রবার পাওয়া যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৃথিবীর ৮০ ভাগের বেশি স্বাভাবিক রবার উৎপন্ন হয়। মালয়েশিয়া রবার উৎপাদনে প্রথম। এই দেশে নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রভাবে বারোমাস প্রবল বারিপাত হয়। মালয় উপদ্বীপটি অনুচ্চ মালভূমি। উপকূলভাগের মাটি বেশ উর্বর। এখানে প্রচুর ব্রিটিশ মূলধন রবার শিল্পে নিয়োজিত রহিয়াছে। শ্রমিকরা অধিকাংশই ভারতীয় ও চীনা। ইন্দোনেশিয়া রবার উৎপাদনে দ্বিতীয়। যবদ্বীপ ও সুমাত্রার নিরক্ষীয় জলবায়ুতে রবার ভাল জন্মে। থাইল্যাণ্ডে প্রায় ২ লক্ষ টন, সিংহলে ১ লক্ষ টন এবং ভারত ও ভিয়েটনামে প্রায় ৭০ হাজার টন রবার উৎপন্ন হয়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ভারতের কেরল অঞ্চল ও ব্রহ্মদেশ এশিয়ার মধ্যে প্রধান রবার উৎপাদক স্থান। তাহা ছাড়া, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও আফ্রিকার লাইবেরিয়া, নাইজিরিয়া ও কঙ্গোনদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে রবার উৎপন্ন হয়। রবার উৎপাদনে থাইল্যাণ্ড তৃতীয় এবং সিংহল চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা, জাপান এবং রাশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রবার রপ্তানি হয়। আমেরিকাই পৃথিবীর সমগ্র রবার উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক এবং ব্রিটেন ও রাশিয়া প্রত্যেকে এক-দশমাংশ গ্রহণ

করে। বর্তমানে ব্রেজিলের ও মধ্য আমেরিকার আবাদী রবারের উপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের রবার আমদানির পরিমাণ সামান্য হ্রাস পাইয়াছে।

**কৃত্রিম রবার**—বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহাকে **কৃত্রিম রবার** ( synthetic rubber ) বলে। এই প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে সফল হইলে নীল চাষের মত রবার চাষও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হয় অ্যালকোহল, কয়লা ও খনিজ তৈলের উপজাত এক প্রকার আঠাল পদার্থ হইতে। উহা প্রস্তুত করার নানা উপায় আছে। এসিটোন, বেনজিন, সেলুলোজ স্পিরিট প্রভৃতি হইতে রবার প্রস্তুত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একা যত কৃত্রিম রবার উৎপন্ন করে তাহা বিশ্বের বৃক্ষজ রবার উৎপাদনের সমান। সকল উন্নত দেশ—ভারতসহ—ইহা প্রস্তুত করে। উহা প্রস্তুত করিতে পূর্বে খরচ অধিক পড়িত বলিয়া উহা সর্বগুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক রবারের সংগে প্রতিযোগিতায় পারিত না। কিন্তু যেভাবে কৃত্রিম রবারের প্রস্তুতব্যয় কমিতেছে এবং উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে স্বাভাবিক রবারের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ অনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তবে মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার বড় বড় রবার বাগানের মালিকগণও স্বাভাবিক রবারের একর প্রতি উৎপাদন খুব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মূল্যের দিক দিয়া স্বাভাবিক রবারের এখনও কিছু সুবিধা রহিয়াছে। কৃত্রিম রবার হইতে উৎকৃষ্ট টায়ার ও তৈলবাহী নল প্রস্তুত হয়। রবারের পরিবর্ত দ্রব্য ( substitutes ) হিসাবে কোন কোন দেশে বালাটা ও গাটাপার্চা নামক দুইটি নিরক্ষীয় উদ্ভিদের আঠাও ব্যবহার করা হয়।

**Q 62 Explain why rubber plantations have been developed mainly in South-Eastern Asia, though the equatorial type of climate needed for rubber production prevails in many other parts of the world. ( C. U. 1958 )**

[ পৃথিবীর নানাস্থানে বিষুবীয় জলবায়ু থাকা সত্ত্বেও কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই প্রধানতঃ রবার আবাদ গড়িয়া ওঠার কারণ কি ? ]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলিতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশকে বুঝায়। সিংহল এবং দক্ষিণ ভারতও এই অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বর্তমানে পৃথিবীর মোট স্বাভাবিক রবার উৎপাদনের বেশির ভাগই উৎপন্ন হয়। ভারত ব্যতীত এই অঞ্চলে আর সকল দেশই প্রায় সমস্ত কাঁচা রবার রপ্তানি করে। ভারত কিছু রবার আমদানি করে, কারণ ভারতের রবার শিল্প বেশ বড়। উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা এবং শ্রমিকের সরবরাহের দিক হইতে বিবেচনা করিলে

দেখা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রবার উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। এই কারণেই সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনিয়া "হিবিয়া" রবার গাছ এখানে চাষের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এই অঞ্চলে রবারের চাষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে :—(১) এখানকার জলবায়ু (নিরক্ষীয়) রবার চাষের পক্ষে আদর্শস্থানীয় অথচ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার মত এখানকার জলবায়ু খুব অস্বাস্থ্যকর নহে। (২) এখানে প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক পাওয়া যায়। যবদ্বীপের লোকসংখ্যা ৬ কোটি। মালয়েশিয়ায় অধিকাংশ শ্রমিক চীনা ও ভারতীয়। (৩) এই অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত। সিঙ্গাপুর রবার বাণিজ্যের কেন্দ্র। (৪) এখানে ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজ মূলধন প্রচুর পাওয়া যায় এবং (৫) ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে নিজেরাই সস্তা রবার উৎপন্ন করে। (ইহার সহিত 60 নঃ প্রশ্নোত্তর হইতে রবার চাষের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লইতে হইবে)।

## তৈলবীজ

**Q. 63. Describe the uses of different kinds of oilseeds. Name the countries producing oilseeds and give an account of the nature of trade in them.**

[বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের বর্ণনা দাও। তৈলবীজ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম এবং তৈলবীজ বাণিজ্যের বিষয় লিখ।]

তৈল সাধারণতঃ দুইপ্রকার হয়, যথা—খনিজ তৈল ও ভেষজ তৈল। ভেষজ তৈল আবার বৃক্ষের ছাল, কাণ্ড, ফল ও বীজ হইতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

বিভিন্ন জাতের গাছের বীজ হইতে ভেষজ তৈল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে চীনাবাদাম (groundnut) মাটির নিম্নে হয়। ইহা ছাড়া, সরিষা (mustard-seed), তিসি (linseed), রেড়ী (castor seed), তিল (sesame seed) ও কার্পাসবীজ (cotton seed) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টুং, জলপাই, নারিকেল, অয়েলপাম প্রভৃতি গাছের ফল ও বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। চীনদেশে ও যুক্তরাষ্ট্রে সয়াবীনের তৈল উৎপন্ন হয়।

**চীনাবাদাম** তৈল খাদ্য হিসাবে, "বনস্পতি" প্রস্তুতের জন্য ও সাবান প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয়। ভারতে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক জন্মে। মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও উত্তর প্রদেশে প্রধানতঃ ইহার চাষ হয়। দক্ষিণ চীন, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রেও ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। ভারত, চীন ও আফ্রিকার দেশগুলি এই তৈল ও বীজ এবং খইল রপ্তানি করে এবং ইউরোপের দেশগুলি ইহা প্রধানতঃ

আমদানি করে। সরিষা ও রাই ( Mustard & rapeseed ) ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকায় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খইল গরুর খাদ্য ও জমির সার। ভারত, পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খুব কম। তিসি বা মসিনার তৈল ফ্লাক্স ( flax ) গাছের বীজ হইতে পাওয়া যায়। ইহা রং প্রস্তুতের জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইহার খইল জমির ভাল সার। রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন ও আর্জেন্টিনায় এই তৈলবীজ প্রচুর জন্মে। শেষোক্ত তিনটি দেশ এই তৈল রপ্তানি করে এবং জাপান এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলি, এমন কি যুক্তরাষ্ট্রও ইহা আমদানি করে। রেড়ির তৈল প্রধানতঃ দীপ জ্বালাইতে, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করিতে এবং ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং ভারত হইতে ইহা নানা দেশে রপ্তান করা হয়। বিমানপোতের যন্ত্রাদি পরিষ্কার করার জন্য ইহা প্রায় সকল উন্নত দেশেই প্রয়োজন হয়। ইহা ভিন্ন জলপাই, নারিকেল, সয়াবীন ও পাম তৈল উল্লেখযোগ্য।

# প্রাণিজ সম্পদ

## ANIMAL RESOURCES

### প্রাণিজ তন্তু ( Animal Fibre )

**Q. 64. What do you know of sericulture ? Name the silk producing and exporting countries of the world. What is rayon ?**

[ রেশমপলুচাষ সম্পর্কে কি জান ? পৃথিবীর রেশম উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম কর। রেয়ন কি ? ]

**রেশম ( Silk )**—রেশম যদিও গুটিপোকা হইতে পাওয়া যায়, তবু কতকগুলি গাছের চাষের উপরেই ইহার উৎপাদন নির্ভর করে। এই গাছগুলির ভিতর তুঁত গাছ (mulbery) প্রধান। এই সকল গাছের পাতায় রেশম কীট ডিম পাড়ে। এই গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশম পোকাগুলিকে পালন করিয়া গুটি উৎপন্ন করা হয়। ভারতে অনেক প্রকার বন্য রেশমও পাওয়া যায়। প্রধানতঃ আসাম ও কাশ্মীর হইতে উহা সংগ্রহ করা হয়। এণ্ডি, মুগা, তসর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উহারা পরিচিত। এই রেশম বিভিন্ন প্রকারের। মোটামুটিভাবে ইহারা আসল রেশম হইতে নিকৃষ্ট জাতীয়। তুঁতগাছ প্রধানতঃ গরম দেশের গাছ। ৩৭° উত্তর দ্রাঘিমার উত্তরে ইহা কমই জন্মে। জাপানে ইহা পাহাড়ের উপর চাষ করা হয়। ইহার পাতায় পালিত কীট হইতে রেশম উৎপন্ন হয়। ডিম হইতে বাহির হইবার পর রেশম কীটগুলি খুব বেশি পরিমাণে কচি পাতা খায় এবং রেশমের গুটি ( cocoon ) প্রস্তুত করে। শরৎকালে ও বসন্তকালে ঐ cocoon উৎপন্ন হয়। গুটি হইতে আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে সূতা প্রস্তুত করা হয়। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে প্রধানতঃ রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১। চীন—ইয়াংসি উপত্যকা এবং ক্যান্টন নগরের চতুর্দিকস্থ অঞ্চল, লোহিত পর্যন্ত ও শানটুং উপদ্বীপ।

২। জাপান—নাগোয়া, বিওয়া হ্রদ অঞ্চল, সিওয়া নদীর মোহনা, কোয়ানটো সমভূমি ও কানাজাওয়া সমুদ্রতট অঞ্চল। রেশম উৎপাদন ও রপ্তানিতে জাপানের স্থান সর্বোচ্চ।

৩। ভারত—ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ, বাঁকুড়া, মহীশূর, বিহারের ভাগলপুর, উড়িষ্যার বহরমপুর, কাশ্মীর ও আসামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারাণসী রেশমশিল্পের অপর একটি কেন্দ্র।

৪। ইটালি—পো-উপত্যকা ( Po Valley )। এইখানে সমগ্র ইউরোপের উৎপন্ন রেশমের অধিকাংশ জন্মে। বলোনা ( Bolona ) ও লাক ইহার কেন্দ্র।

৫। ফ্রান্স—রোঁন নদীর উপত্যকায় ( Rhone Valley ) লিঁয় ( Lyons ) রেশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

৬। ইহা ছাড়া সোভিয়েট এশিয়া, সিরিয়া, স্পেন এবং তুরস্কে সামান্য পরিমাণ রেশম উৎপন্ন হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ রেশম চীন ও জাপানেই উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ ঐ দুই দেশের জলবায়ু তুঁতগাছ উৎপাদন ও রেশম-চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। চীনের শানটুং অঞ্চলে ওক গাছের পাতা খাওয়াইয়া গুটিপোকাগুলিকে পালন করা হয়। রেশম চাষের জন্য প্রায় ২০° সেঃ গ্রেঃ উত্তাপ দরকার হয়। গুটি ( cocoon ) হইতে রেশমের ৩ হইতে ১০টি সূতা একত্র করিয়া পাকাইয়া ( reeling ) রেশম সূতা প্রস্তুত করার জন্য দক্ষতার ও সস্তা শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এইরূপ শ্রমিক চীন ও জাপানেই বেশি পাওয়া যায়। জাপানে উৎপন্ন 'পাকান সিল্কের লাছি'র ( reeled silk ) অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। রেশম মূল্যবান তন্তু, সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রেই ইহার বাজার সর্বাপেক্ষা বড়। সস্তা শ্রমিকের অভাবে যুক্তরাষ্ট্র রেশম উৎপন্ন করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র জাপান হইতে কাঁচা রেশম সূতা আমদানি করিয়া নিজ প্রয়োজন ও রুচিমত রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করে। অপরপক্ষে, জাপান রেশমের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাঁচা তুলা আমদানি করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার বাজারে রপ্তানিযোগ্য বস্ত্র উৎপন্ন করে। ভারত রেশমবস্ত্র রপ্তানি করে। চীনও কাঁচা রেশম ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি করে।

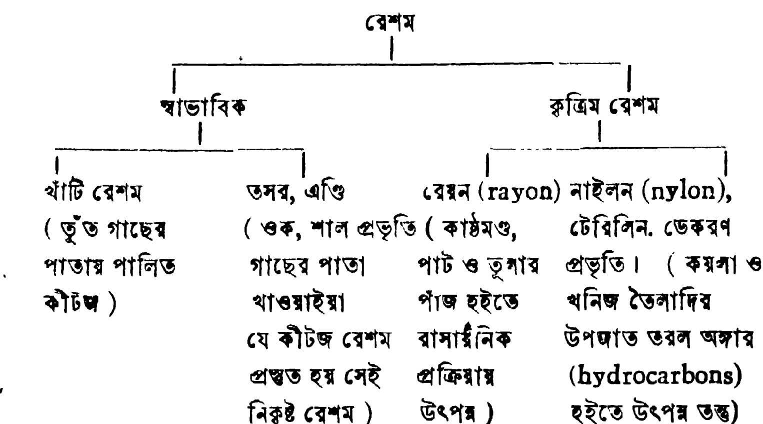
**Q. 65. Name the countries of the world that have advanced in the development of rayon industry. Explain why such a development has been possible.**

**[ যে সমস্ত দেশে কৃত্রিম রেশম শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম লিখ। সেই সব দেশে কেন উহা সম্ভব হইল ব্যাখ্যা কর। ]**

**কৃত্রিম রেশম**—বর্তমানে কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন ( artificial silk or rayon ) উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেয়ন এবং নাইলন জাতীয় কৃত্রিম তন্তুর ( synthetic fibre ) একত্রিত উৎপাদন বর্তমানে স্বাভাবিক রেশম উৎপাদন অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। জাপান, ইটালি, জার্মানী, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রেয়ন উৎপন্ন হইতেছে। ভারতের বোম্বাই বাংলা ও কেরলে ইহা উৎপন্ন হয়। বাঁশ অথবা কাঠের ভিতরের সেলুলা ( Cellulase ) হইতে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারি হয়। কৃত্রিম রেশম প্রধানতঃ নরম কাঠ ( soft wood ) হইতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং যে সমস্ত দেশে নরম কাঠের সরবরাহ অধিক সেই সমস্ত দেশ কৃত্রিম রেশমশিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে। অবশ্য এই শিল্পের জন্য প্রচুর রাসায়নিক পদার্থও প্রয়োজন হয়। জাপান ও ইটালীতে নরম কাঠ হইতে জলবিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করা হয়। বস্তুতঃ যে সকল দেশে সরল বর্গীয় অরণ্য

আছে এবং প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই সকল দেশেই রেয়ন শিল্প গঠিত হইয়াছে।

যদিও কৃত্রিম রেশম আসল কীটজ রেশমের মত কোমল, মসৃণ, সূক্ষ্ম ও চিক্কণ নহে তবুও সুলভতার জন্য কৃত্রিম রেশমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃত্রিম রেশমের মূল্য আসল রেশমের চেয়ে অনেক কম এবং ইহা সহজপ্রাপ্য। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভারতে প্রস্তুত সাড়ি, চাদর, টাই প্রভৃতির বিরাট বাজার আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান এবং সম্ভবতঃ চীনের রেশম উৎপাদনও পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়াছে। ভবিষ্যতে রেঁয়ন শিল্পের ব্যাপক উন্নতিতে কীটজ রেশমশিল্প একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।




**কৃত্রিম তন্তু** ( Synthetic Fibres )—এই তন্তুগুলি সেলুলোজ বা তন্তু জাতীয় নহে। এগুলি নানা প্রকার জলীয় অঙ্গার ( hydrocarbons ) হইতে প্রস্তুত করা হয়। প্রধানতঃ কয়লা ও পেট্রোলের উপজাত একপ্রকার আঠাল পদার্থ হইতে এই কৃত্রিম তন্তুগুলি প্রস্তুত করা হয়। এগুলি কতকটা প্লাষ্টিকের সমগোত্রীয় বলা চলে। নাইলন এবং টেরিলিন নামক অতিসুন্দর মসৃণ রেশমের মত তন্তু এইভাবে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার কৃত্রিম তন্তু বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি খুব উন্নত দেশগুলিতে প্রস্তুত করা হয়। এই তন্তুগুলির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল কারণ ঐগুলি খুব সুন্দর ও হাল্কা এবং জল এবং শীত নিরোধক। এই সমস্ত তন্তুর ব্যবহার সকল দেশেই—এমন কি ভারতেও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে।

মৎস্য শিকার এবং গোচারণ

বিভিন্ন দেশের মৎস্য উৎপাদন

বিভিন্ন দেশের গরুর সংখ্যা

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র

প্রধান

অপ্রধান

মগ্ন চড়া

গোপালন

আইসল্যাণ্ড

ডগারব্যাঙ্ক

গ্র্যাণ্ডব্যাঙ্ক

P DAS

## মৎস্যশিকার ( Fishing ) ও মৎস্যের চাষ ( Pisciculture )

**Q. 66. Why is most of the fishing activity of the world concentrated mainly in the temperate seas ? What geographical factors are favourable for sea-fishing ?**

**[ পৃথিবীর অধিকাংশ মাছ ধরা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ কি ? সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থা অনুকূল ? ]**

মাছ মানুষের অন্যতম সুখাদ্য। ইহা প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের সংস্থান। মৎস্য দুই প্রকার—(১) স্বাদুজলের এবং (২) লবণাক্ত সাগর জলের মৎস্য। নদী, হ্রদ বা পুষ্করিণীতে যে সমস্ত মৎস্যের চাষ হয় তাহা সাধারণতঃ স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া থাকে। সুতরাং এই জাতীয় মৎস্য বিদেশে কমই রপ্তানি হয়। সমুদ্রের মৎস্য অবশ্য স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়াও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়।

মৎস্য শিল্প প্রধানতঃ **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের** সামুদ্রিক অঞ্চলের অগভীর জলেই সীমাবদ্ধ। সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ :—(১) অগভীর জলে মৎস্যের ডিম্ব প্রসব এবং খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা থাকে। (২) সমুদ্রতীরের নিকটস্থ অগভীর জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মে এবং তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকীটও ( প্ল্যাঙ্কটন ) জন্মে। এই সমস্ত উদ্ভিদ ও জলকীট খাইয়া মৎস্যসমূহ জীবনধারণ করে। নদীর স্রোতে যে সমস্ত আবর্জনা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রতীরে সঞ্চিত হয় তাহাও মৎস্যের প্রিয় খাদ্য। এইজন্য সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী **অগভীর জলে বেশি মাছ পাওয়া যায়।** বিভিন্ন মহাদেশের নিকটস্থ মহীসোপানগুলিতে ( continental shelf ) মাছধরা একটি প্রধান শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। (৩) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই বিশেষ করিয়া অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া অধিক। প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে বহু চড়া দেখা যায়, ঐগুলি হিমশৈল দ্বারা বাহিত কাদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট **গ্রাণ্ডব্যাঙ্ক ও জর্জেস ব্যাঙ্ক** বৃহৎ মৎস্য ব্যবসার কেন্দ্র। (৪) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে মৎস্য সহজে পচিয়া যায় না এবং স্বাভাবিক বরফও পাওয়া যায়। সমুদ্রে মাছ ধরিবার পক্ষে ইহা একটি বড় সুবিধা। (৫) এই অঞ্চলে নৌ-নির্মাণের কাঠ পাওয়া যায় এবং ভগ্ন তটরেখা থাকায় বহু ক্ষুদ্র বন্দরও রহিয়াছে। অধিবাসীরা নৌ-দক্ষ এবং কর্মঠ হওয়ায় মৎস্যশিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই অঞ্চলের জেলেরা "ট্রলার" প্রভৃতি যন্ত্রসজ্জিত মোটরবোটে করিয়া সমুদ্রে মাছ ধরে।

**Q. 67. Locate the fishing grounds of the World and give their characteristics. Explain why commercial fishing is undeveloped in tropical waters.** ( B. Com. Part I, 1964 )

[ পৃথিবীর মৎস্যশিকার কেন্দ্রগুলি দেখাও এবং উহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ ধরা এত কম কেন ? ]

সাগরের সর্বত্রই মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু অগভীর সমুদ্রেই মাছ বেশি পাওয়া যায়। কারণ ঐ স্থানগুলিতে মাছের ডিম পাড়ার সুবিধা হয় এবং মাছের খাদ্য প্ল্যাঙ্কটনও পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে মৎস্য শিকারের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্র আছে ; যথা—(ক) উত্তর পশ্চিম ইউরোপের তীরবর্তী আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ে হইতে স্পেন পর্যন্ত অঞ্চলসমূহ, (খ) উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরস্থিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া ও নিউইংল্যাণ্ড (গ) জাপান ও চীন সাগর তীরবর্তী স্থানসমূহ ও কিউরাইল অঞ্চল (ঘ) আলাস্কা ও কানাডার প্রশান্ত মহাসাগর তট (ঙ) পেরু দেশের উপকূল।

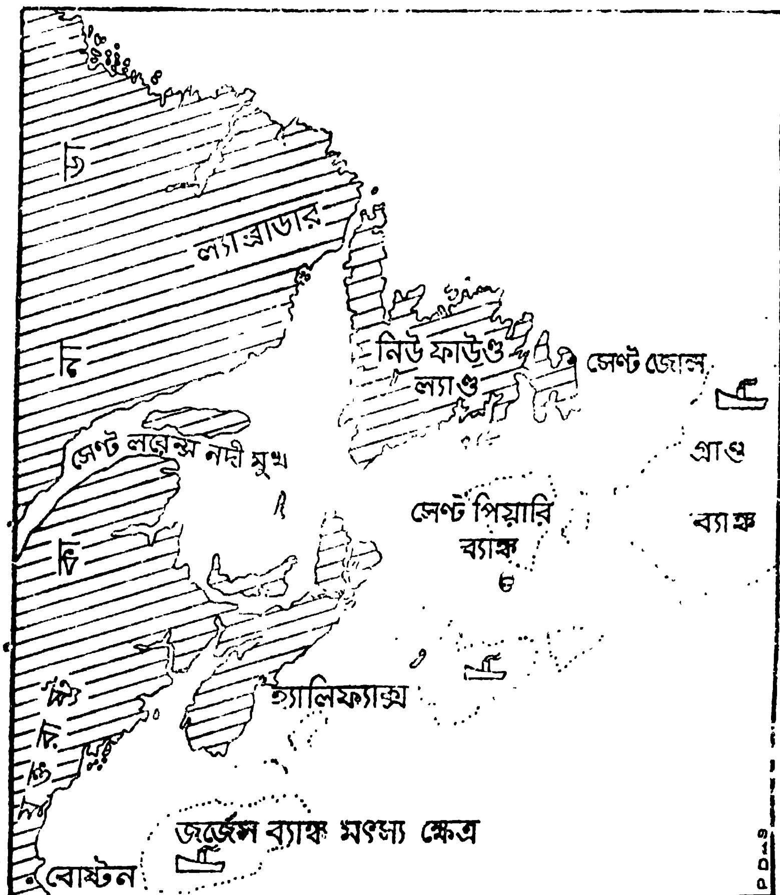
পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্যকেন্দ্রগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ঐগুলি সাধারণতঃ সমুদ্রতীর হইতে কয়েকশত মাইলের মধ্যে অগভীর জলে অবস্থিত এবং প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিতেই সীমাবদ্ধ। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেও অবশ্য প্রচুর মৎস্য জন্মে, তবে জলবায়ুর প্রভাবে উহা দ্রুত পচনশীল হয় বলিয়া ব্যবসা প্রচেষ্টা হিসাবে মাছধরা উষ্ণমণ্ডলে তেমন সাফল্যলাভ করে নাই।

(ক) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের তটভাগ,** বিশেষতঃ উত্তর সাগর মৎস্য শিকারের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইউরোপের নদীগুলি হইতে আবর্জনা আসিয়া উত্তর সাগরে সঞ্চিত হয়। ইহা মৎস্যের প্রধান খাদ্য। ইহা ছাড়া উত্তর সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল অগভীর থাকায় ( ডগার্স ব্যাঙ্ক ) মৎস্য ব্যবসার সুবিধা হইয়াছে। ব্রিটেনের লক্ষ লক্ষ লোক উত্তর সাগরের মৎস্য ব্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। গ্রামবসী, এবারডিন, হাল, ইয়ারমাউথ প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান মাছ ধরার বন্দর। ইহাদের সবগুলিই ব্রিটেনের পূর্বতটে অবস্থিত। নরওয়ের বার্গেন বিখ্যাত মৎস্য শিকারকেন্দ্র। উত্তর সাগরের মৎস্য সম্পদ ক্রমশঃ কমিয়া আসার ফলে বর্তমানে আইসল্যাণ্ড দ্বীপের তটভাগ বৃহৎ মৎস্য শিকার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে মাথাপিছু সর্বাধিক মাছ ধরে। ইহাই তাহাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়।

(খ) মৎস্য শিকারের জন্য **আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরস্থিত উত্তর আমেরিকা** অঞ্চলের নোভাস্কোশিয়া, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত স্থানগুলির তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ও সেণ্ট লরেন্স নদীর মোহানায় জল অগভীর। সেণ্টলরেন্স নদীর প্রশস্ত মোহানা এবং উষ্ণ নর্থ আটলান্টিক ড্রিফ্‌ট্ ও শীতল লাব্রাডার স্রোতের মিলন স্থানের সন্নিহিত গ্রাণ্ডব্যাঙ্ক, জর্জেস

ব্যাঙ্ক ও ল্যাব্রাডার তট কড, হেরিং প্রভৃতি মৎস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে ঝিনুক, কাঁকড়া ও চিংড়ি প্রচুর ধরা হয়।

(গ) জাপান ও চীনের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ পৃথিবীর মধ্যে মৎস্য শিকারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রে উৎপন্ন




উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মৎস্য ক্ষেত্র।

মৎস্যের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। জাপানের জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মৎস্য-ব্যবসায়কে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২৫।৩০ লক্ষ হইবে। চীনের সামুদ্রিক মৎস্য

উৎপাদনও খুব বেশি। ভগ্ন তটরেখা চীনের মৎস্য-ব্যবসার পক্ষে খুব সুবিধাজনক। ভ্লাডিভস্টক অঞ্চলে ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে সোভিয়েট মাছধরা জাহাজের সংখ্যা খুব বেশি। কড, সার্ডিন, ম্যাকিরেল, স্যামন প্রভৃতি মৎস্য, কাঁকড়া ও ঝিনুক এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

(ঘ) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী উত্তর আমেরিকার আলাস্কা উপসাগর হইতে ক্যালিফোর্ণিয়া উপকূল ব্যাপিয়া একটি সুদীর্ঘ মৎস্য ব্যবসায়কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্যামন, কড, হেরিং, হ্যালিবাট প্রভৃতি মৎস্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বিদেশে রপ্তানি হয়। কলম্বিয়ার ভগ্ন তটভাগের খাঁড়িগুলি স্যামন মাছের জন্য বিখ্যাত।

(ঙ) পেরু এখন পৃথিবীর প্রধানতম মৎস্য উৎপাদক দেশ। একরকম ছোট মাছ—এ্যানকোভ—পেরুর তীরে প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল স্রোতের মধ্য হইতে ধরা হয়। বৎসরে ৭০।৭৫ লক্ষ টন মাছ ধরা হয় এবং মৎস্যজ সার রপ্তানি করা হয়।

গ্রীনল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং রাশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শীল ও তিমি পাওয়া যায়। ইহা মেরু অঞ্চলের একটি বিশেষ ধরণের ব্যবসা। জাপানীরা কুমেরু মহাসাগরে তিমি শিকার করে। সমুদ্র হইতে মুক্তা ধারণকারী ঝিনুক সংগ্রহ করাও একটি বড় ব্যবসা। পারস্য উপসাগর ও ভারতের দক্ষিণে মান্নার উপসাগর এজন্য বিখ্যাত।

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের তটভাগেও মৎস্যক্ষেত্র আছে। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পেরুর পরেই জাপান। তাহার পরে চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের স্থান।

উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে মাছ ধরার নানা অসুবিধা। অনেক মাছ সুখাদ্য নয়, কিছু বিষাক্ত। ঝড়ের ভয়ও বেশি। উষ্ণ জলবায়ুতে মাছ সহজে পচিয়া যায়। সমুদ্রে শীতল স্রোত খুব কম, নাই বলিলেই চলে। তাই মাছধরা গরম দেশের সাগরে তত বেশি নয়। গরম দেশগুলিতে মূলধনের অভাবই সবচেয়ে বড় বাধা। প্রচুর মূলধন নিয়োগের ফলে সম্প্রতি অনেক গরম দেশে প্রচুর সামুদ্রিক মৎস্য উৎপন্ন হইতেছে। ভারতের কেরল ও মহারাষ্ট্রের তটভাগের সমুদ্র হইতে প্রচুর সার্ডিন, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ বিদেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে। উষ্ণমণ্ডলে সামুদ্রিক মাছধরা ব্যবসার সাফল্যের জন্য দ্রুতগামী মাছধরা জাহাজ, জাহাজে হিমকক্ষ, উপকূলে কোল্ডস্টোরেজ এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ী, ট্রাক প্রভৃতি।

মৎস্যের চালানি ব্যবসা আজকাল বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। নরওয়ের বার্গেন, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার, প্রিন্স্রুপার্ট ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেণ্টজোন্সই এই ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। মাছ বায়ুশূন্য পাত্রে বোঝাই করিয়া বিভিন্ন দেশে পাঠান হয়। প্রধানতঃ "ক্যান্ড স্যামন", শুকান কড মাছ এবং কড ও হাঙ্গর প্রভৃতির তৈলই বিশিষ্ট বাণিজ্যদ্রব্য।

**সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন সম্পর্কে সতর্কতা**—সুপ্রাচীন কাল হইতে মানুষ সামুদ্রিক মৎস্য শিকার করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে সামুদ্রিক মৎস্যের উৎপাদন প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেখা গিয়াছে, যে কোন এক মগ্ন চড়া (fishing bank) অঞ্চলে অত্যধিক মৎস্য-শিকার দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে ঐ অঞ্চলে মৎস্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে এবং দ্রুতগামী জাহাজ ও নাইলনের জাল ব্যবহার করিয়া বহু আয়াসে মাছ ধরিতে হয়। এই কারণে শংকিত হইয়া জাপান, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন রাশিয়া ও কানাডা সামুদ্রিক মৎস্যের জীবন ও বিচরণক্ষেত্র সম্পর্কে বহু গবেষণা করিয়াছে। ঐ সকল জাতি সামুদ্রিক মাছ ধরার স্থান কাল সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে যাহাতে সমুদ্রে মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত না হয়। তাহা ছাড়া, ঐ সকল দেশের ভগ্ন তটভাগের খাঁড়িগুলিতে ও উপকূলের মৎস্য ক্ষেত্রগুলিতে ডিম ও পোনা ছাড়িয়া রীতিমত মৎস্য চাষ করা হয়। কিন্তু সতর্কতা সত্ত্বেও এখনই কয়েকপ্রকার সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ কোন কোন অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে মানুষ যথেষ্ট সতর্ক হইবার পূর্বেই হয়ত অনেক সুখাদ্য সামুদ্রিক মৎস্য ক্রমশঃ বিরল হইবে এই আশংকাও কোন কোন মৎস্যবিজ্ঞানী পোষণ করেন।

সমুদ্র হইতে ঝিনুক, মুক্তা, স্পঞ্জ এবং শাক-সব্জী ( sea weed ) পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুসান্নিধ্যে অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগরে তিমি শিকার খুব লাভজনক ব্যবসা।

## পশুপালন ( Animal Husbandry )

**Q. 68. Describe the Geographical conditions determining the world distribution of beef-cattle and dairy-cattle. Why has not cattle-rearing-developed as an organised industry in India? ( B. Com. 1952 )**

**[ মাংস এবং দুধের জন্য যে গোপালন করা হয় তাহাদের জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থা দরকার ? ভারতে গোপালন সংগঠিত শিল্পরূপে গড়িয়া না উঠার কারণ কি ? ]**

গো-দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য হইতে মানুষ তাহার জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ লাভ করে। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের গো-মাংস একটি প্রধান খাদ্য। সুতরাং, পৃথিবীর প্রায় সকল অংশের অধিবাসীরাই গো-চারণ ও গো-পালনকে অন্যতম প্রধান কার্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

পৃথিবীতে প্রায় সকল দেশেই গো-পালন করা হয়। তবে কতকগুলি স্থানের ভৌগোলিক অবস্থা গো-পালনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হওয়ায় ঐ সকল স্থানেই অধিক

গো-মহিষাদি দেখা যায়। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, সাধারণতঃ মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানেই গো-পালন অধিক প্রচলিত। নিরক্ষীয় অতিবৃষ্টিপাতযুক্ত অরণ্যভূমিতে সেৎসি (tse-tse) মাছির উপদ্রবে গো-পালন প্রায় অসম্ভব। আবার মরুপ্রায় অঞ্চলেও খুব কম গরু দেখা যায়, কারণ গরুর জন্য প্রচুর পানীয় জল দরকার। তাহা ছাড়া গো-চারণের পক্ষে লম্বা ঘাসই ভাল।

যে সকল দেশে প্রধানতঃ গো মাংসের জন্য গোচারণ করা হয় তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনা ও উরুগোয়ের স্থান উল্লেখযোগ্য। এই দুই দেশ হইতে ইউরোপের বাজারে প্রচুর পরিমাণে জমানো মাংস রপ্তানি হয়। এ বিষয়ে যুক্ত-রাষ্ট্রের ভুট্টা বলয়ও খুব উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়া বর্তমানে মাংস চালানি ব্যবসায় প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। মাংসের জন্য যে সকল গো-জাতীয় প্রাণী পালন করা হয় সেগুলি দুগ্ধবতী গাভী হইতে স্বতন্ত্রজাতীয়। দীর্ঘকাল যাবৎ বিশিষ্ট উপায়ে প্রজনন ও বিশিষ্ট প্রকার খাদ্য ব্যবহারের ফলেই এই স্বতন্ত্র শ্রেণীর গো-জাতীয় প্রাণী উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল প্রাণীর প্রধান খাদ্য নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির পুষ্টিকর ঘাস। পরে উহাদের মোটা করার জন্য ভুট্টা, ওট এবং খইলও খাওয়ানো হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও উরুগোয়ের ভুট্টা বলয়েই এই শ্রেণীর গো-পালন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মাংস হইতে ১০ লক্ষ ক্যালোরি খাদ্য উৎপন্ন করিবার জন্য প্রায় ৩০ বিঘা চারণ ভূমির প্রয়োজন। সুতরাং দক্ষিণ গোলার্ধের বসতিবিরল বিস্তৃত তৃণভূমি অঞ্চলেই মাংসের জন্য গো-চারণ শিল্পের প্রসার দেখা যায়।

পশ্চিম ইউরোপ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল, চীন প্রভৃতি ঘনবসতি অঞ্চলে চারণভূমি কম এবং টাটকা দুধের চাহিদা বেশি। সুতরাং ঐ অঞ্চলে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা খুব বেশি। পৃথিবীতে মোট ৭২ কোটির বেশি গরুর মধ্যে ভারত পশ্চিম ইউরোপ ও চীনেই প্রায় ৪০ কোটি (ভারতে ১৭ কোটি ও চীনে ৬ কোটি) গরু দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডেও দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা কম নয়। মাখন রপ্তানিতে নিউজিল্যাণ্ড পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। গুঁড়া দুধ ও জমাট দুধ প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা রপ্তানি করে। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যাণ্ডও নানাপ্রকার দুগ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানি করে।

ভারত গো সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে চাষের বলদ, গাড়ীটানার বলদ, এবং সেচের জল তোলার বলদই অধিক। দুগ্ধবতী গাভীগুলির অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট ( বৎসরে গড়ে এক একটি ৩১/২ সের দুধ দেয় সেই তুলনায় নিউজিল্যাণ্ডের এক একটি গরু প্রায় ২৮ সের দুধ দেয় )। কেবলমাত্র পাঞ্জাবের হরিয়ানা জাতীয় গরু এবং গুজরাট ও মহীশূরের কয়েকপ্রকার গরুই ভাল জাতের। এ দেশের গরুর দুধ কম হওয়ার কারণ চারণভূমির এবং গো-খাদ্য ফসল চাষের উপযুক্ত

জমির অভাব, প্রজননক্ষম উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাব এবং ব্যাধির প্রকোপ। অথচ গো-দুগ্ধ ভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দুগ্ধবতী গাভী পালন করা এখনও ভারতে তেমন প্রচলিত হয় নাই। কেবলমাত্র গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে ও কলিকাতার নিকট হরিণঘাটায় এবং বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে সরকার নিয়ন্ত্রিত আধুনিক গো-পালন কেন্দ্র রহিয়াছে। মাথাপিছু গো-দুগ্ধ উৎপাদনে ভারতের স্থান নগণ্য। মাখন, জমাটদুগ্ধ প্রভৃতি শিল্পও এখানে খুবই অনুন্নত। কেবলমাত্র কাঁচা ও ট্যানকরা চর্মজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান পৃথিবীতে সবার উপরে।

**Q. 69. Name some of the important products of pastoral industry Where are these products available in large amounts ?**

**[ পশুপালন শিল্পের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কি কি? এই সকল দ্রব্য কোথায় কোথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়? ]**

বর্তমান জগতে প্রাণিজ দ্রব্যের চাহিদা প্রচুর। গরু, মহিষ ও ছাগল দুগ্ধ দান করে। মেষ ও ছাগের লোম হইতে পশম পাওয়া যায় এবং গরু, মহিষ, শূকর, মেষ ও ছাগ হইতে মাংস ও চর্ম পাওয়া যায়।

দুগ্ধ মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। ইহা খাদ্যপ্রাণ প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থের ভাণ্ডার। যে সকল দেশে যথেষ্ট তৃণভূমি আছে সেখানে গোচারণ সুসংগঠিত শিল্পে পরিণত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে মাখন, জমাট দুগ্ধ, গুঁড়া দুধ প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবীতে রপ্তানি হয়। দেশ অতিরিক্ত ঘনবসতিসম্পন্ন হইলে সেখানে পশুর সংখ্যা কম হয়, কারণ সেখানে পশুখাদ্য ফলাইবার জমি ও চারণ-ভূমির অভাব থাকে। জাপান ইহার উদাহরণ। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে। ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ড পশুখাদ্য চাষ করিয়া ও আমদানি করা পশুখাদ্যের সাহায্যে বৃহৎ দুগ্ধশিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে, কারণ নিকটস্থ শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে টাট্‌কা দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা আছে। ভারত যদিও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ তবু এখানে গরুর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। কিন্তু উহারা সামান্য মাত্র দুধ দেয়। কারণ উহাদের খাদ্য সরবরাহের মত যথেষ্ট জমি ও চারণভূমি ভারতে নাই।

মাংস একটি সুখাদ্য, কিন্তু একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে মাংস ভক্ষণ করা বর্তমান সভ্যতার একটি বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। মাংসের বদলে অনেক কিছু খাইয়া উহার অভাব মিটানো সম্ভব। পৃথিবীতে মাংস উৎপাদনে নিম্নলিখিত স্থানগুলি খ্যাতিলাভ করিয়াছে—(১) শিকাগো শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ( যুক্তরাষ্ট্র ), (২) বুনোয়াস অয়ারেস শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ( আর্জেন্টিনা ), (৩) উরুগোয়ে,

(৪) **অষ্ট্রেলিয়া।** বর্তমানে জাহাজের হিমকক্ষে রাখিয়া বহুদূর পর্যন্ত মাংস চালান দেওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মাংসের জন্য প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার উপর নির্ভর করে। ভারতে মাংস উৎপাদন অধিক নয়। ভারতে ছাগলের সংখ্যা সর্বাধিক। ইহারাও মাংস ও চর্মের যোগান দিয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে **পশমই** প্রধান পরিধেয়। পৃথিবীর অধিকাংশ পশমই মেষের লোম হইতে পাওয়া যায়। যেখানেই তৃণভূমি আছে এবং বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম সেখানেই প্রচুর মেষ পাওয়া যায়। মেষচারণের জন্য অষ্ট্রেলিয়াই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মেষ বহুপ্রকার, তাহার মধ্যে মেরিনো ও ইংলিশ মেষ লোমের জন্য বিখ্যাত। **মেরিনোর** আদি বাস স্পেন। সুতরাং, উহা কম বৃষ্টিপাত ও অধিক উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। উহার লোম সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কিন্তু ইংলিশ মেষ পশম ও মাংস উভয়ই যোগায়। মেষপালনে অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও হিমালয় পর্বত অঞ্চলের ছাগল উৎকৃষ্ট পশম উৎপন্ন করে। দক্ষিণ আমেরিকার আলপাকা ও লামা নামক প্রাণিজপশম মূল্যবান।

চর্ম ব্যবসা পৃথিবীতে অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়। শীতপ্রধান দেশে জুতা নিত্য প্রয়োজনীয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহার প্রচলন বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, ব্যাগ প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্যই চর্ম দ্বারা নির্মিত হয়। বর্তমানে কোন কোন দ্রব্য চর্মের পরিবর্তে প্লাষ্টিকের দ্বারা প্রস্তুত করা হইতেছে। ভারত পৃথিবীর মধ্যে অধিক গো, মহিষ ও ছাগচর্ম রপ্তানি করে। মেষ ও ক্যাঙ্গারুর চর্ম অষ্ট্রেলিয়া হইতে এবং নানা প্রকার বন্য জন্তুর চর্ম আফ্রিকা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি করা হয়।

**70. What are the countries in which and what are the geographical environment under which sheep rearing is practised on a commercial basis ? (B. Com. 1969)**

**[ কোন্ কোন্ দেশে এবং কি প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মেষ প্রতিপালন করা হয় ?**

**Or, What are the geographical conditions under which commercial sheep grazing has developed ? Explain why the woollen industry has not developed in the three southern continents that are the principal producers of wool ?**

**(B. Com 1964)**

**[ কি কি ভৌগোলিক কারণে বাণিজ্য ভিত্তিক মেষচারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে ? যে দক্ষিণ মহাদেশ ত্রয় উল যোগানে প্রধান যেখানে উল শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই কেন ব্যাখ্যা কর। ]**

**মেষচারণ ( Sheep rearing )**—মেষ চারণের জন্য নিম্নলিখিত ভৌগোলিক অবস্থা প্রয়োজন—(১) কম বৃষ্টিপাত, (২) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, (৩) অনুর্বর প্রান্তর বা পার্বত্য তৃণভূমি, (৪) ক্ষুদ্র তৃণযুক্ত ভূমি ও (৫) কম লোকবসতিযুক্ত দেশ।

মেষচারণ প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত আছে; তবে নিরক্ষীয় অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলে জলবায়ুর অসুবিধার জন্য মেষের সংখ্যা নগণ্য। মেষ খুব কষ্টসহিষ্ণু। কম বৃষ্টির দেশেও ইহারা জীবনধারণ করিতে পারে এবং ছোট ঘাস ও ঝোপগাছের পাতা খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে মেষচারণবৃত্তি যেমন উন্নতিলাভ করিয়াছে এমন আর কোথাও নহে। মেরিনো মেষ লোমের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা; দক্ষিণ আফ্রিকা পশম রপ্তানিতে ও অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা মাংস রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে মেষচারণ করা হয়। যে সকল স্থানের জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক সেই সকল স্থানেই দীর্ঘ পশমযুক্ত ভাল জাতের মেষ দেখা যায়। উচ্চভূমিতে যে মেষ পালিত হয় তাহার পশম ভাল হয়। কাশ্মীর ও মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চলের মেষের লোম হইতে উৎকৃষ্ট শাল ও কার্পেট প্রস্তুত হয়। উষ্ণ অঞ্চলের মেষের লোম সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও কর্কশ হয়। অধিক বারিপাত মেষচারণের পক্ষে ভাল নহে। মেষ উন্মুক্ত তৃণভূমিতে পালন করা হয়। এক সঙ্গে কয়েক হাজার মেষ মাত্র একজন রাখালেই চরাইতে পারে। সুতরাং, এই ব্যবসায় লাভ বেশি। যে মেষ মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, উহাকে নানাপ্রকার পুষ্টিকর ঘাস খাওয়ানো হয়। কেবলমাত্র ঘাস ও নানারকম ঝোপগাছের পাতা খাইয়াই মেষ বেশ মোটা হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে উৎকৃষ্ট লোমশ মেষ পালন করা হয় বলিয়া ঐ দেশটি পশম রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। ইউরোপে বৃটেনের খড়ি পাহাড় অঞ্চলগুলি, হাঙ্গেরির সমতল ক্ষেত্র, আল্পসের উচ্চভূমি ও স্পেনের মালভূমি মেষচারণের জন্য বিখ্যাত। অষ্ট্রেলিয়াতে সর্বাপেক্ষা অধিক মেষ দেখা যায় ( প্রায় ১৭ কোটি )। প্রধানতঃ মারে উপত্যকার কৃষি অঞ্চলে ও ডাউনস তৃণভূমিতে অধিক মেষ দেখা যায়। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে মেষচারণ বৃত্তি যথাক্রমে স্তেপ ও প্রেয়ারি তৃণভূমিতে দেখা যায়। এই দুই দেশ মেষচারণ ব্যবসায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতের মাদ্রাজ ও রাজস্থানে মেষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু এই মেষের লোম কর্কশ ও ক্ষুদ্র। এই লোম হইতে কম্বল ও কার্পেট হয়। কাশ্মীরের উচ্চ-ভূমিতে যে মেষচারণ করা হয় তাহার লোম সুন্দর রেশমের মত।

পৃথিবীতে বেশির ভাগ দেশেই কিছু পরিমাণে পশম উৎপন্ন হয়। শীতপ্রধান দেশগুলিতে পশমের চাহিদা বেশি। অল্পবসতিযুক্ত দেশগুলি, যথা—অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, দঃ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, মধ্যএশিয়া প্রভৃতি দেশ পশম রপ্তানি করে

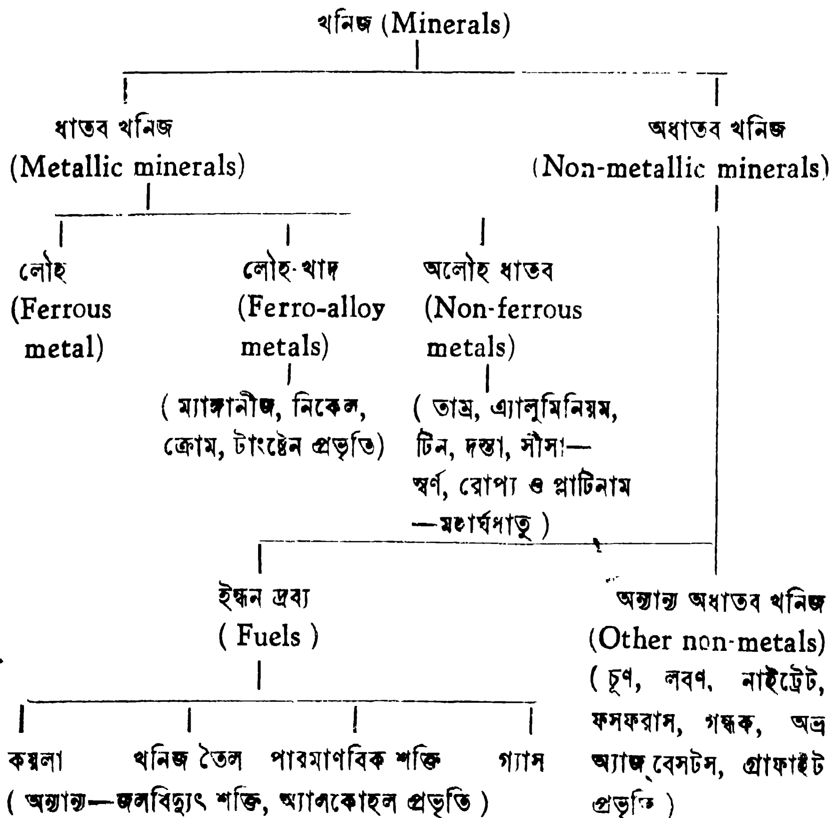
এবং ঘনবসতিযুক্ত দেশগুলি, যথা—ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ প্রধানতঃ পশম আমদানি করে। দক্ষিণ গোলার্ধের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশগুলিতে শ্রমিকের খুব অভাব। পশম শিল্পে শ্রমিক বেশি লাগে—স্বয়ংচালিত যন্ত্রাদি খুব কাজে আসে না। পশম "খাঁটি কাঁচামাল" অর্থাৎ পশম বস্ত্রপ্রস্তুতের পর ওজনে কমে না। কাজেই জনবসতি যেখানে বেশি, শীত যেখানে বেশি এমন সব দেশে পশম লইয়া যাইয়া শিল্পগঠন করা লাভজনক হয়। এই জন্য অষ্ট্রেলিয়ার পশম ব্রিটেনে চালান যায়। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে দক্ষিণ গোলার্ধের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে ঐ অঞ্চলেও বহু পশমের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতে যদিও মেষের সংখ্যা ৪ কোটির মত (অষ্ট্রেলিয়া ১৭ কোটি) তবু এখানকার মেষের পশম ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত ও কর্কশ। মাদ্রাজ ও রাজস্থানের শুষ্ক তৃণভূমি অঞ্চলে বেশি মেষপালন করা হয়। কাশ্মীর এবং হিমাচলের উচ্চভূমিতে ও মেষচারণ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত অঞ্চল দুটিতে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি করা উচ্চশ্রেণীর মেষপালন করা হইতেছে।

# খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস

MINERALS AND POWER RESOURCES

**Q. 71. Give the commercial classification of minerals.**
**[ খনিজ সম্পদের ব্যবসায়িক শ্রেণীবিভাগ লিখ। ]**




**ইন্ধন দ্রব্য ( Fuels ) :—**

**Q. 72 What are the different types of coal? Name the principal centres of production. Describe the world-trade in coal.**

**[ বিভিন্ন প্রকার কয়লা কি কি? প্রধান প্রধান উৎপাদন স্থানের উল্লেখ কর। কয়লার বিশ্ববাণিজ্যের বিবরণ দাও। ]**

**কয়লা**—কয়লা ভেষজ অঙ্গার পৃথিবীতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন

হয়—(১) **লিগনাইট** বা বাদামী কয়লা ( lignite or brown coal )। ইহার ভিতরে অল্প পরিমাণে অঙ্গার পদার্থ থাকে। এই নিকৃষ্ট কয়লা প্রধানতঃ বিদ্যুৎ ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব জার্মানীতে এই জাতীয় কয়লা বেশি উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রচুর পরিমাণে এবং ভারতের আসাম ও মাদ্রাজে অল্প পরিমাণে উহা উৎপন্ন হয়। (২) **বিটুমিনাস** কয়লা (bituminous coal) ; ইহা কৃষ্ণবর্ণের এবং ভঙ্গুর। ইহার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ অংগার পদার্থ। ইহা ইস্পাত প্রভৃতি সকল প্রকার শিল্পে ব্যবহার করা যায়। আমেরিকার পেনসিলভানিয়া, ভারতের ঝরিয়া প্রভৃতি বহুস্থানে এই জাতীয় কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৩) **অ্যানথ্রাসাইট** ( anthracite ) কয়লা ঘনকৃষ্ণবর্ণ এবং উজ্জ্বল ; ইহার ভিতর শতকরা ৯০ হইতে ·৫ ভাগ অংগার পদার্থ ( carbon ) থাকে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা। ইহা জ্বালাইলে ধূম খুব কম উৎপন্ন হয়, কারণ ইহাতে জল বা দাহ্য গ্যাস প্রায়ই নাই বলিলেই হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া, ব্রিটেনের দক্ষিণ ওয়েলস প্রভৃতি খনি অঞ্চলে এই উচ্চ শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়।

**কয়লার ব্যবহার**—কয়লা প্রত্যক্ষভাবে রেলইঞ্জিন, জাহাজ, কারখানা, রন্ধনকার্য প্রভৃতির জন্য ব্যবহার করা হয়। পরোক্ষভাবে ইহার দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া সেই বিদ্যুৎশক্তি শিল্পে ব্যবহার করা হয় এবং ইহা হইতে উৎপন্ন উপজাত দ্রব্যসমূহ ( by-products ) ; যথা—অ্যামোনিয়া, গ্যাস, রঙ, ঔষধ প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।

**কয়লা উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ**—কয়লা উৎপাদনে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ভারত, জাপান, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নেও প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হয়।

**রাশিয়া**—কয়লা উৎপাদনে রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে অনেকটাই লিগনাইট। **ডোনেৎস** কয়লা খনি ( Donetz coalfields ) হইতে প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। ডোনেৎস কয়লা খনি হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয়। মস্কোর দক্ষিণে **টুলাতে** নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ডোনেৎসের পরই কয়লা উৎপাদনে ইউরালের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত **কারাগাণ্ডা** ও সাইবেরিয়ার **কুজবাস** কয়লাখনির স্থান। ইহা ছাড়া, উত্তর রাশিয়ার ইউরাল ও পেচরা অঞ্চলেও

* খনিজ অধ্যায়ের কয়লা, লৌহ ও খনিজ তৈলের সমস্ত পরিসংখ্যান বইয়ের শেষে Monthly Bulletin of Statistics হইতে দেওয়া হইয়াছে।

কয়লাখনি রহিয়াছে। সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত নদী উপত্যকাগুলিতে এবং দূরপ্রাচ্য অঞ্চলেও অনেক কয়লাখনি আছে।

**আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র**—কয়লা উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। **পেন্‌সিলভানিয়া,** পশ্চিম ভার্জিনিয়া ও **আলাবামা** যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল। পেন্‌সিলভানিয়ার কয়লাই সবচেয়ে ভালো, প্রায়ই সবটাই অ্যানথ্রাসাইট বা অন্য কোক (Coking coal) কয়লা। ইহা ছাড়াও ইণ্ডিয়ানা, কানসাস, মিসৌরি, নেব্রাস্কা, ইলিনইস প্রভৃতি স্থানেও বহু কয়লার খনি আছে। এই বিক্ষিপ্ত খনিগুলিকে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণভাগের আভ্যন্তরীণ খনি (interior coalfields) বলা হয়। রকি পর্বত অঞ্চল এবং ওয়াশিংটন রাজ্যেও কয়লা পাওয়া যায়। এই সমস্ত স্থানের কয়লা অধিকাংশই মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর; সেইজন্য ইহা রেলগাড়ী ও গৃহস্থালীর প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়।

**চীন**—চীনের কয়লা শিল্পে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। **শানসি, শেনশি** ও **হোনানের** কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে। মাঞ্চুরিয়া, সেজোয়ান প্রভৃতি স্থানেও কয়লা পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে প্রচুর কয়লা ভূগর্ভে নিহিত আছে। শানসির কয়লার কতকাংশ অ্যানথ্রাসাইট জাতীয়।

**ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ**—এখানকার কয়লাখনিগুলি **পেনাইন পর্বতের** চতুর্দিকস্থ উচ্চভূমিকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। এই খনিগুলির অনেকগুলিই সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখান হইতে অতি সস্তা দরে বিদেশে কয়লা রপ্তানি করা যায়। কয়লা উৎপাদনে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের স্থান পঞ্চম (রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও চীনের পরে)। অধিকাংশ খনির কয়লাই খুব উচ্চশ্রেণীর। ব্রিটেনের কয়লাখনিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য :—(১) স্কটল্যাণ্ডের **আয়ারশায়ার** প্রভৃতি খনি, (২) ইংল্যাণ্ডের **নরদাম্বারল্যাণ্ড-ডারহাম,** (৩) **ইয়র্ক-ডার্বি-নটস্‌,** (৪) **মিডল্যাণ্ড,** (৫) **ল্যাঙ্কাশায়ার** ও (৬) **দক্ষিণ ওয়েলস্‌।**

**জার্মানী**—কয়লা উৎপাদনে জার্মানী বর্তমানে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে এখন পশ্চিম জার্মানীতেই অধিক ভাল কয়লা উৎপন্ন হয়। **পশ্চিম জার্মানীতে** প্রায় ২৫ কোটি টন কয়লা (লিগনাইটসহ) এবং **পূর্ব জার্মানীতে** ২৫ কোটি টন লিগনাইট এবং অল্প পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হয়। পশ্চিম জার্মানীর প্রধান কয়লার খনিগুলি **রুর (Rurh) নদীর তীরে** ওয়েষ্টফালিয়ায় অবস্থিত। একমাত্র রুর নদীর উপত্যকায় জার্মানীর উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৬০ ভাগ পাওয়া যায়। **স্যাক্সনীর** কয়লা অধিকাংশই লিগনাইট। উহা পূর্ব-জার্মানীর অন্তর্গত।

**ফ্রান্স**—ফ্রান্সের কয়লাখনিগুলি **উত্তর ফ্রান্স** এবং মধ্য মালভূমির **সেণ্টইটিনি**

অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উৎপাদন ৫ কোটি টনের মত। গত বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে **সারের** কয়লাখনিগুলি ফ্রান্সের অধিকারে ছিল; কিন্তু বর্তমানে উহা আর ফ্রান্সের অধিকারে নাই।

**পোল্যাণ্ড—সাইলেশিয়ার** বিশাল কয়লাখনি জার্মানীর নিকট হইতে পাইবার পর পোল্যাণ্ডের কয়লা উৎপাদন প্রায় ১৩ কোটি টনে পৌঁছিয়াছে। এখান হইতে প্রচুর কয়লা রপ্তানি করা হয়।

**বেলজিয়াম**—বেলজিয়ামের প্রধান কয়লাখনিগুলি ডিনাণ্ট (Dinunt) এবং ক্যামপাইন (Campine) এ অবস্থিত।

**জাপান**—কিউস্যু (Kyushu) দ্বীপে ও হোক্কাইডোতে জাপানের প্রধান কয়লা খনিগুলি অবস্থিত। কিউস্যু-দ্বীপের উৎপন্ন কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইলেও সাধারণতঃ ইহাই ইয়াওয়াটার ইস্পাত-শিল্পে ব্যবহৃত হয়; কারণ জাপানে ভাল কয়লা নাই।

**চেকোশ্লোভাকিয়া**—উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে এই দেশটিতে ভারত অপেক্ষা বেশি কয়লা উৎপন্ন হয় (১৯৬৯ সালে)। কিন্তু কয়লা খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর হওয়ায় ইন্ধনমূল্যের দিক দিয়া এই দেশটি ভারতের পরে।

**ভারত**—ভারতের বৃহত্তম কয়লাখনিগুলির অধিকাংশই দামোদর নদীর উপত্যকায় **রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া** এবং বোকারো অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতের উৎপন্ন কয়লার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কেবলমাত্র এই অঞ্চল হইতেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চলের কয়লা সাধারণতঃ বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে ইস্পাতের কারখানায় এবং কলিকাতায় ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, আসাম ও রাজপুতানায় অনেকগুলি ছোটবড় কয়লাখনি আছে। মাদ্রাজের নেয়াভেলীতে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়। ভারতের কয়লা ইউরোপ ও আমেরিকার কয়লার তুলনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অধিকাংশই নিকৃষ্ট বিটুমিনাস জাতীয়। এখান হইতে প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণে কয়লা বিদেশে রপ্তানি হয়।

**অষ্ট্রেলিয়া**—অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান খনিগুলি নিউসাউথওয়েলস, ভিক্টোরিয়া এবং কুইন্সল্যাণ্ডে অবস্থিত। **নিউক্যাসল** এবং দক্ষিণ সিডনি কয়লার জন্য বিখ্যাত। ইদানিং অষ্ট্রেলিয়ায় কয়লা উৎপাদন খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাপানে প্রচুর কয়লা রপ্তানি হইতেছে।

**দক্ষিণ আফ্রিকা**—দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউনিয়নের **ট্রান্সভাল,** নাটাল এবং অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেটে অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তবে নাটালের খনির কয়লা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। এখান হইতে প্রচুর কয়লা রপ্তানি হয়।

**কানাডা**—কানাডায় প্রচুর কয়লার স্তর আছে। কিন্তু উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ কম। নিউ ব্রাণসউইক, আলবার্টা ও সাস্‌কাচুয়ানের কয়লাখনির নাম উল্লেখযোগ্য। তবুও যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা এখানে আমদানি করা হয়।

অন্যান্য কয়লা উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে হল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকায় কয়লা খুব কম পাওয়া যায়। ব্রেজিল ও চিলিতে অল্প কয়লা পাওয়া যায়।

কয়লা রপ্তানি-বাণিজ্য দ্রুত পরিবর্তনশীল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাই প্রধানতঃ কয়লা রপ্তানি করিয়া থাকে। প্রধান আমদানিকারক রাষ্ট্রগুলি হইল জাপান, ইটালি, পাকিস্তান, ফ্রান্স, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, কানাডা, হল্যাণ্ড প্রভৃতি।

**Q. 73. What are the various uses and by-products of coal? Discuss how far is coal a localising factor of industry.**

( C. U. B. Com. Part I, 1965 )

**[ কয়লার বিভিন্ন ব্যবহার এবং উপজাতদ্রব্য সম্বন্ধে উল্লেখ কর। কয়লা শিল্পের একদেশতার জন্য কতটা দায়ী বিবৃত কর। ]**

[ পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তরের প্রথম দুই প্যারা গ্রহণ করার পরে নিম্নের প্রশ্নোত্তর যোগ কর। ]

**Q. 74. What do you know of carbonisation of coal? Give a brief account of the various uses and by-products of coal. Does coal localize industries?**

**[ কয়লার অংগারীকরণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ। কয়লার বিভিন্ন ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যের বর্ণনা দাও। কয়লা কি শিল্পের একদেশতা ঘটায়? ]**

কয়লার মধ্যে অংগার, জলীয় অংগার, গ্যাস, জল এবং ছাই বিভিন্ন পরিমাণে থাকে। ঐ সকল পদার্থের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অংগারই উত্তাপ বা শক্তি ( power ) উৎপন্ন করে। কাঁচা কয়লার মধ্যে অত্যধিক জল ও ছাই থাকিলে উহা হইতে অধিক উত্তাপ পাওয়া যায় না এবং অত্যধিক ধূম্র নির্গত হয়। সুতরাং, আধুনিক কোক চুল্লীর মধ্যে ভাল জাতের বিটুমিনাস কয়লা গুঁড়া করিয়া চুল্লীর মুখ বন্ধ করিয়া আগুন দিলে কাঁচা কয়লা পুড়িয়া প্রচুর দাহ্য গ্যাস ( volatile material ) ও বাষ্প নলের মধ্য দিয়া চুল্লী হইতে বাহির হয় এবং ঐ গ্যাস হইতে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। ঐ দ্রব্যগুলিকে উপজাত দ্রব্য ( by-products ) বলে। এখন কোক চুল্লীগুলি খুলিয়া অগ্নিময় কয়লা ঢালিয়া লওয়া হয় এবং প্রচণ্ড বেগে উহার উপর জলবর্ষণ করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করা হয়। এইভাবে যে কয়লা পাওয়া গেল

তাহাকে Coke বা Semi-Coke বলা হয়। ইহার মধ্যে অংগার খুব বেশি থাকে এবং দূষিত পদার্থ খুব কম থাকে। সুতরাং, এই কোক কয়লায় প্রচণ্ড উত্তাপ উৎপন্ন হয়। ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব শিল্পের জন্য এই কোক একান্ত প্রয়োজন। কয়লা পুড়াইয়া কোক এবং নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করাকে অংগারিকরণ ( Carbonisation ) বলে। নানা প্রকার উত্তাপের মধ্যে এই অংগারিকরণ সম্পন্ন হয়। ৭৫০° সেন্টিগ্রেড হইতে ১৩০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তাপে কয়লা পোড়াইলে দাহ্য গ্যাস হইতে নানাপ্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে অংগারিকরণের ফলে যে সকল উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে বেনজল, আলকাতরা প্রভৃতি থাকে। অধিক উত্তাপের ফলে কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রোল প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কয়লা হইতে বহুবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আলকাতরা, রাস্তার পিচ, বেনজিন, এ্যামোনিয়াম সালফেট ( সার ), কৃত্রিম তৈল, নানা প্রকার রং, গন্ধক, ন্যাপথা, স্যাকারিণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কয়লা পৃথিবীর সর্বপ্রধান শক্তির উৎস। আধুনিক শিল্পসভ্যতার জন্য কয়লা অপরিহার্য। শিল্পে কয়লার প্রয়োজন দুই প্রকার, (১) শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং (২) রাসায়নিক সার, রং প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের জন্য। কয়লা এখনও অনেক দেশেই রেলপথের প্রধান অবলম্বন। ভারতে উৎপন্ন কয়লার একটা বড় অংশ রেলইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করে। ষ্টিমার ইত্যাদিও কয়লা ব্যবহার করে। কয়লা হইতে তাপ-বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয় এবং কয়লার সাহায্যে বহু কারখানা চলে। ভারী-শিল্পের জন্য অ্যানথ্রাসাইট বা উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লা প্রয়োজন হয়। রন্ধনকার্যের জন্য কয়লা ও গ্যাস ব্যবহার করা হয়। কয়লা হইতে এমোনিয়া সার, নানাপ্রকার রং এবং কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত করা হয়। কয়লা হইতে উৎপন্ন পিচ রাস্তা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম পেট্রোলে মোটরগাড়ী, বিমান, ট্রাক্টর প্রভৃতি চলে। কয়লা হইতে ন্যাপথা প্রভৃতি নানা প্রকার কীট-নাশক দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। নিম্নশ্রেণীর লিগনাইট অথবা সাব-বিটুমিনাস কয়লা ভারীশিল্পে সাধারণতঃ ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং, ঐ সকল কয়লা পুড়াইয়া তাপ-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা হয় এবং যে ধূম্র বা গ্যাস বাহির হয় তাহা হইতে রাসায়নিক সার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। মস্কোর নিকট টুলা কয়লা ক্ষেত্রে, জার্মানীর স্যাক্সনি কয়লা ক্ষেত্রে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়লাক্ষেত্রে এবং অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের নিম্নশ্রেণীর কয়লা ক্ষেত্রেও এই প্রকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার ও কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণভাগে নেয়াভেলিতে যে লিগনাইট খনি আছে সেখানেও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কৃত্রিম সার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

**কয়লা ও শিল্পের একদেশতা**—কয়লা যেখানে পাওয়া যায় সেখানে উহা খুব সস্তা। কিন্তু ট্রেন অথবা ট্রাকে উহা দূরে লইয়া যাইলে খরচ বেশি পড়ে। তাই সকল দেশের কলকারখানাগুলি কয়লা খনির কাছে গড়িয়া উঠে। ভারতের বেশির-ভাগ ধাতুশিল্প ও অন্যান্য প্রধান শিল্প রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লা বলয়ের কাছে অবস্থিত, ব্রিটেনে মিডল্যাণ্ড, নর্দাম্বারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভানিয়া, রাশিয়ার ডোনেটস ইত্যাদি সকল বড় কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

**Q. 75. Give an idea of the world distribution of mineral oil and the countries controlling its production. Discuss in particular the significance of the fields of the Middle East in the context of the rivalry in oil-trade. (B. Com. 1961)**

**[ খনিজ তৈল পৃথিবীর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় লিখ এবং কোন্ কোন্ দেশ উহার উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে উল্লেখ কর। তৈল শিল্পে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনিগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। ]**

[ 76 প্রশ্নোত্তরের প্রথম ও শেষ চার প্যারাগ্রাফ ব্যতীত অবশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য ]

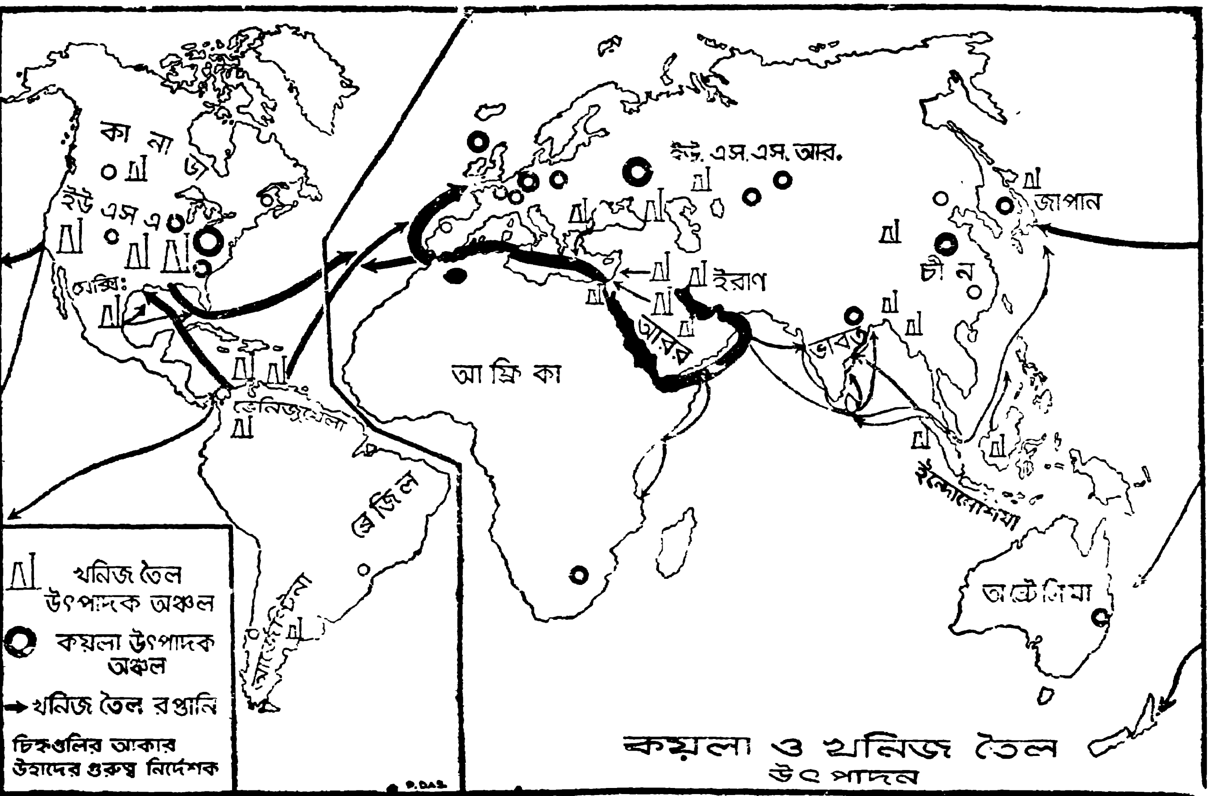
**Q. 76 Give an account of the world distribution and present production of mineral oil. State the important uses of mineral oil. Also, mention the principal exporters of crude oil.**

**[ খনিজ তৈল পৃথিবীর কোথায় কোথায় পাওয়া যাইতে পারে এবং কোথায় উহা উৎপন্ন হইতেছে লিখ। খনিজ তৈলের প্রধান ব্যবহার কি কি ? প্রধান রপ্তানিকারকদেরও নাম উল্লেখ কর। ]**

**খনিজ তৈল**—খনিজ তৈল শিলাস্তরের মধ্য হইতে পাওয়া যায়। খনিজ তৈল যে অবস্থায় খনি হইতে উত্তোলন করা হয় তাহাকে অপরিশোধিত তৈল বা ক্রুড অয়েল বলে। উহা শোধন করিলে কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি নানাপ্রকার তৈল এবং প্যারাফিন মোম উৎপন্ন হয়।

খনিজ তৈল প্রাচীনকালে মাটির সামান্য তলায়, এমন কি পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণার আকারেও পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন মাটির অনেক নীচে হইতে নলের দ্বারা পাম্প করিয়া উহা তুলিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০ হাজার মিটার নীচেও তৈল পাওয়া যায়। কোথাও বা শুধু গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস হইতেও বিদ্যুৎ শক্তি ও রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার উত্তাপে রান্নাও করা চলে।

এক একটি গভীর তৈলকূপ খুঁড়িতে এক হইতে দুই কোটি টাকা এবং ছয় মাস


কানাডা
ইউ এস এ
মেক্সি:
ভেনিজুয়েলা
ব্রেজিল
আর্জেন্টিনা
ইউ. এস. এস. আর.
জাপান
চীন
ইরাণ
আরব
ভারত
আফ্রিকা
ইন্দোনেশিয়া
অষ্ট্রেলিয়া
খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চল
কয়লা উৎপাদক অঞ্চল
খনিজ তৈল রপ্তানি
চিহ্নগুলির আকার উহাদের গুরুত্ব নির্দেশক
কয়লা ও খনিজ তৈল উৎপাদন

সময় লাগে। বেশির ভাগে গর্তেই তৈল পাওয়া যায় না। সুতরাং, তৈল কোম্পানীগুলির বিরাট মূলধন থাকা দরকার।

খনিজ তৈল উৎপাদনে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভেনিজুয়েলা, কুয়ায়েত‡ ইরাণ; সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, রুমানিয়া, মেক্সিকো, ইরাক, কানাডা, কলাম্বিয়া, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ব্রহ্মদেশেও কয়েকটি খনি আছে, তবে এই সমস্ত খনি হইতে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

**আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র**—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট খনিজ তৈলের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ উৎপন্ন হয়। টেক্সাস, ক্যালিফোর্ণিয়া, পেনসিলভানিয়া, কানসাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে উৎপন্ন তৈল খুব উচ্চস্তরের। **টেক্সাস** রাজ্যই তৈল উৎপাদনে প্রথম এবং তাহার পর **ক্যালিফোর্ণিয়া ও কানসাস** রাজ্যের স্থান। ইলিনইস ও সাউথ ইণ্ডিয়ানার খনি অঞ্চলের তৈল উৎপাদন মন্দ নয়। রকি অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায়। কানসাস, ওকলাহামা এবং টেক্সাস অঞ্চলে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে তৈল পরিশোধিত হয়। **উপসাগরীয় অঞ্চলে** উৎপন্ন তৈলের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি হয়। অবশ্য ভেনিজুয়েলা এবং মধ্যপ্রাচ্য হইতে খনিজ তৈল আমদানিও করা হয়।

**সোভিয়েট রাশিয়া**—ককেসাস পর্বতের পূর্ব প্রান্তে **বাকু** (Baku) এবং উত্তরে গ্রজনীতে ( Grazni ) প্রচুর পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হয়। কেবলমাত্র বাকুতেই রাশিয়ার সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, শাখালিন দ্বীপে ( এশিয়া ) ও **ইউরাল পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলেও** ( Second Baku ) প্রচুর তৈল পাওয়া যায়।

**ভেনিজুয়েলা—মারাকাইবো** (Maracibo) উপহ্রদের চতুর্দিকস্থ অঞ্চলে এমন কি হ্রদের মধ্যেও বহু তৈলখনি আছে। ওরিনকো নদীর মোহনাতেও তৈল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে পাওয়া যায়। অধিকাংশ তৈলই জলপথে রপ্তানি হয়।

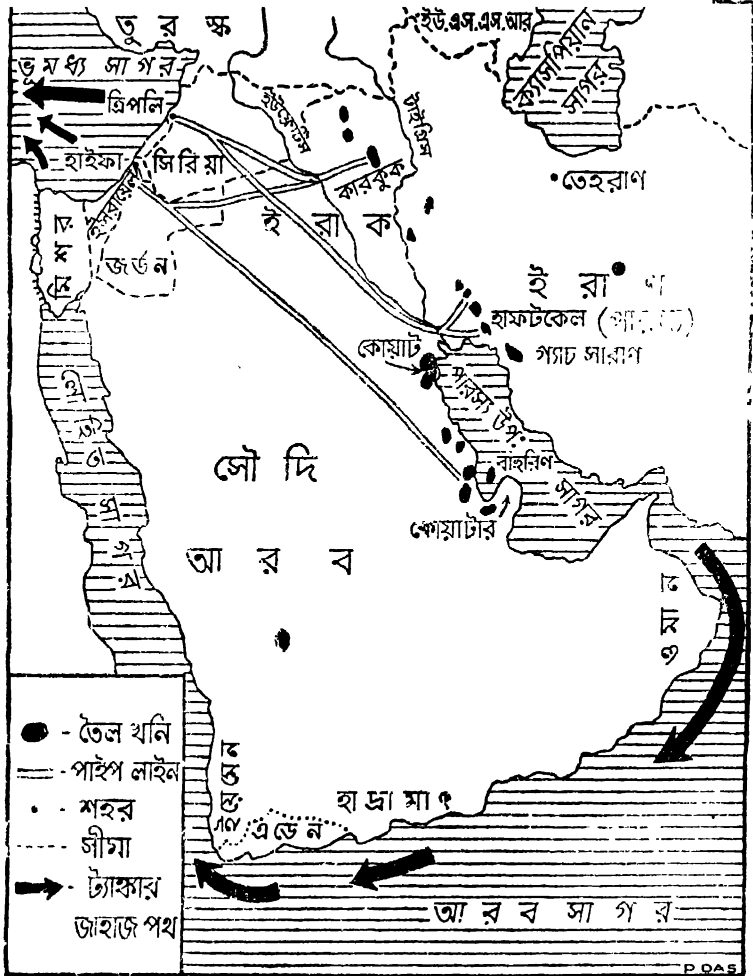
**রুমানিয়া**—প্লেষ্টি নামক স্থানে রুমানিয়ার তৈল উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে তৈল উৎপাদনে রুমানিয়ার স্থান দ্বিতীয়।

*** মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চল**—পঞ্চসাগরের দেশ মধ্যপ্রাচ্য। ভূমধ্য, লোহিত, কৃষ্ণ, আরব ও ক্যাস্পিয়ান সাগর দিয়া সীমায়িত মধ্যপ্রাচ্যের সর্বপ্রধান

---

* এই অংশ কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকিলে এত বিশদভাবে লিখিত হইবে—নচেৎ নহে। ‡ Kuwait—কুয়ায়েত উচ্চারণও হয়।

তৈল উৎপাদক দেশ ইরাণ। দ্বিতীয় স্থান সৌদি আরবের, তৃতীয় কুয়ায়েতের এবং চতুর্থ স্থান ইরাকের। ইহা ছাড়া ওমান, বাহরিণ ও কোয়াটার এবং সংযুক্ত আরব




মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চল

সাধারণতন্ত্রও তৈল উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের ২৫%-এর মত পাওয়া যায় মধ্যপ্রাচ্য হইতে। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ ব্রিটিশ ও আমেরিকান ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠানগুলি তৈল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। কিছু ডাচ এবং ফরাসী স্বার্থও আছে। সম্প্রতি একটি ইটালীয় তৈল প্রতিষ্ঠানও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর তৈল ব্যবসা মাত্র ৫৬টি বড় বড় কোম্পানীর হাতে। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশগুলি এই একচেটিয়া কারবারের বাহিরে আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল লইয়া বিদেশী কোম্পানীগুলির সংগে বহু সংঘাতের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির একটা বুঝাপড়া হইয়াছে।

নিম্নে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান খনিগুলির বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) **সৌদি আরব, কোয়াটার, বাহরিণ দ্বীপ ও কুয়ায়েত**—সৌদি আরব মালভূমির উত্তর ভাগে পারস্য উপসাগরের তীরে এই তৈল ক্ষেত্রটি অবস্থিত। এই অঞ্চলে তৈল উৎপাদন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখন ইহা পৃথিবীতে তৈল উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। আমেরিকান কোম্পানীগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে এখান হইতে তৈল উত্তোলিত হইয়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নলযোগে এই তৈল ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগর তটে লইয়া যাওয়া হয়। এই অঞ্চলের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কুয়ায়েত নামক ক্ষুদ্র মরুভূমিময় আরব দেশটিও সৌদি আরবের প্রায় সমান তৈল উৎপন্ন করে। তাহা ছাড়া, কোয়ার্টার এবং ওমানেও প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। আরব দেশগুলি বৎসরে শত শত কোটি টাকার পেট্রোলের লাভাংশ পায় এবং ঐ দেশগুলিতে সমৃদ্ধির জোয়ার ডাকিয়াছে।

**লিবিয়া**—মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে লিবিয়ার তৈলখনিগুলির উৎপাদন আশ্চর্য্যজনক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৯ সালে লিবিয়ার তৈল উৎপাদন প্রায় সৌদি আরবের সমান হয়। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া এবং আলজিরিয়া এখন তৈল উৎপাদনে উচ্চস্থানের অধিকারী।

(২) **ইরাক**—মসুলের নিকট কতকগুলি খুব অধিক উৎপাদনক্ষম তৈলখনি আছে। ইরাকের দক্ষিণ ভাগেও তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখান হইতে নলযোগে ভূমধ্যসাগর তটে রপ্তানির জন্য তৈল পাঠান হয়।

(৩) **ইরাণ**—১৯৬৯ সালে তৈল উৎপাদনে ইরাণ মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম ছিল। মজিদ-ই সুলেমনের তৈল অঞ্চল হইতে নলযোগে **আবাদন** ( Abadan ) বন্দরে তৈল আনয়ন করা হয়। এখানে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ তৈল শোধনাগার অবস্থিত।

**দূরপ্রাচ্য** (Far East)—**ব্রুনেই ও ইন্দোনেশিয়া** এখানকার প্রধান তৈল উৎপাদন ক্ষেত্র। ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত সুমাত্রা ও যবদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে তৈল উত্তোলিত হইতেছে এবং আরও অধিক তৈল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

**নাইজিরিয়া**—নাইজার নদীর মোহানায় পোর্ট হারকোর্টের নিকটে প্রচুর

**স্বাভাবিক গ্যাস** ( Natural Gas )—মাটির নীচে এই গ্যাস পাওয়া যায়। অনেক সময় পেট্রোলের খনিতেও এই গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাস গৃহে রন্ধনের কাজে, উত্তাপ সৃষ্টির কাজে ও রাসায়নিক শিল্পের কাজে লাগানো হয়। ইহা খুব কম দেশেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সেখানে তিন লক্ষ মাইল পাইপ লাইনের সাহায্যে দেশের সর্বত্র উহা সরবরাহ করা হয়। টেক্সাস, লুইসানিয়া, ওকলাহোমা এবং কালিফোর্ণিয়ায় এই গ্যাস অধিক পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাশিয়া স্বাভাবিক গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তাহার পর ভেনিজুয়েলা ও কানাডার স্থান। পশ্চিম পাকিস্তানে সুই গ্যাস খনির গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে পাঞ্জাবের জ্বালামুখীতে, গুজরাটে এবং আসামের নাহোরকাটিয়াতে এই গ্যাস আছে। আসামে ও গুজরাটে এই গ্যাস হইতে কয়েক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়।

**বিদ্যুৎশক্তি** ( Electricity )—বৈদ্যুতিক শক্তি পৃথিবীর শিল্পক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করিয়াছে। এই শক্তি অনায়াসে এবং অল্পব্যয়ে ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায়। তড়িৎশক্তি নানাভাবে উৎপন্ন হয়। কয়লা, পেট্রোল বা ডিজেল অয়েল, গ্যাস, লিগনাইট, পারমাণবিক ইন্ধন প্রভৃতির সাহায্যে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তাপ-বিদ্যুৎ ( Thermal electricity ) বলে। জল হইতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহাকে জল-বিদ্যুৎ (Hydro-electricity) বলা হয়।

পৃথিবীতে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সকল দেশ অগ্রগণ্য সেগুলি হইল যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রগণ্য দেশ হইল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, ইটালি, জাপান, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ।

**জলবৈদ্যুতিক শক্তি—**

**Q. 80. Describe the natural and economic factors necessary for the development of hydro-electric power. Name the countries that are well-developed in the production of hydro-electric power. ( Cal. B. Com. 1969 )**

**[ জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দাও। যে সব দেশ জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে বিশেষ উন্নত তাহাদের নাম কর। ]**

জলপ্রপাত বা নিম্নগামী বেগবতী নদী হইতে যে বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন করা হয় তাহাকে **জলবিদ্যুৎ শক্তি** ( hydro-electric power ) বলে। শিল্পজগতে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। যদিও প্রায় সকল দেশেই পার্বত্য নদী আছে এবং জলশক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে ( কেবল উষ্ণমরু ও তুষার মরু বাদে ) তবু

সকল দেশেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সহজ নহে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন নিম্নলিখিত কতকগুলি বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা—

(১) পর্বত সংকুল অঞ্চলে পর্বতগাত্রস্থ বেগবতী নদী হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা যায়। (২) বারিপাতপুষ্ট বা তুষার-গলিত জলে পরিপূর্ণ নদী হইতে জলবিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। জলের প্রবাহ বারমাস সমান থাকিলে ভাল হয়। (৩) জলবিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চার করিতে অরণ্যের গুরুত্বও নেহাৎ কম নয়। কেন না অরণ্য বৃষ্টিপাত ও জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। যে সমস্ত নদীর উৎপত্তিস্থানে অরণ্য আছে, সেই সমস্ত নদীতে জলের প্রবাহের সমতা রক্ষিত হওয়ায় সেই সমস্ত নদী হইতে বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপাদন করা যায়। তাহা ছাড়া, অরণ্য থাকায় ভূমিক্ষয় কম হয় বলিয়া নদীর জল খুব পরিষ্কার থাকে। ইহাতে বিদ্যুৎ-যন্ত্র ভাল থাকে। পলি পড়িয়া কৃত্রিম হ্রদ মজিয়া যাইবার আশংকাও কম থাকে। (৪) নদীর সংকীর্ণ উপত্যকার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত অনেক সময় বাঁধ দিয়া সরোবর সৃষ্টি করিয়া বর্ষার সময় উহাতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। তারপর নলের সাহায্যে চালিত জলদ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া ঐ জল নদীর গর্ভে প্রেরিত হয়। (৫) স্বাভাবিক জলপ্রপাত ( যথা—যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্রা ) অথবা কৃত্রিম জলপ্রপাত ( যথা—ভাক্রা বাঁধ ) হইতে টারবাইন যন্ত্রের সাহায্যে জল-বৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল হইলে তবে সেখানে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা যায়। প্রথমতঃ, চাই প্রচুর মূলধন। বাঁধ ও বিদ্যুৎ যন্ত্রাদির জন্য উহা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, চাই যন্ত্রবিদ ও কাঁচামাল ; যথা—সিমেণ্ট, ইস্পাত, তাম্র ও এ্যালুমিনিয়াম। আর তৃতীয়তঃ, চাই বিদ্যুৎশক্তি বিক্রয়ের বাজার অর্থাৎ শিল্প, রেলপথ ও গ্রাম-নগরাদি ; কারণ এই শক্তি যেখানে উৎপন্ন করা হয় সেখান হইতে ৩০০ মাইল পর্যন্ত কম খরচে ইহা তার ও ট্রান্সমিশন টাওয়ারের মাধ্যমে লইয়া যাওয়া যায়। এই শক্তি শিল্প বিকেন্দ্রীকরণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলতড়িৎ উৎপাদক দেশ হইল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, ইটালি, জাপান, নরওয়ে প্রভৃতি।

আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল এবং ইউরোপের পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চলে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন জলবৈদ্যুতিক শক্তির অর্ধেকের বেশি উৎপন্ন হয়। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে "ফল লাইন" ও পশ্চিমাংশে কলাম্বিয়া উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রাশিয়ার ভল্গা নদীর উপর অবস্থিত। কানাডা, জাপান ও ইটালির জল-বৈদ্যুতিক শক্তি প্রধানতঃ শিল্পের শক্তির চাহিদা মিটায়। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়েতে মাথাপিছু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বাধিক। সুইজারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকায় ভবিষ্যতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ভারতের বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। বর্তমানে বোম্বাই, বাঙ্গালোর, ভদ্রাবতী প্রভৃতি স্থানের শিল্পকারখানাগুলি জলবিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে চলে।

পৃথিবীতে জলবিদ্যুৎ শক্তির বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, ইহা প্রকৃতির অফুরন্ত দান, কয়লা ও খনিজ তৈল শেষ হইতে পারে, কিন্তু জলবিদ্যুৎ-শক্তি চিরকাল সমান ভাবেই পাওয়া যায়। অবশ্য কোন বৎসর হয়ত অনাবৃষ্টির জন্য জল সরবরাহ কম থাকায় বা অতিরিক্ত শীতের জন্য জল জমিয়া যাওয়ায় সাময়িক ভাবে এই শক্তির অভাব ঘটিতে পারে ; কিন্তু উহা কমই ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, জলতড়িৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করিতে খরচ কম। যেখানে কয়লা বা খনিজ তৈল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ব্যয়সাধ্য সেখানে উহা লইয়া যাইতে খরচ কম হয়। পল্লী অঞ্চলে সমবায় প্রথায় কুটির শিল্প গঠনে জল-তড়িতের প্রয়োজন খুব বেশি। ইহাতে উৎপাদনের খরচ কম হয়। জাপানে এবং সুইজারল্যাণ্ডের জল-শক্তির সাহায্যে গৃহে গৃহে কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়তঃ, জলশক্তির সাহায্যে রেলগাড়ি চলিতে পারে এবং সর্বপ্রকার শিল্পও চলিতে পারে। ধূম্র না থাকায় জল-তড়িৎ যে সকল শহরে বা গ্রামে ব্যবহৃত হয়, সে সকল স্থানের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। দামোদর ভ্যালির বিদ্যুৎশক্তি ( জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুৎ ) কলিকাতার নিকটস্থ অঞ্চলে রেলপথের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাতে শহরে গমনাগমনকারী দৈনিক ট্রেণ যাত্রীদের খুব সুবিধা হইয়াছে।

**Q. 81. What do you know of nuclear fuels ? Name the countries where atomic energy has been used for peaceful purposes.**

[ পরমাণু শক্তির উৎসগুলি সম্পর্কে কি জান ? কোন্ কোন্ দেশে পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজে লাগানো হইয়াছে ? ]

**পারমাণবিক শক্তি**—মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে ছয় সহস্র টন কয়লা হইতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন হয় মাত্র আধসের ইউরেনিয়ম, প্লুটোনিয়ম অথবা থোরিয়ম ধাতু হইতে সেই পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। পারমাণবিক বৈদ্যুতিক-শক্তি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, কানাডা ও ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে শিল্পে প্রয়োগ করা হইয়াছে। জার্মানী, ভারত, চীন, জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশেও এই শক্তি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার এই শক্তি জাহাজ চালনার কার্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই শক্তির সাহায্যে পরিচালিত একটি জাহাজ কোথাও কোন ইন্ধন দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া এক যাত্রায় বেশ

কয়েকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে। বর্তমানে রেলগাড়ী ও বিমান চালনার জন্যও পারমাণবিক রিয়্যাক্টার প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে।

এপর্যন্ত নানা দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক ইন্ধন দ্রব্য ইউরেনিয়ম ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কানাডা, কঙ্গো, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুর ইউরেনিয়ম পাওয়া যায়। পারমাণবিক-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গ্রাফাইট ও বেরিল প্রয়োজন হয়। গ্রাফাইট মেক্সিকো, জাপান, ম্যাডাগাস্কার প্রভৃতি দেশে এবং বেরিল ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। ভারতে বেরিল এবং ইউরেনিয়ম আছে তবে এখনও ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় নাই। থোরিয়ম ভারতের কেরল রাজ্যের সমুদ্রতটে পাওয়া যায়। ভারতের প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টারটি বোম্বাই নগরের উপকণ্ঠে ট্রম্বেতে স্থাপিত হয়, দ্বিতীয়টি গুজরাটে এবং তৃতীয়টি রাজস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

**Q. 82. Compare and contrast coal, petroleum and hydro-electricity as sources of industrial power. Examine the natural and economic factors favouring the production of hydro-electricity.** ( B. Com. Part I 1964 )

**[ শিল্পে শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ তৈল এবং জলবিদ্যুতের তুলনামূলক আলোচনা কর। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কি প্রকার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন হয় ? ]**

একটি মোটামুটি হিসাব হইতে দেখা যায় যে পৃথিবীতে শক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবৈদ্যুতিক-শক্তি নিম্নলিখিত হারে ব্যবহার করা হয়—কয়লা ৪০%, খনিজ তৈল ৩১% এবং জলবৈদ্যুতিক শক্তি ১২%। অবশিষ্ট ১৭ ভাগের মধ্যে ১০ ভাগের মত শক্তি গ্যাস হইতে উৎপন্ন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও কয়লা হইতেই পৃথিবীর ৯০% শক্তি উৎপন্ন হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে খনিজ তৈল, গ্যাস ও জলশক্তির ব্যবহার কয়লা অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকাংশ উন্নত দেশে রেলপথের জন্য কয়লার বদলে ডিজেল তৈল ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহার হইতেছে। এখন দেখা যাক কয়লা, খনিজ তৈল এবং জল-বৈদ্যুতিক-শক্তি, এই তিনটি প্রধান শক্তির উৎসের প্রত্যেকটির কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা রহিয়াছে।

**কয়লা**—কয়লা নানা প্রকারের হয়। উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস এবং এ্যানথ্রাসাইট কয়লা হইতে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করা যায়। এই উত্তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়, বাষ্পীয় ইঞ্জিন পরিচালিত করা যায় এবং লৌহাদি প্রায় সকল প্রকার ধাতু গলানো যায়। কয়লার মধ্যে যে দাহ্য গ্যাস থাকে, তাহাও উত্তাপ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় এবং কয়লা হইতে নানাপ্রকার মূল্যবান

উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা হয়। যেখানে কয়লার স্তর ভূমির উপর অথবা নদী বা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত সেখানে কয়লা উৎপাদন ও বহন করার খরচ কম। ঐরূপ স্থানে আর কোন শক্তি উৎপাদক দ্রব্য কয়লার সংগে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। কয়লা হইতে খনিজ তৈলের পরিবর্তদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে মোটর, বিমান, জাহাজ ও কৃষিযন্ত্র চালানো যায়। কয়লা বহুদূরদেশে জাহাজ যোগে লইয়া যাইয়া ব্যবহার করা যায়। কয়লা পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া আর সকল মহাদেশেই ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। কয়লার প্রধান অসুবিধা এই যে ভাল কয়লা পৃথিবীতে খুব কম; কয়লার খনি ক্রমশঃ গভীর হইলে উৎপাদনের খরচ বেশি হয়। কয়লা বহন করিতে অনেক জায়গা লাগে বলিয়া খনি হইতে দূরে কয়লার দাম খুব বেশি। সুতরাং, কয়লাখনি অঞ্চলের খুব নিকটে শিল্প গড়িয়া উঠে এবং ধূম্রময় ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টি হয়। ফলে, সামাজিক ও জাতীয় স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

**খনিজ তৈল**—খনিজ তৈলের মধ্যে জলীয় অঙ্গার থাকে। উহা হইতেই শক্তি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে খনিজ তৈলের উৎপাদন ও চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইন্ধন হিসাবে ইহার প্রধান সুবিধাগুলি হইল—(১) খনিজ তৈল পরিমাণের অনুপাতে কয়লা অপেক্ষা অধিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং তৈলচালিত রেল ইঞ্জিন বা জাহাজ একবার ইন্ধন বোঝাই করিয়া বহুদূরে যাইতে পারে। (২) তৈল জলীয় হওয়ায় উহা বহন করা সহজ। নলযোগে কম খরচে ইহা শত শত মাইল দূরে পাঠানো যায়। অতিকায় ট্যাঙ্কার জাহাজ নাম মাত্র খরচে তৈল বহন করে। (৩) খনিজ তৈল হইতে নানা প্রকার তৈল ও উপজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ইহাতে মোটরগাড়ি, বিমান, জাহাজ, ইঞ্জিন, ট্রাক্টর ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র চলে। তৈলদ্বারা যন্ত্রাদি পরিষ্কার করা যায়। কেরোসিন তৈলে আলো জ্বলে। কলকারখানা তৈলের সাহায্যে চালানো যায়। ইহাতে কয়লা অপেক্ষা ধূম্র কম হয় এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে। খনিজ তৈলের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহা মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীতে প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলিকে (যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ায় অবশ্য প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশে তৈলের অভাব) অনুন্নত দেশগুলির উপর (যথা—আরব, ভেনিজুয়েলা প্রভৃতি) নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, খনিজ তৈল অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ বলিয়া উহা সংরক্ষণ বিপজ্জনক। তৃতীয়তঃ, লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি ভারী শিল্প ইহাতে চলে না। উহাদের জন্য কয়লা একান্ত প্রয়োজন। খনিজ তৈল অনুসন্ধান করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য কাজ। ফলে, বড় বড় একচেটিয়া কারবার গড়িয়া উঠে এবং ক্ষুদ্র দরিদ্র দেশের উপর বৃহৎ ও অর্থবান দেশের প্রভাব

আসিয়া পড়ে। তৈলখনির আয়ু অত্যন্ত কম। কয়েক বৎসরেই একস্থানের তৈল-ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়। তৈল খনন কার্যের জন্য সুদক্ষ কারিগর দরকার। খরচও খুব বেশি। উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

**জলবৈদ্যুতিক শক্তি**—জলবৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎশক্তির ভাণ্ডার-গুলির অধিকাংশই কাজে লাগানো সম্ভব হয় নাই। পৃথিবী এই শক্তি সম্পদে অসাধারণ সমৃদ্ধ। এই শক্তির উৎস অফুরন্ত; কারণ পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি চিরদিনই থাকিবে এবং জলপ্রপাতেরও অভাব হইবে না। এই শক্তি উৎপন্ন করিতে প্রথম দিকে ব্যয় অত্যন্ত বেশি হয়। কারণ বড় বড় বাঁধ ও যন্ত্র বসাইতে হয়, শত শত মাইল তার খাটাইতে হয় এবং ঐগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু ঐ সকল কাজ শেষ হইলে জলবিদ্যুৎশক্তির মত সস্তায় আর কোন শক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই শক্তি অধিকদূর লইয়া যাইবার উপায় নাই। সুতরাং, অনুন্নত দেশে ইহা উৎপন্ন হইলেও ইহার বাজার মিলে না। জলবিদ্যুৎশক্তি তারের মাধ্যমে বহন করা হয় বলিয়া ইহা গ্রামাঞ্চলেও সস্তায় পাওয়া যায়। ফলে শিল্পগুলি খুব কেন্দ্রীভূত হয় না। পরিবেশ খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর থাকে। জলবিদ্যুৎশক্তির প্রধান অসুবিধা এই যে ইহা প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। যদি কোন বৎসর বৃষ্টি কম হয় অথবা অতিরিক্ত শীত পড়িয়া জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় তবে সেই শক্তি ব্যবহারকারী শিল্পগুলি নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যদিও কয়লা এবং খনিজ তৈল অপেক্ষা জলবিদ্যুৎশক্তি প্রায় সকল দেশেই সহজলভ্য তবু অর্থাভাবে এবং উপযুক্ত যন্ত্রবিদের অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই শক্তি অধিক পরিমাণে কাজে লাগাইতে পারে নাই। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জলবিদ্যুৎশক্তি মধ্য আফ্রিকায় উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে কোন বৃহৎ শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। ভারতের মত দেশেও মাত্র শতকরা ৬ বা ৭ ভাগ শক্তি কাজে লাগানো সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষতঃ অনুন্নতঃ দেশগুলিতে বহু নূতন জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই শক্তি ব্যবহারের ফলে অনেক দেশেই রেলপথ, কলকারখানা, এমন কি ভারী শিল্পের জন্যও কয়লার প্রয়োজন হইতেছে না। এইজন্যই ফ্রান্সে ইহাকে "white coal" বলা হয়। অবশ্য মোটরগাড়ী, জাহাজ ও বিমান এই শক্তি ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখাও সম্ভব নহে।

উপরিউক্ত তিনপ্রকার শক্তিই বর্তমান বিশ্বে একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীতে এমন শিল্পোন্নত অঞ্চল আছে যেখানে ঐ তিনপ্রকার শক্তির উৎসই পূর্ণভাবে কাজে লাগান হইয়াছে এবং বর্তমান সভ্য মানুষ আরও অধিক শক্তি উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক মহাশক্তির ভাণ্ডারে হাত দিয়াছে। পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক

ব্যবহার আরম্ভ হইলে কয়লা, খনিজ তৈল এবং জলবৈদ্যুতিক-শক্তির কতদূর প্রয়োজন থাকিবে তাহা এখনও নিরূপণ করা সম্ভব নহে।

( শেষাংশের জন্য 80 নং প্রশ্নোত্তরের প্রথমার্ধ দ্রষ্টব্য )

**ধাতব খনিজ ( Metallic Mineral )**

**Q. 83. What do you know of the uses of iron ore ? Name the countries which produce iron ore and give an account of their production**

**[ লৌহ আকরিকের ব্যবহার সম্পর্কে কি জান ? যে সকল দেশে লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় তাহাদের নাম এবং উৎপাদন সম্পর্কে লিখ। ]**

লৌহ [ Iron ( ferrous metal ) ]—ভূত্বকের উপরিভাগের ( SIAL ) মোট শতকরা প্রায় চারভাগ লৌহ ; কিন্তু ইহা সর্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। যে সকল শিলায় লৌহের ভাগ প্রায় ৪০ শতাংশ তাহা গালাইয়া সাধারণতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প লাভজনক ভাবে চালানো যাইতে পারে। অবশ্য লৌহখনির অবস্থান, লৌহ আকরিকের মধ্যে গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ এবং লৌহ উৎপাদক দেশের যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতির উপর লৌহশিলার ব্যবহার নির্ভর করে। ভারত ও ব্রেজিলে অনেক দুর্গম স্থানে এমন অনেক লৌহ আকরিক ভাণ্ডার রহিয়াছে যেখানে শিলায় মোট প্রায় ৭০ শতাংশ লৌহ আছে অথচ উহা কোন কাজেই লাগিতেছে না ; অপর পক্ষে, ব্রিটেন ও জার্মানীতে মাত্র ৩০ শতাংশ লৌহ আছে এমন শিলাও বেশ লাভজনকভাবে কাজে লাগানো হইয়াছে। ভারতের হেমাটাইট লৌহশিলায় গড়ে প্রায় ৬৫ শতাংশ লৌহ আছে ; ম্যাগ্নেটাইট ( রাশিয়ার উরাল পর্বত প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায় ) সর্বাপেক্ষা ভাল লৌহশিলা। হেমাটাইটও খুব উচ্চ শ্রেণীর লৌহ শিলা। লিমনাইট অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহশিলা। ফ্রান্সে ও পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় লৌহশিলা পাওয়া যায়। আমেরিকায় এবং সুইডেনের লৌহশিলা খুব উৎকৃষ্ট। উহাতে ফসফরাস প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থ কম থাকে।

লৌহশিলা কয়লা ও চুনাপাথর সহযোগে ব্লাষ্ট ফারনেসে গালাইয়া কাঁচা লৌহ ( pig iron ) এবং উহার সহিত প্রয়োজন মত কিছু অঙ্গার, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি মিশাইয়া ইস্পাত ( steel ) প্রস্তুত করা হয়। এই ইস্পাত বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড স্বরূপ।

পৃথিবীতে লৌহশিলা উৎপাদনে রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, কানাডা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া চীন, জার্মানী, ভারত, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনিজুয়েলা, চিলি, ব্রেজিল এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। ভারত ও ব্রেজিলে প্রচুর লৌহশিলা আছে ; মাত্র সম্প্রতি এগুলি ব্যাপক-

ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুত ভারতের লৌহশিলার ভাণ্ডার পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ( ২১০০ কোটি টন )।

**রাশিয়া**—বর্তমান বিশ্বে লৌহশিলা উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম। ডোনেৎস নদীর দক্ষিণে **ক্রিভয়রগ** ( Krivoyrog ) খনি রাশিয়ার বৃহত্তম খনি। ইহা ছাড়া দক্ষিণ এবং মধ্য **উরাল**, মধ্য রাশিয়ার **কুর্স্ক** এবং সাইবেরিয়ার কুজবাসের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। কোলা ও কার্চ উপদ্বীপেও লৌহ পাওয়া যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার লৌহশিলা উৎপাদন ১৮ কোটি টনের বেশি এবং ইস্পাত উৎপাদন ১০ কোটি টনের মত হয়। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

**আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র**—যুক্তরাষ্ট্র লৌহসম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও লৌহশিলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান রাশিয়ার অনেক পরে। **সুপিরিয়র হ্রদের** ( Lake—Superior ) পশ্চিমাঞ্চলে ( মিনাসোটা রাজ্যে ) বিশেষতঃ **মেসাবি** ( Messabi ), কুইনা (Quyena), লৌহ পর্বত এবং ভারমিলিয়ন পর্বতে ( Vermellion Ranges ) প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অপর লৌহ খনি অঞ্চল **আলাবামা** ( Alabama ) রাষ্ট্রে অবস্থিত। শিলার মধ্যে গড়ে ৫০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন আরও অনেক বেশি। সুতরাং কানাডা, চিলি, ভেনিজুয়েলা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর লৌহশিলা ( iron ore ) আমদানি করিতে হয়।

**যুক্তরাজ্য** ( U. K. )—ব্রিটেনে উৎপন্ন লৌহ আকরিকের বেশির ভাগ **ক্লিভল্যাণ্ড** পাহাড় ( Cleveland ), নর্দাম্পটন, ফারনেস জেলা ও লিঙ্কনশায়ারে পাওয়া যায়। এই সমস্ত স্থানের উৎপন্ন লৌহ নিম্নশ্রেণীর। সেইজন্য স্পেন, কানাডা এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে উচ্চস্তরের লৌহ আকরিক এখানে আমদানি করা হয়।

**পশ্চিম জার্মানী—ওয়েষ্টফালিয়া** এবং স্যাক্সনি অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায়। কিন্তু এই লৌহশিলা নিম্নশ্রেণীর। বর্তমানে জার্মানী, ফ্রান্স এবং সুইডেন হইতে তাহার প্রয়োজনের অধিকাংশ লৌহশিলাই আমদানি করে। পশ্চিম জার্মানী লৌহ-শিল্পে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সমৃদ্ধ।

**ফ্রান্স—লোরেন** ( Lorrain ), **নরম্যাণ্ডি** ( Normandy ), ব্রিটানি এবং পিরেনিজ পর্বতে ( the Pyrenees ) প্রচুর লৌহ খনিজ পাওয়া যায়। ফ্রান্স লৌহ উৎপাদনে পৃথিবীতে উচ্চ স্থান অধিকার করে। লোরেনের খনিগুলি যদিও খুব উচ্চশ্রেণীর লৌহ উৎপাদন করে না তবুও ইহা জার্মানীর রুর কয়লাক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লৌহখনি অঞ্চল।

**সুইডেন**—সুইডেনের উত্তর ও মধ্যভাগে প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহশিলা পাওয়া যায়। জেলিভারা প্রধান খনি। উহা ব্রিটেন ও জার্মানীতে রপ্তানি করা হয়।

**চীন**—উত্তর এবং মধ্য চীনের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বহু লৌহখনি আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খনি টায়ে ( Tayeh )-তে অবস্থিত। এখান হইতে হাঙ্কাওতে ( Hankow ) লৌহ চালান যায়; মাঞ্চুরিয়াতেও প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। এই লৌহ আনশানের কারখানায় গলানো হয়।

**ভারত**—বিহারের সিংভুম এবং উড়িষ্যার বোনাই ( Bonai ), কেয়নঝড় (Keonjhar) এবং মধ্যপ্রদেশের কিরিবুরুর লৌহখনির নাম উল্লেখযোগ্য। গোয়া, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, এবং মহীশূরেও লৌহখানি আছে। লৌহ সম্পদে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৯৬৯ সালের উৎপাদন ২·৬ কোটি টন। ইহার মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মত রপ্তানি হয়।

উপরিউক্ত দেশগুলি ছাড়া কানাডা, ভেনিজুয়েলা এবং চিলি লৌহ উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে লাইবেরিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকাতে লৌহশিলা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া নরওয়ে, ব্রেজিল, পোল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার "আয়রণ নব" ( "Iron knob ) অঞ্চলে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন দেশও এখন ব্যাপকভাবে লৌহ শিলা রপ্তানি করিতেছে।

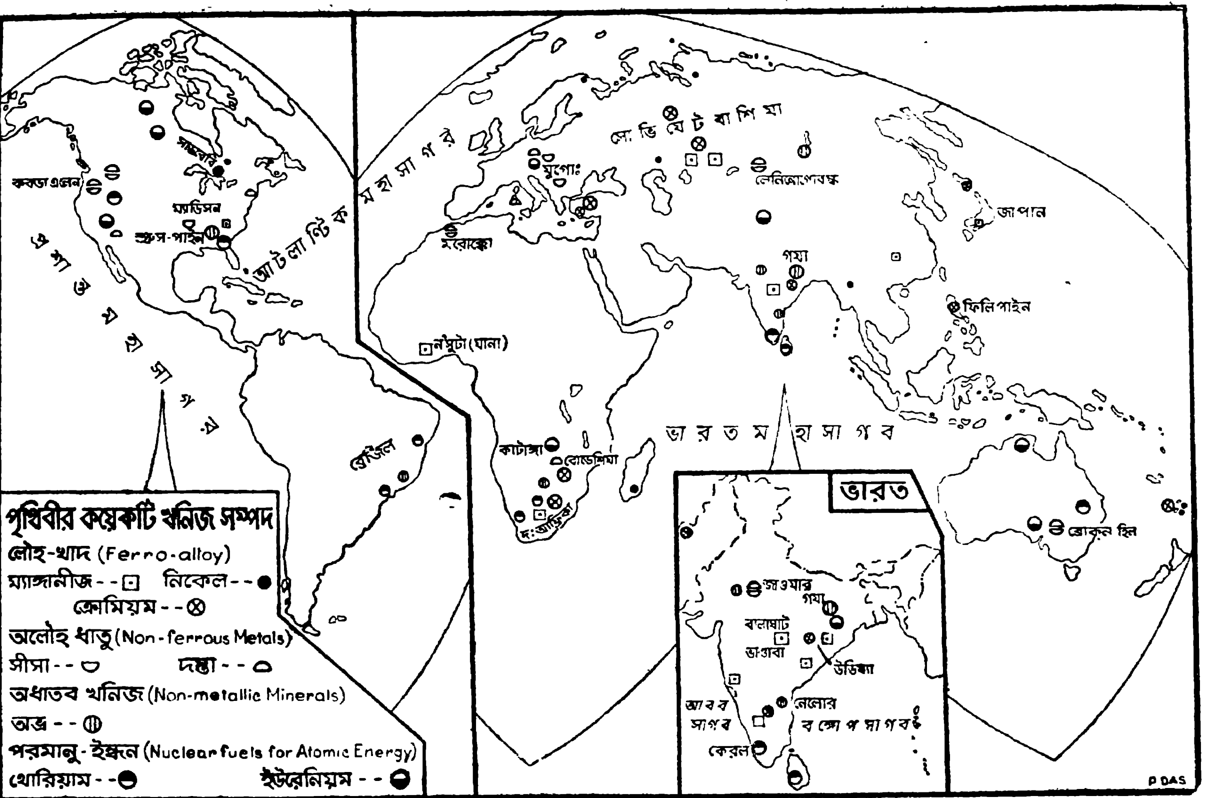
**লৌহ-খাদ ধাতব ( Ferro-alloy metals )**

**Q. 84. What metals are called ferro-alloys ? What are their uses and where are they produced ?**

**[ কোন্ কোন্ ধাতুকে লৌহখাদ ধাতু বলা হয়? তাহাদের ব্যবহার কি এবং ঐগুলি কোথায় পাওয়া যায়? ]**

যে সকল ধাতব খনিজ দ্রব্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাদের লৌহ-খাদ বলে; যথা—ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়ম, নিকেল, টাংষ্টেন, ভানাডিয়াম ও মলিব্‌ডেনাম।

(a) **ম্যাঙ্গানীজ** ( Manganese )—ইস্পাতকে সুদৃঢ় ও ঘাতসহ করিতে এবং লৌহ হইতে দূষিত পদার্থ দূর করিতে এই ধাতু প্রয়োজন। ইহার কোন পরিবর্ত দ্রব্য নাই। রাসায়নিক শিল্পেও ইহার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ব্লিচিং পাউডার, রঙিন কাঁচ এবং বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিতেও ম্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের জর্জিয়া, ইউক্রেণ, ইউরাল পর্বত এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হয়। ভারতে ভাণ্ডারা, নাগপুর, বালাঘাট, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও মহীশূরে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম, ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং ঘানার স্থান তৃতীয়। অন্যান্য দেশের মধ্যে দক্ষিণ


পৃথিবীর কয়েকটি খনিজ সম্পদ
লৌহ-খাদ (Ferro-alloy)
ম্যাঙ্গানীজ - - নিকেল - -
ক্রোমিয়াম - -
অলৌহ ধাতু (Non-ferrous Metals)
সীসা - - দস্তা - -
অধাতব খনিজ (Non-metallic Minerals)
অভ্র - -
পরমাণু-ইন্ধন (Nuclear fuels for Atomic Energy)
থোরিয়াম - - ইউরেনিয়াম - -
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
সোভিয়েট রাশিয়া
ভারত মহাসাগর
ব্রেজিল
মরোক্কো
নসুটা (ঘানা)
কাটাঙ্গা
রোডেশিয়া
দঃ আফ্রিকা
লেনিনোগোরস্ক
গয়া
জাপান
ফিলিপাইন
ব্রোকেন হিল
ভারত
বালাঘাট
ভাণ্ডারা
উড়িষ্যা
নেলোর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কেরল
P DAS

আফ্রিকা, ব্রেজিল, জার্মানী, চীন, জাপান, মিশর ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মণ্টানা ও ভার্জিনিয়াতেও ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। রাশিয়া, ভারত, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউবা প্রভৃতি দেশ ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি করে। প্রধানতঃ আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম ম্যাঙ্গানীজ আমদানি করিয়া থাকে।

(b) **ক্রোমিয়াম** – ( Chromium )—ইহা একপ্রকার অত্যুজ্জ্বল খনিজ পদার্থ। বহুদিন ব্যবহার করিলে এবং জল বাতাসে থাকিলেও ইহাতে মরিচা ধরে না এবং ইহার ঔজ্জ্বল্য বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। ইহা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; এইজন্য বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত এবং কলাইয়ের কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। "ষ্টেনলেস্ ষ্টীল" প্রস্তুতে ক্রোমিয়াম ও নিকেলই লৌহের সহিত ব্যবহৃত হয়। ক্রোমিয়ম উৎপাদনে **রাশিয়ার** স্থান সর্বোচ্চ। **তুরস্ক** দ্বিতীয় এবং **দক্ষিণ আফ্রিকা** ও ফিলিপাইন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থস্থান অধিকার করে। পাকিস্তান, ভারত ( মহীশূর, সিংভূম ) নিউক্যালিডোনিয়া, যুগোশ্লোভিয়া এবং রোডেশিয়াতেও ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়।

(c) **নিকেল** ( Nickel )—নিকেল সাধারণতঃ ইস্পাত শিল্পে, মুদ্রা নির্মাণে, মোটর শিল্পে ও কৃষিকার্যের উপযোগী অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে ইহা একটি অপরিহার্য বস্তু।

নিকেল উৎপাদনে **কানাডার** স্থান সর্বোচ্চ। পৃথিবীতে সমগ্র উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ একমাত্র কানাডাতে উৎপন্ন হয়। কানাডাতে সাডবেরি খনি হইতে নিকেল নিষ্কাশন করা ও গালানো হয়। নরওয়েতে নিকেল শোধন করা হয়। রাশিয়া, নিউক্যালিডোনিয়া, নরওয়ে ও ব্রেজিলেও কিছু পরিমাণ নিকেল উৎপন্ন হয়।

(d) **টাংষ্টেন** ( Tungsten )—এই লৌহখাদ ধাতব অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। টাংষ্টেন 'এ লয় ষ্টিল' এত কঠিন যে উহার দ্বারা যে কোন ধাতু কাটিয়া ফেলা যায়। সুতরাং মেসিনটুল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র এবং সামরিক অস্ত্রাদি উৎপাদনে ইহা একান্ত প্রয়োজন। গর্ত খুঁড়িবার যন্ত্রও এই ধাতুমিশ্রিত ইস্পাতের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। ইহার প্রধান উৎপাদক **চীন** দেশ। তাহা ছাড়া রাশিয়া, পর্তুগাল, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, বলিভিয়া, কোরিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি দেশেও ইহা পাওয়া যায়।

**অলৌহ ধাতু ( Non-ferrous metals )**

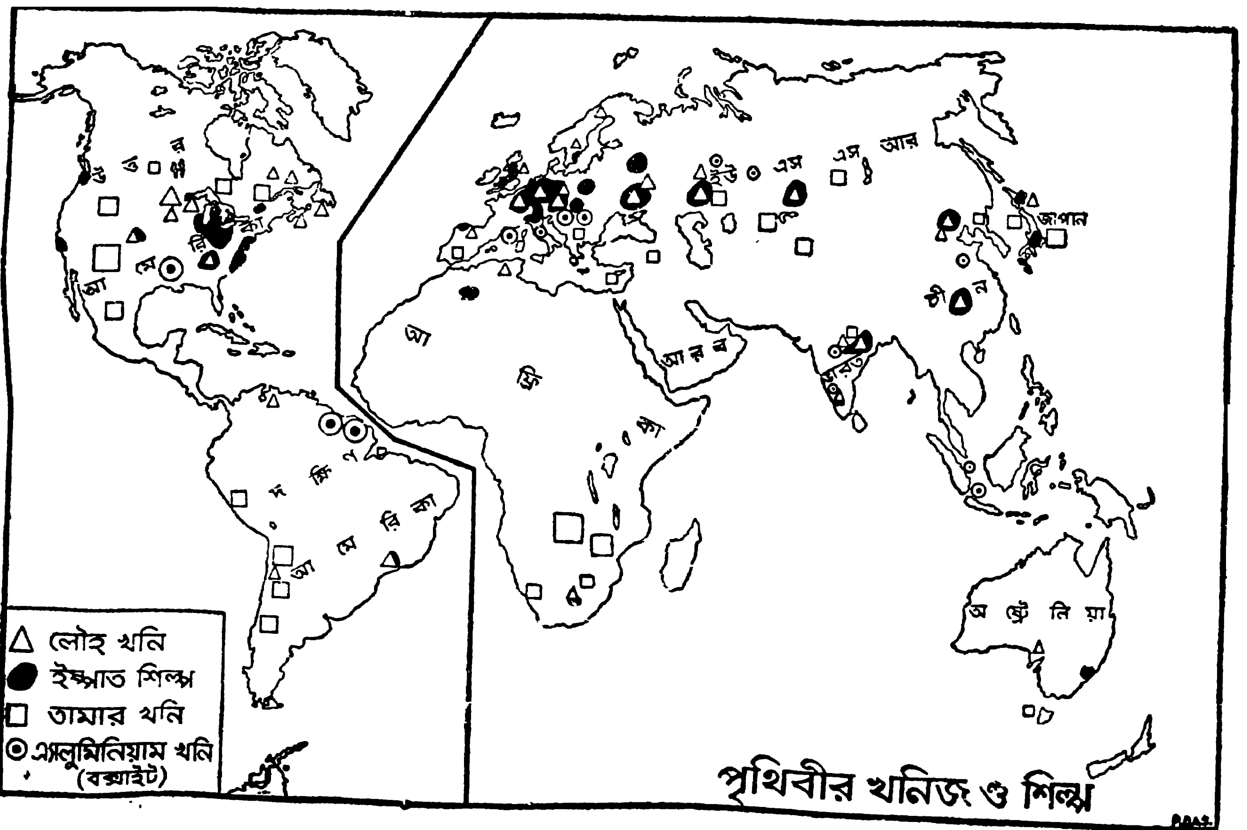
**Q. 85. State the uses of the more important non-ferrous metals and name the countries where each of them is found.**

**[ অপেক্ষাকৃত প্রধান প্রধান অলৌহ ধাতুগুলির ব্যবহার কি বিবৃত কর এবং যে সকল দেশে ঐগুলির প্রত্যেকটি পাওয়া যায় তাহাদের নামোল্লেখ কর। ]** **( C. U. 1960 )**

যে সমস্ত ধাতুর ভিতরে লৌহের অংশ নাই তাহাদিগকে অলৌহ-ধাতু ( Non-ferrous metals ) বলে। এ্যালুমিনিয়াম ( Aluminium ), তাম্র ( Copper ), টিন ( Tin ), দস্তা (Zinc), সীসা (Lead) প্রভৃতি এই জাতীয় ধাতু।

(a) **এ্যালুমিনিয়াম** ( Aluminium )—বক্সাইট হইতে ক্রাইয়োলাইট নামক খনিজ পদার্থের সাহায্যে এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। বক্সাইট গলাইতে ক্রাইয়োলাইট ( Cryolite ) ধাতু লাগে। ইহা গলাইতে ভীষণ উত্তাপের দরকার হয় বলিয়া বিদ্যুৎ-শক্তি যেখানে সস্তায় পাওয়া যায় সেখানে এই শিল্প সাধারণতঃ উন্নতি লাভ করে। এ্যালুমিনিয়াম হইতে বাসন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতব জিনিসপত্র প্রস্তুত হয়। এ্যালুমিনিয়াম নির্মিত জিনিসপত্রগুলি খুব হাল্কা অথচ অল্প ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এরোপ্লেনের পাখা এই ধাতু দিয়া নির্মিত হয়। ইহা ছাড়া, বৈদ্যুতিক তার নির্মাণ করিতে তাম্রের পরিবর্তে ইহা ব্যবহৃত হয়। রেলগাড়ী ও মোটরগাড়ী নির্মাণে ও অন্যান্য বহু কাজেও এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর প্রধান উৎপাদক কিন্তু বক্সাইট উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান **জ্যামেকা**, গিয়ানা ও ফ্রান্সের পরে। প্রধানতঃ জ্যামেকা, **ব্রিটিশ** ও **ডাচগিয়ানার** বক্সাইট (Bauxite) খনি হইতে বক্সাইট আমদানি করিয়া যুক্তরাষ্ট্র তাহার এ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। **জ্যামেকা দ্বীপ** বক্সাইট উৎপাদনে বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া, আরাকানসাসের নাম উল্লেখযোগ্য। **ফ্রান্সের** অন্তর্গত বক্স ( Baux ), ভার ( Var ), হেরল্ট ( Heralt ) এবং আরিজে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায় এবং এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। রাশিয়াতেও বক্সাইট আছে। রাশিয়ার বক্সাইট খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও রাশিয়ার এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন খুব বেশি। **হাঙ্গেরী** এবং **যুগোশ্লোভিয়াতে** প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়াও বক্সাইটের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতে দাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ ভাগে ও ছোটনাগপুরে প্রচুর বক্সাইট এবং অধিক এ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত ল্যাটারাইট ( laterite ) পাওয়া যায়। এই কারণে ভারতের নানাস্থানে এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা ও ইটালীতেও এ্যালুমিনিয়াম শিল্প খুব সমৃদ্ধ। ইটালীতে প্রচুর আকরিক এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় ( ইহা বক্সাইট নহে )।

(b) **তাম্র** (Copper)—আদিম যুগে মানুষ প্রথম তাম্রের ব্যবহার শিখিয়াছিল। কারণ তাম্র প্রাচীনকালে, এমন কি মধ্যযুগেও প্রায় খাঁটি ধাতব অবস্থায় খনি হইতে পাওয়া যাইত কিন্তু সে তাম্র ফুরাইয়া গিয়াছে। তাম্র আকরিক দুই প্রকার : (১) প্রায় খাঁটি তাম্র ( native copper ) ও (২) আকরিক তাম্র ( copper ore )। আকরিক তাম্র গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যসহ মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশ


ইউ এস এস আর
জাপান
চীন
আরব
ভারত
আফ্রিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
অষ্ট্রেলিয়া
লৌহ খনি
ইস্পাত শিল্প
তামার খনি
এ্যালুমিনিয়াম খনি (বক্সাইট)
পৃথিবীর খনিজ ও শিল্প

ক্ষেত্রেই ইহা শিলার মধ্যে সামান্য অংশে ( ১% হইতে ১৫% পর্যন্ত ) মিশ্রিত থাকে। এই জন্য তাম্র যেখানে খনন করা হয় সেখানেই উহা পরিশোধন করা হয়। ইহাতে গাড়ী ভাড়া বাঁচিয়া যায়। বর্তমান জগতে তাম্র অতি প্রয়োজনীয় ; কারণ তাম্র ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব। বৈদ্যুতিক শিল্পে বিশুদ্ধ তাম্রের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। যন্ত্রাদি, মুদ্রা এবং বাসন প্রস্তুতেও তাম্র ব্যবহৃত হয়। তাম্র ও দস্তা মিশাইয়া পিতল এবং তাম্র ও টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ প্রস্তুত করা হয়। নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে এগুলি প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীর ভিতর তাম্র উৎপাদনে **যুক্তরাষ্ট্রের** স্থান সর্বপ্রথম। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এক মিশিগান ব্যতীত অন্যত্র খনিজ শিলার মধ্যে খুব কম পরিমাণে তাম্র আছে। আমেরিকার তাম্রখনিগুলি **মণ্টানা, আরিজোনা, কলোরাডো** ও সুপিরিয়র হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তাম্র উৎপাদনে আমেরিকার পরেই **জাম্বিয়া ও চিলির স্থান**। চিলিতে উৎপন্ন তাম্র আকরিকের মধ্যে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ ধাতু থাকে। কানাডাতেও প্রচুর তাম্র উৎপন্ন হয়। ভারতের পাইরাইট (Pyrite) শিলায় মাত্র ৩ ভাগ তাম্র পাওয়া যায়। কঙ্গো এবং জাম্বিয়ার তাম্রশিলাই সর্বোৎকৃষ্ট। আফ্রিকার ভূগর্ভে প্রচুর তাম্র নিহিত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউনিয়ন, রোডেশিয়া ও **কঙ্গোতেই** এখানকার তাম্রখনিগুলি কেন্দ্রীভূত। কঙ্গোর **কাটাঙ্গা** খনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বলখাস হ্রদের তটে খুব বড় তাম্রখনি আছে। এশিয়ার মধ্যে জাপানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ইউরোপের মধ্যে স্পেন, জার্মানী ও নরওয়েতে সামান্য পরিমাণে তাম্র উৎপন্ন হয়। ভারতে বিহারের ঘাটশিলায় অল্প তামা পাওয়া যায়।

(c) **টিন** ( Tin )—টিন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহা আসলে টিনের আবরণে ঢাকা লৌহের জিনিসপত্র। আসল টিন রূপার মত এক প্রকার উজ্জ্বল খনিজ পদার্থ। ইহা মরিচা হইতে লৌহকে বাঁচাইবার জন্য লৌহের গায়ে লাগানো হয়। বাক্স, কৌটা প্রভৃতি নির্মাণ ও অন্যান্য অনেক কাজে টিন ব্যবহৃত হয়।

প্রধান উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে **পশ্চিম-মালয়েশিয়া, বলিভিয়া, ইন্দোনেশিয়ার** বাঁকা ও বিলটন দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া, নাইজিরিয়া এবং কঙ্গোর নাম উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায়। তাহার পরেই দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ার স্থান। অন্যান্য দেশের মধ্যে নাইজিরিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার উৎপাদন মন্দ নয়। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি টিন ব্যবহার করিয়া থাকে। কেননা এই স্থানের পেট্রোলিয়াম ও মাংস চালানি শিল্পে টিনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, কিন্তু

আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রে অধিক পরিমাণে টিন উৎপন্ন না হওয়ায় এই শিল্পটিকে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতেও টিনের খনি নাই।

(d) দস্তা ( Zinc )—তাম্র ও রৌপ্যের সহিত খাদ হিসাবে দস্তা ব্যবহৃত হয়। দস্তা ও তাম্র মিশাইয়া পিতল তৈয়ারি হয়। সাদা রং, ব্যাটারী এবং বিভিন্ন প্রকার ঔষধে দস্তা ও দস্তার উপজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। লৌহাদির মরিচা নিবারণের জন্যও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দস্তা উৎপাদনে আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চ। রকি পর্বতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যসমূহে ইহা পাওয়া যায়। আমেরিকার পরেই কানাডা এবং তাহার পর অষ্ট্রেলিয়ার স্থান। ইহা ছাড়া মেক্সিকো, জাপান, পোল্যাণ্ড, কঙ্গো, ইটালি, সার্ডিনিয়া, ব্রহ্মদেশ, উত্তর ককেসাস এবং জাম্বিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেও দস্তা পাওয়া যায়।

(e) সীসা (Lead)—সাধারণতঃ ইহা দস্তা বা রৌপ্যের সহিত যুক্ত অবস্থায় দেখা যায় ( galena ore )। বিভিন্ন প্রকার শিল্পে ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। রং, টাইপ যন্ত্র ( typewriter ), মোটরশিল্প, ছাপাখানার কাজ, নানাবিধ কলকব্জা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে সীসা ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর ভিতর সীসা উৎপাদনে আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মিসৌরী, ওক্‌লাহামা, ইডাহো, কলোরাডো, মণ্টানা, নেভাডা ও উট্টা প্রধান। নিউ-মেক্সিকোতেও প্রচুর পরিমাণে সীসা উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়ার নিউসাউথওয়েলসের ব্রোক্‌ন্‌হিল অঞ্চলে সীসা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া মেক্সিকো, কানাডা, ব্রহ্মদেশ, জার্মানী, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও স্পেনে সীসা উৎপন্ন হয়। ভারতে সীসা ও দস্তা অতি সামান্যই আছে ( রাজস্থানের জাওয়ার খনি )।

*(f) স্বর্ণ (Gold)—স্বর্ণ একটি বহুমূল্য এবং প্রয়োজনীয় ধাতু ; ইহা অলঙ্কার, মুদ্রা, ঔষধ প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, আলাস্কা প্রভৃতি স্থানে খাঁটি স্বর্ণ পাওয়া যাইত। বর্তমানে স্বর্ণ-শিলা হইতে অতি সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়। কোন কোন নদীর বালিতেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। স্বর্ণ উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত পূর্বসাইবেরিয়া ও ইউরালের স্থান দ্বিতীয়। কানাডা, ঘানা, অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, আলাস্কা, জাপান, ভারত প্রভৃতি স্থানেও স্বর্ণ পাওয়া যায়।

* (g) রৌপ্য (Silver)—রৌপ্য মুদ্রা ও চিত্রশিল্পে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হয়। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার এণ্ডিজ পর্বত অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ রৌপ্য পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়াতেও রৌপ্য পাওয়া যায়।

*(h) **প্লাটিনাম** (Platinum)—বর্তমান যুগের শিল্পে ও বাণিজ্যে প্লাটিনামের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে, ছায়াচিত্র শিল্পে, গহনা নির্মাণে, রঞ্জনরশ্মি ( X-Ray ) উৎপাদনে, দন্ত চিকিৎসায় ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প-ব্যবসায়ে প্লাটিনাম ব্যবহৃত হয়। প্লাটিনাম উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে কানাডার স্থান সর্বপ্রথম। সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কানাডায় উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, কলাম্বিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউনিয়নের কোন কোন অংশে, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়াতে প্লাটিনাম উৎপন্ন হয়।

(i) **এন্টিমনি** ( Antimony )—ইহা সাধারণতঃ ঔষধ, ছাপাখানার অক্ষর এবং ব্যাটারী তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা উৎপাদনে চীনের স্থান সর্বপ্রথম। চীনদেশের হুনান এবং য়ুনান প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া মেক্সিকো, বলিভিয়া, ফ্রান্স এবং আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রেও এন্টিমনি উৎপন্ন হয়।

(j) **পারদ** ( Mercury )—খনি হইতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নিষ্কাশন করিতেই প্রধানতঃ পারদ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটার জাতীয় তাপ ও চাপমান যন্ত্র, ঔষধপত্র এবং আয়না প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। পারদ উৎপাদনে ইটালীর স্থান সর্বপ্রথম; ইটালির পরেই স্পেনের স্থান। তুস্কানি, ইদ্রিয়াও ট্রিয়েষ্ট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পারদ উৎপন্ন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্ণিয়া, ওরিগন, ওয়াশিংটন, নেভেডা, টেক্সাস ও আরকানসাসে প্রচুর পারদ উৎপন্ন হয়। রাশিয়াতেও ডোনেৎস মোহনায় নিকিটোভাতে পারদের খনি আছে। ইহা ছাড়া মেক্সিকোতে কয়েকটি ছোট ছোট পারদখনি আছে।

**অধাতব খনিজ ( Non-metallic minerals )—**

**Q. 86. Name some of the important non-metallic minerals of the world and mention their uses and world distribution**

**[ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান অধাতব খনিজের নাম কর এবং তাহাদের ব্যবহার ও প্রাপ্তি স্থানগুলির পরিচয় দাও। ]**

যে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য খনি হইতে পাওয়া যায় অথচ ধাতব পদার্থ নহে, তাহাদের অধাতব খনিজ বলে।

(a) **অভ্র** (Mica)—ইহা প্রধানতঃ বেতার শব্দ-প্রেরক যন্ত্রে, বিমান-শিল্প, মোটর-শিল্প এবং নানা প্রকার বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভাল অভ্র ভারতেই প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, এবং আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রেও প্রচুর অভ্র উৎপন্ন হয়। সমগ্র উৎপন্ন "শিট ( sheet ) অভ্রে"র শতকরা ৭৫ ভাগেরও

---

* স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্লাটিনামকে মহার্ঘ ধাতু ( Precious metal ) বলা হয়।

বেশি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যায়। বিহারের অন্তর্গত হাজারীবাগ, গয়া, মুঙ্গের, অন্ধ্রের কৃষ্ণা ও নেলোর এবং রাজস্থানের কোন কোন অংশের অভ্র উৎপন্ন হয়। ভারতের অধিকাংশ অভ্রই বিহারে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপপ্রদেশ ট্রান্সভাল ও নাটাল অঞ্চলে অভ্র পাওয়া যায়। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে ক্যারোলিনা এবং নিউ হ্যাম্পশায়ারে অভ্র উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট অভ্র উৎপন্ন হয়। রপ্তানিতে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ। ব্রেজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও কিছু কিছু অভ্র বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। সাদা, কালো ও হলুদ বা বাদামী রঙের তিন জাতীয় অভ্র পাওয়া যায়।

(b) গ্রাফাইট (Graphite)—ইহা অঙ্গার জাতীয় ( কয়লার পরের অবস্থা ) একপ্রকার খনিজ দ্রব্য। ইহা প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। গ্রাফাইট হইতে পেন্সিলের সীস প্রস্তুত হয়। গ্রাফাইট উৎপাদনে বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার স্থান সর্বোচ্চ। জার্মানীর অন্তর্গত ব্যাভেরিয়াতে গ্রাফাইট পাওয়া যায়। স্থানীয় বনের নরম কাঠ এবং গ্রাফাইটের সুযোগ লইয়া ব্যাভেরিয়া পেন্সিল শিল্পে পৃথিবীর ভিতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রাফাইট উৎপাদনে জার্মানীর পরেই কোরিয়ার স্থান। ইহার পরেই অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মেক্সিকো, মাদাগাস্কার এবং সিংহলের নাম উল্লেখযোগ্য। সিংহলে উৎপন্ন গ্রাফাইট খুব উচ্চশ্রেণীর।

(c) এ্যাস্‌বেসটস (Asbestos)—ইহা তন্তুজাতীয় খনিজ পদার্থ। অগ্নি এবং অন্যান্য তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আবরক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিচালক নয় এবং জলে বহুদিন ব্যবহারেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না বলিয়া ইহা বর্তমানে বাড়ীঘর নির্মাণেও ব্যবহৃত হইতেছে। প্রধানতঃ কানাডা ( পৃথিবীর অধিকাংশ ), আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়াতে এ্যাস্‌বেসটস উৎপন্ন হয়। রাশিয়াতেও ইহা সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তবে উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে কিছু পরিমাণে এ্যাস্‌বেসটস উৎপন্ন হয়। ইহার মূল্য আঁশের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

(d) গন্ধক ( Sulphur )—গন্ধক গোলাবারুদ, সার, ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য একান্ত প্রয়োজন। গন্ধক হইতে সালফিউরিক এ্যাসিড প্রস্তুত হয়। উহা বিভিন্ন শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর ৯০% ভাগ স্বাভাবিক গন্ধক যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকো উপসাগর তটে পাওয়া যায়। গরম জল পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভে প্রবেশ করাইয়া অপর পথ দিয়া গন্ধক বাহির করা হয়। খুব কম খরচে এই গন্ধক উৎপন্ন হয়। সিসিলি ও জাপানে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জার্মানী

প্রভৃতি দেশে তাম্র ও কয়লা শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবে গন্ধক পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রপ্তানিকারক দেশ। ভারত গন্ধক আমদানি করে।

(e) **লবণ** ( Salt )—মানব ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণের জন্য লবণ অপরিহার্য। তাহা ছাড়া নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ( যথা—সোডা এ্যাস প্রভৃতি) প্রস্তুত করার জন্যও লবণ প্রয়োজন। মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যও প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রয়োজন হয়। লবণ পৃথিবীর সর্বত্রই কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ দুইভাবে লবণ পাওয়া যায়, যথা—সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করিয়া ( Sea salt ) এবং খনি হইতে ( Rock salt )। অধিকাংশ লবণ খনি হইতে উৎপন্ন হয়। অবশ্য ভারতের অধিকাংশ লবণ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সমুদ্রোপকূলে প্রস্তুত হয়। অবশিষ্টাংশ রাজস্থানের লবণহ্রদ হইতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ উৎপন্ন হয়। তাহার পরে রাশিয়া, চীন, ভারত, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালির স্থান। এই সকল দেশে লবণ হইতে প্রচুর সোডা অ্যাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

(f) **খনিজ সার** ( Mineral fertilisers )—খনিজ সার বলিতে নাইট্রেট, পটাস, ফসফেট, গন্ধক প্রভৃতি বুঝায়। নাইট্রেট প্রধানতঃ চিলির আটকামা মরুভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে সকল অগ্রসর দেশেই কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হওয়ায় চিলির নাইট্রেট রপ্তানি-বাণিজ্যের পূর্ব সমৃদ্ধি আর নাই। ফসফেট প্রধানতঃ ফ্লোরিডার খনিগুলি হইতে পাওয়া যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাপেক্ষা বেশি উৎপন্ন হয়। তাহার পরেই উত্তর আফ্রিকার মরোক্কো ও টিউনিসিয়া এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি উল্লেখযোগ্য। পটাস সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় জার্মানী এবং ফ্রান্সে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউমেক্সিকোতেও প্রচুর পটাস পাওয়া যায়। রাশিয়াতেও নানাপ্রকার খনিজ সার পাওয়া যায়। ভারতে কয়েকটি কারখানায় স্থানীয় কাঁচামাল হইতে নাইট্রোজেন ও ফসফেট প্রস্তুত করা হয়।

(g) **গৃহ নির্মাণের প্রস্তর** ( Building stones )—মার্বেল, বেলেপাথর, গ্রানাইট, ব্যাসল্ট ও ল্যাটারাইট শিলা এই জন্য ব্যবহার করা হয়। উহাদের রঙ দৃঢ়তা ও সহজ লভ্যতা অনুসারে উহাদের ব্যবহার। বড় বড় প্রাসাদ ও রাজপথ শিলাখণ্ড এবং শিলামিশ্রিত কনক্রিট দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। কনক্রিট নির্মিত বাঁধ ও পথ নির্মাণে ব্যাসল্ট বা লাভাশিলা উৎকৃষ্ট। রঙ ও ঔজ্জ্বল্যে মার্বেল ও বেলেপাথর উৎকৃষ্ট। ইটালির মার্বেল ও ভারতের মার্বেল ও বেলেপাথর বিশ্ববিখ্যাত। প্রায় সকল দেশেই ব্যাসল্ট পাওয়া যায়। ভারতের ছোটনাগপুরে ল্যাটারাইট পাথর গৃহ, সেতু ও পথ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। চুনা পাথর হইতে সিমেন্ট প্রস্তুত হয়।

---

# *পৃথিবীর শ্রমশিল্প

## MANUFACTURING INDUSTRIES OF THE WORLD

## ভৌগোলিক অবস্থান, কাঁচামালের সংস্থান, উৎপাদন ও বর্তমান অবস্থা

**Q. 87. Analyse the causes of localisation of industries.**
**[ শিল্পের একদেশতার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। ]**

মানুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে বনজ, কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। মৌলিক দ্রব্যের এই রূপান্তর ঘটাইতে মূলধন, শ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন। শিল্প দুই প্রকার; যথা—(১) কুটীর শিল্প ও (২) বৃহৎ যন্ত্রশিল্প।

শিল্প চালাইতে হইলে শক্তির ( power ) প্রয়োজন হয়। মানুষের পেশীর শক্তি এবং কাঠ কয়লা, ইহাই ছিল প্রাচীন কালে ছোট ছোট কারখানার অবলম্বন। ফলে, অনেক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে সামান্য মাত্র শিল্প-জাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত। সুতরাং, সকলে তাহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমশঃ কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির আবিষ্কার হইল। বড় বড় কারখানায় বাষ্পীয় শক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রচুর ব্যবহার্য দ্রব্য, যথা—বস্ত্রাদি, লৌহ ও অন্যান্য ধাতুজাত দ্রব্যাদি এবং নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য অতি সস্তায় প্রস্তুত হইতে লাগিল। ফলে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল।

বর্তমান যুগ শিল্প সভ্যতার যুগ। বর্তমান যুগে বড় বড় কলকারখানা এবং ছোট ছোট কুটীর শিল্প উভয়েরই বিশেষ উপযোগিতা আছে। যে সকল দেশে ভারী ও মূল শিল্পগুলি ( heavy industries and basic industries ) বেশি উন্নত সেই সকল দেশ সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

**শিল্পের একদেশতার ( localisation ) কারণ**

পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এক বা একাধিক ধরণের শিল্পের সমাবেশ দেখা যায়। ইহাকে শিল্পের একদেশতা ( localisation ) বলে। বিভিন্ন প্রকার শিল্প কোন স্থানে বহুল পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কতকগুলি কারণ থাকে। এই কারণগুলি হইল—

**কাঁচামালের সহজলভ্যতা**—কতকগুলি কৃষিজ, বনজ ও খনিজ দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং পাট, তুলা, লৌহশিলা, কাঠ প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদন-জাত দ্রব্যকে শিল্পের কাঁচামাল বলা হয়। এই কাঁচামাল আবার তিন প্রকার হয়; যথা—(১) খাঁটি কাঁচামাল

* এই অধ্যায়ের সমস্ত আধুনিক পরিসংখ্যান বইয়ের শেষে আছে।

(pure material) (২) আবর্জনাসহ ভারী কাঁচামাল (weight losing material) এবং (৩) পচনশীল কাঁচামাল (perishable material)। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কাঁচামাল বহু দূরে বহন করিয়া লইয়া যাইয়াও শিল্প গঠন করা লাভজনক হয়; যথা—পাকিস্তানের পাটের সাহার্য্যে ব্রিটেনের ডাণ্ডিতে পাটশিল্প গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঁচামাল অধিক দূরে বহন করা ব্যয়সাধ্য। লৌহশিলা গালাইলে অর্ধেকের বেশি আবর্জনা ফেলিয়া দিতে হয়। সুতরাং, খনির যত নিকটে কারখানা স্থাপিত হয় ততই লাভজনক। অবশ্য আধুনিক পরিবহণের সাহায্যে লৌহশিলাও বহুদূরে বহন করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব; তবু বেশিরভাগ লৌহ কারখানা লৌহখনি বা কয়লা খনির নিকটেই অবস্থিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর কাঁচামাল মোটেই বহন করিয়া দূরে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। ইক্ষু ক্ষেত্রের নিকটেই চিনির কল থাকা দরকার। নচেৎ ইক্ষু শুকাইয়া অনেক চিনি অপচয় হয়। জমাট ও গুঁড়া দুধ প্রস্তুত শিল্প গোপালন কেন্দ্রের খুব নিকটেই গড়িয়া উঠে। অনেক শিল্পেই একাধিক কাঁচামাল প্রয়োজন। সুতরাং, সর্বাপেক্ষা ভারী কাঁচামালের নিকটেই সাধারণতঃ শিল্প গড়িয়া উঠে।

(২) **শক্তির সরবরাহ**—কারখানা চালাইতে শক্তির প্রয়োজন। কুটীর শিল্পে প্রধানতঃ মানুষের দৈহিক শক্তির সাহায্যেই বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের বড় বড় কারখানা চালাইবার জন্য কয়লা, খনিজতৈল, গ্যাস, জল-বৈদ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে। সস্তায় শক্তি সরবরাহের একান্ত প্রয়োজন। যে স্থানে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন শক্তির উৎস রহিয়াছে সেখানেই সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। কয়লা ও খনিজ তৈল বহুদূরে বহন করিয়া লইয়া যাইয়া শিল্পগঠন করা যায় কিন্তু কয়লা বহন করিতে খরচ অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় কয়লাখনি অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে শিল্প গঠিত হয়। কোন কোন শিল্পের জন্য ইন্ধন দ্রব্য অধিক লাগে। ঐ সকল শিল্প ইন্ধন দ্রব্যের সান্নিধ্যে গড়িয়া তোলা হয়।

(৩) **জলবায়ু**—জলবায়ু কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের একদেশতায় সাহায্য করে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প ঐ অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ুর উপর কতক পরিমাণে নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, জলবায়ু কাঁচামালের সরবরাহ, শ্রমিকের কর্মক্ষমতা এবং যানবাহন ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জলবায়ু শিল্পের একদেশতায় সাহায্য করে। তবে মানুষ আপন উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ক্রমশঃ জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাবকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইতেছে। আর্দ্র জলবায়ু আজকাল কারখানার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যায়। তবু এখনও স্বাভাবিক সুবিধাজনক স্থানগুলিতেই সাধারণতঃ অধিক সংখ্যায় শিল্প গড়িয়া উঠে।

(৪) **শ্রমিকের সরবরাহ**—কারখানা চালাইবার জন্য শ্রমিকের একান্ত প্রয়োজন। ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল দেশে অধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। কোন কোন শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে সুদক্ষ অথচ সস্তা শ্রমিক প্রয়োজন হয়। কাশ্মীরী শাল অথবা মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প এই প্রকার শিল্প। যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে সকল দেশে শ্রমিকের মজুরী বেশি সে সকল দেশে এই ধরণের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। অপর পক্ষে বর্তমান যুগে ক্রমশঃ অত্যন্ত দুরূহ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির প্রবর্তন হইতেছে। এই সকল কারখানা চালাইতে সুশিক্ষিত ও কর্মঠ শ্রমিক অল্প পরিমাণে প্রয়োজন। অগ্রসর দেশগুলিতে এরূপ সুদক্ষ যন্ত্রবিদ্ অধিক পাওয়া যায়। শ্রমিক এক দেশ হইতে অপর দেশে লইয়া যাওয়া যায়। ভারতের বড় বড় নূতন কারখানাগুলিতে রুশ, জার্মান, ব্রিটিশ, ফরাসী ও জাপানী যন্ত্রবিদ্‌গণ কাজ করিতেছেন। কারণ ভারতীয় শ্রমিকগণ এখনও সকল প্রকার যন্ত্র চালাইবার মত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারেন নাই। আবার সস্তা মজুরীতে কাজ করে এমন নিগ্রো শ্রমিক ব্রিটেনের কারখানাগুলিতে প্রচুর দেখা যায়।

(৫) **সুবিন্যস্ত পরিবহণ-ব্যবস্থা**—শিল্পগঠনের জন্য সুবিন্যস্ত পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। যে দেশে রেলপথ, রাস্তা, নদী ও খালপথ যত উন্নত সে দেশে তত অধিক সংখ্যায় বড় বড় শিল্প গঠিত হয়, কারণ ভারী কাঁচামাল, ইন্ধন দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য এবং শ্রমিককে স্থানান্তরিত করিবার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিক শিল্পোন্নতি হইয়াছে। ঐ দুই অঞ্চলের কোন স্থানই রেলপথ হইতে দশ মাইলের অধিক দূরে নহে। তাহা ছাড়া, অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থারও অভাব নাই। জলপথে সর্বাপেক্ষা সস্তায় ভারী পণ্যাদি আদানপ্রদান করা যায়। সুতরাং, সমুদ্র-বন্দর, নদী-বন্দর ও হ্রদ-বন্দরগুলিতে সাধারণতঃ বড় বড় শিল্প গঠিত হয়। যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে পণ্য আদানপ্রদান করা হয় অর্থাৎ যেখানে রেলওয়াগন, মোটরট্রাক বা জাহাজ বড় একটা খালি যায় না সেখানে কম খরচে মাল বহন করা সম্ভব। সুতরাং, ঐ সকল বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রগুলিতেই আরও অধিক শিল্প গঠিত হয়।

(৬) **মূলধনের সরবরাহ**—শিল্পগঠনের জন্য মূলধন একান্ত প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কিনিতে, শ্রমিকের মজুরী দিতে এবং অন্যান্য খরচ চালাইতে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে মূলধনের একান্ত অভাব, কারণ এদেশের লোকের রোজগার এত কম যে ধন সঞ্চয় করার ক্ষমতা নাই। সরকারের রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়ায় সরকারও অধিক মূলধন সরবরাহ করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু বিদেশ হইতে মূলধন আমদানি করা যায়; যদিও তাহার জন্য সুদ বা লভ্যাংশ দিতে হয়। শিল্প গঠনের জন্য যত প্রকার সুবিধার প্রয়োজন তাহার

মধ্যে মূলধনই সর্বাপেক্ষা সহজে দূরদেশে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশী মূলধনকে আকৃষ্ট করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার। কোন কোন শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হইতে থাকে। এই সকল শিল্পের জন্য ব্যক্তিগত মূলধনের অভাব হয় না। কিন্তু কোন কোন শিল্পে লাভ হইতে অনেক দেরী হয়। এই সকল শিল্প স্থাপনের জন্য অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেও সরকারকে মূলধন সরবরাহ করিতে হয়। রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজ তান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকারই শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন।

(৭) **বাজারের সান্নিধ্য**—শিল্প গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন উপযুক্ত বাজার যেখানে শিল্পজাত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হয়। অধিকাংশ শিল্পই বাজারের যত নিকটে সম্ভব গড়িয়া উঠে। কেবল কয়েকপ্রকার ভারী শিল্প কাঁচা-মালের নিকটেই অধিক দেখা যায়। যে অঞ্চলে লোকবসতি অধিক সেই অঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক হয়। যদি অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চ হয়, তবে পণ্যের চাহিদাও বেশি এবং নানা রকমের হয়। সুতরাং, ঐ সকল অঞ্চলে নানা প্রকার শিল্প গঠিত হয়। আবার অনেক শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিদেশেও থাকে। কলিকাতার পাটজাত দ্রব্যের প্রধান বাজার সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে। পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস তুলা উৎপন্ন হয় না বলিলেই হয়; কিন্তু হুগলী নদীর অববাহিকায় প্রায় ৪০টি কাপড়ের কল আছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের বিরাট চাহিদা রহিয়াছে।

শিল্পের একদেশতার জন্য আরও কতকগুলি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে। কোন কোন স্থানে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কারণে শিল্পকেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। উদাহরণ স্বরূপ নিউ ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের কথা বলা যায়। প্রাচীন-কাল হইতে কোথাও কোন শিল্প থাকিলে সেখানে বংশানুক্রমে সুদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। রাজনৈতিক প্রয়োজনেও অনেক দেশে শিল্প গঠিত হয়। কোন কোন রাজনৈতিক মতবাদ শিল্পশ্রমিকের আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া আপন প্রভাব বজায় রাখিতে চায়।

**Q. 88. What geographical conditions are suitable for the development of shipbuilding industry? What are the important shipyards of the world?**

**[জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের জন্য কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজন? পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাহাজ নির্মাণকেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত?]**

**জাহাজ নির্মাণ শিল্প**—আধুনিক যুগে জাহাজ নির্মাণ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ

শিল্পরূপে স্থানলাভ করিয়াছে। বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করিতে প্রচুর ইস্পাতের চাদর, ভাল কাঠ এবং কয়লা প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, চাই সুদক্ষ যন্ত্রবিদ্ এবং সুগভীর ও শান্ত জলযুক্ত স্বাভাবিক পোতাশ্রয় অথবা প্রশস্ত নদীমুখ যেখানে জাহাজ জলে ভাসাইয়া পরীক্ষাকার্য চালানো যাইতে পারে। একটি আধুনিক মাল ও তৈল-বাহী জাহাজ ৩ লক্ষ টন মাল বহন করিতে পারে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বর্তমানে জাহাজের বেশিরভাগ অংশই দেশাভ্যন্তরের বিভিন্ন কারখানায় ঢালাই হয় এবং জাহাজ কারখানায় ঐগুলিকে একত্র জুড়িয়া জলে ভাসানো হয়। জাহাজ কয়লা এবং পেট্রোল উভয় ইন্ধনই ব্যবহার করে। পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজও ক্রমশঃ ব্যবহৃত হইতেছে।

বর্তমানে জাপান বিশ্বের জাহাজনির্মাণ শিল্পের পুরোভাগে রহিয়াছে। জাপানের প্রধান প্রধান জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্র ( Shipbuilding yards ) কিউস্যু দ্বীপের নাগাসাকিতে এবং হনস্যু দ্বীপের ইয়োকোহামা, ওয়াসা এবং কোবেতে অবস্থিত। ব্রিটেনের জাহাজ শিল্পও সুবৃহৎ ক্লাইড নদীর তীরে গ্লাসকো অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। টি ও টাইন নদীর তীরে নিউক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে এবং বার্কেনহেড, বারো প্রভৃতি স্থানেও এই শিল্প খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলফাষ্টও বিখ্যাত জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর স্থান ব্রিটেনের পরেই। হ্যামবার্গ ও লুবেক বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। ফ্রান্সের নান্তে, শেরবুর্গ প্রভৃতি স্থানে, ইটালির জেনোয়া এবং নেপলস্ বন্দরে এবং সুইডেন, যুগোশ্লোভিয়া ও হল্যাণ্ডেও বড় বড় জাহাজ কারখানা আছে। রাশিয়ার লেনিনগ্রাড এবং ইওরোপের অন্যান্য কয়েকটি স্থানেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প উল্লেখযোগ্য।

দুই বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জাহাজ নির্মাণ করিলেও, বর্তমানে ঐদেশের জাহাজশিল্প তেমন উল্লেখযোগ্য নহে; কারণ এখানে উৎপাদনের ব্যয় অধিক। আটলাণ্টিক তটে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও বাল্টিমোর এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সেটল বন্দর জাহাজ নির্মাণের জন্য উল্লেখযোগ্য। কানাডার সেণ্টলরেন্স নদীতীরে মন্ট্রিল বন্দর জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র। উপরিউক্ত স্থানগুলি ছাড়া অষ্ট্রেলিয়ার সিড্নি-নিউক্যাশল অঞ্চলে, ভারতের বিশাখাপত্তনমে এবং চীনের ডেইরেণ ও সাংহাই অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে।

**Q. 89. Name the industries that utilise jute as the chief raw material. Explain with illustrations if there is any relationship between the present day jute growing areas and the centres of jute industry.**

**[ কোন্ কোন্ শিল্পে পাট প্রধান কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়? উদাহরণ**

সহ দেখাও বর্তমানের পাট উৎপাদক অঞ্চলগুলি এবং পাটশিল্পের কেন্দ্রগুলির মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান ? ]

**পাটশিল্প**—পৃথিবীতে যত প্রকার ভেষজ তন্তু আছে তাহাদের মধ্যে পাট সবচেয়ে সস্তা। পাট নানা প্রকার শিল্পে অন্যতম কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার পৃথিবীজোড়া চাহিদা রহিয়াছে। পাটতন্তু কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া দড়ি, হেসিয়ান কাপড়, ছোট ও বড় বস্তা ( bags and sacks ), কার্পেট, ওয়াটারপ্রুফ-কাপড় ও ত্রিপল, ক্যাম্বিস ( canvas ) প্রভৃতি বহুপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য আমাদের দেশে অধিকাংশ পাটতন্তু ব্যবহারকারী কারখানায় কেবলমাত্র বস্তা, দড়ি ও হেসিয়ান প্রস্তুত হয়, কয়েকটি মাত্র আধুনিক কলে কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। কোন কোন কারখানায় পাট হইতে একপ্রকার নকল রেশমও প্রস্তুত হয়। বিড়লাপুরে পাট ও তৈলবীজ সহযোগে একপ্রকার মেঝেতে পাতবার মজবুত আবরণ প্রস্তুত হয়, ইহাকে লিনোলিয়াম বলে।

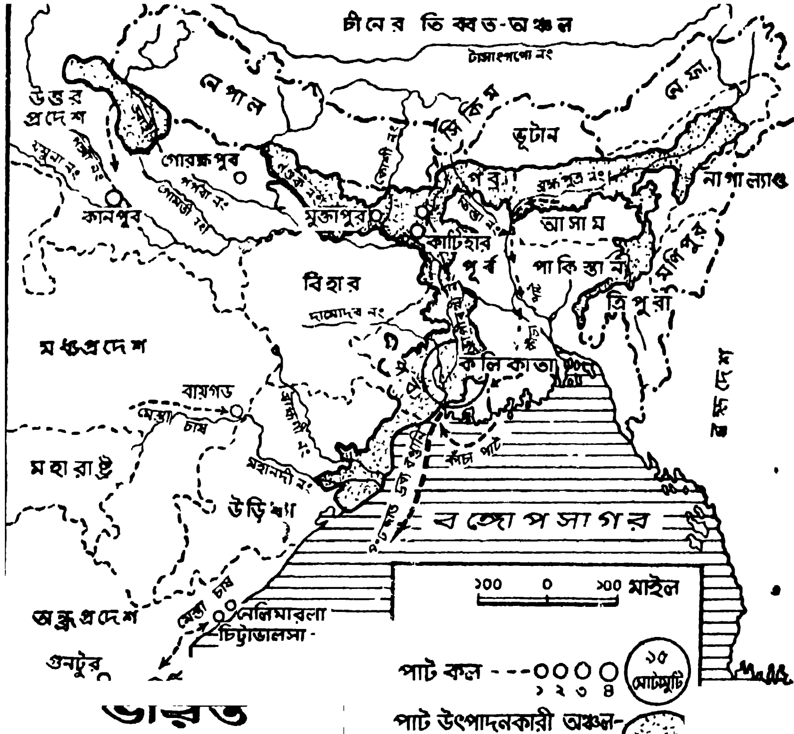
ভারতের বাহিরে ব্রিটেনের ডাণ্ডি অঞ্চলে, জার্মানীর হ্যামবার্গে এবং ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি নানা দেশে আমদানি করা পাট হইতে বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট দ্রব্য ( কার্পেট, রেশম আদি ) প্রস্তুত হয়।

পাট-চাষের পক্ষে মৌসুমী জলবায়ু বিশেষ সহায়ক। সুতরাং, পাট মৌসুমী অঞ্চলেরই ফসল। নদীর তীরে নরম পলিমাটিতে ইহার চাষ হয়। পাট চাষের জন্য সুদক্ষ অথচ সস্তা শ্রমশক্তি প্রয়োজন কারণ আজ পর্যন্ত পাটের আঁশ ছাড়াইবার কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং যে সকল দেশের মাটি ও জলবায়ু উপরিউক্তরূপ এবং প্রচুর শ্রমিক সহজলভ্য কেবল সেই সকল দেশেই পাটচাষ করা যায়। এমন দেশ পৃথিবীতে মাত্র চারটি আছে ; যথা—ভারত, পূর্ব-পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ চীন।

পাট খাঁটি কাঁচামাল ( pure raw material ) অর্থাৎ কাঁচা পাট হইতে পাটজাতদ্রব্য উৎপন্ন করার সময় উহার প্রায় কোন অংশই ফেলা যায় না। যদি বা কিছু ফেলা যায় তাহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং আধুনিক ধরণের যন্ত্রাদির সহজলভ্যতার উপরেই পাটশিল্পের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল। বর্তমানে মেস্তা বা ম্যাসতা নামক পাটজাতীয় একপ্রকার পরিবর্তদ্রব্য পাটের সঙ্গে মিশাইয়া পাটজাত দ্রব্যের দর কমানো সম্ভব হইতেছে ; কারণ পাট অপেক্ষা ম্যাসতার দর কিছু কম।

পৃথিবীতে যত পাটশিল্পের কেন্দ্র আছে তাহাদের মধ্যে ভারতের হুগলী নদীর

অববাহিকাই সর্বপ্রধান। পৃথিবীতে যত পাটকল আছে তাহার অন্ততঃ অর্ধেক হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলের পাটশিল্প প্রধানতঃ স্থানীয় পাট এবং কিছু-পরিমাণে আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার পাট ও ম্যাসতার উপর নির্ভর করে। উচ্চ-শ্রেণীর পাকিস্তানী পাট অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। যদিও সস্তা ও সুদক্ষ শ্রমশক্তি, সস্তা কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তি এবং নদী ও বন্দরের সান্নিধ্যই প্রধানতঃ এই



পাট শিল্প ও কাঁচামালের সংস্থান

শিল্পের উন্নতির জন্য দায়ী তবু পাটচাষের জমির নৈকট্যও এই শিল্পের পক্ষে এক বিশেষ সুবিধা তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কারণে পাট আমদানি বন্ধ হইলেও এখানকার মিলগুলির চিন্তার কোন কারণ নাই। পূর্ব পাকিস্তানের পাট শিল্প প্রধানতঃ ঐ দেশের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সহজলভ্যতার জন্যই গঠিত হইয়াছে। সেখানে শক্তি উৎপাদক দাহ্যবস্তুর এবং উৎকৃষ্ট যানবাহন ব্যবস্থার

অভাব আছে। তবুও পাকিস্তানে পাট শিল্পের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। ভারতের পাটশিল্পে প্রায় দুই লক্ষ এবং পাকিস্তানে প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

ভারত-পাকিস্তানের বাহিরে প্রধান পাটশিল্পগুলি পশ্চিম ইউরোপে গঠিত হইয়াছে। ইদানিং জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, এমন কি মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতেও অনেক পাটকল গঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল দেশে মোটেই পাট জন্মে না এবং মিলগুলি সম্পূর্ণতঃ পাকিস্তান হইতে ( সম্প্রতি ভারত হইতেও ) আমদানি করা পাটের উপর নির্ভরশীল। এই মিলগুলির যন্ত্রপাতি এমন আধুনিক ধরণের যে যদি পাটদ্রব্যের বাজারে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ইহারা প্রতিযোগিতায় সাময়িকভাবে পারিয়া না উঠে তবে ইহারা কিছুকাল লিনেন প্রভৃতি অন্যান্য তন্তু-বুনিয়া কাজ চালায়। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাণ্ডির পাটশিল্প ভারতের পাটশিল্প অপেক্ষাও পুরাতন এবং খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত। নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা এই মিলগুলি এমন উন্নতধরণের পাটজাত দ্রব্য পৃথিবীর বাজারে সরবরাহ করে যে, ভারত ও পাকিস্তানে উৎপন্ন সাধারণ পাটজাত থলি, দড়ি ও বস্তার সঙ্গে সেগুলির তুলনা বা প্রতিযোগিতা হয় না। সুতরাং, পাট উৎপাদন অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের পাট শিল্পগুলির যে অসুবিধা তাহা তাহারা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা পূরণ করিতে সমর্থ।

**Q. 90. How is steel made? Describe the location and the present position of the Iron and Steel industry of the world.**

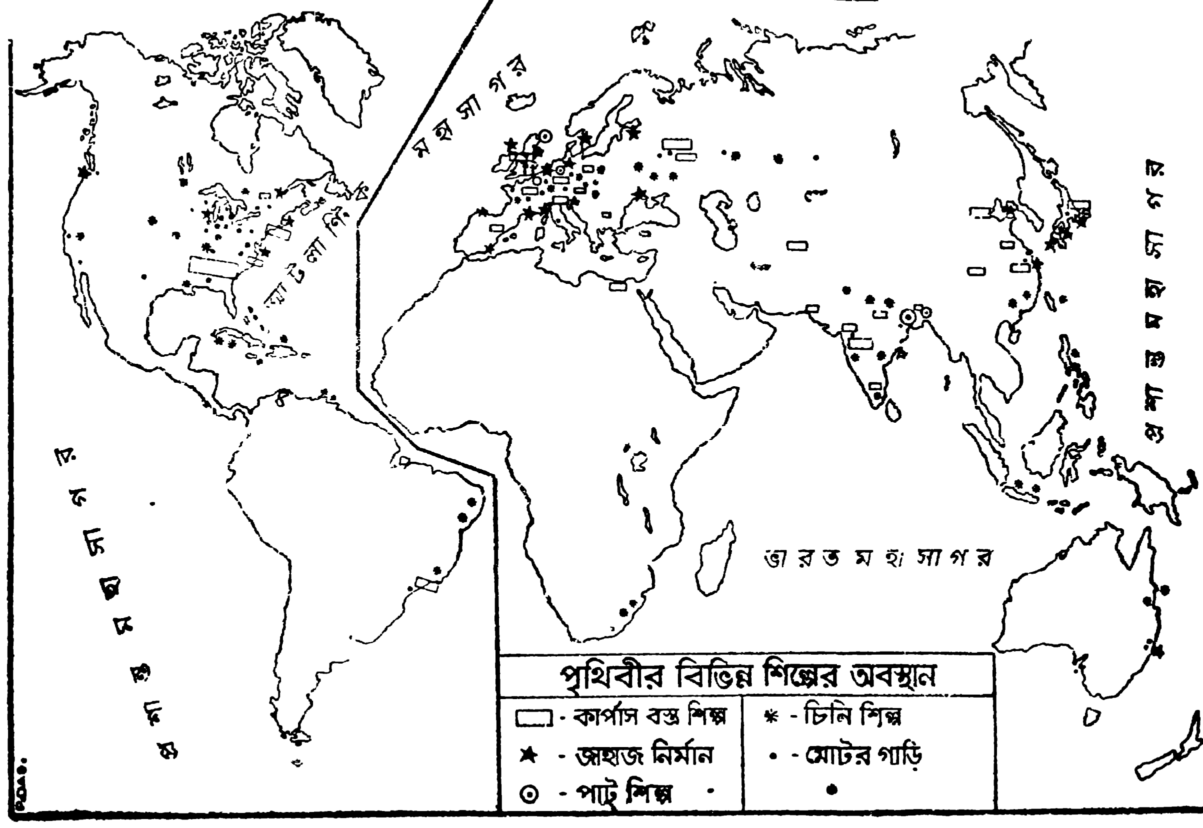
**[ ইস্পাত কিভাবে প্রস্তুত হয়? পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ]**

**পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প**—লৌহ বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দ্রব্য একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামরিক শক্তি বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন দ্বারা নিরূপণ করা যায়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পগুলির অন্যতম। পূর্বে কাঠকয়লার সাহায্যে লৌহ আকরিক গালাইয়া অতি সামান্য পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইত। ফলে, লৌহজাত দ্রব্যের দাম ছিল বেশি। কিন্তু বর্তমান যুগে কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে অতিকায় চুল্লী বা 'blast furnace" এ লৌহশিলা ও চুনাপাথর কোক কয়লার সাহায্যে গালানো হয়। এইভাবে কাঁচা লৌহ বা "Pig iron" পাওয়া যায়। এই লৌহ ভঙ্গুর হওয়ায় ইহাকে আরও পরিশোধন করা হয়। 'বেসমার চুল্লীতে' ও 'ওপন হার্থ' চুল্লীতে ঐ লৌহের সহিত কিছু অঙ্গার এবং ম্যাঙ্গানীজ

প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ মিশাইয়া সুকঠিন ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। নানাপ্রকার গুণযুক্ত খাদ মিশাইয়া নানা প্রকার ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়।

ইস্পাত শিল্প নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার স্থানে স্থাপিত হইতে দেখা যায়; যথা—(১) কয়লাখনির নিকটে, বিশেষতঃ ব্রিটেনের কয়লাখনিগুলির নিকট ইস্পাত-শিল্প বেশি দেখা যায়। কারণ কয়লাখনি অঞ্চলে লৌহশিলাও পাওয়া যায়। (২) লৌহ-খনির নিকটে, বিশেষতঃ যদি লৌহ আকরিক নিম্নশ্রেণীর হয়, তবে ঐ লৌহ আকরিক অধিক দূরে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া ব্যয়সাধ্য হয়। (৩) বড় সমুদ্র বন্দরে বা হ্রদ-বন্দরে যেখানে জলযানের সাহায্যে অল্প খরচে বহুদূর হইতে লৌহশিলা অথবা কয়লা অথবা উভয়ই আমদানি করা সম্ভব এমন স্থানেও বৃহৎ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত প্রকার অবস্থানের উদাহরণ ব্রিটেনের বার্মিংহাম, যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ, জার্মানীর এসেন এবং ভারতের কুলটি। দ্বিতীয় প্রকার অবস্থানের উদাহরণ জাপানের মোরোরাণ, ভারতের ভিলাই এবং রাশিয়ার ম্যাগ্নিটোগোরস্ক। অবশ্য শেষোক্ত দুই-স্থানের লৌহ-শিলা অতি উচ্চ শ্রেণীর। তৃতীয় প্রকার অবস্থানের উদাহরণই সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা যায়; যথা—জাপানের ইয়াওয়াটা, যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারি ও ফিলাডেলফিয়া, ব্রিটেনের নিউক্যাসল, গ্ল্যাসগো, কার্ডিফ প্রভৃতি। কোন কোন অঞ্চলে ভাল কয়লা, উচ্চশ্রেণীর লৌহশিলা, চুনাপাথর এবং দুই এক প্রকার খাদও খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। ভারতের জামসেদপুর, যুক্তরাষ্ট্রের বার্মিংহাম এবং রাশিয়ার স্টালিনো, প্রভৃতি স্থান এরূপ অসাধারণ সৌভাগ্যের অধিকারী।

পৃথিবীতে ইস্পাত উৎপাদনে প্রথম স্থান যুক্তরাষ্ট্রের। এখানে প্রতি বৎসর বারো কোটি টনেরও বেশি ইস্পাত উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত উৎপাদনের প্রধান অঞ্চলগুলি হইল—(১) মিশিগান হ্রদের দক্ষিণ তটে **শিকাগো** এবং **গ্যারি** শহরের সন্নিহিত অঞ্চল, (২) পেনসিলভানিয়া রাজ্যে ওহিও নদীর তটে পিটসবার্গ শিল্পাঞ্চল, (৩) ইরি হ্রদ তটের বন্দর **ক্লিভল্যাণ্ড** ও বাফেলো। **পিট্সবার্গ** শহরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলি সুদূর সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিম তটের মেসাবি লৌহখনি হইতে ক্লিভল্যাণ্ড বন্দর মারফত লৌহশিলা আমদানি করে। আবার পিটসবার্গ হইতে ঐ পথেই কয়লা পাঠানো হয়। সুতরাং, ক্লিভল্যাণ্ড ও পিটসবার্গের মধ্যপথে ইয়ং-স্টাউনেও ইস্পাত-শিল্প গঠিত হইয়াছে। (৪) পেনসিলভানিয়া রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে **লেবানন** এবং **বেথলেহেমও** বৃহৎ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। (৫) **ফিলাডেলফিয়া** বন্দরের নিকট বৃহৎ ইস্পাতের কারখানা আছে। এখানে প্রধানতঃ বিদেশ হইতে আমদানি করা লৌহশিলা গালানো হয়। (৬) আলাবামা রাজ্যের **বার্মিংহামও** বৃহৎ ইস্পাত-শিল্পের কেন্দ্র। নিকটেই কয়লা এবং লৌহশিলা পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে ও প্রশান্ত মহাসাগর তটেও কয়েকটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে।


পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পের অবস্থান
- কার্পাস বস্ত্র শিল্প
- চিনি শিল্প
- জাহাজ নির্মান
- মোটর গাড়ি
- পাট শিল্প
প্রশান্ত মহাসাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক
মহাসাগর
ভারত মহাসাগর

যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ইস্পাত উৎপাদনে **সোভিয়েট রাশিয়ার** স্থান। এখানকার বড় বড় লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলি প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, যথা—(১) ইউক্রেণ অঞ্চল। এখানে ডনেৎস কয়লা খনি এবং ক্রিভয়রগের লৌহ-আকর পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ক্রিভয়রগ, **স্টালিনো** প্রভৃতি শহরে বড় বড় ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) টুলা-কুস্ক-মস্কো অঞ্চল। টুলায় নিম্নশ্রেণীর কয়লা এবং কুস্কে ভাল লৌহশিলা পাওয়া যায়। এই অঞ্চল ইস্পাতজাত যন্ত্রাদির জন্য প্রসিদ্ধ। (৩) ইউরাল পর্বত অঞ্চলে **ম্যাগ্নিটোগোরস্ক** ও **সার্ডেলোভস্ক** অঞ্চল। এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট লৌহশিলা এবং উত্তর ভাগে কিছু পরিমাণ কয়লা থাকায় ইস্পাত শিল্প গঠিত হইয়াছে। তবে ভাল কয়লা কারাগাণ্ডা খনি হইতে আমদানি করিতে হয়। (৪) মধ্য সাইবেরিয়ার কুজবাস কয়লা খনি অঞ্চলে অনেক বড় বড় ইস্পাত ও যন্ত্রাদির কারখানা আছে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে অনেকগুলি বড় বড় ইস্পাত কারখানা অঞ্চল রহিয়াছে, যথা—(১) গ্রেটব্রিটেনের **বার্মিংহাম**, কার্ডিফ, সোয়ানসি, **শেফিল্ড**, নিউক্যাসল, **গ্লাসগো** প্রভৃতি ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। (২) পশ্চিম জার্মানীর সমগ্র রুর উপত্যকা। এখানকার বৃহৎ কেন্দ্রগুলির মধ্যে **এসেন** বিখ্যাত। ব্রিটেন অপেক্ষা পশ্চিম জার্মানীর ইস্পাত উৎপাদন অধিক। ইহার পরেই ফ্রান্সের স্থান। (৩) ফ্রান্সের প্রধান ইস্পাত কারখানাগুলি উত্তর ফ্রান্সের কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। ইহার কিছু উত্তরেই লাক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়ামের বৃহৎ ইস্পাত কারখানাগুলি অবস্থিত। (৪) ইউরোপের অন্যান্য যে সকল দেশ ইস্পাত-উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে সেগুলি হইল **ইটালি**, পোল্যাণ্ড, পূর্ব-জার্মানী, সুইডেন, যুগোশ্লাভিয়া, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং স্পেন।

এশিয়ার মধ্যে জাপানের ইস্পাত-উৎপাদন সর্বাধিক এবং সমগ্র বিশ্বে জাপান তৃতীয়। **ইয়াওয়াটা** এবং **মোরোরাণের** কারখানাগুলি খুব বড়। জাপান ভাল কয়লা এবং লৌহশিলা আমদানি করে। এশিয়ার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে চীনের **আনশান** ও **উহান** এবং ভারতের **ভিলাই** ও **জামসেদপুরের** নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে চীনের ইস্পাত উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দেশে ইস্পাত শিল্পের মধ্যে কেবল কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের ইস্পাতশিল্প উল্লেখযোগ্য।

**Q. 91. Where are the principal centres of cotton textile industry located in the different countries of the world ?**

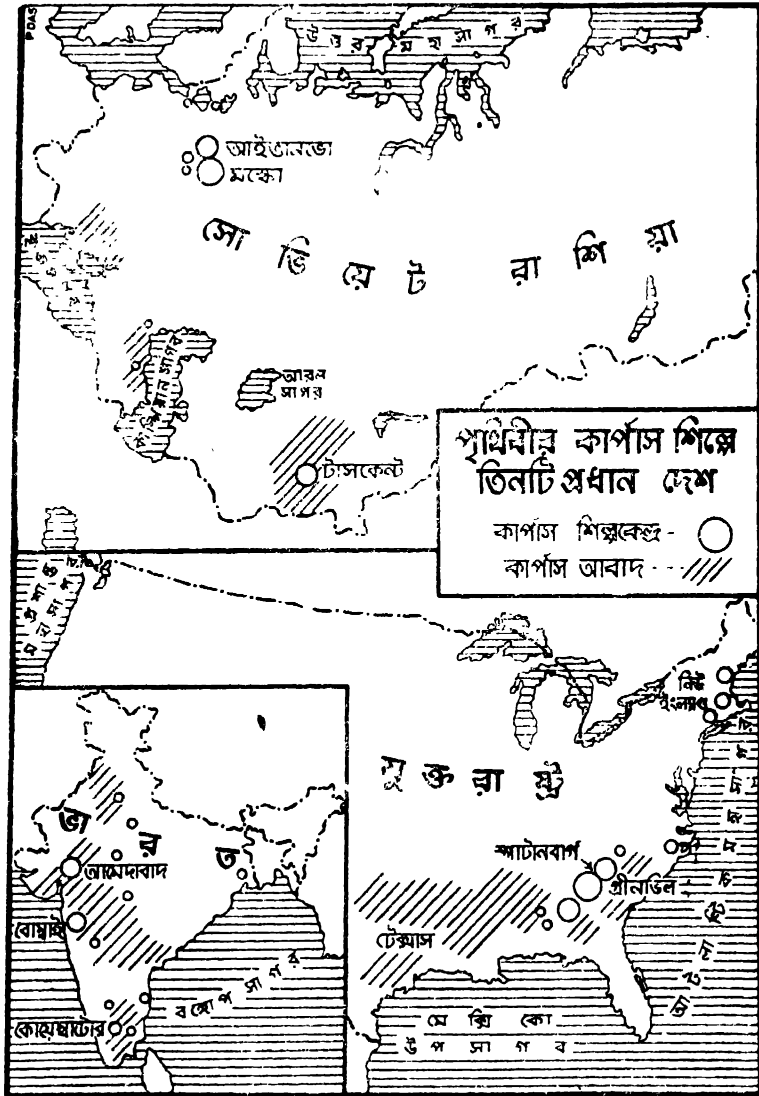
**[ পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস বস্ত্রশিল্প বিভিন্ন দেশের কোন্ কোন্ জায়গায় অবস্থিত ? ]**

**কার্পাস বস্ত্রশিল্প**—কার্পাস তুলা হইতে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত দুই প্রকারে করা হয় ; যথা—(ক) **কুটীর শিল্প** অর্থাৎ চরকায় ও মিলে প্রস্তুত সূতা হইতে হস্তচালিত তাঁতে বোনা কাপড়। এই প্রকার শিল্প এখনও ভারত ও চীনদেশে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। (খ) **বৃহৎ বস্ত্রশিল্প** অর্থাৎ বাষ্প বা বিদ্যুৎচালিত বড় বড় কারখানায় স্বয়ংক্রিয় টাকু ও তাঁতের সাহায্যে খুব কম খরচে ও অল্প সময়ে কম শ্রমিকের সাহায্যে প্রচুর বস্ত্র উৎপাদন করা। এই প্রকার বৃহৎ শিল্প এখন পৃথিবীর সকল প্রধান দেশগুলিতে গঠিত হইয়াছে। এই শিল্পের জন্য চাই প্রচুর কাঁচা তুলার সরবরাহ, প্রচুর মূলধন, সুদক্ষ শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু ( বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা যায় ), কয়লা অথবা জলবৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ এবং নিকটেই ভাল বাজার।

পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে আধুনিক শক্তিচালিত তাঁতের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি **যুক্তরাষ্ট্রের**। তাহার পরেই **রাশিয়া, চীন** ও **ভারতের** স্থান। **জাপান** ও **ব্রিটেনের** স্থান তাহার পর। তবে ব্রিটেনের শিল্প পতনের মুখে। অন্যান্য দেশের মধ্যে জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, মিশর, মেক্সিকো, পাকিস্তান, ইটালি এবং ব্রেজিলের বস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন :

(১) **যুক্তরাষ্ট্রের** দক্ষিণাঞ্চলের গ্রিণভীল ও স্পার্টানবাগ শহর। এই অঞ্চলে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। আলাবামার কয়লা ক্ষেত্রও নিকটেই অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিউ ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পও উল্লেখযোগ্য। ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলেও বস্ত্রশিল্প আছে। তবে বর্তমানে নিউইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প পতনোন্মুখ। (২) **রাশিয়ার** প্রধান কার্পাস শিল্পাঞ্চল দুইটি। মস্কো-আইভানভো অঞ্চল কার্পাস শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র। এখানে তুলা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ ইউক্রেণের তুলা এখানে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি তুলা উৎপাদক মধ্য এশিয়ার টাসখেণ্ট শহরকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। (৩) **ভারতের** প্রধান প্রধান বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কোয়েম্বাটোরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অপরাপর কেন্দ্র কানপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, মাদুরাই, শোলাপুর, পুনা, সুরাট, ইন্দোর, নাগপুর, দিল্লী প্রভৃতি। (৪) **জাপানের** বৃহত্তম বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র ওসাকা শহর। তাহার পরেই নাগোয়া এবং টোকিও অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। (৫) **ব্রিটেনের** বস্ত্রশিল্প বর্তমানে অবনতির পথে। ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাঞ্চেষ্টার, ওল্ডহ্যাম, বোল্টন প্রভৃতি শহর স্কটল্যাণ্ডের পেস্‌লি উল্লেখযোগ্য বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র। ব্রিটেনে তুলা




উৎপন্ন হয় না। সমস্ত তুলাই আমদানি করিতে হয়। (৬) চীনের বস্ত্রশিল্প প্রধানতঃ পিকিং, তিয়েনসিন, সাংহাই ও হাঙ্কাও অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে জার্মানীর রাইন নদীর তটভাগ, ফ্রান্সের উত্তর ভাগে লিঁল, ইটালির

মিলান ও টুরিন, স্পেনের বার্সিলোনায়, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও বহু কাপড়ের কল আছে।

**Q. 92. Write an account of either (i) the woollen industry or (ii) the paper industry of the world.**

**[ পৃথিবীর (ক) পশম শিল্প অথবা (খ) কাগজ শিল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ]**

**পশম শিল্প**—শীত প্রধান দেশে পশমজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক। সুতরাং, এই শিল্প প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলিতে অর্থাৎ বাজারের নিকটে গড়িয়া উঠিয়াছে। অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু মেষ চারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ছাগলের লোম হইতেও অল্প পরিমাণে পশম পাওয়া যায়। পশম-শিল্পের জন্য প্রচুর সুনিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, কয়লা খনির সান্নিধ্য এবং প্রচুর নরম জলের ( soft water ) সরবরাহও প্রয়োজন হয়। পশম বহু দূরে বহন করিয়া লইয়া যাইয়াও শিল্পগঠন করা যায় কারণ শিল্পিত পণ্যের রূপান্তরের সময় ইহার কোন অংশ বাদ যায় না।

ব্রিটেন পৃথিবীর পশম শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই দেশের পেনাইন পর্বতের ঢালু গাত্রে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মেষ চারণ করা হয়। ইয়র্কশায়ারের কয়লা খনিকে কেন্দ্র করিয়া পশমের কারখানাগুলি গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসেও পশম কারখানা আছে। বর্তমানে ব্রিটেনে কাঁচা পশমের চাহিদা প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও আর্জেণ্টিনা হইতে আমদানিকৃত পশম দ্বারা মিটানো হয়; কারণ স্থানীয় পশম সরবরাহ যথেষ্ট নহে। বিদেশী এবং স্থানীয় উভয় প্রকার পশমের উপর নির্ভর করিয়া জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান এবং ইটালিতেও বৃহৎ পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সকল দেশেই প্রচুর পশম বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ইউরোপে রাশিয়ার পশম শিল্প বৃহত্তম। এশিয়ার মধ্যে জাপানের পশমশিল্পই বৃহত্তম। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে আমদানিকৃত পশমের উপর এই শিল্প নির্ভরশীল। ইরাণ, তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, সিকিয়াং এবং ভারতের কাশ্মীরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পেট ও শাল প্রস্তুত হয়। এই কার্পেট আমেরিকা ও ইউরোপে রপ্তানি হয়। অষ্ট্রেলিয়া এবং দঃ আফ্রিকাতেও পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে লামা ও আলপাকার লোম হইতেও বস্ত্রবয়ন করা হয়।

(২) **কাগজ শিল্প**—মিশরে প্রাচীনকালে পেপিরাস নামক জলজঘাস হইতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়। কাগজ প্রাচীন কালে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশেও হাতে প্রস্তুত হইত ( hand-made paper )। কিন্তু বর্তমানে বড় বড় কলকারখানাতেই

"মেকানিক্যাল" ও "কেমিক্যাল পাল্প ( pulp )" বা মণ্ড হইতে সাদা কাগজ ও নিউজপ্রিণ্ট ( খবরের কাগজ ছাপার সস্তা কাগজ ) প্রচুর পরিমাণে এবং কম খরচে প্রস্তুত হয়। ভাল কাগজ প্রস্তুত হয় ছেঁড়া কাপড়, ঘাস ও বাঁশ হইতে। কাগজ প্রস্তুতের সর্বপ্রধান উপাদান সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাঠ, বিশেষতঃ যে সকল কাঠে রজন জাতীয় আঠাল পদার্থ কম। ফার, স্প্রুস এবং হেমলক গাছের নরম কাঠই কাগজ প্রস্তুতের উপযুক্ত। তবে বর্তমানে পাইন গাছের রজনযুক্ত কাঠ হইতেও খুব শক্ত প্যাক করার কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে শক্ত কাঠ হইতেও নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হয় বটে, তবে উৎপাদন খুব কম। পৃথিবীতে কাগজ ও নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদনে কানাডার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদেশে উৎপন্ন কাঠের এক-তৃতীয়াংশই কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। কুইবেক এবং অণ্টারিও রাজ্যেই অধিকাংশ কাগজের কল অবস্থিত। কারণ, এখানে প্রচুর স্প্রুস ও হেমলক কাঠ, জলবৈদ্যুতিক শক্তি এবং নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য— যাহা কাগজ উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য—তাহা পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের কাগজের কলগুলি কলাম্বিয়া মালভূমি, অ্যাপলাশিয়ান পার্বত্যভূমির দক্ষিণাংশ ও দক্ষিণের পাইনবন অঞ্চলে অবস্থিত। ইউরোপের মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে এবং রাশিয়া কাগজ উৎপাদনে উচ্চস্থান অধিকার করে। ব্রিটেন ও জার্মানী কানাডা ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতে কাষ্ঠমণ্ড (wood pulp) আমদানি করে। এশিয়ার মধ্যে জাপান কাগজ উৎপাদনে বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। এখানে প্রচুর নরম কাঠ পাওয়া যায়। ভারতে কাগজ প্রস্তুতের জন্য প্রধানতঃ বাঁশ ও সাবাই ঘাস ব্যবহার করা হয়।

**Q. 93. Discuss the role of 'heavy chemicals' in modern economic development and describe briefly the principal regions of the world well-developed in "heavy chemical industries."** ( C. U. B. Com. 1969 )

[ আধুনিক আর্থিক বিকাশে ভারী রসায়ন শিল্পের ভূমিকা কি? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প বেশ উন্নত ? ]

রাসায়নিক শিল্প—কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়া অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প চলিতে পারে না; সুতরাং সকল উন্নত দেশেই এই শিল্পটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নানা প্রকার অম্লজাতীয় উপাদান, যথা—সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি এবং নানা প্রকার ক্ষার জাতীয় উপাদান, যথা— কসটিক সোডা, সোডা এ্যাস প্রভৃতি এবং রাসায়নিক সার, রঙ, ফটোগ্রাফ প্রস্তুতের উপকরণ, ব্যাটারি প্রস্তুতের উপকরণ, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং নানা প্রকার ঔষধ ও গন্ধদ্রব্য রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্গত। এই শিল্পের প্রধান প্রধান কাঁচামাল হইল

লবণ, চুন, গন্ধক, জিপসাম, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ, দস্তা প্রভৃতি। পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এই শিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। তাহার পরে জাপান, রাশিয়া, জার্মানী, ব্রিটেন ও ইটালির স্থান। পৃথিবীর প্রায় সকল কয়লাখনি অঞ্চলে নানা প্রকার রাসায়নিক শিল্পের সমাবেশ দেখা যায়। তৈলখনি, লবণখনি এবং গন্ধকের খনি অঞ্চলেও এই শিল্প দেখা যায়। লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, তাম্র শিল্প প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পের উপজাতদ্রব্য হিসাবেও প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। কলিকাতা, পুনা, বোম্বাই, বরোদা, বাঙ্গালোর, ওখা প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা আছে।

রাসায়নিক শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক-বাল্টিমোর অঞ্চল, পেনসিলভানিয়া, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, দক্ষিণ এ্যাপালাসিয়ান, ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাস অগ্রগণ্য। রাশিয়ার রাসায়নিক কারখানাগুলি ডনেটস্, বাকু, ইউরাল এবং কুজবাস অঞ্চলে অবস্থিত। জাপান এই শিল্পে তৃতীয়। জাপানের কারখানাগুলি হনসুর দক্ষিণ ভাগে, সিকোকু ও কিউসু দ্বীপে অবস্থিত। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভারী রসায়ন পশ্চিম জার্মানী, উত্তর ফ্রান্স, উত্তর ইটালি ও বেলজিয়ম অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। চীন এবং ভারতও এই শিল্পে খুব উন্নতি করিয়াছে।

**Q. 94. What do you know of the sugar industry of the world? Give an idea of the sugar production of the important producing countries.**

**[ পৃথিবীর চিনি শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ। প্রধান প্রধান দেশগুলির চিনি উৎপাদন সম্পর্কে কি জান ? ]**

**পৃথিবীর চিনি শিল্প**—ইক্ষু, মিষ্ট বীট এবং অন্যান্য নানা প্রকার গাছের রস ( যথা—তাল, খেজুর ও ম্যাপল ) হইতে চিনি এবং নানা প্রকার শর্করা জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। চিনির মধ্যে যথেষ্ট খাদ্যগুণ আছে এবং সভ্যমানুষের জীবনযাত্রায় ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু। চিনি প্রস্তুতের সময় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় উপজাত দ্রব্যও পাওয়া যায় ; যথা—অ্যালকোহল এবং নানা প্রকার পশুখাদ্য।

চিনি নানা জাতীয় ভেষজের রস হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া চিনি শিল্প "কাঁচামাল-কেন্দ্রীভূত" শিল্প। রস খুব কম সময়ের মধ্য শুকাইয়া যায় বলিয়া চিনির কলগুলি ইক্ষু বা বীট উৎপাদন ক্ষেত্রের সন্নিকটেই অবস্থিত হয়। চিনির বাজার হইতে চিনির কল এবং ফসল উৎপাদক ক্ষেত্রগুলি প্রায়ই বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় চিনির বহির্বাণিজ্য খুব বেশি এবং অন্তর্বাণিজ্যও মন্দ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পশ্চিম ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে চিনি হাজার হাজার মাইল

দূরে অবস্থিত ইউরোপ এবং এশিয়ার মূলভূখণ্ডে অবস্থিত বন্দরগুলিতে পাঠানো হয়। আবার ভারতেও ঠিক ঐ একই প্রকার বাণিজ্য—অবশ্য এ ক্ষেত্রে অন্তর্বাণিজ্যই বেশি। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে চিনি পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হয়।

পৃথিবীতে যে সকল দেশে **ইক্ষু-চিনি শিল্প** ( Cane-sugar industry ) বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে সেগুলি হইল—*ভারত, কিউবা, ব্রেজিল, পোর্টোরিকা, হাওয়াই, জাভা, ফিলিপাইন, ফরমোজা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্র। ঐ সকল দেশের মধ্যে ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের চিনি শিল্প সাধারণতঃ স্থানীয় বাজারে চিনি সরবরাহ করিয়া থাকে। অপর দেশগুলি সাধারণতঃ বিদেশের বাজারে চিনি রপ্তানি করিয়া থাকে।

**বীট চিনির** উৎপাদন ইক্ষু-চিনির উৎপাদনের তুলনায় কম হইলেও ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে ঐ চিনি স্থানীয় চাহিদার বেশ উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করিয়া থাকে। যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে বীট চিনি উৎপন্ন হয় সেগুলি হইল—সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের অন্যান্য দেশ, ফ্রান্স, ইটালি, ব্রিটেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং ফ্রান্সকেও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে। অন্যান্য দেশগুলি ইক্ষু চিনি আমদানি করিয়া থাকে।

ম্যাপল গাছের রস হইতে উৎপন্ন চিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় স্থানীয় চাহিদা কিছু পরিমাণে মিটাইয়া থাকে। ভারতে তাল এবং খেজুর গাছের রস হইতে উৎপন্ন গুড় কোন কোন অঞ্চলে আংশিকভাবে স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া থাকে।

চিনি শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা কৃষিকার্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অনেক দেশেই চিনি কলগুলি বৎসরে মাত্র কয়েক মাস পুরাদমে চলে। সুতরাং, এই শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ আদি নানা প্রকার সমস্যা আছে। ভারত ছাড়া আর সর্বত্রই ইক্ষু চাষ এবং চিনি শিল্প সম্পূর্ণতঃ ব্যাপক আকারে করা হয়। ভারতে বহু বৃহদাকার চিনির কল থাকিলেও এদেশের অধিকাংশ চিনি জাতীয় দ্রব্য; ( যথা—গুড় ও খান্দসরি ) এখন পর্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের কুটীর শিল্পের এলাকাভুক্ত।

## প্রধান শিল্পাঞ্চল সমূহের অবস্থান

**Q 95. Why are industries developed in some parts of the world? Describe the location of the important industrial regions of the world.**

---

* ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩৮ লক্ষ টন চিনি এবং ৪০ লক্ষ টনের বেশি গুড় উৎপন্ন হয়।

[ পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে মাত্র শিল্পের বিকাশ দেখা যায়—ইহার কারণ কি ? পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির বর্ণনা দাও। ]

বর্তমান যুগে বড় বড় কলকারখানা গঠন করিতে হইলে কতকগুলি সুবিধা থাকা প্রয়োজন। ঐ সকল সুবিধায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। কোথাও দেখা যায় কেবলমাত্র প্রধান কাঁচামালকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পাঞ্চল গঠিত হইয়াছে ; অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এমনকি দক্ষশ্রমিক এবং মূলধনও বিদেশ হইতে আমদানিকৃত। আবার কোথাও দেখা যায় যে উপযুক্ত জলবায়ু, যানবাহনের সুবিধা, মূলধনপ্রাপ্তির সুবিধা এবং শ্রমিকের দক্ষতাকে কেন্দ্র করিয়া বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গঠিত হইয়াছে। হল্যাণ্ডে কয়লা সামান্যই পাওয়া যায়, লৌহশিলাও নাই। ইস্পাত উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য নয়। জাহাজ নির্মাণের কাঠও মোটেই উৎপন্ন হয় না। তবুও আধুনিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে হল্যাণ্ড বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। আবার কঙ্গোতে সুপ্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। ঐ দেশের বড় বড় জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু কঙ্গোতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণের একটিও কারখানা নাই। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে হল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে ঐ দেশের অধিবাসীদের উদ্যম, মূলধনের প্রাচুর্য এবং বিক্রয়ের বাজারের নৈকট্য উক্ত দেশের জাহাজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছে। অপর পক্ষে, কঙ্গো রাজ্যের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, দুর্গম অরণ্য, রেলপথের অভাব এবং সর্বোপরি মূলধন ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবে সেখানে শিল্প গঠন করা সম্ভব হয় নাই।

আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলি কাঁচামাল আমদানি করিয়া তাহা শিল্পজাতদ্রব্যে রূপান্তরিত করিয়া রপ্তানি করে। ঐ সকল দেশ কাঁচা রবার, কাঁচা চামড়া, নানা প্রকার ধাতু, গন্ধক প্রভৃতি বহুবিধ কাঁচামাল আমদানি করে। ভারতও বহুবিধ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করে। আবার কয়লা, লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজ, কাঁচা চামড়া, তুলা, শণ প্রভৃতি কাঁচামাল রপ্তানিও করে। প্রসিদ্ধ শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে জাপান, ইটালি ও হল্যাণ্ডকে ইন্ধনদ্রব্য আমদানি করিতে হয় খুব বেশি এবং যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাঁচামাল আমদানি অপেক্ষাকৃত কম। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশ মূলধন ও দক্ষশ্রমিক বিদেশে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। ভারত মূলধন ও দক্ষশ্রমিক আমদানি করে।

বিভিন্ন মহাদেশের কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল—(ক) **ইউরোপ**—(১) **ব্রিটেনের** স্কট্ল্যাণ্ডের গ্লাসগো ও ডাণ্ডি অঞ্চল, ইংল্যাণ্ডের নিউক্যাসল, শেফিল্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার, লিভারপুল, বার্মিংহাম, কভেন্টি, নটিংহাম, কার্ডিফ, সোয়ানসি, ব্রিষ্টল ও লণ্ডন অঞ্চল। (২) **জার্মানীর রুর** অববাহিকা, এসেন, কলোন, হ্যানোভার, হ্যামবার্গ, লুবেক, ম্যাগডিবার্গ, ড্রেসডেন ও বার্লিন অঞ্চল। (৩) **ফ্রান্সের** লিঁল, লিয়ঁ,

রুয়ে ও প্যারিস অঞ্চল। (৪) পোল্যাণ্ডের সাইলেশিয়া অঞ্চল। (৫) বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের বন্দর ও কয়লাখনি অঞ্চল। (৬) ইটালির মিলান, টুরিন, জেনোয়া এবং নেপলস অঞ্চল। (৭) সোভিয়েট রাশিয়ার ডনেৎস কয়লাখনি, খারকোভ, ষ্টালিনো, রাষ্টোভ, ওডেসা, ষ্টালিনগ্রাড, মস্কো, আইভানভো, গোর্কি, লেনিনগ্রাড, ম্যাগ্নিটোগোরস্ক, বাকু প্রভৃতি অঞ্চল। (খ) এশিয়া—(১) জাপানের টোকিও, ওসাকা, কোবে, নাগোয়া, নাগাসাকি, ইয়াওয়াটা, মোরোরাণ প্রভৃতি অঞ্চল। (২) চীনের সাংহাই, আনশান, হ্যাঙ্কাও প্রভৃতি অঞ্চল। (৩) ভারতের হুগলী অববাহিকা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটোর, কানপুর, বাঙ্গালোর, জামসেদপুর, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চল, এবং (৪) পাকিস্তানের করাচি, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। (গ) উত্তর আমেরিকায়—(১) যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া, নিউইয়র্ক, নিউইংল্যাণ্ড, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, গ্যারি, ডেট্রয়েট, ক্লিভল্যাণ্ড, বাফেলো, বার্মিংহাম প্রভৃতি অঞ্চল। (২) কানাডার অণ্টারিও, মণ্ট্রিল ও কুইবেক অঞ্চল। (ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায় কেবলমাত্র ব্রেজিলের রায়ো-ডি-জেনিরো অঞ্চল। (ঙ) আফ্রিকায় কেবলমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চল। (চ) অষ্ট্রেলিয়ার নিউক্যাশল, সিডনি ও মেলবোর্ণ অঞ্চল।

# পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর

## TRANSPORT SYSTEM, CITIES AND PORTS

**Q. 96. Give a brief history of the evolution of transport system. What is meant by transport co-ordination? How far it is necessary in India?**

**[ পরিবহণ ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। পরিবহণ সমন্বয় কাহাকে বলে? ভারতে উহার প্রয়োজন আছে কি? ]**

**পরিবহণ ব্যবস্থার বিবর্তন**—মানব সভ্যতার বিকাশের প্রথম যুগে মানুষ নিজেই মাথায় বা পিঠে পণ্যাদি বহন করিত। আজও সেৎসি মাছি অধ্যুষিত আফ্রিকার অনেক স্থানে মানুষই বাণিজ্যিক পণ্য (যথা: গজদন্ত, পাম তৈল প্রভৃতি) বহন করে। ক্রমশঃ মানুষ নানা প্রকার বন্যজন্তুকে বশীভূত করিয়া ভারবহন করাইতে লাগিল। এখন সমভূমি অঞ্চলে বলদ ও ঘোড়ার গাড়ি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। উহাদের স্থান গ্রহণ করিতেছে মোটর ট্রাক ও রেলগাড়ি, কিন্তু উচ্চ পর্বতে অশ্বতর, লামা ও ইয়াক ছাড়া এখনও মালবহনের অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। অবশ্য উচ্চ পর্বতে ক্রমশঃ জীপগাড়ি এবং বিদ্যুৎচালিত রোপ-ওয়ের সাহায্যে মালবহন করা হইতেছে। তবে এ সকল ব্যবস্থা খুব উন্নত দেশগুলিতেই প্রচলিত হইয়াছে। রেলপথেও বিবর্তন কম হয় নাই। ষ্টিফেনসনের ঘণ্টায় ১০।১৫ মাইল বেগসম্পন্ন ক্ষুদ্র, দুর্বল, ধূম্র-উদ্‌গীরণকারী ইঞ্জিন আর বর্তমান যুগের শক্তিশালী বিদ্যুৎ বা তৈলচালিত বিরাট যন্ত্রদানবের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হইয়াছে জলপরিবহণে। প্রথম যুগে মানুষ কলা বা বাঁশ গাছের ভেলায় যাতায়াত করিত। পার্বত্য নদীর জন্য ছিল গাছের গুঁড়ির ডোঙ্গা ( dug out )। আর সমুদ্রে যাতায়াত করিত ক্ষুদ্রকায় পালতোলা জাহাজ। বর্তমানের তিন লক্ষ টন তৈলবহনক্ষম সুপার-ট্যাঙ্কার জাহাজের তুলনায় এগুলি মোচার খোলার মতই নগণ্য। আকাশ-পথেও মানুষ অতিকায় বিমানপোতের সাহায্যে ঘণ্টায় ৬০০ মাইলের অধিক বেগে ২।৩ শত যাত্রী ও মাল বহন করিতেছে।

পরিবহণ ব্যবস্থার উপরিউক্তরূপ আমূল পরিবর্তন হওয়ার ফলে, প্রথমতঃ বহু লোক উহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ, পরিবহণের ব্যয় অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

**পরিবহণ সমন্বয়**—পৃথিবীতে আজ বহুপ্রকার যানবাহন আছে। ঐগুলি যদি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া শক্তির অপচয় না করে, এবং পরস্পর অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় তবে তাহাকে পরিবহণ সমন্বয় ( transport co-ordination ) বলা চলে। যেখানে রেলপথ আছে সেখানে মোটর ট্রাক কেবল পচনশীল দ্রব্য বহন করিবে অথবা ভারী মাল রেল স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে। আর,

যেখানে রেলপথ নাই সেখানে উহা সকল প্রকার দ্রব্যই বহন করিবে। অথবা, কোথাও যদি এত পণ্য থাকে যে রেলপথ তাহা বহন করিতে সমর্থ নয়, তবে বাড়তি পণ্য ট্রাক বহন করিবে। ইহা হইল রেলপথ-রাজপথ পরিবহণ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। যেখানে সকল প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থারই সুবিধা আছে সেখানে যে প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা সবদিক দিয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল তাহার প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ভারত সরকার Rail-road co-ordination-এর জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। অন্যান্য দেশেও এরূপ ব্যবস্থা আছে। পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতির ইহা এক মৌলিক প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতে পরিবহণযোগ্য পণ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, একা রেলপথের সাধ্য নাই যে উহা বহন করিয়া দেশের সর্বত্র পৌছাইয়া দেয়। তাই আজ উপকূলের জলপথেও কয়লা পাঠানো হইতেছে। এমনকি রাস্তার ট্রাক, গরুর গাড়ি আদি সর্বপ্রকার পরিবিহণের সাহায্য লইবার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইহা পরিবহণ-সমন্বয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত বলা চলে।

**Q. 97. Discuss with specific examples the influence of transport on economic development of a region.**

**(B. Com. Part I 1965)**

[ উদাহরণসহ দেখাও কিভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা কোন অঞ্চলের আর্থিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। ]

বর্তমান যুগে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং জাপানের মানচিত্র খুলিলেই এই সত্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। পাকারাস্তা, রেলপথ, আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক জলপথ এবং আকাশপথ—শিল্পবাণিজ্যের দিক হইতে ইহাদের প্রত্যেকটির গুরুত্ব আছে।

কোন অঞ্চলে যতই প্রাকৃতিক সম্পদ থাক না কেন, সেখানে যতদিন না রেলপথ ও পাকারাস্তা নির্মিত হইতেছে সে সম্পদ ততদিন ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আমাদের দেশে মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা যেখানে মিশিয়াছে সেই স্থানটি খনিজ সম্পদে খুব সমৃদ্ধ। কিন্তু সে সম্পদ এতদিন কোন কাজে লাগে নাই। এখন সেখানে বিশাখাপতনম কিরিবুরু রেলপথ বসিয়াছে। বিশাখাপতনম পর্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে; তাই এখন সেখানকার বিপুল লৌহভাণ্ডার কাজে লাগিতেছে। ওখানকার লৌহশিলা এখন জাপানে চালান দিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হইতেছে। ঐ অঞ্চলেই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেছে।

( ইহার সহিত 102 নং প্রশ্নোত্তর হইতে ট্রান্স সাইবেরীয় রেলপথের বিবরণ যোগ কর। )

**Q. 98. Discuss with examples how speed and cost of transport determine the regional specialisation of industries.**

**[ পরিবহণের বেগ ও ব্যয় কিভাবে আঞ্চলিক শিল্পের প্রকৃতি নির্ধারণ করে তাহা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর। ] (C. U. B. Com. 1969)**

পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভাব সকল শিল্পের উপরেই রহিয়াছে। কোন অঞ্চলে কি ধরণের শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা পরিবহণের বেগ ও ব্যয়ের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয়—কাঁচামাল, ইন্ধন ও শ্রমিক—এবং এগুলি নানা স্থান হইতে কোন শিল্পকেন্দ্রে লইয়া যাইতে হয়। আবার শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে দ্রুত ও অল্প খরচে পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, চিনি শিল্পের কাঁচামাল ইক্ষু দ্রুত কারখানায় না পাঠাইলে চিনি অপচয় হয়। তাই ইক্ষুক্ষেত্রের নিকটে দ্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থা—সাধারণতঃ মোটর ট্রাক প্রয়োজন হয়। আবার বর্তমান যুগে বড় বড় শিল্প কেন্দ্রে শ্রমিক কারখানার নিকটে বাস করিতে পারে না; তাই দ্রুতগামী ইলেকট্রিক ট্রেনে শ্রমিকদের ঠিক সময়ে কারখানায় পৌছাইয়া দিতে হয়। যে সকল কাঁচামাল খুব ভারী; যথা—কয়লা, লৌহ আকরিক—সেগুলি কম ব্যয়ে দূর দূরান্তে সরবরাহ করার জন্য জলপথে অতিকায় জাহাজ ব্যবহৃত হইতেছে এবং স্থলপথে অতি শক্তিমান ডিজেল ইঞ্জিন একসঙ্গে পঞ্চাশ টনের শতাধিক ওয়াগন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহাতে একই লাইন অনেক বেশি মাল অনেক দ্রুত বহণ করিতে পারে। জাপানের ইস্পাত শিল্প কিভাবে বিদেশী কয়লা ও লৌহশিলার উপরে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এত উন্নতি করিয়াছে তাহা আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

জলপথে পরিবহণ সবচেয়ে সস্তা কিন্তু উহা খুব দ্রুত নহে। উহাকে দ্রুত করিবার ব্যয় অত্যধিক। অপর পক্ষে, বিমানপথ সবচেয়ে দ্রুত পরিবহণের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু ইহার খরচ অত্যধিক। মোটর পরিবহণ যদিও একটু ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু ইহার উপযোগিতা এই যে ইহাতে বারবার মাল উঠানো-নামানোর প্রয়োজন হয় না। রেলপথে ভারী জিনিস খুব দ্রুত বহন করা যায়। আঞ্চলিক শিল্পের বিকাশে এগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুসন্ধিৎসুছাত্রগণের জন্য নীচের Reference-গুলি দেওয়া হইল।

Reference—Chisholm's Handbook of Econ. Geography

এবং

Readings in Economic Geography—1967, Roepke & Maresh

এই গ্রন্থে Alexander, Brown and Dahlberg লিখিত "Freight Rates : Selected aspects of uniform and Nodal regions" প্রবন্ধ।

**Q. 99 Discuss the relative advantages and disadvantages of land, water and air transport. Name the trans-continental railways of Eurasia and North America (C. U. 1947)**

**[স্থল, জল ও আকাশ পথ পরিবহণের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর। ইউরেশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মহাদেশ পারাপারের রেলপথগুলির নাম কর।]**

**বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনা**—বর্তমান জগতে মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাতায়াত ব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক উন্নত দেশগুলির সর্বত্র রেলপথ, রাস্তা, নদী ও খালপথ ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য যানবাহন ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও বিস্তারলাভ করিতেছে।

কোন ব্যবসাদার যখন কোন বাণিজ্যিক পণ্য স্থানান্তরে পাঠাইবার জন্য যানবাহন ব্যবস্থার স্মরণাপন্ন হন তখন তাঁহার যে সকল কথা মনে আসে তাহা হইল—(১) কোন্ পথে মাল পাঠাইতে খরচ কম, (২) কোন্ পথে নিরাপদে ও দ্রুত মাল পাঠানো যায়, (৩) কোন্ পথে এক সঙ্গে অধিক মাল পাঠানো যায় প্রভৃতি।

বাণিজ্যিক পণ্য যদি আয়তনে এবং পরিমাণে অধিক হয় এবং যদি দ্রুত পচনশীল না হয় তবে জলপথে পাঠানোই সুবিধা। কারণ যদিও জলপথে মাল পাঠাইতে বিলম্ব ঘটে তবু সস্তায় ভারী মাল প্রেরণের ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কিন্তু যদি পণ্য দ্রুত পচনশীল হয় তবে স্থলপথে মোটর ট্রাকের সাহায্যে অথবা দূরপথ হইলে আকাশপথে বিমানপোতের সাহায্যে পাঠানোই সুবিধাজনক। যদিও বিমানপোতের ভাড়া অত্যধিক তবু ঐ পথে মাল খুব টাট্‌কা অবস্থায় বাজারে পাঠানো যায়। মালদহের ফজলি আম মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সুপক্ক অবস্থায় কলিকাতার বাজারে পাঠানো যায়। ইহাতে ভাড়া অত্যধিক পড়ে বটে; তবে ট্রেনে পাঠাইলে যে পরিমাণে আম পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহা ধরিলে বিমানে আম পাঠানো খুব ব্যয়সাধ্য এমন কথা বলা যায় না। রেলপথ সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং নির্ভরযোগ্য যানবাহন ব্যবস্থা। প্রায় সকল দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবহণের ইহাই সর্বপ্রধান অবলম্বন। কিন্তু ভাল রাজপথ না থাকিলে রেল ষ্টেশনে মাল সরবরাহ করা যায় না। সুতরাং, পল্লীঅঞ্চলে পথ ব্যবস্থার গুরুত্ব অধিক। সমুদ্রপথে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করে। বড় জাহাজে মাল খুব সস্তায় এবং নিরাপদে বহন করা যায়। পৃথিবী ¾ ভাগ জল দ্বারা আবৃত। সুতরাং, এক দেশ হইতে অপর দেশে জলপথেই মাল আদান-প্রদান করা সহজ। বর্তমান যুগে নানাপ্রকার মাল সস্তায় বোঝাই এবং খালাস করিবার জন্য নানপ্রকার বিশেষ ধরণের জাহাজ প্রবর্তিত হইয়াছে। অতিকায় ট্যাঙ্কার জাহাজ পেট্রোল বহন করে। লৌহশিলা, কয়লা এবং গম বহন করিবার স্বতন্ত্র প্রকার জাহাজ আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সস্তা এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজনই তেমনি অতিদ্রুত গমনোপযোগী পরিবহণ ব্যবস্থাও দরকার। বিমানপোত খুব ব্যয়-বহুল বটে, কিন্তু উহাই দ্রুততম পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বিমানপোত পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি, তুষারক্ষেত্র এবং সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। পরিবহণের ব্যয়ের দিক হইতে জলপথেই পণ্য পরিবহণের সুবিধা সর্বাপেক্ষা অধিক।

এক অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন পাকারাস্তার উপর দিয়া প্রায় ৪০ মণ মাল প্রতি সেকেণ্ডে তিন ফুট টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ঐ অশ্বশক্তিই রেলপথের উপর দিয়া দশগুণ মাল বহন করিতে পারে এবং জলপথের উপর দিয়া ৭০ মণ অধিক মাল বহন করিতে পারে। কিন্তু জলপথে যদি কোন পণ্য দ্রুতগতিতে লইয়া যাইতে হয় অর্থাৎ অধিক অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন নিয়োগ করিতে হয় তবে পরিবহণের ব্যয় রেলপথ অপেক্ষা অধিক হয়। তাহা ছাড়া, জলপথে মাল অধিকবার উঠাইতে ও নামাইতে হয়। তাহাতে খরচ বেশি পড়ে।

পার্বত্য রাস্তায় রেলপথ স্থাপন করা যায় না, সুতরাং পাকারাস্তার উপরই নির্ভর করিতে হয়। কানাডায় যেখানে প্যাসিফিক রেলপথটি রকি পর্বত পার হইয়াছে সেখানে পরিবহণের ব্যয় সমভূমির তুলনায় তিনগুণ বেশি। রেলপথ স্থাপন করার খরচ রাস্তা নির্মাণের খরচ অপেক্ষা অনেক বেশি। সমুদ্রপথ ও বিমানপথ নির্মাণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিমান ঘাঁটি রক্ষা করার ব্যয় অত্যধিক।

[ পৃথিবীর প্রধান প্রধান মহাদেশ পারাপারের রেলপথগুলির জন্য 102 ও 103 নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য ]

**Q. 100. What do you know of the road transport of the world ?**

**[ পৃথিবীর সড়ক-পরিবহণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ]**

প্রত্যেক দেশেই রাস্তার যাতায়াত ব্যবস্থা বা পথ পরিবহণ ( Road Transport ) গুরুত্বপূর্ণ; কেন না, রাস্তা না থাকিলে মোটর বা অন্যান্য প্রকার যানবাহন চলাচল সম্ভব হয় না; এমন কি মানুষের গতিপথ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। রাস্তা নির্মাণ বিজ্ঞানকে যাঁহারা বিশেষভাবে উন্নত করেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রিটেনের টেলফোর্ড ও ম্যাকাডামের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পীচ ও পাথর মিশাইয়া রাস্তা প্রস্তুত হয়। উহাকে টার-ম্যাকাডাম ( tarmac ) রাস্তা বলে। কন্‌ক্রিটের রাস্তা বর্তমানে খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। উহা মেরামত করিতে হয় কম এবং যে দেশে পাহাড় নাই সেখানেও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে উহা প্রস্তুত করা যায়। মরুভূমির বালির উপরেও এখন মোটর-গাড়ি চলিতে পারে। এইজন্য সাহারা এবং আরবীয় মরুভূমিতে বিশেষ ধরণের মোটরের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থা

প্রচলিত হইয়াছে। স্থলপথে রাস্তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য। গ্রাম এলাকার সহিত শহরের যোগসূত্র রাস্তা দ্বারাই রক্ষিত হয়। কারণ গ্রাম অঞ্চলে রেলপথ খুব বেশি কার্যকরী হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীতে ৯২ লক্ষ ২৫ হাজার *মাইল রাস্তা আছে। তন্মধ্যে একমাত্র আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রেই ৩০ লক্ষ মাইল রাস্তা ( ৫½ কোটি মোটরযান ) আছে; অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর রাস্তার এক তৃতীয়াংশই আমেরিকায়। মাথাপিছু পাকারাস্তার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ফ্রান্সের স্থান। ব্রিটেন ও জার্মানী তাহার পরে। এশিয়ার মধ্যে সিংহল, মালয় ও ইরাকের রাজপথ ব্যবস্থা ভাল। ভারত এবিষয়ে একটু পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। অবশ্য জাপান ছাড়া এশিয়ার সকল দেশ অপেক্ষা ভারতেই অধিক মোটরযান দেখা যায়। আমেরিকার বড় বড় রাস্তার মধ্যে প্যান আমেরিকান †হাইওয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীগুলিকে যুক্ত করিয়াছে। আলাস্কা হাইওয়েও বিখ্যাত। এশিয়ান হাইওয়ে নির্মাণ করা হইতেছে।

### পৃথিবীর কয়েকটি দেশে পাকারাস্তার দৈর্ঘ্য

| | | | |
|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩০ লক্ষ মাইল | জার্মানী | ২'৭ লক্ষ মাইল |
| ফ্রান্স | ৬'৫ " " | কানাডা | ৩'৯ " " |
| ব্রিটেন | ১'৭ " " | ভারত | ১'৮ " " |

**Q 101. What geographical conditions are suitable for the development of railways ? Illustrate your answer with suitable examples.**

**[কি ধরণের ভৌগোলিক অবস্থা রেলপথের উন্নতির পক্ষে সুবিধাজনক? উপযুক্ত উদাহরণ সহ উত্তরগুলি বর্ণনা কর।]**

**রেলপথ** ( Railways বা Railroad )—যাতায়াত ব্যবস্থায় **রেলগাড়ির** গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। ষ্টিম এঞ্জিন আবিষ্কার করেন **ষ্টিভেনসন**। বর্তমানে কয়লা, তৈল ও বিদ্যুৎ—তিন প্রকার শক্তির সাহায্যেই রেলগাড়ি চালানো যায়। রেলগাড়ি চালু হইবার ফলে পৃথিবীর বহু নূতন স্থানে ঘনবসতি সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কানাডা এবং সাইবেরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রেলপথ নির্মাণকার্য জলবায়ু এবং ভৌগোলিক অবস্থার উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে।

* একমাইল=১৭৬০ গজ, এক কিলোমিটার=১০৯৩ গজ মোটামুটি হিসাব ১ মাইল=১'৬ কিলোমিটার।

†Highway বলিতে সাধারণতঃ পাকারাস্তা—বিশেষতঃ দূরের পথকে বুঝায়। প্রচলিত অর্থে অনেক সময় সমুদ্রপথকেও 'ওসান-হাইওয়ে' বলা হয়।

**রেলপথের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব** বলিতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝায়—(১) জলবায়ুর প্রভাব, (২) ভূ-প্রকৃতির প্রভাব। তাহা ছাড়া অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

যে সকল অঞ্চলে মন্দোষ্ণ জলবায়ু এবং মধ্যম বারিপাত হয় সেই সকল স্থানই রেলপথ স্থাপনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। অবশ্য বর্তমানে উন্নত ধরণের যন্ত্রাদির সাহায্যে রেললাইন হইতে তুষার, বালুকা প্রভৃতি অপসারণ করা যায়। তবু জলবায়ুর অসুবিধার জন্যই আজ পর্যন্ত রাশিয়া ও কানাডার সুমেরুতটে রেলপথ স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। সাহারা ও আরবের মরুভূমিতে রেলপথ নাই। অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এবং অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের আমাজন ও নাইজার নদীর অববাহিকায় অধিক রেলপথ স্থাপন করা হয় নাই। আসামে অত্যধিক বারিপাতের ফলে অনেক সময় রেলসংযোগ ব্যাহত হয়।

রেলপথ স্থাপনের জন্য সমতলভূমি বা নদী উপত্যকাই উৎকৃষ্ট স্থান। পার্বত্য-প্রকৃতি রেলপথ স্থাপনের উপযোগী নহে। তিব্বত ও আফগানিস্তানে রেলপথ নাই বলিলেই চলে। সম্প্রতি অবশ্য বহু অর্থব্যয়ে এই দুই দেশেই রেলপথ স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছে। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পার্বত্য রেলপথ লাভজনক হয় না। কানাডার কিকিং হর্সপাস দিয়া যে রেলপথ রকি পর্বত পার হইয়াছে উহাতে পরিবহণ খরচ সমতলভূমির রেলপথের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। বদ্বীপের নরম মাটিতেও রেলপথ স্থাপনের নানা অসুবিধা। পূর্ব পাকিস্তানে বড় বড় নদী থাকায় সেখানে রেলপথ নির্মাণের ব্যয় অত্যধিক; সুতরাং ঐ রাজ্যে রেলপথ খুব কম। বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকায় বিভিন্ন ধরণের রেলপথের প্রয়োজন হয়। যেখানে পাহাড়-পর্বত বেশি এবং অধিক পণ্যদ্রব্যও পাওয়া যায় না সেখানে ছোট রেলপথ (narrow gauge railway) দেখা যায়। দার্জিলিং-এর রেলপথ এই ধরণের। অন্যান্য ধরণের রেলপথ হইতেছে—মিটারগেজ, স্ট্যাণ্ডার্ডগেজ (ইহা ভারতে নাই, ইউরোপের সর্বত্র এই ৪′—৮″ গেজ) ও ব্রডগেজ—এই সকল লাইন নির্মাণ করার খরচ খুব বেশি। সুতরাং কোন অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক হইতে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইলে তবে সেখানে ঐ প্রকার রেলপথ স্থাপন করা লাভজনক হয়। অনেক সময় বিভিন্ন সরকার কোন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অথবা দেশরক্ষার জন্য রেলপথ নির্মাণ করেন। ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ প্রথমোক্ত প্রকার এবং পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রেলপথ শেষোক্ত শ্রেণীর রেলপথের নিদর্শন।

---

* রেলপথের দৈর্ঘ্য মাইল অথবা কিলোমিটারে দেওয়া যাইতে পারে (১মাইল=প্রায় ১'৬ কিলোমিটার)। বিভিন্ন পুস্তকে এক দেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য একটু আলাদা হইতে পারে কারণ দূরত্ব track mileage ও Route mileage এই দুই ভাবে মাপা হয়।

পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রেলপথ আছে। উহার *দৈর্ঘ্য ২ লক্ষ ২০ হাজার মাইলেরও বেশি। ভারত সাধারণতন্ত্রে মোট প্রায় ৪০ হাজার মাইল রেলপথ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগ, পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, রাশিয়া, জাপান, ভারত, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি স্থানের রেলপথ-জাল ঘন এবং উন্নত শ্রেণীর।

**Q. 102. What is a Trans-Continental Railway? Name some of the trans-continental railways and discuss their functions.**

**[ মহাদেশ পারাপারের রেলপথ কাহাকে বলে? কয়েকটি মহাদেশ পারাপারের রেলপথ সম্বন্ধে আলোচনা কর। ]**

**মহাদেশ পারাপারের রেলপথ** ( Trans-Continental Railway )— যে সকল দীর্ঘ রেলপথ কোন মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অথবা এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সেই রেলপথগুলিকে মহাদেশ পারের রেলপথ বলা হয়।

পৃথিবীতে **মহাদেশ পারের রেলপথ** অনেক আছে। উহাদের মধ্যে (১) **ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ** (৫৫০০ মাইল দীর্ঘ), (২) কানাডিয়ান প্যাসিফিক ও ন্যাশনাল রেলপথ, (৩) চিলি আর্জেন্টিনা রেলপথ এবং (৪) নর্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ ( বিষদ বিবরণের জন্য আমেরিকা অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) এই চারটি রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ** পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। এই রেলপথটি সোভিয়েট রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত লেনিনগ্রাড হইতে ধরা যাইতে পারে। অতঃপর উহা মস্কো হইয়া বহুদূরে ইউরাল পর্বতমালা পার হইয়া শিল্প নগর সার্ডেলোভস্ক, ওমস্ক, নভোসাইবিরস্ক, কুজবাস কয়লাখনি, বৈকাল হ্রদ তীরে ইর্কুটস্ক ও চিটা জংশন হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তটে ভ্লাডিভষ্টক বন্দরে পৌঁছিয়াছে। কুজবাসের কয়লা, ইউরাল অঞ্চলের লৌহ প্রভৃতি খনিজ এবং সাইবেরিয়ার বিশাল সরলবর্গীয় অরণ্যের বিপুল কাষ্ঠ সম্পদ এবং পশুলোম এই রেলপথ মারফত সোভিয়েট রাজ্যের নানাস্থানে আদান-প্রদান করা হয়। যখন এই রেলপথ স্থাপিত হয় সে সময় কুজবাসের সুবিশাল কয়লা খনির অস্তিত্বের বিষয় কেহ জানিত না। তখন কাঠ-কয়লার সাহায্যে মন্থরগতি রেলইঞ্জিনগুলি এই পথে যাতায়াত করিত। বর্তমানে এই পথে বড় বড় ইঞ্জিন কয়লা ও পেট্রোলে চলে। পথের অনেকটাই "ডবল লাইন"। বিশেষতঃ ম্যাগ্নিটোগোরস্ক এবং সার্ডেলোভস্ক হইতে নভোসাইবিরস্ক ও স্টালিনস্ক পর্যন্ত পথে খুব বেশি কয়লা ও লৌহবাহী ওয়াগন চলাচল করে। নরম কাঠ ও পশুলোমও এই রেলপথের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে বহন করা হয়। এই রেলপথের

চিটা জংশসন-ষ্টেশন হইতে একটি রেলপথ চীনে গিয়াছে। মস্কো হইতে একবার মাত্র ট্রেন বদলাইয়া এখন এই পথে পিকিং যাওয়া যায়। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পথে এখন প্রচুর পরিমাণে মাল চলাচল করে।

**Q. 103. "Railways have been the making of Canada" Discuss this statement.** ( C, U. 1953 )

] "রেলপথগুলিই কানাডাকে গড়িয়া তুলিয়াছে"—এ সম্বন্ধে আলোচনা কর। ]

কানাডা একটি সুবিশাল রাজ্য। যদিও দেশটির তিনদিকে সাগর উপসাগরাদি রহিয়াছে এবং তটরেখাও ভগ্ন, তবু এই উপদেশটির মধ্যভাগে রেল-পরিবহণই ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। প্রকৃতপক্ষে কানাডার বর্তমান আর্থিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে উহার দুইটি প্রধান রেলপথ—**কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ ও কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ**। যদিও দেশের আয়তনের তুলনায় এই দুইটি বৃহৎ রেলপথ যথেষ্ট নহে তবু উহাদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রথম রেলপথটি কানাডার প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলের প্রধানতম বন্দর **ভ্যাঙ্কুভার** হইতে আরম্ভ হইয়া মূল্যবান অরণ্য ও খনিজ সম্পদে পূর্ণ সুউচ্চ রকি পর্বতমালা ভেদ করিয়া ক্রমশঃ পূর্বদিকস্থ সমতল প্রেয়ারি প্রান্তরে নামিয়া আসিয়াছে। এই স্থানে আলবার্টার নূতন খনিজ তৈলক্ষেত্র ও বাসন্তি গম-বলয়ের উর্বর প্রান্তর। ম্যানিটোবা ও সাসকাচুয়ানের গম-বলয়ের মধ্য দিয়া এই রেলপথটি বিখ্যাত গম রপ্তানি কেন্দ্র **উইনিপেগ** নগরে আসিয়া কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ; ইহা প্রশান্ত মহাসাগর তটের মৎস্য বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর প্রিন্স রূপার্ট হইতে আরম্ভ হইয়া শীতপ্রধান সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্বদিকে উইনিপেগে প্যাসিফিক রেলওয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। ন্যাশনাল রেলওয়েটি সরকার কর্তৃক বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করা হইয়াছে। সরকারের উদ্দেশ্য নূতন উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে জনসাধারণকে সাহায্য করা। অতঃপর উইনিপেগ হইতে প্রধান রেলপথ দুইটি অণ্টারিও রাজ্যের বিশ্ববিখ্যাত **নিকেল, এ্যাসবেসটস** ও **কোবাল্ট** খনি অঞ্চল ও কাষ্ঠমণ্ড শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া সেণ্টলরেন্স উপত্যকায় আসিয়াছে। এখানকার বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রগুলি এই দুই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। **টরেণ্টো, মন্ট্রিল** ও **কুইবেক** হইয়া প্যাসিফিক রেলপথটি আটলান্টিক তটস্থ বরফমুক্ত গম রপ্তানি বন্দর হ্যালিফ্যাক্সে পৌঁছিয়াছে। নোভাস্কোশিয়া উপদ্বীপের খনিজ সম্পদও এই রেলপথের আয়ত্তাধীন। আর একটি রেলপথ কানাডার গম ক্ষেত্রকে হাডসন উপসাগর তীরে চার্চিল বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের প্রশস্ততম অংশে পারাপারের কার্যে নিযুক্ত কানাডার প্রধান রেলপথ দুইটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রেলপথগুলির অন্যতম। যদিও ইদানিং গ্রেটলেকস্ ও হাডসন উপসাগরের পথে কানাডার বহির্বাণিজ্যের কতকটা চলাচল করিতেছে, তবু দেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকায় কানাডিয়ান প্যাসিফিক ও ন্যাশনাল রেলওয়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতে প্রচুর কানাডিয়ান রেলইঞ্জিন আমদানি করা হইয়াছে। উভয়দেশের রেলপথগুলি সুদীর্ঘ বলিয়া কানাডা ভারতীয় অবস্থার উপযোগী ইঞ্জিন নির্মাণ করিতে সমর্থ।

**Q. 104. In what way does railway development depend on the geographical condition of a region? Briefly describe a few of the more important Trans-Continental railways of the world.**

[ কোন অঞ্চলের রেলপথ উন্নত করণে ভৌগোলিক অবস্থা কিভাবে নির্ভরশীল? আরো কতকগুলি মহাদেশ পারাপারের রেলপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ]

[ উত্তরের জন্য 101, 102 ও 103 নং এবং আমেরিকা অধ্যায়ে নর্দার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। ]

নদীপথ—

**Q. 105. What do you know of inland water transport? Mention the chief geographical factors which make a river a highway of commerce. Illustrate your answer by a few examples** ( C. U. 1952 )

[ অন্তর্দেশীয় জলপথ সম্বন্ধে কি জান? একটি নদীকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে সুনাব্য হইতে হইলে কি কি প্রধান ভৌগোলিক উপাদান থাকা প্রয়োজন? উদাহরণ সহ উহা বিবৃত কর। ]

মালপ্রেরণ বা আমদানির পক্ষে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই খরচ কম। তবে জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার দায়িত্ব খুব বেশি। জলপথে চলাচল ব্যবস্থা দুই প্রকারের হইয়া থাকে; যথা—**অন্তর্দেশীয়** ( inland ) এবং **মহাসাগরীয়** ( ocean route )। অন্তর্দেশীয় জলপথ বলিতে নদী, হ্রদ ও খাল এবং মহাসাগরীয় জলপথ বলিতে সমুদ্র এবং সমুদ্রখালকে ( ship canal ) বুঝায়।

**অন্তর্দেশীয় জলপথ**—ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে নদীপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। সমস্ত নদীতেই যাতায়াত ব্যবস্থা চালু হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এমন অনেক অগভীর নদী আছে যাহা জলপথ হিসাবে জগতের কোন উপকারে আসে না। প্রথম শ্রেণীর নদীর নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক:—(১) কোন নদী সুনাব্য অর্থাৎ

জাহাজ চলাচলের উপযোগী হইতে হইলে তাহা বরফমুক্ত এবং খুব গভীর হওয়া চাই। খরস্রোতা এবং জলপ্রপাতযুক্ত নদীতে জাহাজ চলাচল করা আদৌ নিরাপদ নয়। (২) নদীর জলপ্রবাহ বারমাস যথেষ্ট থাকিলে ভাল হয়। যদি নদীর উৎপত্তিস্থানে বারমাস প্রবল বৃষ্টি হয় অথবা বরফগলা জলের সংস্থান থাকে তবে ইহা সম্ভব। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, রাইন, ইয়াংসি প্রভৃতি এই শ্রেণীর নদী। (৩) নদী তট কর্দমমুক্ত এবং নদী বালুচরহীন হওয়া প্রয়োজন। (৪) নদী সহজ গতি হওয়া চাই। বাঁক থাকিলে নানা অসুবিধা হয়। (৫) নদী বরফমুক্ত সাগরে প্রবাহিত হওয়া চাই। হ্রদে পতিত নদীর নানা অসুবিধা। (৬) জলযান গমনোপযোগী নদীগুলি জনবহুল স্থানে অবস্থিত হওয়া চাই। আমাজন নদী গভীর ও সুনাব্য হওয়া সত্ত্বেও প্রায় কোন কাজেই আসে না।

ইউরোপে জলযান চলাচলের উপযোগী বহু নদী আছে; জার্মানীতে এই প্রকার নদীর সংখ্যা খুব বেশি। জার্মানীর নদীগুলির মধ্যে ওয়েসার ( Weser ), এলব ( Elbe ), রাইন ( Rhine ) এবং ওডার ( Oder ) বৃহৎ ও সুনাব্য। জার্মানীর নদীগুলির অধিকাংশই দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে আড়াআড়ি ভাবে প্রবাহিত। এই সমস্ত নদীগুলি বিভিন্ন খাল দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্তির ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জলপথে যোগসূত্র রক্ষায় সাহায্য করে। জার্মানীর প্রধান নদী রাইন ( Rhine )। এই নদীপথে সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী ও হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চলগুলি অবস্থিত। ২০০০ টনের বজরাগুলি এই নদীপথে আগাগোড়া চলাচল করিতে পারে। ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাব্য নদী।

জার্মানীর পরেই ফ্রান্সের নাম উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে অন্তর্দেশীয় নদীপথ খুব উন্নত। ইহাই এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রধান কারণ। ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য নদীগুলির মধ্যে রোন ( Rhone ), শোঁন ( Saone ), সিন ( Seine ) এবং লয়ার ( Loire )-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল নদীর মধ্যে প্রায় সবগুলিই জলযান চলাচলের উপযোগী। ইহা ছাড়াও ডর্ডোঁ (Dordogen) এবং গ্যারোন ( Garonne ) নদীও জলযান চলাচলের উপযোগী। এই সমস্ত জলপথের সাহায্যে কৃষি ও শিল্প-জগতে ফ্রান্সের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে।

রাশিয়াতেও প্রচুর সুনাব্য নদী আছে। তাহাদের মধ্যে ডুইনা ( Dvina ), ভলগা ( Volga ), ডন ( Don ), নীপার (Dniper) এবং নিষ্টার (Dniester)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ডুইনা নদীর প্রবাহ উত্তরে হিমপ্রদেশগুলির দিকে প্রবাহিত হওয়ায় অনেক সময় জলযান চলাচল বন্ধ থাকে। অপর নদীগুলি দক্ষিণে প্রবাহিত। রাশিয়ার নদীগুলি বাণিজ্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। ভলগা ইউরোপের বৃহত্তম নদী। ইহা ক্যাস্পিয়ান হ্রদে মিশিয়াছে। বর্তমানে ভলগা নদী একটি খালের সাহায্যে ডন নদীর সহিত যুক্ত হইয়াছে।

দানিয়ুব ( Danube ) নদীটিকে ইউরোপের আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়। ইহা প্রায় আগাগোড়া সুনাব্য। যুগোস্লোভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশে ইহাই জলযান যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। এই নদীর একস্থানে বিখ্যাত গিরিখাত লৌহদ্বার ( Iron gate ) অবস্থিত। এই স্থানটি বিপদসংকুল।

অষ্ট্রেলিয়ার নদীপথ তেমন উন্নত নয়। কেবলমাত্র পূর্বাঞ্চলের নদীগুলি জলযান চলাচলের উপযোগী। ইহাদের মধ্যে ডার্লিং ( Darling ) ও মারে ( Murray ) নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

জলপথে কানাডা খুব সম্পদশালী। কিন্তু অধিকাংশ নদীই বৎসরের বেশির ভাগ সময় বরফে আবৃত থাকে। **সেণ্টলরেন্স** ( St. Lawrence ) নদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেণ্টলরেন্স পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জলপথ; অবশ্য নদীটি স্থানে স্থানে খুব খরস্রোতা হওয়ায় খাল কাটিয়া ঐ স্থানগুলিকে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহা আটলাণ্টিক মহাসাগর ও গ্রেট লেক্‌সের মধ্যে যোগসূত্র। সম্প্রতি এই নদীপথটিকে সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াতের উপযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাকে **সেণ্টলরেন্স সিওয়ে** ( St. Lawrence Seaway ) বলা হয়। ইহার উপর বহু শিল্পনগর অবস্থিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০,০০০ মাইল হইবে। নদীগুলির মধ্যে **মিসিসিপি** এবং মিসৌরীর নাম উল্লেখযোগ্য। ওহিও, টেনিসি প্রভৃতি বহু নাব্য উপনদী মিসিসিপি নদীতে মিশিয়াছে। মিসিসিপির ব-দ্বীপ অঞ্চল নিম্ন ও কর্দমাক্ত হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রচুর গম ও তৈল বহন করে। উহা খাল দ্বারা গ্রেট লেকসের সঙ্গে যুক্ত। গ্রেট লেকস্ অর্থাৎ সুপিরিয়র, মিশিগান, হুরণ, ইরি এবং অণ্টারিও হ্রদ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আভ্যন্তরীণ জলপথ। বড় বড় জাহাজ এই হ্রদগুলি দিয়া যাতায়াত করে। হাডসন নদীও নৌবাহন যোগ্য।

দক্ষিণ আমেরিকার **আমাজন নদী** দৈর্ঘ্যে ৪,০০০ মাইল। আমাজন এই মহাদেশের বৃহত্তম নদী। এই নদীপথে বৎসরে বারমাসই জলযান যাতায়াত সম্ভব। কিন্তু অববাহিকায় লোকসংখ্যা কম বলিয়া নদীটি দিয়া অল্প সংখ্যক জলযান যাতায়াত করে। ওরিনকো ( Orinoco ) এবং প্যারানা ( Parana ) নদীগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকার অনেকস্থলে জলপথই একমাত্র যাতায়াতের উপায়। **নীল** ( Nile ) আফ্রিকার বৃহত্তম নদী। জাম্বেসী, কঙ্গো এবং নাইজারের নাম উল্লেখযোগ্য। বহু জলপ্রপাত থাকা সত্ত্বেও এই সকল নদীর অনেকাংশ নাব্য। লিমপোপোর কতকাংশ জলযান যাতায়াতের উপযোগী। ইহা ছাড়া ট্যাঙ্গানিকা এবং নিয়াসা হ্রদগুলিও নাব্য। ভবিষ্যতে এই হ্রদগুলিতে জলযান চলাচলের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

এশিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদীপথ আছে ভারতে এবং চীনদেশে। এই প্রসঙ্গে উত্তর ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অসংখ্য সুনাব্য শাখানদী ও উপনদী আছে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে মহানদী, কৃষ্ণা ও গোদাবরীর নিম্নপ্রবাহ জলযান চলাচলের উপযোগী। এই নদীগুলি গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। চীন দেশের অন্তর্গত হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং এবং সিকিংয়াং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইয়াংসি নদীপথে ৭৫০ মাইল পর্যন্ত বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করিতে পারে। আরও হাজার মাইল পর্যন্ত ছোট জাহাজ চলে। চীনের বিখ্যাত গ্রাণ্ড ক্যানাল ও বহু নৌবাহনযোগ্য খাল ইয়াংসি নদীর সঙ্গে সমগ্র উত্তর চীনের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

**সমুদ্রপথ ও জাহাজ খাল—**

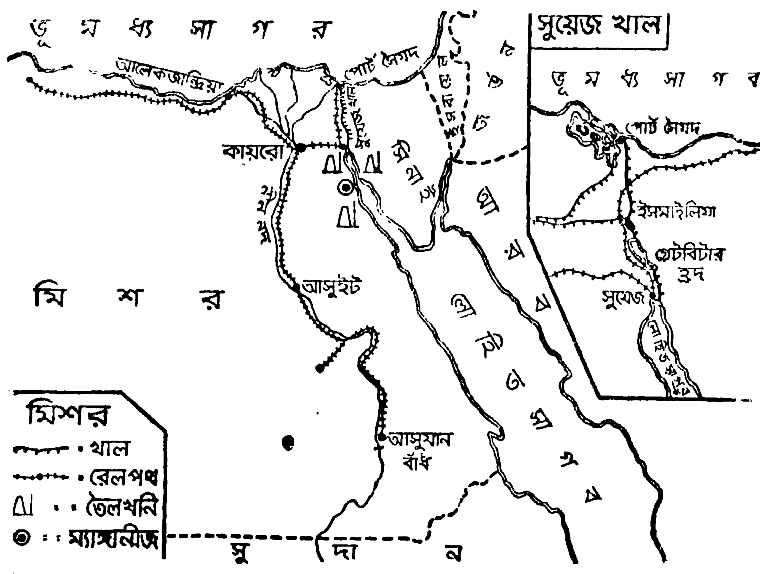
**Q. 106. State the importance of the Mediterranean-Suez route and describe the nature of trade passing through this route.**

**[ ভূমধ্যসাগর-সুয়েজখাল পথের গুরুত্ব এবং এই পথের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্পর্কে আলোচনা কর। ]**

**সুয়েজখাল** লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্স এই খাল পরিকল্পনা করেন। ১৮৬৯ সালে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০৩ মাইল। লোহিত এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে তিনটি লবণাক্ত হ্রদ আছে। খালটি এই হ্রদগুলিকে লোহিত এবং ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহার গভীরতা কোন জায়গায়ই ৩৫ ফুটের কম নয়। এই খালটি মিশর দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং বর্তমানে ইহা মিশর সরকারের সম্পত্তি। খালটির পূর্বদিকে এশিয়া এবং পশ্চিম দিকে আফ্রিকা মহাদেশ। ঐ অঞ্চলটি একটি মরুভূমি—ইহাকে নেগেভ মরুভূমি বলা হয়।

যখন সুয়েজ খাল খনন করা হয় নাই তখন ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে অনেক বেশি সময় লাগিত এবং ঐ পথে ঝড়ঝাপটার জন্য বড়ই অসুবিধা হইত। খালটি খনন করিবার ফলে কলিকাতা ও লণ্ডনের দূরত্ব ৪৫০০ মাইল এবং লণ্ডন ও ইয়োকোহামার দূরত্ব ৩০০০ মাইল কমিয়াছে। সুয়েজখাল মারফত যে সকল জাহাজ এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ইউরোপের ও আমেরিকার বন্দরগুলিতে যাতায়াত করে সেগুলি পথিমধ্যে অনেক ভাল বন্দরে মাল উঠাইবার ও নামাইবার সুযোগ পায়। এই পথে বহু বড় বড় বন্দর আছে; যথা—ইউরোপে লণ্ডন, লিভারপুল, এ্যান্টোয়ার্প, রটারডাম, মার্সাই, জেনোয়া,

ওডেসা, আফ্রিকার আলেকজান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ, মোম্বাসা, এশিয়ার এডেন, করাচী, কলম্বো ইত্যাদি। সুয়েজখালের আর একটি প্রধান সুবিধা এই যে ইহার মধ্যপথে জাহাজাদির ইন্ধনদ্রব্য ( fuel ) প্রচুর পাওয়া যায়। মধ্যপথে মিশরে, আরবে, ইরাণে ও ইরাকে পেট্রোল এবং পশ্চিম প্রান্তে ইউরোপে কয়লা মেলে। সুয়েজখাল দিয়া দৈনিক প্রায় ৫০টির বেশি জাহাজ যাতায়াত করে। এই খাল দিয়া যত মাল যাতায়াত করে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি অংশ ব্রিটেনের এবং বাকী অংশ যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জাপান প্রভৃতি দেশের।




ব্যবসা-বাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্ব এত অধিক হওয়া সত্ত্বেও: খালটিকে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিশূন্য বলা যায় না। কেন-না এই খালটি সংকীর্ণ হওয়ার জন্য অধুনা নির্মিত খুব বড় বড় জাহাজগুলি উহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। বর্তমানে এই অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে মাত্র ১২ ঘণ্টার কিছু অধিক সময়েই খুব বড় জাহাজও সুয়েজখালের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছিতে পারে। এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে হইলে কর দিতে হয়। পূর্বে এই করের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত ব্যাহত হইত। বর্তমানে অবশ্য এই করের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাওয়ায় পূর্ব অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনানুসারে ( কনষ্টান্টিনোপল কনভেনশন—১৮৮৮ সাল ) যুদ্ধ এবং শান্তি যে কোন

সময়ে যে কোন দেশের জাহাজ নিজ জাতীয় পতাকাসহ এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারে।*

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির নিকট সুয়েজখালের গুরুত্ব খুব বেশি। সুয়েজ পথকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের প্রধানতম যোগাযোগ বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এই খাল মারফত মধ্য-প্রাচ্যের তৈল-ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করে। আরবের তৈল ট্যাঙ্কার জাহাজযোগে সুয়েজ মারফত ইউরোপে ও আমেরিকায় যায়। সুতরাং, এই খাল দিয়া জাহাজগুলির চলাচল খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের দেশগুলি তাহাদের প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ ভাগ পেট্রোলিয়াম সুয়েজখাল পথে আমদানি করে।

সুয়েজখাল পথে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি হইতে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য, যথা—বস্ত্র, ইস্পাতদ্রব্য, নানাপ্রকার যানবাহন, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা হইতে গম, যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে প্রধানতঃ সুয়েজখাল পথেই আসে। এশিয়ার দেশগুলি হইতে চা, তামাক, পাট, তৈলবীজ, চর্ম, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, খনিজ তৈল, তুলা, রবার প্রভৃতি নানাপ্রকার কাঁচামাল ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। অষ্ট্রেলিয়ার গম ও পশম এবং পূর্ব আফ্রিকার তুলা, চা প্রভৃতিও এই পথের মারফত ইউরোপের বাজারে পৌঁছায়।

**Q. 107. Describe the importance of the Panama Canal route and show that the commercial development of western coastal regions of North and South America has been due to the opening of this Canal. Also, give a description of the Canal.**

**[ পানামা খালের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উহার বর্ণনা দাও। এবং দেখাও যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক উন্নতি এই খাল পথ প্রস্তুতির জন্যই সম্ভব হইয়াছে।**

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী পানামা যোজকটি আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। সুয়েজখাল খনন করিবার পরে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করিয়া অপর একটি খাল খনন করিবার কথা সকলেই চিন্তা করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত পানামা খালের পরিকল্পনা স্থির হয়। ১৯০৭ সালে এই খালের খনন কার্য শুরু হয়। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে ১৯১৪ সালে পানামা খালে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। দৈর্ঘ্যে এই

* ১৯৬৭ সালের জুন মাস হইতে দুই বৎসরের বেশি সুয়েজ খাল বন্ধ থাকে—পূর্বপারে ইস্রেলী এবং পশ্চিম পারে আরবরা সুয়েজ খাল বরাবর কামানের গোলা বিনিময় করিতে থাকায় প্রাচীন কেপ পথেই পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য চলিতে থাকে।

খালটি প্রায় ৪১ মাইল দীর্ঘ। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর অঞ্চল হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অঞ্চল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল। ইহার গভীরতা কোন স্থানেই ৪০ ফুটের কম নয়। খালটি পার্বত্য অঞ্চলকে ভেদ করিয়া গিয়াছে। সুতরাং, জাহাজগুলিকে লকগেটের সাহায্যে এবং শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দ্বারা ৮৫´ ফুট উচ্চে গর্টূন হ্রদ নামক কৃত্রিম হ্রদে তুলিতে হয় এবং পুনরায় অপর দিকের গেট দিয়া ধাপে ধাপে নামাইয়া দিতে হয়। এই খালটি পার হইতে প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

এই খালটি খনন করিবার ফলে একদিকে যেমন অনেক নূতন শহর ও বন্দরের সৃষ্টি হইয়াছে অপরদিকে তেমনি পূর্ব প্রচলিত পথের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইতিপূর্বে আমেরিকার পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলের ভিতর যাতায়াত করিতে হইলে ম্যাগেলান প্রণালী ঘুরিয়া যাইতে হইত। কিন্তু এই খাল খনন করিবার ফলে আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের সহিত আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই খাল পানামা রাজ্যের মধ্যে হইলেও খাল সন্নিহিত অঞ্চলটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীন।

বাণিজ্য জগতে পানামার প্রভাব অসামান্য। ইহা থাকার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল এবং উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলের মধ্যবর্তী দূরত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। এই খাল খনন করিবার ফলে উভয় অঞ্চলের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বেশি পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডের দূরত্ব এই খাল খনন করিবার ফলে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং ইউরোপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ড যাইবার এক নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন সমুদ্রপথে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূলের দূরত্ব প্রায় ৭০০০ মাইল কমিয়া গিয়াছে। পানামা খাল খনন করিবার পূর্বে এই দুই উপকূলের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য ( Sea borne trade ) একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হইতে ইউরোপের দূরত্ব ৫০০ মাইলেরও বেশি সংকুচিত হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, চিলি এবং কলম্বিয়া রাজ্য পানামা খাল মারফত ইউরোপ এবং পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলির নিকটতর হওয়ায় উহাদের বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সুয়েজখাল যতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ইহার প্রভাব অবশ্য ততটা নয়। কারণ ইহার দুই পার্শ্বে সুয়েজ অঞ্চলের মত ঘনবসতিপূর্ণ এবং শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত কোন দেশ নাই। এক প্রান্তে সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে আশ্রয় ও বন্দরের অভাবও খুব বেশি। এই

দিক দিয়া সুয়েজ খালের তুলনায় পানামা খালের অসুবিধা অনেক বেশি। পানামা খালের জাহাজ লইবার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ( যুদ্ধপূর্বকালে দৈনিক ২৬টি জাহাজ পানামা খাল দিয়া যাইতে পারিত এখন অনেক বেশি জাহাজ যাইতে পারে। ) বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এমন কি একটু উত্তরে আর একটি জাহাজ গমনোপযোগী খাল কাটার কথাও উঠিয়াছে। পানামা খাল পানামা নামক স্বাধীন দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কিন্তু খালের নিকটস্থ অঞ্চলটি মার্কিনদের অধিকারে আছে।

**Q. 108. Compare and contrast the trade which passes through the Suez and the Panama Canal. (C. U. 1955)**

**[ সুয়েজ খাল ও পানামা খালের মধ্য দিয়া বাণিজ্যিক পণ্য আদান-প্রদানের তুলনামূলক আলোচনা কর। ]**

সুয়েজ ও পানামা খালদ্বয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। তবে ইহাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ নিম্নে বর্ণনা করা হইল—

| সুয়েজ খাল | পানামা খাল |
|---|---|
| (১) ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির দূরত্ব হ্রাস করিয়াছে—বোম্বাই হইতে লিভারপুল যাইতে হইলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যতদূর হয় তাহা অপেক্ষা সুয়েজ মারফত দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল কম। | (১) ইহা প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর তটের বন্দরগুলির সঙ্গে আটলান্টিক তটের বন্দরগুলির দূরত্ব হ্রাস করিয়া বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করিয়াছে। লণ্ডন হইতে স্যানফ্রান্সিস্‌কো যাইতে হইলে পানামা খালই সংক্ষিপ্ত পথ। |
| (২) এই খাল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রভাবিত একটি কোম্পানীর অধীন ছিল। বর্তমানে এখানে মিশরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খালটি মিশরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। | (২) এই খালটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্তৃত্বাধীন। মধ্য আমেরিকার পানামা রাজ্যের যে অঞ্চল দিয়া এই খাল কাটা হয়, উহাও যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। |
| (৩) এই খালপথে পূর্বে প্রধানতঃ ব্রিটিশ জাহাজই চলিত, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান দেশগুলি এই পথে। কিন্তু বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল চালানে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় | (৩) এই পথে প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজই চলে। এই পথেই ক্যালিফোর্নিয়ার খনিজ তৈল এবং তুলা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে জাহাজযোগে পাঠানো হয়। অবশ্য |

| সুয়েজ খাল | পানামা খাল |
|---|---|
| উহার জাহাজের সংখ্যা এই পথে ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া জার্মান, ইটালিয়ান, জাপানী ও নরওয়ের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যাও কম নয়। | ব্রিটিশ জাহাজগুলিও নিউজিল্যাণ্ড ও পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া যাইতে এই পথ ব্যবহার করে। পেরু ও চিলির সহিত ইউরোপের বাণিজ্যও এই পথেই চলে। |
| (৪) এই খালপথে বেশ বড় জাহাজ যাইতে পারে। ১০৩ মাইল যাইতে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে—কারণ খালটি বালুকাময় মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়াছে। | (৪) মাত্র ৪০ মাইল লম্বা এই খালটি পার হইতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে, কারণ বড় বড় জাহাজগুলিকে লকগেটের সাহায্যে ৮৫' ফুট উচ্চে উঠাইতে ও নামাইতে হয়। |
| (৫) এই খালের কর খুব বেশি। প্রত্যেক জাহাজকে এই শুল্ক দিতে হয়। | (৫) এই খালের কর বেশি নয়। যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত সকলকেই কর দিতে হয়। |
| (৬) এই পথে ভারত মহাসাগরের চতুর্দিকের অঞ্চল হইতে ভূমধ্যসাগরের ও আটলান্টিক মহাসাগরের তীরস্থ অঞ্চলে প্রধানতঃ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য চালান যায় এবং বিপরীত পথে অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এশিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রধানতঃ শিল্পিত পণ্য চালান যায়। | (৬) এই খালপথে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের অনুন্নত দেশগুলি হইতে আটলান্টিক মহাসাগর অঞ্চলের উন্নত দেশগুলিতে প্রধানতঃ খাদ্য ও কাঁচামাল এবং বিপরীত মুখে অর্থাৎ চিলি, পেরু প্রভৃতি রাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের তটভাগে শিল্পিত পণ্য চালান যায়। |
| (৭) এই পথের মধ্যভাগে যেমন মরুঅঞ্চল আছে তেমন দুই দিকেই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ঘনবসতি সম্পন্ন দেশগুলি থাকায় এই খালে পানামা খাল অপেক্ষা অনেক বেশি জাহাজ চলাচল করে। ইহার রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বও খুব বেশি। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের উপর বৃহৎ শক্তিগুলির লুব্ধ দৃষ্টি রহিয়াছে। | (৭) এই খালের নিকটস্থ অঞ্চলগুলি অনুন্নত এবং ঐ অঞ্চলের জলবায়ুও উষ্ণ। পানামা খালের দুইদিকে দুই বিশাল মহাসাগর অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বভাগে কোন উন্নত দেশ বা বড় দ্বীপ নাই বলিয়া ইহার মোট বাণিজ্যের পরিমাণ সুয়েজ খালের তুলনায় কম। |
| (৮) সুয়েজ পথে আরব ও ইরাণের তৈল, পাকিস্তানের তুলা ও পাট, ভারতের তামাক, চা, চর্ম দ্রব্য, ও পাটদ্রব্য, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার চা, | (৮) এই পথে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিকের দিকে যায় ক্যালিফোর্ণিয়ার তৈল ও ফল, ভ্যাঙ্কুভারের কাঠ ও মাছ, চিলির তাম্র আকরিক ও |

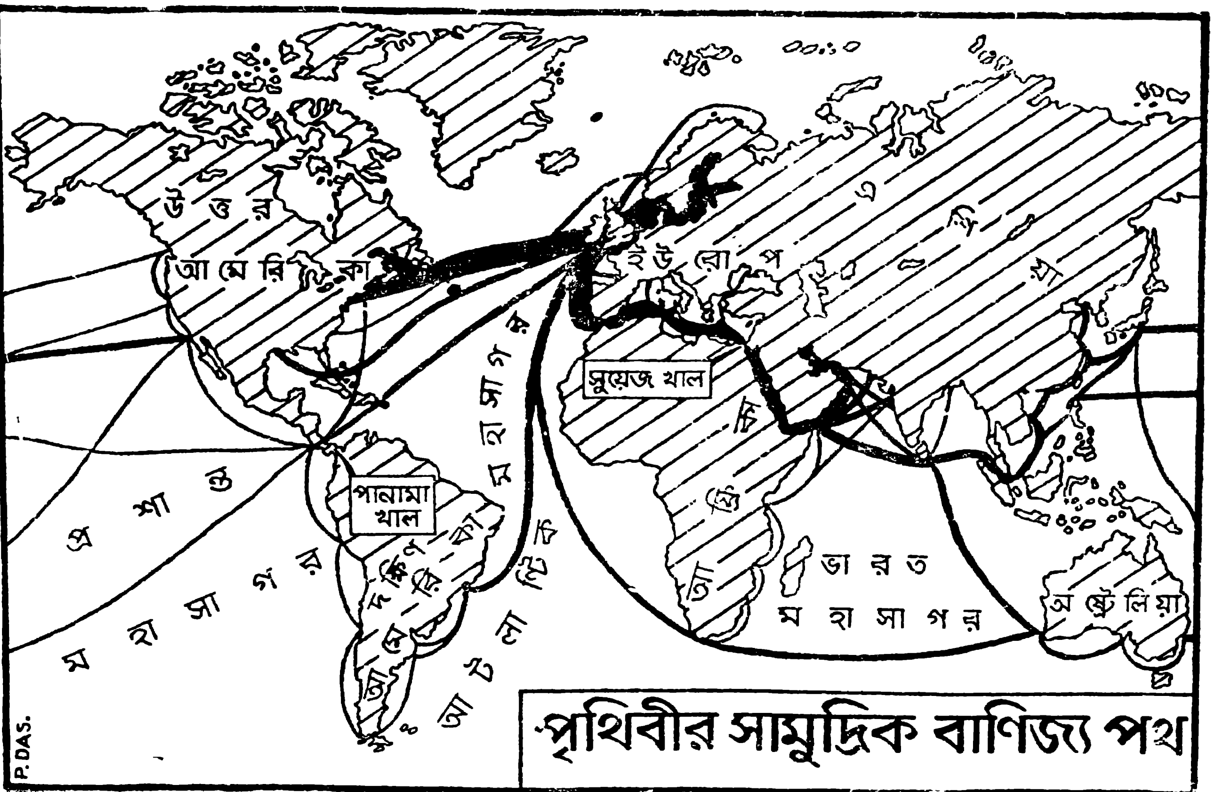
| সুয়েজ খাল | পানামা খাল |
| --- | --- |
| মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার রবার, চীন ও জাপানের রেশম, পূর্ব আফ্রিকার তুলা, অষ্ট্রেলিয়ার গম, পশম প্রভৃতি ইউরোপ অথবা আমেরিকায় চালান যায়। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আসে মোটরগাড়ি, ইঞ্জিন, বস্ত্রাদি, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাদি। | নাইট্রেট, হাওয়াই ও ফিজির চিনি, জাপানের রেশম, বলিভিয়ার টিন এবং নিউজিল্যাণ্ডের দুগ্ধজাত দ্রব্য। বিপরীত মুখে যায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ ও ইউরোপ হইতে মোটরগাড়ি, কৃষিজ দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি, ঔষধ ও লৌহদ্রব্য। |

**109. What are the advantages of ocean transport? Name the principal ocean trade routes of the world and describe their functions.**

**[ সমুদ্র পথের সুবিধাগুলি কি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথগুলির নাম কর এবং তাহাদের কার্যের গুরুত্ব আলোচনা কর। ]**

**সমুদ্র পথেই** পৃথিবীর অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচল করে। পৃথিবীতে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ অনেক বেশি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং, এক দেশ হইতে অপর দেশে কোন মাল প্রেরণ করিতে হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা সমুদ্রপথ মারফত প্রেরণ করিতে হয়। তাহা ছাড়া সমুদ্রপথে মাল প্রেরণ করা অল্পব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং বর্তমান যুগে সুবৃহৎ বাষ্পচালিত ( Steamship ) ও পেট্রোলচালিত দ্রুতগামী জাহাজের ব্যবস্থা থাকায় সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের তুলনায় সমুদ্রপথে বিপদের ভয় এখন নাই বলিলেই চলে। সমুদ্রপথে যে কোন জাতির যে কোন আকারের বাণিজ্য-জাহাজ ( ২।৩ শত টন হইতে তিন লক্ষাধিক টনের Supertanker পর্যন্ত ) যে কোন দিকে যখন খুশি যাতায়াত করিতে পারে। সমুদ্রপথ প্রকৃতির মহৎ অবদান—তাই আজ সকল সভ্যদেশের মানুষ সমুদ্রপথে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিতেছে। সুবিশাল মহাসমুদ্রে কোন সুনির্দিষ্ট পথ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু এক বন্দর হইতে অপর বন্দরে যাইবার জন্য কতকগুলি মোটামুটি নির্দিষ্ট পথ আছে; এই পথগুলি নিরাপদ এবং দুই বন্দরের মধ্যে স্বল্পতম পথ। সাধারণতঃ সমুদ্রে জাহাজের পথ ঠিক সরলরেখার মত হয় না, কারণ পৃথিবী সমতল নহে, উহা গোলাকার; সুতরাং, মানচিত্রে দেখা যায় যে, জাহাজের পথগুলি একটু বাঁকা। ঐ বাঁকা পথগুলিই দুই বন্দরের মধ্যে স্বল্পতম পথ। এখানে দুইটি প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল :—

**(১) উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্য পথ ( North Atlantic Trade Route )**—উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের অবস্থান বাণিজ্যের দিক হইতে অত্যন্ত


পৃথিবীর সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
অষ্ট্রেলিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
সুয়েজ খাল
পানামা খাল
P.DAS.

গুরুত্বপূর্ণ। এই মহাসাগরের পূর্বপারে শিল্পসমৃদ্ধ জনবহুল ইউরোপ মহাদেশ এবং পশ্চিম পারে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র এবং সম্পদশালী দেশ কানাডা। এই মহাসাগরের উভয়পারের জাতিগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং মৎস্য ব্যবসায়ে অত্যন্ত উন্নত। কলম্বসের উত্তর আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বেও নরওয়ের নাবিকেরা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও লাব্রাডার অঞ্চলে মাছ ধরিতে যাইত। তখন হইতে আজ পর্যন্ত উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্য পথের গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ইহাই পৃথিবীর সর্বপ্রধান বাণিজ্যপথ ; পৃথিবীর বৃহত্তম এবং আধুনিকতম সহস্র সহস্র জাহাজ প্রতি বৎসর এই পথে যাতায়াত করে।

উত্তর আমেরিকার দেশগুলি, খনিজ, আরণ্যজ ও প্রাণিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। ঐ সকল পণ্য উত্তর আমেরিকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়। কারণ প্রথমতঃ, সম্পদগুলির সংস্থান অত্যন্ত ব্যাপক এবং দ্বিতীয়তঃ, উত্তর আমেরিকার লোকসংখ্যা কম হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অসাধারণ শিল্পপ্রসার হইয়াছে। ঐ দেশগুলি প্রচুর পরিমাণে ইস্পাত দ্রব্য, খনিজ তৈল, কাগজ এবং বস্ত্রাদি রপ্তানি করিয়া থাকে। অপরপক্ষে, ইউরোপে অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বপারের লোকসংখ্যা অত্যধিক ঘন। বহু লোক প্রতি বৎসর উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে বাস করিতে যায়। ব্রিটেনের সাউদাম্পটন, ফ্রান্সের শেরবুর্গ ও হ্যাভার এবং জার্মানীর হামবার্গ বন্দর হইতে বড় বড় যাত্রীবাহী জাহাজগুলি কানাডার মন্ট্রিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ফিলাডেল-ফিয়া প্রভৃতি বন্দরে যাতায়াত করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে অসংখ্য বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু মহাদেশটির পশ্চিম অংশে কাঁচামালের সংস্থান যথেষ্ট নহে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র হইতে কার্পাস শিল্পের জন্য তুলা, মোটরগাড়ির জন্য পেট্রোল, তামাক শিল্পের জন্য তামাক এবং কানাডা হইতে কাগজ শিল্পের কাঁচামাল মণ্ড ও কাষ্ঠ আমদানি করিতে হয়। তাহাছাড়া, পশ্চিম ইউরোপের জনসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় খাদ্যও আমদানি করিতে হয়। অধিকাংশ প্রয়োজনীয় গম আসে কানাডার মন্ট্রিল, হ্যালিফাক্স ও চার্চিল বন্দর এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বন্দর মারফৎ ঐ দুই দেশ হইতে। তাহাছাড়া যব, ভুট্টা প্রভৃতি পশুখাদ্য এবং মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতিও আমদানি করিতে হয়। উত্তর আমেরিকাও চা, ম্যাঙ্গানিজ, পাট প্রভৃতি ক্রয় করে এবং ঐগুলির অধিকাংশই সোজাসুজি যে দেশে পাওয়া যায় সেখান হইতে না কিনিয়া ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে কিনে। ইউরোপ হইতে প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রাদি এবং বিলাসদ্রব্য ( যথা—ফ্রান্স ও ইটালীয় মদ্য, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি ) উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে রপ্তানি হয়।

উত্তর আটলান্টিক পথ পৃথিবীর প্রধানতম বাণিজ্যপথ হইলেও পথটিতে কিছু অসুবিধা আছে। এই পথে অত্যন্ত কুয়াশা হয় এবং মাঝে মাঝে ভাসমান হিমশৈল দেখা যায়। ঐগুলি জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তবে আধুনিক যুগে রাডার যন্ত্রাদির সাহায্যে ঐগুলি এড়াইয়া চলা যায়। শীতকালে যখন সেন্টলরেন্স নদীর মোহনা বরফে জমিয়া যায় তখন উত্তর আটলান্টিক পথের কিছু পরিবর্তন হয়। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উভয়তটেই ভাল ভাল গভীর জলযুক্ত পোতাশ্রয় আছে। সুতরাং, পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজগুলি এই পথে অনায়াসে চলাচল করে।

(২) **সুয়েজখাল পথ** (Suez Canal Route)—106 নং প্রশ্নোত্তর পাঠের পর নিম্নাংশ লিখিতে হইবে।

সুয়েজখাল পথে যে বাণিজ্য পরিচালিত হয়, তাহা মোটামুটি এই—ইউরোপ পাঠায় বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্য এবং গ্রহণ করে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়া হইতে পাট, চা, রবার, তুলা, রেশম, পশম, গম, তৈলবীজ, চর্ম, নানাপ্রকার খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি। এই পথের দুই প্রান্তে কতকগুলি প্রধান বন্দরের নাম—ইউরোপের (১) লণ্ডন, (২) লিভারপুল, (৩) হ্যামবার্গ, (৪) রটারডাম, (৫) এণ্টোয়ার্প, (৬) মার্সাই, (৭) নেপল্‌স ও আফ্রিকার—(৮) আলেকজান্দ্রিয়া। এশিয়ার—(৯) কলিকাতা, (১০) বোম্বাই, (১১) করাচী, (১২) সিঙ্গাপুর, (১৩) হংকং, (১৪) আবাদান ও (১৫) কলম্বো এবং অষ্ট্রেলিয়ার—(১৬) ফ্রিমেণ্টাল।

বিমানপথ-

**Q. 110. Give a brief account of the chief air routes of the world.**

[ পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিমান পথগুলির বর্ণনা দাও। ]

বিমান পথের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বিগত ( ১৯১৪-১৯ ) মহাযুদ্ধের পর বিমান পথের উন্নতি অতি দ্রুত ঘটিয়াছে। বিমান পথে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে সুদূর পথ অতিক্রম করা যায়। ইহা ছাড়া, সমুদ্র ও পাহাড়-পর্বতের জন্য কোন অসুবিধা বিমান পথে নাই। বর্তমানে ডাকের চিঠি-পত্রাদি মালপত্র এবং যাত্রী বহন করিবার কাজে বিমানপোতের ব্যবহার হইতেছে। রেল বা জলপথের তুলনায় বিমান পথ একটু বেশি ব্যয় সাপেক্ষ। আকাশ পথে চলাচল ব্যবস্থা আবহাওয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রচুর বৃষ্টিপাত বা অত্যধিক তুষারপাত হইলে সাময়িক ভাবে আকাশপোত চলাচল ব্যাহত হয়। ভূমিতে কুয়াশা হইলে আকাশযানের পক্ষে অবতরণ করা খুবই বিঘ্নসংকুল হয়। সমতল ভূমিতে আকাশপোতের পক্ষে অবতরণ

করা সহজ। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং কানাডায় আকাশপোত চলাচল-ব্যবস্থা খুবই উন্নত হইয়াছে।

আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের স্থান এ বিষয়ে সর্বপ্রথম। এখান হইতে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য পথে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল করে। উহাদের মধ্যে ট্রান্স ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ, প্যান আমেরিকান ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ প্রভৃতি প্রধান। ব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান প্রতিষ্ঠান হইতেছে ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন। ভারত ও পাকিস্তানেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিমান চলাচল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর আকাশপথগুলি মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমান পথ। (২) ইউরোপ, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ। (৩) ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ। (৪) আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ এবং (৫) সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানপথ (সম্প্রতি দিল্লী হইতে টাসকেণ্ট হইয়া পাক, ভারতীয় ও রুশ বিমান মস্কো হইয়া লণ্ডন যাতায়াত করিতেছে)। ইউরোপ এবং আমেরিকার ভিতরে প্রধানতঃ ফরাসী, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ বিমান যাতায়াত করে।

ইউরোপ, এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার ভিতর বিমান চলাচল ব্যবস্থা ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ, ভারতীয়, জাপানী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, ব্রিটিশ প্রভৃতি জাতির বিমান দ্বারা পরিচালিত হয়। এই পথ লণ্ডন হইতে আরম্ভ হইয়া জেনেভা, কায়রো, করাচী, দিল্লী, কলিকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া মেলবোর্ণে গিয়া শেষ হয়। ইউরোপ ও আফ্রিকার ভিতরের বিমান চলাচল ব্যবস্থা ইটালিয়ান, ফরাসী এবং ব্রিটিশ বিমানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিমানপথ আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে উত্তর মেরু অতিক্রম করিয়া জাপানে গিয়াছে। ইহা খুব কম দূরের পথ।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়া আমেরিকা এবং এশিয়ার ভিতরে বিমান চলাচল ব্যবস্থা প্রধানতঃ আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল ব্যবস্থার কর্তৃত্বাধীন। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রে আকাশপোতের উন্নতি হইবার ফলে সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতের বিমানগুলিও এখন দেশের মধ্যে ও বাহিরে বহুস্থানেই যাত্রী ও মাল বহন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতীয় বিমান বর্তমানে লণ্ডন, বোম্বাই, কলম্বো, রেঙ্গুন, ব্যাঙ্কক, হংকং, টোকিও, সিঙ্গাপুর, কাবুল, মস্কো প্রভৃতি নগরের মধ্যে নিয়মিত ভাবে চলাচল করে। কলিকাতার বিমানবন্দর দমদম পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বিমানকেন্দ্র। পৃথিবীর অপরাপর বৃহৎ

বিমানবন্দর—লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, নিউইয়র্ক, শিকাগো, কায়রো, হংকং, করাচী, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি।

**Q. 111. Discuss the effect of the development of air routes upon the economic life of a country.**

**[ বর্তমান জগতে বিমানপোত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আলোচনা কর। ]**

বর্তমান জগতে বিমানপোত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে বিমানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; যথা—(১) ইহা সর্বাপেক্ষা দ্রুত চলে (২) ইহার জন্য কোনরূপ পথ নির্মাণ করিতে হয় না। বহু দূরে দূরে কয়েকটি আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত বিমান ঘাঁটি রাখিলেই চলে। হেলিকপটার নামক বিমান আবার যেখানে সেখানে নামিতে পারে। (৩) বিমানপোত যে কোন প্রাকৃতিক বাধা, যথা—পর্বত, মরুভূমি, তুষারক্ষেত্র প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারে। (৪) ইহা না অবতরণ করিয়া হাজার হাজার মাইল যাইতে পারে। (৫) ইহা সোজাপথে চলে। (৬) ইহা আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। (৭) ইহা চালাইতে খরচ অত্যন্ত বেশি।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতে বিমানপথের অভাবনীয় প্রসার হইয়াছে। স্বাধীনতার পরেই পাঞ্জাব হইতে লোক অপসারণের জন্য বিমান একান্ত প্রয়োজন হয়। রেলপথ তখন নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ভারতে বিমান পরিবহণের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন হয় তখন, যখন ভারত বিভাগের ফলে আসাম অবশিষ্ট ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। •বর্তমানে প্রতিদিন বহুসংখ্যক বিমান ব্যারাকপুর বিমান বন্দর হইতে উত্তর বঙ্গের বাগডোগরা, আসামের ধুবড়ি, গৌহাটি, ডিব্রুগড় প্রভৃতি বিমান বন্দর ও ত্রিপুরার আগরতলায় সারাদিন ধরিয়া মাল বহন করে। চা, লেবু প্রভৃতি কলিকাতায় চালান আসে এবং ফিরতি বিমানগুলি বস্ত্র, ঔষধাদি লইয়া যায়। তাহা ছাড়া, কাশ্মীরের সঙ্গেও ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিমানপথে সকল সময়েই রক্ষিত হয়। শীতকালে তুষার পাতের ফলে বানিহাল পথ বিপজ্জনক হইলে বিমানেই অধিক পণ্য সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ভারতের সকল কর্মব্যস্ত ব্যক্তিবর্গ আকাশপথেই যাতায়াত করেন। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টায় দিল্লী যাওয়া যায়। বাণিজ্যের দিক হইতে যদিও অত্যধিক খরচের জন্য বিমান পথের ব্যবহার কম তবু দ্রুত পচনশীল মৎস্য ও ফল চালানি কারবার বিমানপথেই ভাল চলে। মালদহের আম এখন বিমানের কল্যাণে লণ্ডনেও পাওয়া যায়। ভারত হইতে বানরাদি বহু জীবজন্তু বিমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়; কারণ জাহাজে উহাদের যে পরিমাণ খাদ্য লাগে বিমানে তাহা লাগে

না; তাই খরচ কম হয়। বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিমানে পাঠানো নিরাপদ, কারণ চুরি ডাকাতির ভয় কম। কেবল বর্ষার কয়েক মাস ছাড়া অন্য সময় ভারতের আবহাওয়া বিমান চলাচলের পক্ষে খুব উপযুক্ত থাকে কারণ ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতে কুয়াশার ভয় খুব কম।

ভারতের বাহিরে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বড় বড় এবং উন্নত দেশে বিমান পথের প্রসার খুব বেশি হইয়াছে। যেখানেই অন্য যানবাহন ব্যবস্থা নাই, সেখানেই বিমানের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। সাইবেরিয়ার উত্তরে যে বিশাল তুষারময় অঞ্চল রহিয়াছে সেখানেও "স্কী" লাগানো বিমান খাদ্য সম্ভার লইয়া বরফের উপর অবতরণ করে। খনি শ্রমিকরা ঐ খাদ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। ফিরিবার পথে ঐ বিমানগুলি খনিজ দ্রব্য বাহিয়া আনে। মানুষ চলাচলেরও উহাই একমাত্র পথ। বন্যার সময় এখন সকল দেশেই বিমান হইতে খাদ্য, ইন্ধন ও ঔষধ নিক্ষেপ করা হয়। হেলিকপটার নামিয়া বন্যায় আটক দুর্গতদের সরাইয়া আনে। ভারতের আসামে প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ঐরূপ সেবা কার্য করিতে হয়। কোথাও অসুখ দেখা দিলে জরুরী প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ডাক্তার বিমানে পাঠানো হয়।

এপর্যন্ত পৃথিবীতে ডাক ও যাত্রী বহনই বিমানের প্রধান কাজ। যাত্রী বহনকারী আধুনিক বিমানগুলির এক একটি প্রায় ৩।৪ শত জন যাত্রী বহন করিয়া ঘণ্টায় ছয় শতাধিক মাইল বেগে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ৩০।৪০ হাজার ফুট উপরে—অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টির উপর দিয়া একবারও না থামিয়া তিনহাজার মাইল বা আরও বেশিপথ অনায়াসে যাতায়াত করে। এই আধুনিক বিমানগুলি যুক্তরাষ্ট্র ( বোইং এবং ডি, সি, ), ব্রিটেন ( Sper V. C. ) ও রাশিয়ায় ( টি, ইউ ১১৪ ) প্রস্তুত হয়। কিছু ছোট আকারের প্রায় সমান শক্তিশালী বিমান ব্রিটেন এবং ফ্রান্সেও প্রস্তুত হয়। তবে আমেরিকায় ও রাশিয়ায় যে সকল অতিকায় বিমান প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে অল্প খরচে ভারী জিনিসও বিমানে লইয়া যাওয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের জন্য যুদ্ধ-বিমান আজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

( ভারতের বিমানপথ—তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য )

# বন্দর ও পশ্চাদ্‌ভূমি

## PORT AND HINTERLAND

**Q. 112. What is a port? Illustrate your answer with special reference to an Indian sea port?**

**[ বন্দর কাহাকে বলে ? একটি ভারতীয় উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যকে পরিষ্কার কর। ]**

যেখানে স্থলভাগ এবং জলভাগের বাণিজ্যপথগুলি একত্রিত হইয়াছে তাহাকে *বন্দর (port) বলা হয়। সুতরাং, বন্দরের প্রধান কার্য হইল স্থলভাগের যানবাহন হইতে পণ্যাদি জলযানে স্থানান্তরিত করা এবং জলযান হইতে আবার স্থলভাগের রেলগাড়ি, ট্রাক প্রভৃতি মারফত পণ্যাদি স্থানান্তরিত করা। বন্দরগুলি বিভিন্ন দেশের বহির্বাণিজ্যের বা উপকূল বাণিজ্যের দ্বার স্বরূপ। অবশ্য নদী-বন্দর বা খাল-বন্দরগুলি সাধারণতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়। অনেক নদীবন্দর আছে ( যেমন—কলিকাতা, লণ্ডন, সাংহাই, হ্যামবার্গ প্রভৃতি ) যেখানে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে।

বন্দর গঠনের জন্য সমুদ্রতীরে বা নদীতে গভীর জল থাকা প্রয়োজন। সমুদ্র বন্দরের জন্য আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন। ভগ্নতটে ভাল ভাল পোতাশ্রয় ( অর্থাৎ জাহাজ যেখানে ঝড়ঝাপটায় নিরাপদ আশ্রয় পাইতে পারে ) দেখা যায়। ভাল স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথ সংকীর্ণ অথচ গভীর হয় এবং অভ্যন্তরভাগে সুবিস্তৃত ও গভীর জলরাশি থাকে—যাহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি জাহাজ আশ্রয় পাইতে এবং মাল আদান-প্রদান করিতে পারে। যদি সমুদ্রতটে স্বাভাবিক আশ্রয়-স্থান না থাকে তবে কংক্রিটের বাঁধ দিয়া কৃত্রিম পোতাশ্রয় ( artificial harbour ) নির্মাণ করিতে হয়। মাদ্রাজ এইরূপ কৃত্রিম পোতাশ্রয়। এইরূপ পোতাশ্রয়ে স্থানাভাব থাকায় এক সঙ্গে বেশি জাহাজ আশ্রয় পায় না। বোম্বাই ভারতের একটি সুন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়।

**বোম্বাই**—বোম্বাই ভারতের প্রধান বন্দর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। বোম্বাই বন্দরটি আরব সাগরের উপর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আশ্রয়ে অবস্থিত। দ্বীপটি ভারত ভূখণ্ডের এত নিকটে যে রেলপথ স্থাপন করার কোন অসুবিধা নাই। ঐ দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত সুরক্ষিত জলভাগ বোম্বাইয়ের স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। এখানে জল খুব গভীর ও শান্ত; ঝড়ঝাপটার ভয় কম, কারণ এই স্থানটি দ্বীপের আড়ালে রহিয়াছে। বোম্বাই দ্বীপটিতে রেলপথ ও শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত স্থানের

---

*Port, harbour, roadstead, anchorage, haven এই কথাগুলির অর্থ যথাক্রমে—বন্দর, পোতাশ্রয়, পোতাশ্রয়হীন বন্দর, নোঙরঘাঁটি ও বহির্বন্দর। বিমান অবতরণ ক্ষেত্রকেও বিমান 'বন্দর' বলা হয়।

খুব অভাব নাই। বন্দরের নিকট কোন বিপজ্জনক মগ্ন চড়াও নাই। সুতরাং, বোম্বাইকে একটি প্রথম শ্রেণীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলা চলে।

পৃথিবীর ভাল ভাল পোতাশ্রয়ের মধ্যে নিউইয়র্ক, সিডনি, সানফ্রান্সিসকো ও রায়ো ডি জেনিরোর নাম করা যায়।

**Q. 113. What is Hinterland? Describe the Hinterland of any two important ports of British Isles.**

**[ পশ্চাদ্‌ভূমি কি ? দু'টি ব্রিটিশ বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির বর্ণনা দাও। ]**

কোন একটি বন্দর যে অঞ্চলের বহির্দ্বারের কাজ করে **সেই অঞ্চলকে সেই বন্দরের হিণ্টারল্যাণ্ড বা পশ্চাদ্‌ভূমি** বলা হয়। অর্থাৎ কোন বন্দরের সন্নিহিত যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্দরের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং যে সমস্ত অঞ্চলের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য ঐ বন্দর মারফত চালান যায় ও বিদেশ হইতে ঐ বন্দর মারফত আমদানিকৃত দ্রব্যাদি বন্দর সন্নিহিত যে অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়—সেই অঞ্চলগুলিকে বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলা হয়। কোন বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির খুব সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করা সম্ভব নহে, কারণ অনেক সময় একই অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য দুই বা ততোধিক বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশের পণ্যদ্রব্য বোম্বাই এবং কলিকাতা উভয় বন্দর মারফতই চালান যায়। পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত রাইন নদী অববাহিকার পণ্য দ্রব্যাদি জার্মানীর ব্রেমেন, হল্যাণ্ডের রটারডাম এমন কি অনেক সময় বেলজিয়ামের এণ্টোয়ার্প বন্দরের মারফতও রপ্তানি হয়। পশ্চাদ্‌ভূমির সীমা নির্দেশের আরও কতকগুলি সমস্যা আছে। নরওয়ের বার্গেন বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি নির্দেশ করাও কঠিন কারণ ঐ বন্দরের সন্নিহিত অঞ্চল অত্যন্ত পর্বতময় ও প্রায় জনহীন। ঐ বন্দর মারফত রপ্তানি হয় প্রধানতঃ সমুদ্রের মাছ ও অরণ্যের কাঠ। অনেক সময় পশ্চাদ্‌ভূমির পরিবর্তনও হয়। পূর্ববঙ্গ পূর্বে ছিল কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি; বর্তমানে উহা চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি।

পশ্চাদ্‌ভূমির আকার, আয়তন, লোকবসতি, শিল্পোন্নতি, যানবাহন ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। ব্রিটেনের লিভারপুল বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির আয়তন ক্ষুদ্র হইলেও জনাকীর্ণ ও শিল্পোন্নত; সুতরাং বন্দরটির বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশি। অপরপক্ষে, লিবিয়ার সাহারা মরুপ্রান্তে অবস্থিত ত্রিপলি বন্দরটির মরুময় পশ্চাদ্‌ভূমি জনহীন ও সম্পদহীন। তাই ঐ পশ্চাদ্‌ভূমি ত্রিপলি বন্দরের উন্নতি ঘটাইতে পারে নাই। তবে এখন লিবিয়ার মরুভূমি হইতে বৎসরে বহু কোটি টন পেট্রোল উৎপন্ন হইতেছে। তাই ত্রিপলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারে। আমদানি ও রপ্তানি অনুসারে বন্দরগুলিকে অনেক সময় চালানি

বন্দর ( contributory ) ও যোগানি ( distributory ) বন্দর এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু অনেক বন্দরের চালানি এবং যোগানি কার্য প্রায় সমান।

ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্যের দিক দিয়া কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পরেই স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই দেশটিতে বহু বড় বড় বন্দর রহিয়াছে ; যথা—লণ্ডন, লিভারপুল, গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টার, কার্ডিফ্, হাল, নিউক্যাসল প্রভৃতি। লণ্ডনের বহির্বাণিজ্যে পুনঃরপ্তানি ( entrepot ) দ্রব্যের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং, পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে বন্দরটির সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। এখানে লিভারপুল ও গ্লাসগো বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির বিষয় আলোচনা করা হইল।

**লিভারপুল**—এই বন্দরটি ব্রিটেনের পশ্চিমাংশে মার্সে নদীর বিস্তৃত ও গভীর মোহনায় অবস্থিত। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি সমগ্র ল্যাঙ্কাশায়ার এবং পার্শ্বস্থ উত্তর ওয়েলস্ অঞ্চল। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঘনবসতি সম্পন্ন। এখানে বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও বস্ত্রশিল্প রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ল্যাঙ্কাশায়ারে কয়লাখনিও রহিয়াছে। লিভারপুল হইতে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি, কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস তুলা ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রধান। তাহা ছাড়া চর্ম, পশম, শণ প্রভৃতি কাঁচামালও আমদানি হয়। লিভারপুলের সমগ্র পশ্চাদ্‌ভূমিতে রেলপথ ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। একটি জাহাজ গমনাগমনের উপযুক্ত সুগভীর খাল ম্যাঞ্চেষ্টারের বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। এখন আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের তুলা সোজাসুজি ম্যাঞ্চেষ্টারে যায়। কার্পাস বস্ত্রাদি লিভারপুল ছাড়া ম্যাঞ্চেষ্টার বন্দর মারফতও রপ্তানি হয়। তবু লিভারপুলের সমৃদ্ধি হ্রাস পায় নাই ; কারণ এখানকার সুবিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প রপ্তানির জন্য বিপুল পরিমাণ ইস্পাত যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

**গ্লাসগো**—এই বন্দরটি স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত। ক্লাইড নদী অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এই নদীর দুই তীরে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জাহাজ-নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর বহু দেশের জন্য এখানে জাহাজ নির্মাণ করা হয়। গ্লাসগোর নিকট বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে ; কারণ আয়ার-শায়ার, ল্যানার্ক ও ফাইফ্‌শায়ারে প্রচুর কয়লা ও নিকটেই কিছু লৌহও পাওয়া যায়। গ্লাসগোর প্রধান রপ্তানিদ্রব্য নানা প্রকার ইস্পাত যন্ত্রাদি, ইঞ্জিন, কার্পাসদ্রব্য, পশম দ্রব্য ইত্যাদি। আমদানির মধ্যে রহিয়াছে লৌহশিলা, নানাপ্রকার ধাতু, খাদ্যদ্রব্য ও নানাপ্রকার কাঁচামাল।

**Q. 114 What are the important factors that favour the development of sea ports? Illustrate your answer with conspicuous examples. ( C. U. 1952 )**

[ সমুদ্রে বন্দর গড়িয়া উঠার পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থাগুলির বর্ণনা দাও। ভাল ভাল উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ]

**Or, Describe the conditions that are necessary for the development of good sea-ports. Examine and state whether those conditions are fulfilled by Liverpool, New York, Yokohama and Bombay.** ( C. U. 1959 )

[ ভাল সমুদ্র-বন্দর গড়িয়া তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা কর। লিভারপুল, নিউইয়র্ক, ইয়াকোহামা এবং বোম্বে ঐ অবস্থাগুলি দ্বারা প্রতিপালিত কিনা পরীক্ষা কর। ]

**সমুদ্র বন্দর গঠনের সুবিধা**--পৃথিবীর বাণিজ্যের অধিকাংশই সমুদ্রপথে সমুদ্রবন্দরগুলি মারফত পরিচালিত হয়। সমুদ্রবন্দর উন্মুক্ত সমুদ্রতটে গঠিত হয় না। কারণ জাহাজ যখন মাল উঠায় বা নামায় তখন তরঙ্গের আঘাতে উহা যাহাতে বিপন্ন না হয় তাহার জন্য পোতাশ্রয়ের প্রয়োজন। ভগ্নতটভাগে ঐ প্রকার পোতাশ্রয় দেখা যায়। নদীর মুখও পোতাশ্রয়ের কাজ করে। লিভারপুল, কলিকাতা, লণ্ডন প্রভৃতি সমুদ্র বন্দরগুলি নদীর গভীর ও প্রশস্ত মুখে (escuary ports ) অবস্থিত। নিউইয়র্ক এবং বোম্বাই বন্দর সমুদ্রতটে দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত সুরক্ষিত পোতাশ্রয়। ইয়োকোহামা ও সানফ্রান্সিসকো আশ্রয়যুক্ত উপসাগরতটে অবস্থিত সমুদ্র বন্দর। সমুদ্র বন্দর গঠন করিতে হইলে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন :-

(১) বন্দরে প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম পোতাশ্রয় ( harbour ) থাকা দরকার যাহাতে ঝড়বাতাসের কবল হইতে জাহাজগুলি রক্ষা পাইতে পারে। **ভগ্নতটরেখা** বন্দর গঠনের পক্ষে খুব উপযুক্ত, কারণ ভগ্নতটে বহুগভীর ও প্রশস্ত খাঁড়ি দেখা যায়। অবশ্য স্থানগুলি পর্বত পরিবেষ্টিত হইলে যাতায়াতের পথ গঠন করা ব্যয়সাধ্য হয়।

(২) উপকূলের নিকটবর্তী সাগরের **জল খুব গভীর** হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সর্বপ্রকার আধুনিক জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে।

(৩) বন্দরের নিকটবর্তী সমুদ্র যদি বৎসরের বার মাসই **বরফমুক্ত** থাকে তবে খুব ভাল হয়। কেননা বরফ জমিলে জাহাজ চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়ে, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়।

(৪) বন্দরের নিকট **যথেষ্ট স্থান থাকা চাই** যাহাতে জাহাজ মেরামতের জন্য প্রচুর স্থান পাওয়া সম্ভব হয়।

(৫) বন্দরের নিকট **সমতলভূমি** থাকিলে শহর নির্মাণ, রেলপথ, মালগুদাম প্রভৃতি স্থাপন এবং কারখানা গঠনের সুবিধা হয়।

**কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ বন্দর গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সামাজিক পরিবেশও অনুকূল হওয়া দরকার। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলিও থাকা দরকার :—**

(ক) **পশ্চাদ্‌ভূমি ঘন লোকবসতিপূর্ণ** এবং শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হওয়ার উপরেই মোটামুটিভাবে বন্দরের গুরুত্ব নির্ভর করে।

(খ) বন্দর হইতে দেশের **অভ্যন্তরে যাতায়াতের ব্যবস্থা** খুব উন্নত হওয়া চাই যাহাতে দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত বন্দরের যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ হয়।

(গ) জাহাজ মেরামতের সুবিধা অর্থাৎ ড্রাইডক প্রভৃতি থাকা দরকার।

[ লিভারপুল, নিউইয়র্ক, ইয়োকোহামা এবং বোম্বাই-এর জন্য যথাক্রমে Q. 113, 117 (12), (17) এবং ভারতের পরিবহণ, নগর ও বন্দর অধ্যায় দ্রষ্টব্য ]।

**Q. 115. River ports play a vital role in the economic development of a country—Discuss.**

**[ "কোন দেশের আর্থিক উন্নয়নে উহার নদী বন্দরগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কর।" ]**

নদীর উপর অবস্থিত বন্দরকে **নদী-বন্দর** বলা হয়। নদী-বন্দর দুই প্রকার, যথা—

(ক) যে সকল নদী খুব গভীর, মোটামুটি সরলগতি ও বালুচরহীন হয়, সেই সকল নদীর উপর বহু সংখ্যক বন্দর গড়িয়া উঠে। বিশেষতঃ যেখানে দুইটি বড় নদী একত্রে মিলিত হইয়াছে সেখানে বৃহৎ নদী-বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। পূর্ব-পাকিস্তানের **গোয়ালন্দ** পদ্মা ও যমুনা নদীদ্বয়ের সঙ্গমের উপর অবস্থিত বিখ্যাত নদী-বন্দর। বড় বড় নদী-চর ষ্টিমার এখানে ধান, তৈল, পাট প্রভৃতি লইয়া যাতায়াত করে। উত্তর ভারতের **এলাহাবাদও** এই শ্রেণীর নদী-বন্দর। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে ইহা হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান এবং বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। ফ্রান্সের প্যারিস ও লিয়ঁ এবং চীনের হ্যাঙ্কাও খুব বড় নদীবন্দর। হ্যাঙ্কাও বন্দর যদিও সমুদ্র হইতে সাত শতাধিক মাইল দূরে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপর অবস্থিত তবু এখানে সমুদ্রগামী জাহাজও যাতায়াত করিতে পারে। জার্মানীর **ডাসেলর্ডফ** এবং মিশরের কায়রোও বিখ্যাত নদীবন্দর।

(খ) আর এক শ্রেণীর নদীবন্দর আছে যাহাকে নদীর প্রান্তিক বন্দর বলা হয়। কলিকাতা, হ্যামবার্গ, নিউ অর্লিয়েন্স, লণ্ডন, সাংহাই, রেঙ্গুন প্রভৃতি এই শ্রেণীর নদীবন্দর। এই বন্দরগুলির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানে বড় বড় সমুদ্রগামী পোত এবং নদীচর নৌকা এবং জাহাজ উভয়ই যাতায়াত করে। এখানকার প্রধান বাণিজ্য হইল মাল বদল করা ( transhipment ); কলিকাতা বন্দরের কার্যও এইরূপ। কোন্নগরের চটকলের ঘাট হইতে ষ্টিমারে করিয়া পাটের থলি কলিকাতা বন্দরে আসিলে উহা সমুদ্রগামী জাহাজে তুলিয়া হয়ত যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হইল। অথবা ব্যাঙ্কক হইতে সমুদ্রগামী জাহাজে পাট আসিল কলিকাতার জেটিতে। ঐ পাট নৌকায় বোঝাই করিয়া হয়ত কোন পাটকলের ঘাটে নামাইয়া

দেওয়া হইল। কলিকাতায় এই ধরণের বাণিজ্য অধিক হয়। ইউরোপের হ্যামবার্গ এবং রটারডাম বন্দরেও এই ধরণের বাণিজ্য খুব বেশি হয়। সমগ্র রাইন নদীর অববাহিকার অর্থাৎ সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীর শিল্পাঞ্চলের মাল বড় বড় ষ্টিমার বা ফ্ল্যাট বোঝাই হইয়া রাইন নদীর মুখে অবস্থিত রটারডাম বন্দরে আসিলে ঐ মাল সমুদ্রগামী জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হয়। হ্যামবার্গে তেমনি সমগ্র এলব নদীর সুনাব্য জলপথের দুইধারে অবস্থিত অঞ্চলের অর্থাৎ মধ্য জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মাল বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজে তোলা হয়। সুতরাং, এই প্রান্তিক নদীবন্দরগুলিতে সমুদ্রপথ এবং আভ্যন্তরীণ জলপথগুলি একত্র হইয়াছে। কোন দেশে নদীবন্দর থাকিলে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি খুব সহজে সম্ভব হয়। কারণ নদীপথে অল্প খরচে ভারী ও কমদামী মাল দেশের দূর অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া যায়। জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল এবং ফ্রান্সের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে বড় বড় নদীবন্দরের অবদান। ভাল নদীবন্দরের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা উচিত এবং দোষগুলি থাকা উচিত নহে—

(১) নদীতে প্রচুর জল এবং জোয়ার-ভাঁটা থাকা দরকার যাহাতে অগভীর নদীতে জোয়ারের সময় বড় জাহাজ ঢুকিতে পারে। কলিকাতা বন্দর জোয়ারের উপর খুবই নির্ভরশীল।

(২) নদীতে বালুচর এবং কর্দমাক্ত তীরভূমি না থাকা ভাল। কলিকাতায় হুগলী নদীতে অত্যধিক বালুচর থাকায় নৌবাহনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং নদীর গভীরতা রক্ষা করিতে অত্যধিক খরচ হয়।

(৩) নদীতে অধিক বাঁক থাকা ভাল নহে। উহাতে অনর্থক দূরত্ব বাড়িয়া যায় এবং বালুচর সৃষ্টি হয়।

(৪) নদীর নিকট উন্মুক্ত সমভূমি থাকা দরকার যাহাতে রেলপথ, ডক, মালগুদাম প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৫) নদী চওড়া ও গভীর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শীতকালে জল কমিয়া গেলে অথবা বৎসরের কোন সময় নদীতে জল কম থাকিলে খুবই অসুবিধা হয়।

(৬) বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি উর্বর ও প্রাকৃতির সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন।

**Q. 116. What do you understand by 'entrepot'? What are the main factors contributing to its importance?**

**[পুনঃরপ্তানি বন্দর কাহাকে বলে? ইহার গুরুত্বের কারণগুলি দেখাও।]**

কোন বন্দরে যেমন বিদেশ হইতে মাল আমদানি করা হয় তেমনি বিদেশে মাল রপ্তানিও করা হয়, আবার বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াও রপ্তানি করা

হয়। পণ্য-দ্রব্যাদি বহুদূর দেশে বহু পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইলে প্রথমে উহা কোন এক কেন্দ্রীয় বন্দরে আনয়ন করিয়া সঞ্চিত করিতে হয়। বহু স্থান হইতে সামান্য সামান্য পরিমাণে আনিয়া সঞ্চয়ের পর এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা হয়। আবার অনেক দূর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মাল আমদানি করিয়া বন্দরের নিকটস্থ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে সামান্য সামান্য পরিমাণে সরবরাহ করাও হইয়া থাকে। যে সকল বন্দরে প্রধানতঃ এই প্রকার বাণিজ্য চলিতে থাকে সেই সকল বন্দরকে **আঁতরিপোত** (entrepot) বা পুনঃরপ্তানি বন্দর বলা হয়। আঁতরিপোতের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি থাকা দরকার :—

(১) কোন বন্দর এরূপ পুনঃরপ্তানি বন্দর বা আঁতরিপাত হিসাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে যে সমস্ত দেশ হইতে মাল আমদানি বা যে সমস্ত দেশে মাল রপ্তানি করা হয় সেই সমস্ত দেশের সহিত বন্দরটির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা চাই।

(২) বন্দরটি কয়েকটি দেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হইবে (যথা—সিঙ্গাপুর ও লণ্ডন)। কেননা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হইলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে মাল আমদানি করা বা বিভিন্ন অঞ্চলে মাল সরবরাহ করা সহজ হয়।

(৩) যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া এই জাতীয় বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে সেই পণ্য-দ্রব্যাদির মূল্য অধিক, আয়তন ক্ষুদ্র এবং স্থায়িত্ব অধিক হওয়া খুব দরকার।

(৪) বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপত্তি স্থান যদি পশ্চাদপদ হয় বা ঐ স্থানে যদি কোন বন্দর না থাকে তবে নিকটস্থ পুনঃরপ্তানি বন্দরের গুরুত্বও বাড়িয়া যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ **সিঙ্গাপুরের** নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। থাইল্যাণ্ড এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন প্রকার মসলা, রবার, টিন এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য সিঙ্গাপুর মারফত ইউরোপে ও অন্যান্য বহুদূর দেশে রপ্তানি করা হয়। এলব নদীর উপকূলে **হামবার্গ** একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃরপ্তানি বন্দর। মধ্য ইউরোপ হইতে আগত পণ্যদ্রব্যাদি এখান হইতে পৃথিবীর নানা দেশে সরবরাহ করা হয়। **লণ্ডন** পৃথিবীর প্রধানতম পুনঃরপ্তানি বন্দর। উপনিবেশ ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি হইতে আমদানিকৃত কাঁচামাল লণ্ডন হইয়া নানা দেশে রপ্তানি হয়।

**Q. 117. Analyse the geographical conditions that have influenced the situation and development of some of the important places of the world.**

**[পৃথিবীর কতকগুলি প্রধান নগর বন্দরের অবস্থান এবং শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দাও।]**

(১) আকিয়াব—ব্রহ্মদেশের পশ্চিম উপকূলে ইহাই প্রধান বন্দর। ইহার উপকূল পোতাশ্রয়ের পক্ষে বেশ উপযোগী। পশ্চাদ্‌ভূমি খুব বিস্তৃত নহে কিন্তু অত্যন্ত উর্বর। ইহা প্রধানতঃ চাউল রপ্তানি করিয়া থাকে।

(২) **এডেন**—এডেন উপসাগরের তীরে ইহা একটি বন্দর এবং সুয়েজ খাল পথের উপর বড় কয়লা ষ্টেশন ( Coaling Station )। সুয়েজখালের বাণিজ্যপথকে রক্ষা করিবার পক্ষে ইহা উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ ঘাঁটি ও বন্দর। ইয়েমেনে এবং আবিসিনিয়ার পর্বতে উৎপন্ন কফি ও স্থানীয় লবণ এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়।

(৩) **বুয়েনাস আয়ারেস**—লা-প্লাতা নদীর মোহনায় সমতল ভূমির উপরে অবস্থিত ইহা আর্জেন্টিনার প্রধান বন্দর এবং রাজধানী। গম উৎপাদন ক্ষেত্রের সহিত রেলপথে ইহার যোগাযোগ আছে। আর্জেন্টিনাতে প্রচুর গম ও ভুট্টা জন্মে; সেইজন্য এই বন্দর দিয়া গম, মাংস এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়।

(৪) **শিকাগো**—ইহা মিশিগান হ্রদের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত হ্রদ-বন্দর এবং রেলপথ দ্বারা মিসিসিপি নদীর উপত্যকার সহিত যুক্ত। প্রেয়ারী ভূমিতে পশুপালন করা হয়। এখান হইতে গবাদির মাংস কৌটাবন্দী অবস্থায় রপ্তানি হয়। বর্তমানে ইহা ইস্পাতশিল্পের একটি কেন্দ্র। সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিম অঞ্চলে লৌহ এবং অভ্যন্তরভাগের খনি হইতে আনিত কয়লায় এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

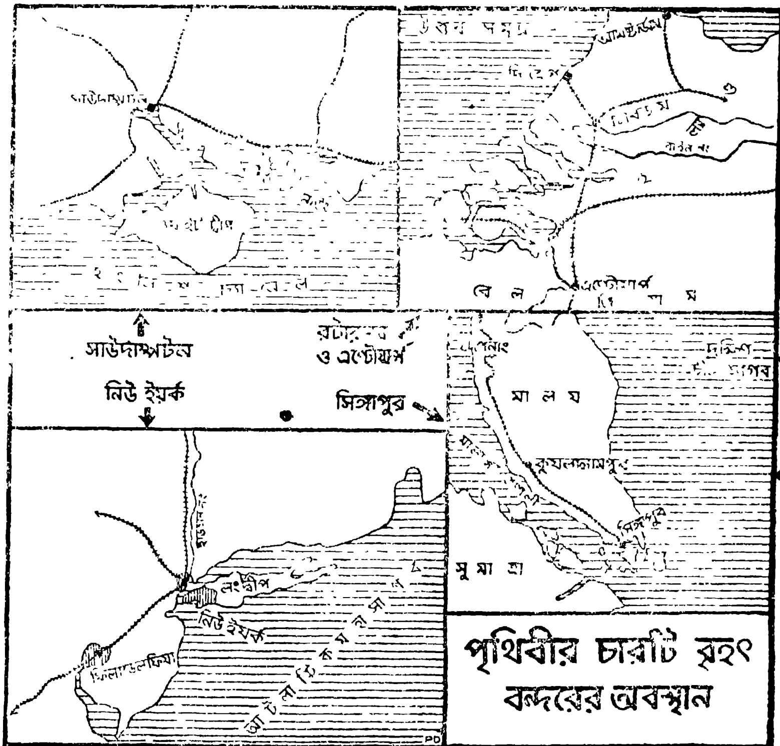
(৫) **জিব্রাল্টার**—ইহা আইবেরিয়ান উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ নৌ-ঘাঁটি। যুদ্ধ এবং অন্যান্য সময়ে এখানে বহু রণপোতের সমাবেশ করিয়া সুয়েজখাল পথ রক্ষা করিতে পারা যায়। ইহার ভৌগোলিক অবস্থিতিই রাজনৈতিক গুরুত্বের একমাত্র কারণ। ইহাকে 'ভূমধ্যসাগরের চাবি' নামে অভিহিত করা হয়। বন্দর হিসাবে ইহা নগণ্য, কারণ দেশের অভ্যন্তর ভাগের সঙ্গে ইহার সংযোগ খুবই কম।

(৬) **করাচী**—সিন্ধু নদের মোহনার পশ্চিমে অবস্থিত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান বন্দর। পশ্চিম পাকিস্তানের বাড়তি মাল রপ্তানির ও ঘাটতি মাল আমদানির ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তুলা, যব, চাউল, ছোলা, তৈলবীজ, চামড়া, পশম প্রভৃতি কাঁচা মাল এখান হইতে রপ্তানি হয়। চিনি, পশমজাতদ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি এই বন্দরে আমদানি হয়। বিমান বন্দর হিসাবেও করাচীর গুরুত্ব খুব বেশি।

(৭) **হ্যামবার্গ**—এলব নদীর উপরে অবস্থিত হ্যামবার্গ পশ্চিম জার্মানীর বৃহত্তম বন্দর। ইহা বারমাসই বরফমুক্ত থাকে। এই বন্দর দিয়া লৌহ এবং ইস্পাত নির্মিত দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রব্যের ভিতর কফি, কোকো, তৈলবীজ, পাট, পশম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রপ্তানি বন্দর হিসাবে ইহার গুরুত্ব খুব বেশি। নরওয়ে ও সুইডেনের সরবরাহও অংশতঃ এই স্থান হইতেই হয়।

[ (৮) গ্লাসগো এবং (৯) লিভারপুল—113 নং প্রশ্নোত্তরের শেষ দুই অনুঃ দ্রষ্টব্য। ]

(১০) মার্সাই—ইহা রোন নদীর মোহানা হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রধান শহর এবং প্রধান বন্দর। ইহা ডাক জাহাজের একটি বড় ষ্টেশন। রোন নদীর উপত্যকায় উৎপন্ন জলপাই, রেশমজাত দ্রব্যাদি, মদ, তৈল প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয় এবং রেশম, কফি, তৈলবীজ প্রভৃতি আমদানি হয়। সমুদ্রপথে বাণিজ্য পরিচালনা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই স্থানের জাহাজ শিল্প যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে।



পৃথিবীর চারটি বৃহৎ বন্দরের অবস্থান

(১১) নিউ অর্লিয়েন্স—ইহা যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বন্দর। ইহা মিসিসিপি নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি খুব সমৃদ্ধিশালী। এই বন্দর দিয়া তুলা, গম, ভুট্টা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়। উপসাগরীয় উপকূলে প্রচুর তৈল

উৎপাদিত হয় এবং এই বন্দর দিয়া সেই তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। বন্দরটি অগ্রসরমান ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত হওয়ায় নানা অসুবিধা হইয়াছে।

(১২) নিউইয়র্ক—এই বন্দরটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলে হাডসন ( Hudson ) নদীর মোহানায় একটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত। বৃহৎ পোতাশ্রয়ের সুবিধা থাকায় বন্দরটির গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বন্দর। বৈদ্যুতিক যন্ত্র, গম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত এবং চর্ম নির্মিত দ্রব্যাদি এই বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হয়। নানাপ্রকার কাঁচামাল, বিলাস দ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দর মারফত আমদানি হয়। এখানে সর্বাধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজগুলি যাতায়াত করে।

(১৩) রেঙ্গুন—ইহা ইরাবতী নদীর শাখা রেঙ্গুন নদীর তীরে অবস্থিত ব্রহ্মদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ও রাজধানী। সমুদ্র হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ২৪ মাইল। এখান হইতে চাউল ও কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানি হয়। ব্রহ্মদেশের অন্য শিল্পজাত দ্রব্য, ঔষধপত্র প্রভৃতি আমদানির ইহাই প্রধান কেন্দ্র।

(১৪) সানফ্রান্সিসকো—ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি স্বাভাবিক বন্দর। প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজগুলি এই বন্দর হইতে যাতায়াত করে। ক্যালিফোর্ণিয়া উপত্যকা বিভিন্ন প্রকার ফল ও গমের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল দ্রব্য এখান হইতে রপ্তানি হয়। চা, চিনি ও রেশম এই বন্দরের প্রধান আমদানি দ্রব্য।

(১৫) সিঙ্গাপুর—মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে একটি দ্বীপের উপরে সিঙ্গাপুর বন্দরটি অবস্থিত। ভারত হইতে চীনের বন্দরগুলিতে যাইতে হইলে এই বন্দর হইয়া যাইতে হয়। এখান হইতে রবার, মশলা, টিন, আনারস প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে পেট্রোলিয়াম, লৌহ এবং ইস্পাত নির্মিত যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। ভৌগোলিক অবস্থিতির ফলে সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। দূর প্রাচ্যের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃরপ্তানি বন্দর।

(১৬) ভ্যাঙ্কুভার—কানাডার প্রশান্ত-মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের আড়ালে এই বন্দরটি অবস্থিত। ভ্যাঙ্কুভার একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। এই বন্দর দিয়া প্রধানতঃ কাষ্ঠ, গম এবং মৎস্যাদি বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, চীন এবং জাপানের সহিত ইহার যোগাযোগ আছে।

(১৭) ইয়োকোহামা—হনসু দ্বীপে টোকিওর দক্ষিণে অবস্থিত ইয়োকোহামা জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। সুবৃহৎ পোতাশ্রয়ের সুবিধা থাকায় বন্দরটির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেশমজাত দ্রব্যাদি, ইস্পাত দ্রব্য, কার্পাসজাত দ্রব্যাদি এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এই স্থান হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়।

(১৮) **সাউদাম্পটন**—ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত একটি বন্দর। এই বন্দরটির সমুদ্রতট অশ্বখুরাকৃতি হওয়ায় পোতাশ্রয় নির্মাণের সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজগুলিকে আশ্রয় দিবার সুযোগও এখানে আছে। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাত্রীবাহী বন্দর।

(১৯) **গ্রীম্‌সবি**—ইংল্যাণ্ডের এই বন্দরটি প্রসিদ্ধ মৎস্য শিকার কেন্দ্র; 'ডগার' ব্যাঙ্ক চড়ার সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রাধান্য বিদ্যমান। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির শিল্পজাতদ্রব্য ও মৎস্য অল্পব্যয়ে বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে এই বন্দরটিতে ডক ও জেটির বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২০) **অ্যাণ্টোয়ার্প**—ইহা বেলজিয়ামে শেল্ড নদীর গভীর ও প্রশস্ত মোহানায় অবস্থিত। ইহা সুনাব্য নদী ও খাল দ্বারা (রাইন, মিউজ ও সীন নদী মারফত) জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির সহিত সংযুক্ত। বেলজিয়াম, ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল, রাইন নদীর উপত্যকা ও রুরের কয়লা খনি অঞ্চল লইয়া ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি গঠিত। এই পশ্চাদ্‌ভূমির প্রয়োজনেই বন্দরটি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(২১) **ডারবান**—ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। সমগ্র নাটালের মালভূমি এই বন্দরটির "পশ্চাদ্‌ভূমি"। ডারবান হইতে কয়লা ও পশম বিদেশে রপ্তানি হয়। এই বন্দরের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ হওয়ায় অনেক ভারতীয় ব্যবসা ব্যপদেশে এইখানে বাস করিতেছেন।

(২২) **মুরমানস্ক**—সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তরদিকে কোলা উপদ্বীপে অবস্থিত একমাত্র বরফমুক্ত বন্দর। আটলান্টিক মহাসাগর মারফত সারা পৃথিবীর সঙ্গে ইহার বাণিজ্য চলে। তাহা ছাড়া তুষারাবৃত সাইবেরিয়ার উত্তর ভাগের সঙ্গেও গ্রীষ্মকালে বরফ ভাঙ্গা (ice breaker) জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য চলে। কাষ্ঠ, মণ্ড প্রভৃতি এখানকার রপ্তানি দ্রব্য।

(২৩) **হংকং**—চীনের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ব্রিটিশ অধিকৃত দ্বীপ-বন্দর। বন্দরটি ক্ষুদ্র এক উপসাগর তীরে অবস্থিত। বন্দরটি স্বাভাবিক ও গভীর জলযুক্ত, বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাসবস্ত্র, রেশম বস্ত্র প্রভৃতি এই বন্দর মারফত রপ্তানি হয়।

(২৪) **লিওপোল্ডভিল**—কঙ্গোর রাজধানী এই শহরটি কঙ্গোনদীর তটে সমুদ্র হইতে কিছু অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। লিওপোল্ডভিল হইতে সমুদ্রের দিকে কয়েকটি ছোট জলপ্রপাত আছে, কিন্তু অভ্যন্তরভাগে নদীটি নাব্য। এই নদীপথে রবার, গজদন্ত, তামা ও অন্যান্য ধাতু রপ্তানির জন্য প্রথমে লিওপোল্ডভিলে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর তথা হইতে রেলযোগে সমুদ্র বন্দর মাতাদিতে পাঠানো হয়।

---

# বাণিজ্য

## TRADE

**Q. 118. Do you think international trade is the barometer of the economic development of a country ?**

[ "কোন দেশের বহির্বাণিজ্য সে দেশের আর্থিক প্রগতির চাপমান যন্ত্র" ;—এ বিষয়ে তোমার 'বক্তব্য কি ? ]

**বহির্বাণিজ্য অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠি**—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা বহির্বাণিজ্য বলিতে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বাণিজ্য বুঝায় ( আর একই দেশের দুই অংশের মধ্যের বাণিজ্যকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয় )। বহির্বাণিজ্য হইতে কোন এক দেশের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার কথা মোটামুটি বুঝা যাইতে পারে ; কিন্তু ইহা কোন দেশের অর্থনৈতিক মান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরিতে পারে না।

বহির্বাণিজ্য দুইভাবে দেখা যাইতে পারে ; যথা—(১) মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ( total volume of trade ) এবং (২) মাথাপিছু বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ( per capita foreign trade )।

মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ হইতে কোন দেশের অধিবাসীদের জীবন ধারণের মান সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয় না। কিন্তু বাণিজ্যের পরিমাণের সঙ্গে দেশের আয়তন এবং লোকসংখ্যা জানা থাকিলে অনেকটা ঠিক ধারণা করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৬১ সালে ছিল ৩৪৬ কোটি ডলার এবং ডেনমার্কের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ঐ একই বৎসরে ছিল ৩৮০ কোটি ডলার। ঐ বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৪ কোটি আর ডেনমার্কের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫ লক্ষ। সুতরাং, ডেনমার্কের মাথা পিছু বাণিজ্য ভারত অপেক্ষা প্রায় শতগুণ বেশি। সুতরাং, ইহাতে বুঝা যায় যে ডেনমার্কের লোকেদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং ভারতীয়দের জীবনযাত্রা অত্যন্ত নিম্ন মানের। তবে ইহাও সম্পূর্ণ চিত্র নয়। কারণ ভারতীয়দের তুলনায় ডেনদিগের মাথাপিছু আয় বা জীবনযাত্রার মান সত্যই উন্নত কিন্তু পার্থক্য এত বেশি নয়। ভারত এক বিশাল দেশ। এদেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও প্রয়োজন খুব বেশি তাই রপ্তানির পরিমাণ কম। তাহা ছাড়া ভারতের তটরেখা অভগ্ন হওয়ার ফলে বাণিজ্য আরও কম হইয়াছে।

আবার মালয়েশিয়া এবং রাশিয়ার মাথাপিছু বাণিজ্য তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু বাণিজ্য বেশি ; কিন্তু রাশিয়ার লোকের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান অনেক উচ্চ। এই অবস্থার একটি কারণ এই যে রাশিয়ার অর্থনীতি কতকটা রাজনৈতিক কারণে স্বাবলম্বন কেন্দ্রীত। সম্প্রতি তাহার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অবশ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। আর একটি কারণ এই যে রাশিয়া

বিশাল দেশ। সেখানে উৎপাদন ও চাহিদা দু'ইই বেশি ; সুতরাং উদ্‌বৃত্ত কম বলিয়া মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও কম।

কোন দেশের বহির্বাণিজ্য কমবেশি হইবার বহুপ্রকার কারণ থাকিতে পারে। তাই মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ হইতে অর্থনৈতিক অবস্থার ঠিক চিত্রটি পাওয়া যায় না—মাথাপিছু বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ হইতে উহা কতকটা পাওয়া যায়।

**Q. 119. What are the basic factors of international trade?**

**[ বহির্বাণিজ্যের মূল বিষয়গুলি ( কারণগুলি ) কি ? ]**

**বহির্বাণিজ্যের মৌলিক কারণ**—বর্তমান পৃথিবীতে সভ্যমানুষের অনেক জিনিস দরকার হয়। নানা কারণে সকল দেশে সকল জিনিস পাওয়া যায় না ; তাই অন্যদেশ হইতে ঐ সমস্ত জিনিস আমদানি করিতে হয়। প্রধানতঃ (ক) পরিবেশের পার্থক্য (খ) অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য (গ) জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য ও (ঘ) পরিবহণ ব্যবস্থার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং, এইগুলিই বহির্বাণিজ্যের জন্য দায়ী।

**পরিবেশের পার্থক্য**—নানা দেশে নানা প্রকার জলবায়ু, মৃত্তিকা, নানা যুগের শিলাস্তর ইত্যাদি থাকার ফলে অর্থনৈতিক উৎপাদনও নানা প্রকার হয়। সভ্য মানুষের প্রয়োজন বহুবিধ, তাই সকল দেশই বিদেশ হইতে নানা প্রকার কৃষিজ, অরণ্যজ ও খনিজ দ্রব্য আমদানি করে।

(খ) **অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য**—পৃথিবীর সকল দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির সমান পর্যায়ে অবস্থিত নয়। কোন কোন দেশে শিল্পবাণিজ্যে প্রগতি বেশি হইয়াছে ; যথা—ব্রিটেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী। কোন কোন দেশে শিল্প কম গঠিত হইয়াছে ; যথা—ভারত, ব্রেজিল, মিশর ; আবার অনেক দেশে শিল্প-বাণিজ্য খুব কম, যথা—আফগানিস্তান, ঘানা, ব্রহ্মদেশ। উন্নত দেশগুলি অনুন্নত দেশগুলি হইতে নানা প্রকার কাঁচামাল আমদানি করে এবং বিনিময়ে ঐ সকল দেশে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশ কাঁচামাল ও শিল্পিত পণ্য আমদানিও করে আবার রপ্তানিও করে।

(গ) **জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য**—ভারতের ধান উৎপাদন ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা বহুগুণ বেশি, তবু ভারত ব্রহ্মদেশ হইতে ধান আমদানি করে, কারণ ভারতে লোকবসতি বেশি আর জমি কম এবং ব্রহ্মদেশে জমি বেশি, লোক কম। আবার জার্মানীতে লোকবসতি বেশি, দক্ষ ও কর্মঠ ও শ্রমিক বেশি বলিয়া সেখানে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই জার্মানী শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারে। অপরপক্ষে, নিউজিল্যাণ্ডে শ্রমিকের অভাবে শিল্প অধিক গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং, নিউজিল্যাণ্ড জার্মানী হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে।

(ঘ) **পরিবহণ-ব্যবস্থার পার্থক্য**—মোট কত বাণিজ্য কোনদেশ এবং অপর দেশের মধ্যে হইবে তাহা অনেকটা মাল পরিবহণের সুবিধা ও খরচের উপর নির্ভর করে। প্রাচীন যুগে পালতোলা জাহাজ আর গরু-ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে এক দেশ হইতে আর এক দেশে মাল অল্পই লইয়া যাওয়া যাইত এবং ব্যয়ও অনেক হইত। আর বর্তমানে বড় বড় জাহাজে (হিমকক্ষাদি সকল সুবিধাযুক্ত) বা শতওয়াগন-মালগাড়িতে খুব কম খরচে মাল এক দেশ হইতে অপর দেশে লইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপরে যে সকল বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইল তাহা ছাড়া কোন দেশে মূলধনের সরবরাহ, জীবনযাত্রার মান, মূলধন, বিশেষতঃ বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের উপযুক্ত রাজনৈতিক অবস্থা, শুল্কনীতি ও বাণিজ্যের প্রসারও ব্যবসা-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

**120. Do trade routes arise from economic activity, or does economic activity arise from trade routes? Take concrete examples and discuss.** ( C. U B. Com , Part I 1963 )

[অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে বাণিজ্যপথ গড়িয়া উঠে—না বাণিজ্য-পথ থাকিলে তবে ব্যবসাবাণিজ্য গড়িয়া উঠে? উদাহরণসহ অলোচনা কর।]

প্রাচীনকালের কথা ধরা যাক। চারিদিকে শুধু গভীর অরণ্য, কোথাও সভ্যতার কোন চিহ্ন নাই। অরণ্যের মধ্যদিয়া একটি নদী প্রবাহিত। নদীটিতে প্রচুর জল আছে, স্রোত কম এবং কোন জলপ্রপাত নাই। এই নদীর তীরে একশত মাইলের ব্যবধানে তিনটি গ্রাম—খুব অনগ্রসর গ্রাম; নাম দেওয়া যাক ক, খ ও গ। ক-গ্রামের লোকেরা নদীর ধারের পলিমাটিতে ফসল ফলায়। কিন্তু কাপড় বুনিতে জানে না, লৌহের ব্যবহারও তাহাদের কাছে অজ্ঞাত। খ-গ্রামের লোকেরা কাপড় বুনিতে জানে (গাছের আঁশ হইতে) কিন্তু চাষ-আবাদ অথবা লোহার ব্যবহার জানে না। আর গ-গ্রামের লোকেরা কেবল লোহার ব্যবহার জানে, কৃষি বা তন্তুবিদ্যা জানে না। তিনটি গ্রামই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু নদীতে কেহ ভেলা অথবা নৌকা ভাসাইয়া ঐ তিন গ্রামের মধ্যে অনায়াসে যোগাযোগ সৃষ্টি করিল, বাণিজ্যের প্রবর্তন করিল। তখন তিনটি গ্রামই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল। উহাদের তখন খাদ্য, পরিধেয় এবং যন্ত্রশক্তির অভাব থাকিল না। সুতরাং, এক্ষেত্রে বাণিজ্যপথ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দায়ী।

এযুগেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। ভারত এবং ইউরোপ

সুসভ্য ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া অগ্রসর বলিয়াই অবশ্য সুয়েজখাল খনন করিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ খোলা হইল। কিন্তু এই বাণিজ্যপথ খোলার ফলে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; তাহাদের অর্থনৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হইল।

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। উত্তর আঁটলান্টিক বাণিজ্যপথ বিশ্বের প্রধানতম পথ। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় যখন অনগ্রসর রেড্ ইনডিয়ানরাই মাত্র বাস করিত তখন তো এই পথে একখানি জাহাজও চলাচল করিত না। যখন উত্তর আমেরিকার মৃত্তিকা সম্পদ, বনজ ও খনিজ সম্পদ কার্যকরী হইল তখনই ইউরোপ হইতে শত শত জাহাজ উত্তর আমেরিকায় যাতায়াত করিতে লাগিল এবং বাণিজ্য পথের সূচনা হইল।

বর্তমান যুগে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রগতির কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং, এখনকার দিনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বাণিজ্য-পথ নির্মাণ একই সঙ্গে সম্পন্ন হয়। কারণ একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কথা কল্পনাও করা যায় না। হলদিয়াতে বন্দর গঠন করা হইতেছে। ঐ বন্দরে পণ্য চলাচলের জন্য রেলপথও নির্মাণ করা হইতেছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে বাণিজ্যপথ নির্মাণ ও আর্থিক প্রগতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

## অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অঞ্চল সমূহ—

**Q. 121. Divide the world into major commercial regions and indicate the pattern of trade existing between these regions.** ( Burdwan 1965 & C. U. B. Com., Part I 1963 )

**[ পৃথিবীকে প্রধান বাণিজ্যমণ্ডলগুলিতে ভাগ কর এবং ঐগুলির পরস্পরের মধ্যের বাণিজ্যের বর্ণনা কর। ]**

বাণিজ্যিক অঞ্চল বা অর্থনৈতিক অঞ্চল বলিতে কতকগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীকে ধরা যাইতে পারে। যথা—(১) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্যমণ্ডল ( সাতটি দেশ লইয়া এই মণ্ডল গঠিত )। (২) ইউরোপীয় সাধারণ বাজার মণ্ডল ( ছয়টি দেশ লইয়া এই মণ্ডল গঠিত )। (৩) ডলার অঞ্চলের দেশগুলি ( মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও লাটিন আমেরিকা লইয়া এই মণ্ডল গঠিত )। (৪) কমিউনিষ্ট দেশগুলিকে লইয়া একটি মণ্ডল এবং (৫) কলম্বো শক্তিবর্গকে আর একটি মণ্ডল হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু এইভাবে সমগ্র পৃথিবীর সব দেশগুলিকে কোন-না-কোন মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এবং এই বিভাগগুলিও যে কোন একটি আদর্শকে ভিত্তি করিয়া ধরা হইয়াছে এমনও নহে।

সুতরাং, এভাবে বিভাগ না করিয়া আমরা যদি পৃথিবীর সবকটি দেশকে আন্তর্জাতিক প্রগতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বিচার করিয়া মোটামুটিভাবে নানাভাগে ভাগ করি তবে আলোচনা সার্থক হইতে পারে। এই তিনটি শ্রেণী হইল—(১) আর্থ নৈতিক দিক দিয়া খুব উন্নত দেশগুলি (যথা—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ, ইটালি, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, কানাডা, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড)। (২) অর্থ নৈতিক দিক দিয়া অল্প উন্নত দেশগুলি (যথা—ভারত, চীন, পাকিস্তান, মেক্সিকো, মিশর, ব্রেজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলি; (৩) অর্থ নৈতিক দিক দিয়া অনুন্নত দেশগুলি (যথা—আফ্রিকার ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ)।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ। এই দেশগুলি কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া সমান শক্তিশালী। (খ) ব্রিটেন, জার্মানী, জাপান, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলি। এই দেশগুলি শিল্পের দিক দিয়া খুব উন্নত হইলেও খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে ইহাদের স্থান উল্লেখযোগ্য নহে (যদিও কৃষির মান খুবই উচ্চ)। (গ) অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও নিউজিল্যাণ্ড। এই দেশগুলি কেবল কৃষির দিক দিয়াই উন্নত। যে সকল শিল্প এই দেশগুলিতে আছে সেগুলি উচ্চ মানের হইলেও পরিমাণের দিক দিয়া অধিক নহে। যাহা হউক (ক), (খ) ও (গ) শ্রেণীর মধ্যে বাণিজ্যের বিষয় এখানে আলোচ্য নহে। এখানে শুধু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইবে।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর উন্নত দেশগুলি প্রধানতঃ শিল্পজাতদ্রব্যই রপ্তানি করে এবং (খ) ও (গ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাদ্য এবং কাঁচামালও রপ্তানি করে। (ক) ও (খ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাদ্য ও কাঁচামাল এবং (গ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাদ্য, কাঁচামাল ও শিল্পজাতদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানি দুই-ই করে। তবে ইহারা কাঁচামালই প্রধানতঃ রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্যই প্রধানতঃ আমদানি করে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি এবং শিল্পজাত পণ্যাদি আমদানি করে।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড

## আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক ভূগোল

(REGIONAL ECONOMIC GEOGRAPHY)

১। অষ্ট্রেলিয়া ২। যুক্তরাষ্ট্র। ৩। ব্রিটেন। ৪। সোভিয়েট রাষ্ট্র। ৫। জাপান। ৬। ব্রহ্মদেশ। ৭। পাকিস্তান এবং ৮। ভারত (ভারত খুব ব্যাপক ও গভীর ভাবে পড়িতে হইবে)।

### *অষ্ট্রেলিয়া*

AUSTRALIA

**Q 1. How was Australia colonised? Give the physical back ground.**

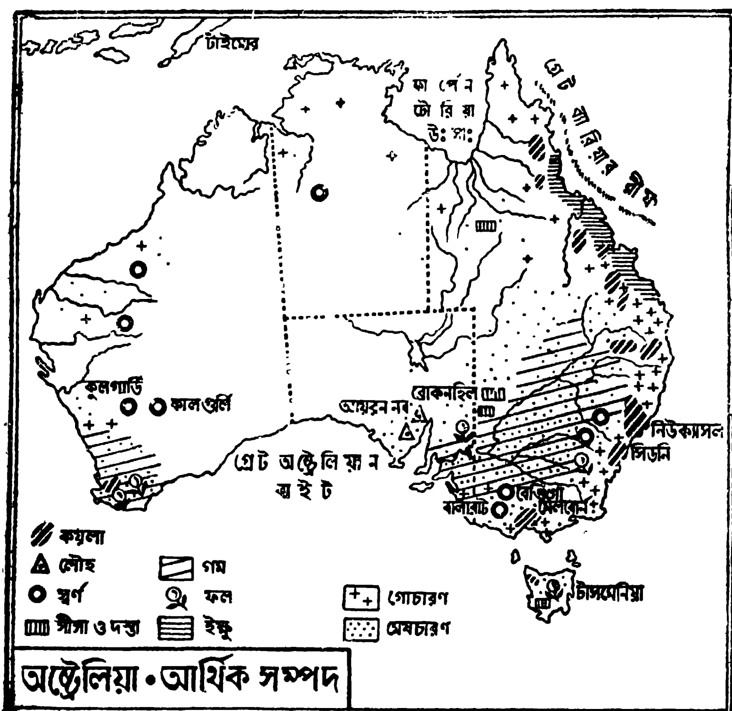
**[অষ্ট্রেলিয়ায় কি ভাবে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল? উহার প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচয় দাও।]**

**অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ** আবিষ্কার সম্পর্কে ডাচ নাবিক টাসম্যান ও ইংরাজ নাবিক কুকের নাম উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলি হইতে বহুদূরে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের অবস্থান। তাই এখানে মানুষের বসতি কম। অতীতকালে যখন অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হয় তখন কেহই সেখানে বসতি স্থাপন করিতে চাহিত না। কারণ প্রথমতঃ, ইহা ইউরোপ হইতে বহুদূরে; দ্বিতীয়তঃ, ইহার জলবায়ু অধিকাংশ স্থানেই শুষ্ক, উষ্ণ এবং মরুপ্রায় এবং তৃতীয়তঃ, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান কৃষিযোগ্য ভূমি মারে এবং ডার্লিং নদীর অববাহিকার উর্বরতার বিষয় কাহারও ভাল জানা ছিল না। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে যতটা মরুপ্রায় মনে করা হইয়াছিল মহাদেশটি বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এই মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব-ভাগের আর্দ্র ও নাতিশীতল জলবায়ু ইউরোপীয়দের বসবাসের পক্ষে বেশ উপযোগী। তাহা ছাড়া, মারে ও ডার্লিং নদীর অববাহিকার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাটি অসাধারণ উর্বরতা সম্পন্ন। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়ার কয়েক স্থানে বড় বড় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইলে, স্বর্ণলোভী মানুষ দূরত্ব ও নিঃসঙ্গতাকে—এমন কি মরুভূমির উত্তাপ ও পিপাসাকে অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল অষ্ট্রেলিয়ায়। এইভাবে মহাদেশটির উন্নতির সূত্রপাত হয়।

**Q. 2. Give an account of the mineral resources of Australia and indicate the chief mining areas of the country.**

**[ অস্ট্রেলিয়ার প্রধান খনিজ সম্পদগুলির বর্ণনা দাও এবং খনি এলাকাগুলির স্থান নির্ণয় কর। ]** **( B. Com. 1965 )**

**খনিজ সম্পদ**—অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা এক কোটির বেশি ; তাহার মধ্যে সাত লক্ষাধিক লোক খনিজ শিল্পে নিযুক্ত আছে। পূর্বে **স্বর্ণ ই** ছিল প্রধান খনিজ। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মোট স্বর্ণ-উৎপাদনের মাত্র ৪ ভাগ উৎপন্ন করে। প্রধান স্বর্ণখনিগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার **কালগুর্লি** ও **কুলগার্ডি** এবং ভিক্টোরিয়ার




বেণ্ডিগো ও বালারাট বিখ্যাত। তাহা ছাড়া, কুইন্সল্যাণ্ডের রকহ্যাম্পটনেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। বর্তমানে **কয়লাই** অস্ট্রেলিয়ার প্রধান খনিজ সম্পদ ; সমগ্র দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় সর্বাপেক্ষা ভাল কয়লা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রচুর লিগনাইট বা বাদামী কয়লাও পাওয়া যায়। সর্বাপেক্ষা বড় কয়লা খনি নিউসাউথ ওয়েলসের প্রশান্ত মহাসাগরের তটে **নিউক্যাসল** অঞ্চলে অবস্থিত।

এই কয়লা বেশ ভাল, উহা দ্বারা লৌহ গালানো হয় এবং বহু শিল্প ও রেলগাড়ী চলে। মেলবোর্ণের নিকট একটি বড় লিগনাইট কয়লা খনি আছে। তাহা ছাড়া, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার কোলিতে ও কুইন্সল্যাণ্ডের কয়েক স্থানেও প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় ভাল লৌহশিলা প্রচুর; অধিকাংশ লৌহভাণ্ডার দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আয়রণ নব অঞ্চলে অবস্থিত। এখান হইতে লৌহ আকরিক নিউক্যাসল ও পোর্ট কেম্বলা অঞ্চলের ইস্পাতের কারখানায় জলপথে পাঠানো হয়। অষ্ট্রেলিয়ার সীসা ও দস্তা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বিখ্যাত ব্রোকেনহিল খনি নিউসাউথ-ওয়েলস রাজ্যের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। এখানে ধাতু পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে। ইহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ সীসা-দস্তা খনি। অষ্ট্রেলিয়ায় তাম্রও পাওয়া যায়। ইদানিং অষ্ট্রেলিয়ায় তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে সীসা, দস্তা ও কিছু পরিমাণ কয়লা রপ্তানি করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক খনিজও পাওয়া যায়।

**Q. 3. Describe the influence of relief and climate of Australia on the features of agriculture and the crop produced there (C. U. B. Com. 1969)**

**[ অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি ব্যবস্থা এবং ফসল চাষের উপরে ঐ দেশের ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয় কর ]।**

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ু সাধারণ ভাবে কৃষির পক্ষে খুব উপযোগী নহে। সেই জন্য ঐ দেশের মাত্র শতকরা ৩।৪ ভাগ জমি চাষের যোগ্য বলা যাইতে পারে। এবং ঐ জমির মাত্র অর্ধেক আবাদ হয়। কারণ উত্তরদিকের গরমে শ্বেতকায়রা চাষ-আবাদ করিতে চায় না এবং লোকসংখ্যা খুব কম বলিয়া পণ্যদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা খুব কম।

অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমার্ধ মরুভূমি। পূর্বভাগের সাগরতীরে বৃষ্টি ১০০-১৫০ সেঃ মিঃ। কিন্তু একটু অভ্যন্তর ভাগে গ্রেটডিভাইডিং পাহাড়ের পশ্চিম পাড়ে বৃষ্টি মাত্র ৬০ সেঃ মিঃ। একমাত্র মারে নদী বারমাস বহে। অভ্যন্তরের অন্য সকল নদী, এমনকি ডারলিংও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। তাই সেচব্যবস্থাও অপ্রতুল।

অষ্ট্রেলিয়ায় উর্বর সমভূমি খুব কম। মারে ডার্লিং সমভূমি বেশ উর্বর এবং আয়তনেও বিশাল। উত্তর ভাগে কুইন্সল্যাণ্ড এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতে যথেষ্ট উর্বর জমি আছে তবে ঐ অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব।

**কৃষিজ সম্পদ**—কৃষিজ সম্পদ অষ্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান সম্পদ। পৃথিবীতে গম রপ্তানিতে অষ্ট্রেলিয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পশুজাত দ্রব্যের মধ্যে পশম, মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার সর্বপ্রধান ফসল গম। অন্যান্য ফসলের মধ্যে পশুখাদ্য হিসাবে যব ও ওট চাষ করা হয়। ইক্ষু চাষও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় এবং টাসমেনিয়ায় প্রচুর আপেল উৎপন্ন হয়। উহা রপ্তানিও করা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় সর্বপ্রধান গম ক্ষেত্র মারে অববাহিকার রিভারিনা সমভূমিতে অবস্থিত। এখানে মারে ও মারাম্বিজ নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে গম চাষ করা হয়। পূর্বভাগের উচ্চভূমি অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৬০ সেন্টিমিটার হওয়ায় ঐ অঞ্চলে গম চাষের জন্য জলসেচ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জমি হইতে একটি মাত্র ফসল পাওয়া যায়। অপর পক্ষে জলসেচযুক্ত অঞ্চলে ( মোট ১২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়—অবশ্য অধিকাংশ খালই প্লাবন খাল জাতীয় ) বৎসরে একাধিক ফসল উৎপন্ন হয়। সর্বত্রই শীতকালে গম চাষ হয়। মারে অববাহিকা অঞ্চলে ৫০ হইতে ৬০ সেন্টিমিটার বারিপাত হয়। এখানকার পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর। সমগ্র কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। খুব কম শ্রমিক প্রচুর গম উৎপন্ন করে বলিয়া উহাদের মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় খুব বেশি। যবের চাষ হয় প্রধানতঃ গরুর খাদ্য হিসাবে। কুইন্সল্যাণ্ডের উপকূলভাগে যেখানে বৃষ্টি বেশি ও গরম বেশি সেখানে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এখানে বর্তমানে প্রতি বৎসর প্রায় ১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইতেছে। চিনি বর্তমানে একটি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। কিছু ধানের চাষও আছে। মারে অববাহিকায়ও গ্রীষ্মকালে সামান্য ধান জন্মে। নিউসাউথওয়েলস ও ভিক্টোরিয়ার তটভাগে যে সকল স্থানে বারিপাত অধিক সেখানে ওট চাষ অধিক হয়। টাসমেনিয়ায় বহু আপেল বাগান আছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ তটভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাবে প্রচুর গম ও যব চাষ করা যায়। দ্রাক্ষা চাষও হয়। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বভাগে প্রচুর জমি আছে। ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট হয়, কিন্তু অশ্বেতকায় শ্রমিকের অভাবে এখানে লক্ষ লক্ষ একর ভাল জমি অনাবাদি রহিয়াছে। এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে প্রচুর ধান ও ইক্ষু চাষ হইতে পারে। বর্তমানে এই অঞ্চলে অরণ্যসম্পদ আহরণ ও গোচারণ করা হয়।

পশুজ সম্পদে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান অগ্রগণ্য। যদিও মহাদেশটিতে মাত্র এক কোটির কিছু বেশি লোকের বাস তবু এখানে প্রায় ১৭ কোটি মেষ এবং দেড় কোটি গরু দেখা যায়। মেষপালনে অষ্ট্রেলিয়ার স্থান পৃথিবীতে সকল দেশের উপরে। অধিকাংশ মেষই অল্প বারিপাতযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায় এবং অধিকাংশ গরুই অধিক বারিপাতযুক্ত পূর্ব উপকূলে দেখা যায়। ইহার কারণ গরুর জন্য ঘাস ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য দরকার হয়। কিন্তু মেষ অধিক কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী। উহা অতি অল্প জলপান করিয়া এবং সল্টবুশ প্রভৃতি ঝোপের পাতা খাইয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করে। শুধু ঘাস খাইয়াই বেশ মোটা হয়। মেষ মাংস অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য।

স্পেনদেশীয় মেরিনো মেষ লোমের জন্ত বিখ্যাত। উহার লোম অতি সুন্দর ও দীর্ঘ। উহা অধিক উত্তাপ ও জলাভাব সহ্য করিতে পারে। কুইন্সল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে মরুপ্রায় অঞ্চলে ইদানিং বহু আর্টিসিয়ু কূপ স্থাপিত হওয়ায় মেষের জলপান সমস্যার সমাধান হইয়াছে। আধামরু অঞ্চলে মেষচারণই অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি। ৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বারিপাত অঞ্চলে যদিও বহু মেষ দেখা যায় তবু ঐ অঞ্চলে মেষ-পালন অপেক্ষা চাষবাসই অধিক হয়। মারে-ডার্লিং অববাহিকায় মেষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পশ্চিম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায়ও বহু মেষ আছে। ইদানিং মেষপালন অঞ্চলে খরগোশের উৎপাত খুব বাড়িয়াছে। উহারা তৃণ ও ঝোপগাছ বিনষ্ট করিয়া মেষপালন ভূমির ক্ষতি করে। উহাদের মারিয়াও শেষ করা যায় না।

ভিক্টোরিয়া ও নিউসাউথওয়েলসের সংকীর্ণ তটভাগে অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ গরু দেখা যায়। এই সকল গরু প্রচুর দুধ দেয়। অষ্ট্রেলিয়া হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্য সমগ্র বিশ্বে রপ্তানি হয়। কুইন্সল্যাণ্ড হইতে দুধ অপেক্ষা মাংসই অধিক চালান যায়। মাংস, পশম ও চর্ম রপ্তানির প্রধান বন্দর ব্রিসবেন, এডিলেড, সিডনি ও মেলবোর্ণ। অধিকাংশ পশম ও মাংসই ব্রিটেনে চালান যায়।

মেষ ও গরু ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ায় ১১ লক্ষ শূকর প্রতিপালন করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় হিংস্র জন্তু খুব কম থাকায় পশু পালন করা খুব সুবিধা।

**Q. 4. Why does not Australia, which is a large producer of wool, develop extensive woollen manufactures?**

**[ যদিও অষ্ট্রেলিয়া পশম উৎপাদনে অগ্রণী তবু তাহার পশম বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠে নাই কেন? ]**

অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলগুলিতে এবং 'ডাউনস' তৃণভূমিতে পশুচারণোপযোগী বহু বিস্তীর্ণ স্থান আছে। এই সমস্ত কারণে অষ্ট্রেলিয়া পশুচারণে, বিশেষতঃ মেষচারণে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানকার এক একটি পশুচারণ কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ মেষ প্রতিপালিত হয়। এই সমস্ত মেষের মাংস ও চর্ম হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু পশম বয়ন শিল্প সেতুলনায় একেবারেই নগণ্য। তবে কাঁচা পশমের রপ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ অন্য সমস্ত উৎপাদন ও শিল্পকেই ছাপাইয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পশম উৎপাদক দেশ। অষ্ট্রেলিয়া অন্য দেশে কাঁচা পশম চালান দেয়। ব্রিটেনই অষ্ট্রেলিয়ার কাঁচা পশমের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। ইহা ছাড়া ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সকল দেশেই অল্প বিস্তর পরিমাণে এই পশম রপ্তানি হইয়া থাকে। এই সমস্ত দেশে এই কাঁচা পশম বয়ন করিয়া নানা শিল্পজাত পণ্য প্রস্তুত করা হয়। অথচ

অষ্ট্রেলিয়ার পশম বয়ন শিল্প তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে গড়িয়া উঠে নাই। ইহার কারণ এই যে—

(১) পশম ও পশম শিল্পজাত দ্রব্য উভয়ের পরিবহণের খরচ একই। বস্তুতঃ পশম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিলে কাঁচামালের (পশম) মোট ওজন অপরিবর্তিতই থাকে। সুতরাং, অষ্ট্রেলিয়ার পশম হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় পশমবস্ত্র উৎপন্ন করিতে যে খরচ হয় অষ্ট্রেলিয়ার পশম হইতে ব্রিটেনে পশমবস্ত্র প্রস্তুত করার খরচ তাহা অপেক্ষা অধিক হয় না। অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা ব্রিটেনের শ্রমিক ও বাজারের সুবিধা অনেক বেশি। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া প্রধানতঃ কাঁচা পশম ব্রিটেনে রপ্তানি করিয়া থাকে।

(২) অষ্ট্রেলিয়ার লোকবসতি অত্যন্ত কম। ইহার ফলে জনপ্রতি জমির পরিমাণ খুব বেশি হইয়াছে। সুতরাং কলে বা কারখানায় চাকুরী করা অপেক্ষা জমির কাজ করিলে বেশি উপার্জন হয় বলিয়া কৃষিকার্যের দিকেই অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণের ঝোঁক বেশি। তাহার উপর আবার 'শ্বেত' উপনিবেশের ধুয়া তুলিয়া অশ্বেতজাতির প্রবেশে নানা বাধা সৃষ্টি করার ফলে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে সস্তায় শ্রমিক পাইবার পথও রুদ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া একেবারে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য শিল্প বরং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কম শ্রমিকে চলিতে পারে, কিন্তু পশম শিল্পে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

(৩) দেশের ভিতর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ খুব ব্যয়সাধ্য। দেশে ভাল জলপথই নাই, নদীর সংখ্যাও খুব কম। অষ্ট্রেলিয়ার রেলপথসমূহ নানারকম। এক এক প্রদেশে এক এক মাপের লাইন প্রচলিত থাকায় মাল চালান দিতে বা আমদানি করিতে অনেকবার উঠাইতে ও নামাইতে হয়। তাহার ফলে দেশের মধ্যে পশমজাত দ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানি অস্বাভাবিক ভাবে ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠে। এই ভাবে পৃথিবীর শিল্পবাণিজ্যে অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার শিল্প প্রসার অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই সমস্ত কারণে প্রচুর পশম থাকা সত্ত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার পশমশিল্প বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

**Q. 5.** ***Discuss the development of the east and west coast of Australia and state if the influence of climate is responsible for such development.***

[অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের উন্নয়নের বর্ণনা দাও এবং দেখাও যে জলবায়ুর প্রভাব উহার জন্য দায়ী কি না।]

অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলস্থ অঞ্চলের জলবায়ু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এই জন্য দেখা যায় যে জনবসতি, কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদন প্রভৃতি

বিভিন্ন দিক দিয়া পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল হইতে অনেক বেশি অগ্রসর। পূর্ব-উপকূলে প্রায় সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু পশ্চিম উপকূলের উপর দিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় জলকণা মিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত না হওয়ায় এবং জলকণাপূর্ণ বায়ুকে প্রতিরোধ করিবার মত কোন উচ্চ পর্বতমালা না থাকায় এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বলিলেই চলে। বৎসরে কয়েকমাস ব্যতীত প্রায় সকল সময়েই এই অঞ্চল শুষ্ক থাকে।

কুইন্সল্যাণ্ড, নিউসাউথওয়েলস, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থানগুলি অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত। কুইন্সল্যাণ্ড ছাড়া এই অঞ্চলের সর্বত্র নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের জলবায়ু বিরাজমান। এই অঞ্চলের অনেকাংশ উপগ্রীষ্মমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদে পূর্ণ। এই অরণ্যে বিখ্যাত জারা, কারি প্রভৃতি নানা জাতীয় ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ জন্মে। এখানে গরু, মেষ প্রভৃতি নানাপ্রকার পশুপালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা প্রভৃতি নানাপ্রকার ফসল এবং ইক্ষু জন্মে। এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদও পশ্চিম-উপকূলের তুলনায় অনেক বেশি। নিউক্যাসেলের কয়লাখনি এবং বেণ্ডিগো ও বালারাটের স্বর্ণখনি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই স্থানে কৃষিকার্য, খনিজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি শিল্প প্রচেষ্টা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। সিডনি, মেলবোর্ণ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের রেলপথও উন্নত।

অপরপক্ষে, অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম-উপকূলের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা মনুষ্য-বাসের প্রায় অযোগ্য। কারণ এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয় না বলিলেই চলে। নিকটে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন নদী না থাকায় অন্তর্দেশীয় যাতায়াত আদৌ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কেবল মাত্র সমুদ্র বন্দর দিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। তটভাগ বন্দর গঠনের উপযুক্ত নহে এবং সমুদ্রতট হইতেই মরুভূমি আরম্ভ হইয়াছে। এই অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগও মরুময়। এই সমস্ত কারণে এই অঞ্চলে কৃষিকার্য বা শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে দু'একটি স্বর্ণখনি আছে। পশ্চিম উপকূলের অধিবাসীরা অনেক স্থানে গম চাষ ও মেষচারণ করে। ফল উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা সংরক্ষণ, মদ্য প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি শিল্পে এই অঞ্চল বেশ উন্নত। পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণ ভাগের এক ক্ষুদ্র অংশকে বাদ দিলে সমগ্র পশ্চিম-উপকূল প্রায় মনুষ্যবসতির অযোগ্য। এককথায় বলিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূল অঞ্চল সুন্দর জলবায়ু এবং খনিজসম্পদের জন্য যেমন উন্নত, বৃষ্টিপাত ও খনিজের স্বল্পতা হেতু পশ্চিম উপকূলস্থ স্থানগুলিও তেমনি অনুন্নত। ইদানি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

**Q. 6 Give an account of the distribution of the population in Australia.**

[ অষ্ট্রেলিয়ার লোকবসতি বিন্যাসের বর্ণনা দাও। ]

**অষ্ট্রেলিয়ার লোকবসতি**—অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবিরল মহাদেশ। ইহার মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষের মত। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ স্থান মরুময় অথবা মরুভূমি। ইহার প্রধান কারণ অষ্ট্রেলিয়ায় জলীয়বাষ্প প্রতিরোধক সুউচ্চ পর্বতমালার একান্ত অভাব। একমাত্র পূর্ব উপকূলে একটি সুদীর্ঘ ও সুউচ্চ ( গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ ) পর্বতমালা রহিয়াছে। ফলে, এই অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু মহাদেশের অন্যান্য স্থানে এরূপ কোন পর্বতমালা নাই। সুতরাং, পূর্বদিকে বাদ দিলে সমগ্র অষ্ট্রেলিয়াকেই একপ্রকার আধা-মরুভূমি বলা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার কতক অংশে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। তাই মাত্র ৩০ হইতে ৪০ সেন্টিমিটার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতেও জলসেচের সাহায্য ব্যতীতই কোন কোন স্থানে গম উৎপাদন করা সম্ভব। ইহা ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়ার মধ্য ও উত্তর-পূর্বভাগে **আর্টিসিয় কূপ** খননের উপযুক্ত স্থান রহিয়াছে। যদিও ইহার সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা চালানো অদ্যাবধি কোথাও ব্যাপকভাবে সম্ভব হয় নাই তবুও এই কূপগুলির জল মেষপালনের প্রধান অবলম্বন। তাই ঊষর মরু অঞ্চলেও আজকাল কিছু কিছু লোকের বাস আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকের কুইন্সল্যাণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চল মৌসুমী বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট বারিপাত হয়। কিন্তু শ্বেতকায়গণ এখানে উত্তাপের জন্য অধিক সংখ্যায় বাস করিতে পারে না। তাই আজিও এই অঞ্চল বিপুল সম্ভাবনা লইয়াও জনবিরল হইয়া রহিয়াছে।

**ভিক্টোরিয়া ও নিউসাউথওয়েল্‌স্‌**-এর উপকূলভাগ, মারে নদীর উপত্যকা, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার সর্বদক্ষিণ অংশ এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ভাগ প্রধান লোকবসতি অঞ্চল। ঐ সকল অঞ্চল শীতল, আর্দ্র ও খনিজ সম্পদে পূর্ণ। এই স্থানগুলির মধ্যে ভিক্টোরিয়ায় গম, বার্লি ও অন্যান্য কৃষিজদ্রব্য, স্বর্ণ ও নিম্নশ্রেণীর কয়লা থাকার ফলে লোকবসতি অধিক হইয়াছে। বিশেষতঃ **মেলবোর্ণ** ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে লিগনাইট খনি ও নানাপ্রকার কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে বসতি অধিক ঘন হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া ও নিউসাউথওয়েলস্‌ রাজ্যের সীমায় অষ্ট্রেলিয়ার একমাত্র নাব্য নদী **মারে** অবস্থিত। এখানে উর্বর রিভারিনা সমভূমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছে। ইহাই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান কৃষি অঞ্চল। **নিউসাউথওয়েলস্‌** রাজ্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার মধ্যে **কয়লাই** প্রধান। **সিডনি ও নিউক্যাসল** অঞ্চলে দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লাখনি অবস্থিত। নানাপ্রকার ধাতুও নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া

পায়। আর্দ্র জলবায়ুর জন্য গম ও ওট চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে, তবে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে মেষচারণই প্রধান উপজীবিকা। লোকবসতি সমুদ্র তীরেই কিছু ঘন। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ব্রোকেন্‌হিলে দস্তা ও সীসার খনি আছে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর জন্য দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার স্পেনসার উপসাগরের তটভাগ গম ও ফল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এখানের লোকবসতি মন্দ নহে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান সম্পদ কালগুর্লি প্রভৃতি খনির স্বর্ণ এবং নিম্ন শ্রেণীর এক প্রকার কয়লা। এখানে সামান্য গমের চাষ এবং মেষ পালনও হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র পার্থ শহর ও ফ্রিমেণ্টাল বন্দর বাদে এখানকার লোকসংখ্যা সামান্য।

অষ্ট্রেলিয়ার ৭০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। তাহার মধ্যে বৃহত্তম শহর সিডনির লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ। মেলবোর্ণ এবং নিউক্যাসল বেশ বড় শহর।

অষ্ট্রেলিয়ানরা প্রায় সকলেই শ্বেতকায় এবং কিছু ইটালীয় ও জার্মান বাদে সকলেই ইংল্যাণ্ড হইতেই আগত। জার্মানগণ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় এবং গরম সহ্য করিতে পারে বলিয়া ইটালীয়েরা কুইন্সল্যাণ্ডে বাস করিতেছে। ইহা ভিন্ন প্রায় কুড়িহাজার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী প্রধানতঃ উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলের জঙ্গলে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ সম্পূর্ণ জনহীন বলিয়া উহাকে "Dead heart of Australia" বলা হয়।

**Q. 7. Write an explanatory account of the different types of pastoral occupations to be met within Australia and Newzealand.**

**[অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে যে বিভিন্ন ধরণের পশুচারণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাদের ব্যাখ্যা সহ বর্ণনা দাও।]**

উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ গোলার্ধের লোকসংখ্যা কম; কিন্তু মাথাপিছু গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অনেক বেশি। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত; সুতরাং এই দুইটি দেশে পশুচারণ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক ১ কোটি কিন্তু সেখানে মেষের সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি এবং গরুর সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি। নিউজিল্যাণ্ডে সাড়ে তিন কোটি মেষ পালিত হয়। কিন্তু দেশটির লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষেরও কম। দক্ষিণ গোলার্ধে, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে লোকসংখ্যার অনুপাতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা এত বেশি হইবার কারণ কি? প্রথমতঃ, জনবিরল দেশে প্রচুর পশুচারণ ভূমি পাওয়া যায় বলিয়া পশুচারণ খুব সুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে বৃষ্টিপাত কম বলিয়া শতকরা ৫০ ভাগের উপর জমি পশুচারণের উপযোগী কিন্তু কৃষিকার্যের উপযোগী নহে। তৃতীয়তঃ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে হিংস্র জন্তু কম বলিয়া পশুগুলি রক্ষার জন্য খরচ কম হয়। চতুর্থতঃ, পশুপালনের জন্য কম লোকের দরকার হয় বলিয়া জনবিরল দেশে উহা খুব লাভজনক ব্যবসা।

পশুপালন নানা উদ্দেশ্য লইয়া করা হয় ; যথা—(ক) মেষের লোম অথবা পশমের জন্য (খ) মেষের মাংস রপ্তানির জন্য এবং উপজাতদ্রব্য চর্ম প্রভৃতি রপ্তানির জন্য (গ) গরুর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্য (ঘ) গরুর মাংস, চর্ম প্রভৃতির জন্য। বিভিন্ন ধরণের জলবায়ুতে বিভিন্ন ধরণের পশুচারণ শিল্প গড়িয়া উঠে। নিম্নে কয়েক প্রকার পশুচারণ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল—

(১) অষ্ট্রেলিয়ার পুর্বতটভাগ বরাবর গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের অবস্থানের জন্য ঐ অঞ্চলে ১০০ সেন্টিমিটারের অধিক বারিপাত হয়। ঐ অঞ্চলে প্রচুর তৃণ জন্মে। তাহা ছাড়া ওট, ভুট্টা এবং যবের চাষও হইয়া থাকে। এই ফসলগুলি গরুর খাদ্য। গরু বৃহৎ জন্তু। উহার জন্য প্রচুর ঘাস, ভুট্টা, ওট প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, উহার পানীয় জলের চাহিদাও অধিক ; সুতরাং, অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ গরু পূর্বভাগের সংকীর্ণ তটভাগের অধিক বারিপাতযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায়। এখানে ব্রিসবেন, সিডনি ও মেলবোর্ণ বন্দরের নিকট জমান দুধ মাখন প্রভৃতির কারখানা দেখা যায়। নিউজিল্যাণ্ডে বৃষ্টিপাত অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা বেশি এবং জলবায়ু আরও শীতল। এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য মাখন। নিউজিল্যাণ্ড একটি ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু উহার মাখন রপ্তানি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। বর্তমানে জাহাজে হিমকক্ষের ব্যবস্থা থাকায় নিউজিল্যাণ্ড হইতে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত ব্রিটেনে অধিক পরিমাণে মাখন সরবরাহ করার কোন অসুবিধাই নাই।

(২) মাংস উৎপাদনের জন্য পশুপালন নিউজিল্যাণ্ডে তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। অষ্ট্রেলিয়াতে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যাই বেশি ; কিন্তু মাংসের জন্য যে স্থূলকায় গরু (beef cattle) পালন করা হয় তাহার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রচুর ভুট্টা এবং ওট খাওয়াইয়া উহাদের মোটা করা হয়। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ভুট্টা এবং ওট উৎপাদন কম। অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন হইতে প্রচুর পরিমাণ গো-মাংস ও মেষ রপ্তানি হয়।

(৩) পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতেই মেষের সংখ্যা বেশি। অষ্ট্রেলিয়ার ভূমি মেষচারণের পক্ষে আদর্শ স্থানীয়। সাধারণতঃ দুই প্রকার মেষ পালন করা হয় ; যথা—স্পেন দেশীয় মেরিনো মেষ এবং ব্রিটেন হইতে আমদানী কৃত উৎকৃষ্ট মেষ। মেরিনো মেষ খুব কষ্টসহিষ্ণু। উহারা উষ্ণ জলবায়ুতে খুব কম জল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম। ছোট ঘাস এবং সেজবুশ ও সল্টবুশের পাতা উহাদের প্রিয় খাদ্য। এই মেষের লোম খুব দীর্ঘ এবং রেশমের মত। এই মেষ সাধারণতঃ অল্পবৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-সাউথওয়েলস ও কুইন্সল্যাণ্ডে অধিক দেখা যায়। অপরপক্ষে, ব্রিটেনের মেষ একটু মোটা এবং উহার লোমও বেশ ভাল। এই মেষ হইতে মাংস এবং পশম উভয়ই পাওয়া যায়। তবে ইহার জন্য শীতল জলবায়ু এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। ভিক্টোরিয়া রাজ্য ও নিউসাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ ভাগে এই মেষ দেখা যায়। নিউজিল্যাণ্ডের

| জাপান | যুক্তরাষ্ট্র |
| --- | --- |
| ২। কলকারখানাগুলি সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এতে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আসে এবং বিদেশেই তৈয়ারি মাল রপ্তানির সুবিধা হয়। | ২। বেশির ভাগ কলকারখানা দেশের অভ্যন্তরে কয়লা খনির কাছে অবস্থিত। রপ্তানি খুব বেশি নয়। স্থানীয় চাহিদা খুব বেশি। |
| ৩। শিল্পাঞ্চলে বড় বড় কারখানাও যেমন আছে তেমনি গ্রামাঞ্চলে সস্তায় জলবিদ্যুৎ পাওয়ার ফলে আধুনিক ছোট শিল্পও খুব বেশি গড়িয়া উঠিয়াছে। | ৩। বড বড় কলকারখানা এবং শ্রমনিবারক ব্যবস্থা বেশি। শ্রমনিবিড় ছোট প্রতিষ্ঠান প্রায় নাই কারণ মজুরী খুব বেশি। |
| ৪। এখানকার জাহাজ নির্মাণ শিল্প পৃথিবীর মধ্যে বড় এবং এখনও রেশম শিল্প খুব উন্নত। | ৪। বহু জাহাজ কারখানা আছে কিন্তু খুব কম জাহাজ তৈরি হয় ( জাপান হইতে সস্তায় জাহাজ মেলে)। রেশম বস্ত্রের চাহিদা খুব কিন্তু উৎপাদন প্রায় নাই। |
| ৫। অধিবাসী শ্রমিকরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং তাহাদের দেশপ্রেমের তুলনা নাই। | ৫। শ্বেতাঙ্গরা অল্পশ্রমে অতি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিতে কাজ করে। দৈহিক শক্তির কাজ করে নিগ্রোরা। |

**Q. 17. Describe a trans-continental railway route across the United States and explain the difference in natural productions along the route.**

**[ যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশপারের রেলপথগুলির বর্ণনা দাও এবং ঐগুলির ধারে কি প্রকার প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার বর্ণনা ও বৈষম্যের ব্যাখ্যা দাও। ]**

**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে** পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি রেলপথ আছে ( ২৫২ হাজার মাইল )। দেশটি যেমন বিশাল তেমনি তাহার আর্থিক সম্পদও বহুবিধ। এই বিপুল সম্পদ আহরণের জন্য রেলপথগুলিকে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক তটভাগ হইতে যে কোন একটি **মহাদেশ পারের রেলপথ** ( trans-continental railway route ) ধরিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের তটভাগের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে নানাপ্রকার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, অরণ্য, জীবজন্তু এবং কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত অনেকগুলি সমান্তরাল রেলপথ আছে। ইহাদের মধ্যে **নিউইয়র্ক** হইতে **সেটেল** বন্দর পর্যন্ত যে পথটি যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে উহাই সর্বপ্রধান। উহাকে

"নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ" বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগকে পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে অনুরূপভাবে একটি রেলপথ অতিক্রম করিয়াছে। উহাকে "সার্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ" বলা হয়। এই রেলপথটি মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর **নিউ অর্লিয়েন্স** হইতে পশ্চিম দিকে মরুপ্রায় অঞ্চলের মধ্য দিয়া সুউচ্চ রকি পর্বতমালা পার হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তটে **লসএঞ্জেলস** বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথটি অর্থনৈতিক দিক দিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। সুতরাং, এখানে নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ ( নিউইয়র্ক—সেটেল রেলপথ ) লইয়া আলোচনা করা যাক্।

**নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথটি** আটলান্টিক তট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগর ও বন্দর **নিউইয়র্ক** অবস্থিত। রেলপথটি মক ও হাডসন নদীর উপত্যকা ধরিয়া সুউচ্চ এ্যাপালাশিয়ান পর্বতমালার উত্তরভাগ অতিক্রম করিয়া ইরি হ্রদের তটে বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও হ্রদবন্দর **বাফেলোয়** পৌছিয়াছে। এখান হইতে এই রেলপথটি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। কারণ, এই অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগ কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। ক্লিভল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট, গ্যারি, শিকাগো, মিলওয়াকি প্রভৃতি বড় বড় শিল্পকেন্দ্র বৃহৎ হ্রদগুলির দক্ষিণ ভাগে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিশাল শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়া নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথটি ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে গিয়াছে। মিশিগান হ্রদের পশ্চিমে বিস্তৃত প্রেয়ারী তৃণভূমি ও ভুট্টাবলয়ে মাংসের জন্য সংখ্যাতীত গরু ও শূকর পালন করা হয়। কিন্তু প্রেয়ারী ও তাহার পশ্চিমে অবস্থিত রকি মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টি কম বলিয়া ঐ অঞ্চলে মেষচারণ অধিক প্রচলিত। কোথাও কোথাও জলসেচের সাহায্যে গম ও ভুট্টা চাষ করা হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু তীব্র ভাবাপন্ন অর্থাৎ গরম এবং শীত উভয়ই অত্যধিক। মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্কর ধূলিঝড় বহে। অতঃপর আরও পশ্চিমদিকে দুরারোহ রকি পর্বতমালায় তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি থাকায় রেলপথটি কোনক্রমে গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পর্বতগাত্রে সরলবর্গীয় বৃক্ষের ঘন অরণ্য আছে। এই অঞ্চলে সোনা, রূপা এবং সীসা ও দস্তার খনি আছে। তাহা ছাড়া, প্রচুর তাম্রও পাওয়া যায়। এখানে প্রচুর বাদামী কয়লা থাকিলেও উহা বর্তমানে বিশেষ কাজে লাগিতেছে না। মণ্টানা রাজ্যের তাম্র খনিগুলি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান তাম্রের সংস্থান। অতঃপর রেলপথটি রকি পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর তটে অবস্থিত ওয়াশিংটন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে বিপুল অরণ্য সম্পদের সাহায্যে কাগজ শিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে কিছু ভাল কয়লা এবং লৌহও পাওয়া যায়। সেটেল

প্রভৃতি বন্দরে জাহাজ শিল্প গঠনে উহা কাজে লাগাইয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া খরস্রোতা এবং বিপুলকায়া কলম্বিয়া নদী প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে প্রচুর জলবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। নদীর উর্বর উপত্যকায় প্রচুর গম জন্মে। এখানে শীত ও বসন্ত উভয় ঋতুতেই গম চাষ হয়। এই অঞ্চলের পশ্চিমভাগে প্রশান্ত মহাসাগর তটে কোষ্টরেঞ্জ নামক পর্বতমালা বরাবর অত্যধিক বারিপাত হয়। কলাম্বিয়া মালভূমির মাটি বেশ উর্বর ; উহা আগ্নেয় কৃষ্ণ মৃত্তিকা। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি অল্পদিনের। সম্প্রতি এখানে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে এবং লোকবসতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বাস্তবিক পক্ষে মিশিগান হ্রদের পশ্চিমতট হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। কেবল খনিজ আহরণকেন্দ্র এবং পশুচারণ কেন্দ্রগুলিতে কিছু লোক বাস করে। তবে রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়া অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত সুগম গিরিপথ থাকায় রেলপথ স্থাপন করা বর্তমানে সম্ভব হইয়াছে।

নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথে আটলান্টিক তট হইতে পশ্চিমদিকে প্রশান্ত মহাসাগর তটভাগ পর্যন্ত যাইতে হইলে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হয় :—

(ক) প্রাকৃতিক—আটলান্টিক তটের সমভূমি, মক-হাডসন উপত্যকা ও এ্যাপালাশিয়ান পর্বতমালা, হ্রদ অঞ্চল, প্রেয়ারী সমভূমি, রকি মালভূমি ও পর্বতমালা, কলাম্বিয়া মালভূমি ও নদী উপত্যকা।

(খ) জলবায়ু—পূর্ব উপকূলীয় বা চীনীয় জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ মরুপ্রায়ভূমির চরমভাবাপন্ন জলবায়ু, পার্বত্য জলবায়ু ও মৃদু শীতল আর্দ্র জলবায়ু।

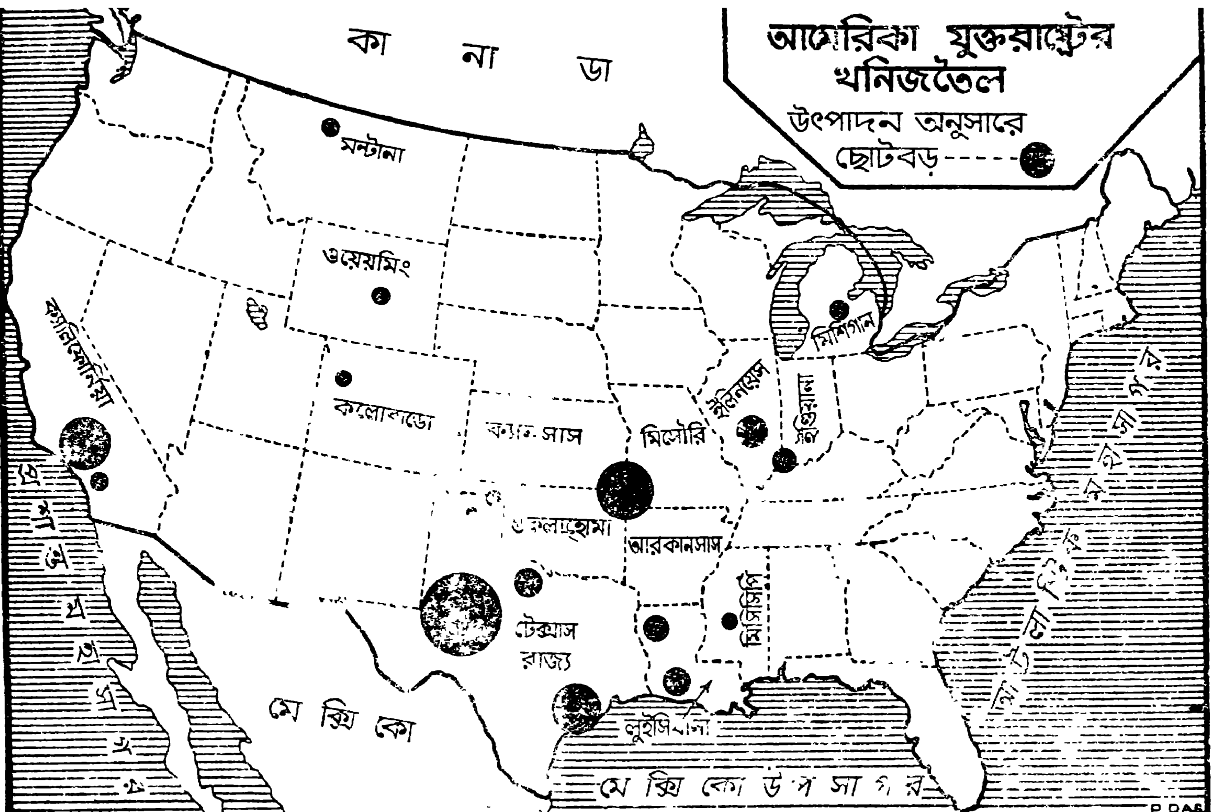
(গ) অর্থনৈতিক—নিউইয়র্ক শিল্পাঞ্চল, তটভাগের মিশ্রকৃষি অঞ্চল, এ্যাপালাশিয়ান অরণ্য বলয়, পেনসিলভানিয়া কয়লাখনি অঞ্চল, গ্রেট লেকস শিল্পাঞ্চল, ভুট্টা ও বাসন্তি গম বলয়, প্রেয়ারী পশুচারণ বলয়, মণ্টানার খনি অঞ্চল, কলাম্বিয়া ও রকি মালভূমির অরণ্য বলয়, কলাম্বিয়া উপত্যকার কৃষি অঞ্চল ও সেটেল বন্দরের মৎস্য শিল্প, বিমান কারখানা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প অঞ্চল।

যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৩ শতাংশ লোক রেলগাড়িতে চড়ে, বাকী সকলে যায় মোটরে বা এয়ারোপ্লেনে।

**Q. 17. Examine and estimate the Coal and Petroleum resources of the U. S. A.**

**[ যুক্তরাষ্ট্রের কয়লা ও পেট্রোলিয়ম সম্পদের সম্পর্কে আলোচনা কর। ]**

[ ১১ নং প্রশ্নোত্তর হইতে কয়লার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিম্নাংশ যোগ কর। ]


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের
খনিজতৈল
উৎপাদন অনুসারে
ছোটবড়
কা না ডা
মন্টানা
ওয়েয়মিং
ক্যালিফোর্নিয়া
কলোরাডো
ক্যান্সাস
মিসৌরি
ইলিনয়েস
ইণ্ডিয়ানা
মিশিগান
ওকলাহোমা
আরকানসাস
মিসিসিপি
টেক্সাস
রাজ্য
লুইসিয়ানা
মে ক্সি কো
মে ক্সি কো উ প সা গ র
প্র শা ন্ত ম হা সা গ র
P DAS

**খনিজ তৈল** উৎপাদনে আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের ৩০ শতাংশের কিছু কম খনিজ তৈল একমাত্র আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রেই পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যুদ্ধপূর্বকালে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ৬০ ভাগের অধিক তৈল উৎপন্ন করিত। যুদ্ধের পরবর্তী কালে যুক্তরাষ্ট্রে তৈল উৎপাদন ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ; অথচ পৃথিবীর মোট তৈল উৎপাদনের মাত্র ৩০ ভাগ এখন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। ইহার করণ কি ? ইহার কারণ এই যে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা দ্রুতগতিতে মধ্যপ্রাচ্যের ( লিবিয়া, আরব, ইরাক ) তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের তৈল অঞ্চলগুলিকে প্রধানতঃ সাতটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

(১) এ্যাপালাশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল। (২) ইলিনয়নইস এবং ইণ্ডিয়ানার দক্ষিণ-পশ্চিম-অঞ্চল। (৩) লিমা-ইণ্ডিয়ানা অঞ্চল। (৪) মধ্যমহাদেশীয় অঞ্চল ( Mid-Continental oilfields )। (৫) মেক্সিকো উপসাগরীয় উপকূল অঞ্চল। (৬) রকি পর্বত অঞ্চল। (৭) ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চল।

আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় কিন্তু তৈলের প্রয়োজন এত বেশি যে বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ ভেনিজুয়েলা, কলাম্বিয়া ও আরব হইতে প্রচুর তৈল আমদানি করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ৫½ কোটি মোটরগাড়ী এবং লক্ষ লক্ষ ট্রাক্টর, হাজার হাজার বিমান ও তৈল ব্যবহারকারী রেলইঞ্জিন ও জাহাজ থাকায় অত্যধিক পরিমাণে তৈলের প্রয়োজন হয়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিশোধিত তৈল বিদেশে রপ্তানিও করে। তবে উৎপাদনের তুলনায় বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ কম। ইহা ছাড়া মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার তৈলাঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের অনেকটা কর্তৃত্ব আছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানির পরিমাণ মন্দ নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাপালাশিয়ান অঞ্চলের তৈলখনিগুলি নিউইয়র্ক হইতে টেনিসি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এখানে সর্বপ্রধান খনি পেনসিলভানিয়া রাজ্যে অবস্থিত। পূর্বের তুলনায় এই অঞ্চলে তৈল উৎপাদন খুবই কম। বর্তমানে টেক্সাস রাজ্যেই ( উৎপাদন ৪০ কোটি ব্যারেল ) সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈল মিলে। ইহা মধ্য-মহাদেশীয় অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার পরেই ওক্লাহামা ও ক্যালিফোর্ণিয়ার স্থান। কানসাস এবং আরাকানসাস রাজ্যদ্বয়ের তৈল উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য। তৈল খনিগুলি খুব শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে, আজ যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক তৈল উৎপন্ন হইয়াছে, মাত্র কয়েক বৎসর পরে সেখানে তৈল উৎপাদন নাও হইতে পারে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে তৈলবাহী ও গ্যাসবাহী নল ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। ফলে খুব কম খরচে রাজ্যের সর্বত্র তৈল ও গ্যাস সরবরাহ করা হয়। তৈল পরিশোধনের বৃহৎ কেন্দ্রগুলি নিউ অর্লিয়েন্স, লস এঞ্জেলস প্রভৃতি বন্দরে এবং মিসিসিপি অববাহিকায় অবস্থিত।

**Q. 18. Account for the economic development of the eastern part of the U. S. A.**

[ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের আর্থিক উন্নতির কারণ বর্ণনা কর। ]

আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগ পশ্চিমভাগের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। আটলান্টিক তটভাগ হইতে সেণ্টলরেন্স নদী উপত্যকা, হ্রদ অঞ্চল পেনসিলভানিয়া, টেনিসি উপত্যকা এবং গাল্‌ফ কোষ্টসহ সমগ্র মিসিসিপি সমভূমি অঞ্চল শিল্প, বাণিজ্য, খনিজ ও কৃষিজ সম্পদে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই নহে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও উন্নতিশীল অঞ্চল। এই অসাধারণ উন্নতির অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে—(১) যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগেই প্রথম ইউরোপীয় জাতিগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে। পশ্চিম ভাগে অনেক পরে উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। (২) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগ দিয়া ১০০° দ্রাঘিমা দেশটিকে পূর্ব ও পশ্চিমভাগে ভাগ করিয়াছে। এই দ্রাঘিমার পূর্বভাগে বৃষ্টিপাত সর্বত্রই ৫০ সেণ্টিমিটারের অধিক হয় এবং পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত খুব কম। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ আটলাণ্টিক তট হইতে দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত হয়। ফলে পূর্ব তটভাগে বৃষ্টি অধিক হয় এবং মধ্য ও পশ্চিমভাগে অনুর্বর ভূমি এবং তৃণভূমি অধিক দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কলোরাডো রাজ্যে মরুভূমিও আছে। (৩) যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগে কয়েকটি বড় বড় উর্বর সমভূমি থাকায় অধিকাংশ কৃষিজমি পূর্বভাগেই অবস্থিত। অপরপক্ষে, পশ্চিমভাগে সুবিশাল রকি পর্বতমালা থাকায় উর্বর জমি নাই বলিলেই চলে পূর্বভাগে মিসিসিপি নদীর উর্বর পলিমাটি, টেক্সাস অঞ্চলের উর্বর কৃষ্ণমৃত্তিকা এবং আটলাণ্টিক তটের বালুকা-প্রধান মাটি বেশ উর্বর। এই অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে অধিক তামাক ও ভুট্টা জন্মে। (৪) মিসিসিপি ও সেণ্টলরেন্স নদী ও হ্রদগুলির সুন্দর জলপথ থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগ দ্রুত উন্নত হইয়াছে। বড় বড় সমতলভূমি থাকায় এই অঞ্চলে রেলপথ স্থাপন করাও সহজ হইয়াছে। এখানে রেলপথ, রাস্তা, তৈল ও গ্যাসবাহী নল প্রভৃতি ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চলে শিল্প গঠন করা সহজ হইয়াছে। (৫) আটলাণ্টিক তট ও মেক্সিকো উপসাগরের তটভাগ বেশ ভগ্ন হওয়ায় নিউইয়র্ক, বষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, সাভানা, প্রভৃতি বড় বড় বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় বড় বন্দরের অবস্থানের জন্য আটলাণ্টিক তটভাগ ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। (৬) যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগে এ্যাপালাশিয়ান পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যসমভূমিতে এবং মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে পৃথিবীর বৃহত্তম কয়লা, খনিজ তৈল ও গন্ধকের খনি অবস্থিত। পেনসিলভানিয়ার কয়লা খনি অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বড় ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি গঠিত হইয়াছে।

তাহা ছাড়া আলাবামায় লৌহ ও ক্যারোলিনায় বস্ত্র শিল্প, শিকাগোর কৃষিযন্ত্রের কারখানা, ডেট্রয়েট ও ক্লিভল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত মোটর কারখানা এবং নিউইংল্যাণ্ডের বস্ত্র, যন্ত্রাদি ও চর্ম শিল্প থাকায় কোটি কোটি লোক এইসকল অঞ্চলে বাস করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে প্রচুর স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, দস্তা ও খনিজ তৈল এবং সামান্য কয়লা পাওয়া যায়। ঐগুলি শিল্প গঠনে বিশেষ সাহায্য করে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতু শোধনাগারগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বকি পর্বতের জন্য এই অঞ্চলে রেলপথও কম। অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরের তটভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল।

**Q. 19. Discuss the main factors accounting for the movement of cotton textile industry from the traditional centres of the U. S. A to the Southern States (B Com. 1957)**

[ কি কি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্রশিল্প পুরাতন কেন্দ্রগুলি হইতে দক্ষিণাঞ্চলে সরিয়া গিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর। ]

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস শিল্প প্রধানতঃ দুইটি অঞ্চলে গঠিত হইয়াছে, যথা —(১) নিউ ইংল্যাণ্ড এবং (২) দক্ষিণাঞ্চল। বর্তমানে নিউ ইংল্যাণ্ডের তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে ছয়গুণের মত অধিক কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ১৯২৫ সাল হইতে নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ঐ সময় হইতে দক্ষিণাঞ্চলের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নিউ ইংল্যাণ্ডে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করে। এই সমৃদ্ধির প্রধান কারণ ঐ অঞ্চলে জল-বৈদ্যুতিক শক্তির সহজলভ্যতা, উপকূল পথে দক্ষিণের অনুন্নত রাজ্যগুলি হইতে কার্পাস আমদানির সুবিধা এবং প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিকের সংস্থান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত হইয়া উঠে এবং ঐ অঞ্চলে স্থানীয় সহজলভ্য কাঁচামালের সুবিধা ছাড়াও প্রচুর কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামও উৎপন্ন হইতে থাকে। সুতরাং, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, টেনিসি, আলাবামা এমন কি টেক্সাস রাজ্যেও বহু কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলে নিগ্রো শ্রমিকও সহজলভ্য। সুতরাং এই বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অতি দ্রুত উন্নতি করিতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চল প্রথমদিকে প্রধানতঃ মোটা কাপড় ও সাধারণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে থাকে এবং নিউ ইংল্যাণ্ড উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য উৎপাদনে আপন স্থান বজায় রাখে; কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলেও ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর দ্রব্যের বাজার গড়িয়া উঠে। অরণ্য সম্পদ সহজলভ্য হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে রেয়ন শিল্পও দ্রুত গড়িয়া উঠে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসে ১৯২৫ সাল হইতে

১৯৪৫ সালের মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ডের দ্রুত অধঃপতন ঘটিতে থাকে। বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন কার্পাস বস্ত্র পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যান্য দেশেও রপ্তানি হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, নিউ ইংল্যাণ্ড কেবলমাত্র অতি উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস দ্রব্য এবং নানাপ্রকার কৃত্রিম ও মিশ্র তন্তুজাত দ্রব্য ও বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব-তট অঞ্চলে ফিলাডেলফিয়া বন্দরেও বস্ত্রশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্রের বৃহত্তম-বাজারগুলির নিকটে অবস্থিত। দক্ষিণাঞ্চলের কার্পাস তুলা এবং এ্যাপালাশিয়ান অঞ্চলের কয়লা কোনটিই অধিক দূরে নহে। সুতরাং, দক্ষিণের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সত্ত্বেও নিউ ইংল্যাণ্ডের মত এই অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটে নাই।

**Q. 20. Write short nctes on—(a) New Orleans (b) New York (c) Chicago (d) Vancouver (e) San Francisco (f) Philadelphia (g) Minneapollis (h) Boston (i) Pittsburgh (j) Seattle (k) Los Angeles (l) Montreal (m) Alaska.**

[(ক) নিউ অরলিনস, (খ) নিউইয়র্ক, (গ) চিকাগো, (ঘ) ভ্যাঙ্কুভার, (ঙ) সানফ্র্যান্সিস্‌কো, (চ) ফিলাডেলফিয়া, (ছ) মিনিয়াপোলিস, (জ) বষ্টন, (ঝ) পিটস্‌বার্গ, (ঞ) সিটল্‌, (ট) লস এঞ্জেলস, (ঠ) মন্ট্রিল এবং (ড) আলাস্কা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ টিকা লিখ।

[ (a), (b), (c), (d), এবং (e)র জন্য প্রথম খণ্ডের ১১৭নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ]

(f) **ফিলাডেলফিয়া**—ইহা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক উপকূলের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে কাঁচামাল এবং কয়লাখনি অঞ্চল অবস্থিত থাকায় ইহা একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের শিল্পসমূহের ভিতর জাহাজ নির্মাণ, লৌহ, ইস্পাত, ও কলকব্জা নির্মাণ, বস্ত্রশিল্প এবং পশম-শিল্প উল্লেখযোগ্য।

(g) **মিনিয়াপোলিস**—ইহা উত্তর মিসিসিপি উপত্যকায় মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানকার প্রেয়ারি ভূমিতে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ময়দা প্রভৃতি গম-জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এই স্থানের তৈয়ারী ময়দা বিদেশে রপ্তানি হয়।

(h) **বষ্টন**—ইহা আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত। ইহা উত্তর আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি প্রধান পোতাশ্রয় ও বন্দর। বোষ্টন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলের বহির্দ্বারের কাজ করে। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পশম বাণিজ্যের কেন্দ্র। নানাপ্রকার যন্ত্র, বস্ত্র ও কাগজ এখানকার রপ্তানি দ্রব্য।

(j) **পিটসবার্গ**—ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় অবস্থিত এবং পৃথিবীর মধ্যে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের বৃহত্তম কেন্দ্র। ইহার নিকটে কয়লা ও চুন থাকায়

এখানে লৌহ এবং ইস্পাতশিল্পের এরূপ সমৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের মূলকেন্দ্র।

(i) সিটল্—এই শহরটি উত্তর আমেরিকার একটি বিশিষ্ট জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের কেন্দ্র। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগের খাঁড়িতে অবস্থিত এবং ইহার বন্দর খুব সুন্দর হওয়ায় এখানে জাহাজ ভাসাইবার সুবিধা আছে। এখানে বিরাট বিমান নির্মাণের কারখানা আছে। রপ্তানিদ্রব্য কাঠ, মাছ ও বিমান।

(k) লস এঞ্জেলস—ইহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর তটের দক্ষিণভাগে অবস্থিত বৃহৎ শহর ও তৈলশিল্পের কেন্দ্র। নিকটেই ইহার কৃত্রিম বন্দর অবস্থিত। এখান হইতে তৈল ও হলিউডের ফিল্ম রপ্তানি করা হয়।

(l) মন্ট্রিল—ইহা কানাডার সর্বপ্রধান শহর ও বন্দর। এই বন্দর দিয়া গম, যন্ত্রপাতি, কাগজ ও রেল ইঞ্জিন রপ্তানি হয়। এখানকার কাগজ শিল্প, ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুব বড়। ইহা সেণ্ট লরেন্স নদীর উপর অবস্থিত। কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ নদী পার হইয়া হ্যালিফাক্স বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে।

(m) আলাস্কা—ইহা উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এক পর্বতময় ও হিমশীতল উপদ্বীপ। ইহা আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। উপকূলভাগে প্রচুর মৎস্য ও অভ্যন্তরভাগে স্বর্ণ ও কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় সামরিক ঘাঁটি।

---

# ব্রিটেন

UNITED KINGDOM

**Q. 21. Explain the reasons for the concentration of the cotton textile industry in Lancashire and describe the present position of the industry.**

**[ কি কি কারণে ল্যাঙ্কাশায়ারে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে এবং উহার বর্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা বিবৃত কর। ]**

**কার্পাস বয়ন শিল্প**—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বয়নশিল্প প্রধানতঃ ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেশির ভাগই এই অঞ্চলের কলকারখানার কার্যে ব্যাপৃত আছে। ব্রিটেনের পশ্চিমভাগে ল্যাঙ্কাশায়ারে কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠার কারণ :—

(১) ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র পৃথিবীর আধুনিক বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। সুতরাং, এখানে প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। ম্যাঞ্চেষ্টার অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত হয়; (২) এই অঞ্চলে জলকণা মিশ্রিত পশ্চিমাবায়ু ( **Westerlies** ) প্রবাহিত হয়। ইহাতে বয়ন কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়। কেননা জলকণা মিশ্রিত বায়ু না থাকিলে সূক্ষ্ম সূতাগুলি ছিঁড়িয়া যায়। (৩) ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা-খনি অঞ্চলের নিকট পেনাইন পর্বত-নিঃসৃত জলধারা সূতা পরিষ্কার করার উপযুক্ত হওয়ায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা থাকায় এই শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। (৪) আমেরিকার বন্দরগুলি ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিভারপুলের সোজা-সুজি আটলাণ্টিক মহাসাগরের পারে অবস্থিত হওয়ায় আমেরিকা হইতে তুলা আমদানি করাও খুব সহজ। লিভারপুলের ন্যায় একটি উন্নত বন্দর নিকটবর্তী থাকায় আমদানি ও রপ্তানি সকল দিক হইতেই এই শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। (৫) ম্যাঞ্চেষ্টার খালকাটার পর, ম্যাঞ্চেষ্টারও একটি সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হইয়াছে।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে তুলার চাষ হয় না। তাহাকে সম্পূর্ণভাবেই আমদানি করা তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান এবং ব্রেজিল হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আমদানি করা হয়।

ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পনগরগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা —উত্তরাঞ্চলের শহর এবং দক্ষিণাঞ্চলের শহর। **পোষ্টন, ব্লাক্‌বার্ণ** প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের শহরগুলি বয়নকার্য এবং **রকডেল, ওল্ডহাম, বোল্টন, বারী** প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলি সূতা তৈয়ারির জন্য প্রসিদ্ধ। ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপন্ন

কার্পাস ও অন্যান্য তন্তুনির্মিত দ্রব্যাদি তুরস্ক, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জই পৃথিবীর কার্পাসজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিত। কিন্তু পরবর্তীকালে জাপান এবং আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে এই শিল্পের অগ্রগতির জন্য পূর্বদেশীয় বাজারগুলি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ল্যাঙ্কাশায়ারের গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর বস্ত্র রপ্তানি বাজারে জাপান চীন, এবং ভারতের স্থান ব্রিটেনের উপরে। ব্রিটেন এখন ভারত, হংকং ও পাকিস্তান হইতে কোটি কোটি টাকার বস্ত্র ক্রয় করে।

পৃথিবীর প্রধান বস্ত্র উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ১৯৬৯ সালে ব্রিটেন সপ্তম স্থানে নামিয়া যায় এবং আগামী ২।৪ বৎসরের মধ্যে আরও অন্ততঃ তিনটি দেশ ব্রিটেনকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে।

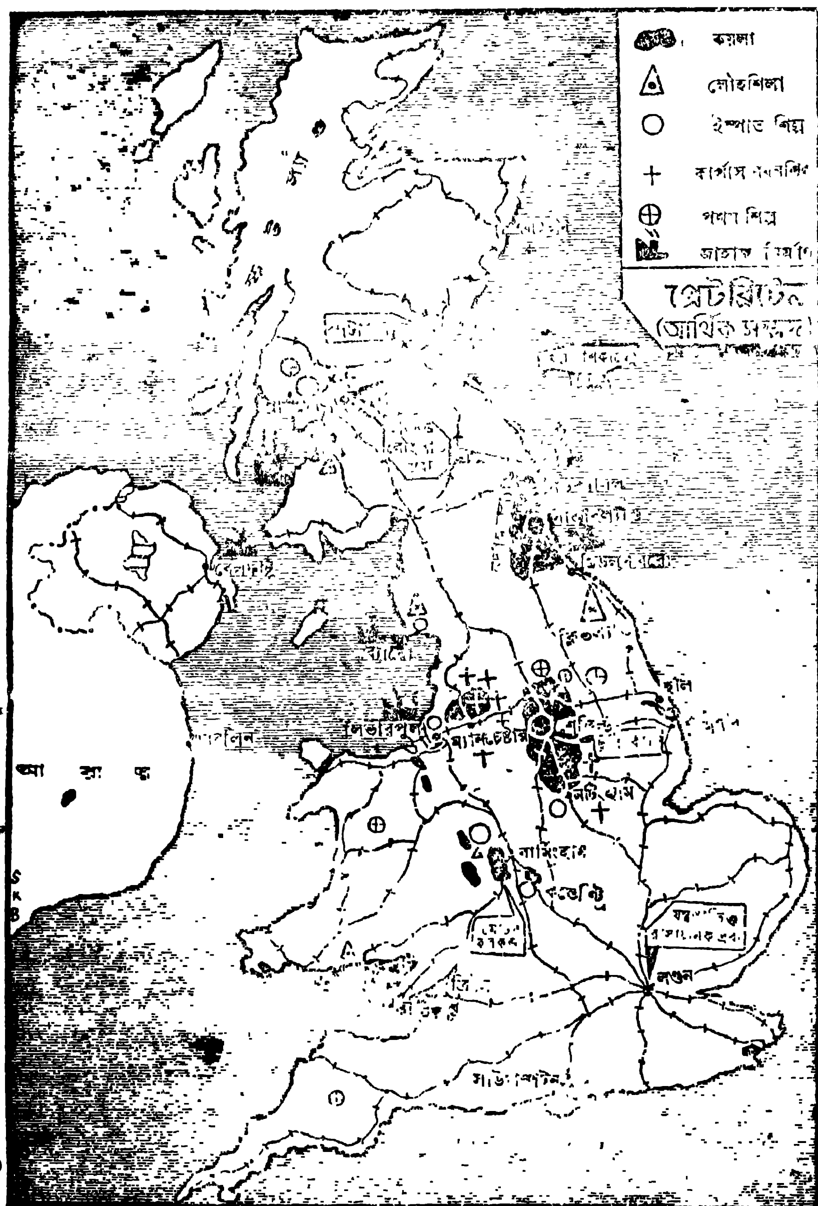
**Q. 22. Describe and account for the growth and localization of the following industries of the U. K.—(i) Iron and Steel industry (ii) Shipbuilding industry (iii) Woollen industry.**

[ব্রিটেনের নিম্নলিখিত শিল্পগুলির বিকাশ এবং অবস্থান সম্পর্কে লিখ—(ক) লৌহ ও ইস্পাত। (খ) জাহাজ নির্মাণ (গ) পশম শিল্প।]

(১) **লৌহ ও ইস্পাতশিল্প**—লৌহ এবং ইস্পাতশিল্পে পৃথিবীর ভিতরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্রিটেনে বৎসরের ২½ কোটি টনের মত ইস্পাতদ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ব্রিটেনের বৃহত্তম শিল্প। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নিম্নলিখিত ছয়টি অঞ্চলে প্রধানতঃ লৌহ এবং কয়লার সহজলভ্যতার সুযোগে ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, ব্রিটেনের লৌহশিল্পে আমদানি-কৃত লৌহশিলাও ব্যবহৃত হয়।

(১) **কৃষ্ণ অঞ্চল** (Black Country)—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে এই স্থানের গুরুত্ব কম নহে। এখানে সামান্য পরিমাণে নিকৃষ্ট লৌহশিলা, প্রচুর কয়লা এবং চুন পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্য এখানে ব্লাস্ট ফার্ণেসের সংখ্যা কম; কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সুবৃহৎ। এই অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রগুলির ভিতরে বার্মিংহাম, কভেন্ট্রি, ডাডলি ও রেডিডচের নাম

* বিশ্বের বস্ত্রশিল্পে প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যুগ্মভাবে চীন ও ভারতের। রাশিয়ার স্থান চতুর্থ, জাপান পঞ্চম এবং পাকিস্তান ষষ্ঠ। এছাড়া ব্রেজিল, মিশর এবং মেক্সিকো ব্রিটেনের প্রায় সমকক্ষ (Monthly-Bul. Stat. of Aug. 1969.)।


কয়লা
লৌহশিলা
ইস্পাত শিল্প
পশম শিল্প
গ্রেটব্রিটেন
লিভারপুল
ম্যাঞ্চেষ্টার
নটিংহাম
বার্মিংহাম
কভেন্ট্রি
হাল
লণ্ডন
ডাবলিন

উল্লেখযোগ্য। মোটর, সাইকেল, রেলগাড়ীর যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার জন্য বার্মিংহাম এবং মোটরগাড়ী ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের জন্য কভেণ্ট্রি, গাড়ি এবং সাইকেলের জন্য রেডিচ, সূঁচ এবং শিকলের জন্য ডাডলি বিখ্যাত।

(২) **শেফিল্ড**—এই শিল্প কেন্দ্রটি ইংল্যাণ্ডের মধ্যভাগে ইয়র্ক-ডার্বি-নটস্ কয়লাখনির উপর অবস্থিত। এই স্থানে লৌহ, কয়লা এবং চুনাপাথর সহজলভ্য হওয়ায় শেফিল্ড লৌহ এবং ইস্পাতের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের অন্যান্য কেন্দ্রগুলির ভিতর রথারহাম্ এবং চেষ্টারফিল্ডের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৩) **উত্তর-পূর্ব উপকূল** ( North East Coast )—কয়লা ( নর্দাম্বারল্যাণ্ড ), লৌহ ( ক্লিভল্যাণ্ডহিল ) এবং চুনের খনিগুলি নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চল লৌহ এবং ইস্পাতশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের নিউক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি নগরী লৌহশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে সুইডেন হইতেও লৌহশিলা আমদানি করা হয়।

(৪) **ফারনেস অঞ্চল** ( The Furness District )—উত্তর-পশ্চিম উপকূলে প্রচুর আকরীয় লৌহ পাওয়া যায়; সুতরাং, এখানে নর্দাম্বারল্যাণ্ড হইতে কয়লা আনিয়া ইস্পাতশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ-শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ব্যারো ইহার কেন্দ্র।

(৫) **দক্ষিণ ওয়েল্‌স**—স্পেন এবং কানাডা হইতে লৌহ এবং মালয়েশিয়া, বলিভিয়া এবং নাইজিরিয়া হইতে টিন আমদানি করিয়া এখানে স্থানীয় উৎকৃষ্ট কয়লার সাহায্যে বৃহৎ টিনপ্লেট ও অন্যান্য ধাতুশিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কার্ডিফ ও সোয়ানসি ইস্পাত উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র।

(৬) **গ্লাসগো**—স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো অঞ্চলে স্থানীয় উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ-শিলার সাহায্যে বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তবে লৌহশিলার-উৎপাদন যথেষ্ট নয়। লৌহশিলা প্রধানতঃ আমদানি করিতে হয়।

ব্রিটেনের ইস্পাতশিল্পের ইতিহাসকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) যখন কাঠ কয়লার সাহায্যে লৌহ গলানো হইত তখন উইল্ড প্রভৃতি বনাঞ্চল লৌহ-শিল্পের কেন্দ্র ছিল। (২) লৌহ গলাইতে কয়লার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় মিডল্যাণ্ড, নর্দাম্বারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়লাক্ষেত্রগুলি বৃহৎ লৌহশিল্পের কেন্দ্র হইয়া উঠিল। ঐ সকল স্থানে কয়লা ও লৌহ একত্র পাওয়া যাইত। (৩) ক্রমশঃ ব্রিটেনের ভাল লৌহ-শিলা ফুরাইয়া আসার ফলে বিদেশ হইতে আমদানি করা লৌহ-শিলার উপর ব্রিটেন অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ফলে ইস্পাতের কারখানাগুলি নিউক্যাসল, গ্লাসগো, কার্ডিফ, নিউপোর্ট, প্রভৃতি বন্দরে স্থানান্তরিত হইল। (৪)

বর্তমানে ব্রিটেনের স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর লৌহশিলার অত্যন্ত ব্যাপক ব্যবহার হইতেছে, কারণ নিম্নশ্রেণীর লৌহশিলা হইতে সস্তায় লৌহ নিষ্কাশনের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও বৃটেনের লৌহ-শিলা আমদানি কমে নাই ( কারণ ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ) তবু দেশের মধ্যে লৌহশিলার যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় মিডল্যাণ্ড প্রভৃতি সমুদ্র উপকূল হইতে দূরবর্তী অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে লৌহশিল্প গঠনের সুবিধা হইয়াছে।

ব্রিটেনের রপ্তানি-বাণিজ্যে ইস্পাতশিল্পের দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলি হইল লৌহ ও ইস্পাতজাত যন্ত্রাদি, ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, জাহাজ, ট্রাক্টর প্রভৃতি। অনুন্নত দেশগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের উন্নততম দেশগুলি পর্যন্ত ব্রিটেনের যন্ত্রাদি ও মোটরগাড়ি আমদানি করে। ভারতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা মূল্যের লৌহযন্ত্রাদি রপ্তানি করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ব্রিটেনের বৃহত্তম শিল্প। এই শিল্প ইস্পাত কারখানাগুলি হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করে। ব্রিটেন লৌহশিলা আমদানি করে এবং লৌহজাত দ্রব্য রপ্তানি করে।

(২) **জাহাজ নির্মাণ শিল্প** ( Shipbuilding Industry )—ইহা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ক্লাইড নদীর তীরে অবস্থিত গ্লাসগো জাহাজ নির্মাণে পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত কেন্দ্র। ইহার কারণ—

(ক) **ক্লাইড নদীর উপত্যকায়** লৌহ ও কয়লা সহজপ্রাপ্য হওয়ায় এখানকার ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ। (খ) ফাইফ ও আয়ারশায়ার কয়লাখনিগুলি হইতে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়, (গ) স্কটদেশীয় কারিগরগণ লৌহ ও ইস্পাতশিল্পে অত্যন্ত দক্ষ, (ঘ) নদীর উভয় দিকে সংকীর্ণ সমতল ভূমি থাকায় রেলপথ স্থাপন করিবার সুবিধা হইয়াছে, (ঙ) ক্লাইড নদী খুব গভীর ও শান্ত, সেইজন্য পরীক্ষার জন্য জাহাজ এই নদীতে ভাসাইতে পারা যায়।

পূর্বে যখন কাষ্ঠদ্বারা জাহাজ নির্মিত হইত তখন টেমস্ নদী তীরে এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখনও মাছধরা জাহাজ এবং বড় জাহাজের ডেক ও কেবিনের কাজ এখানে করা হয়। ব্রিটেনের ওক কাঠ জাহাজ নির্মাণের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

উত্তর-পূর্ব তটভাগে **নিউক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড, মিডলস্‌বরো** অঞ্চলে **টি ও টাইন** নদীর গভীর জল এবং নিকটস্থ বিরাট লৌহশিল্পের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুবিশাল জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। লিভারপুলের নিকট বার্কেনহেড নামক স্থানেও জাহাজ নির্মিত হয়। অন্যান্য জাহাজ নির্মাণকেন্দ্রের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের **ব্যারোতে** বড় বড় জাহাজ নির্মিত হয় এবং দক্ষিণ ওয়েলসের বন্দরগুলিতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ কারখানা আছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের **বেলফাষ্ট** বিখ্যাত জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। এখানে লৌহ ও কয়লা উভয়ই আমদানি

করিতে হয়। ইহার বন্দরটি জাহাজ নির্মাণের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় এবং শ্রমিকরাও খুব সুদক্ষ।

বর্তমানে ব্রিটেনের জাহাজ কারখানাগুলি নিজেদের দেশ ছাড়াও নানাদেশের বাণিজ্য ও ট্যাঙ্কার জাহাজ নির্মাণ করিতেছে। জাহাজ ব্যবসা ব্রিটেনের অন্যতম প্রধান ব্যবসা। ব্রিটেনের বাণিজ্য নৌবহর বর্তমানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহৎ।

( এই শিল্পের বর্তমান সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২৪ নং প্রশ্নোত্তরের "জাহাজ নির্মাণ শিল্প" দ্রষ্টব্য। )

(৩) **পশমশিল্প** ( Woollen Industry )—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কার্পাস শিল্পের চেয়ে পশমশিল্প বেশি প্রাচীন। এই শিল্প প্রধানতঃ ইয়র্কশায়ারের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত। এই স্থানে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। ইয়র্কশায়ারে এই শিল্পের একদেশতার ( localisation ) কারণগুলি হইল—

(১) এখানকার জলবায়ু পশমশিল্পের অনুকূল। (২) পেনাইন পর্বতের জলধারা পশম ধৌত করা এবং রঙিন করিবার পক্ষে খুব অনুকূল। (৩) পেনাইন পর্বতে প্রচুর মেষচারণের উপযোগী ক্ষেত্র থাকায় পশম পাওয়া সহজ। (৪) কয়লা ও জলবৈদ্যুতিক শক্তি এখানে খুব সহজপ্রাপ্য। (৬) সমুদ্রোপকূলের নৈকট্য থাকায় বিদেশী পশম আমদানি ও পশমজাত দ্রব্য রপ্তানিরও খুব সুবিধা আছে।

বর্তমানে পশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলির ভিতর **লিড্‌স্, ব্রেডফোর্ড, হ্যালিফ্যাক্স, হাডার্সফিল্ড** প্রভৃতি শহরগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। স্কটল্যাণ্ডের পশমশিল্প প্রধানতঃ টুইড নদীর উপত্যকায় কেন্দ্রীভূত। হওউইক ( Hawick ), জেডবরো (Jadborough) এবং ডানন্ট্রিস (Duntries) উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। তাহা ছাড়া ওয়েলস, ডেভন ও কর্ণোয়াল অঞ্চলেও পশমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় পশমের দ্বারা সমস্ত চাহিদা মিটে না বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ে হইতে প্রচুর পশম আমদানি করা হয়। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশমজাত দ্রব্যাদি ভারত, জার্মানী, জাপান, সুইডেন, নরওয়ে, রাশিয়া, ডেনমার্ক, ইটালি, স্পেন, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

**Q. 23 Describe the principal British Coalfields and establish their connection with British Industries.**

**[ ব্রিটেনের প্রধান প্রধান কয়লাখনিগুলির বিবরণ দাও এবং উহাদের সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পগুলির যোগাযোগের বিষয় উল্লেখ কর। ]**

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কয়লাখনিগুলির নিকটে প্রধান শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। একমাত্র লণ্ডন অঞ্চল বাদে প্রায় সকল শিল্পাঞ্চলই কয়লা বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ছয়টি

প্রধান কয়লাখনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যে শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল :—

(১) **দক্ষিণ ওয়েলস ও ব্রিষ্টল** অঞ্চলের কয়লাখনিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এক বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ ওয়েলসে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রিষ্টলের কয়লা খনিটি খুব ছোট। এখানে এ্যালুমিনিয়াম শিল্প আছে। দক্ষিণ ওয়েলস অঞ্চলের প্রধান শিল্প-কেন্দ্র ও বন্দর কার্ডিফ, সোয়ানজি, নিউপোর্ট। এই সকল স্থান হইতে কয়লা রপ্তানি করা হয়। আমদানির মধ্যে স্পেনের লৌহশিলা, যুক্তরাষ্ট্র ও চিলি হইতে তামা, মালয়েশিয়া হইতে টিন প্রভৃতি প্রধান। এই সকল ধাতু পরিশোধন ও শিল্পিত পণ্যে রূপায়ণ এখানকার প্রধান কাজ। লৌহ যন্ত্রাদি রপ্তানি হইয়া থাকে।

(২) **মিডল্যাণ্ড কয়লাখনি** অঞ্চল ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। কয়লা খনিগুলি নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। পূর্বে এখানে প্রচুর লৌহ পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন অল্প পরিমাণে নিম্নশ্রেণীর লৌহশিলা পাওয়া যায়। বার্মিংহাম, কভেন্ট্রি প্রভৃতি শিল্পপ্রধান শহর এখানে অবস্থিত। কয়লা সম্পদ সুপ্রচুর না হওয়ায় এবং স্থানীয় লৌহশিলা প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় এখন এখানে সূক্ষ্ম ও দক্ষতা প্রসূত যন্ত্রাদি ও যানবাহন-শিল্পই বেশি দেখা যায়। যন্ত্রাদি নির্মাণে এই অঞ্চলের সমকক্ষ অঞ্চল পৃথিবীতে আর নাই। তাহার পরই মোটর-গাড়ি ও সাইকেল-শিল্প।

(৩) **নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহাম** কয়লাখনি ব্রিটেনের অন্যতম বৃহৎ ও বিখ্যাত খনি। উত্তর-পূর্ব তটের এই খনিগুলির সর্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে, কয়লা ক্ষেত্রটি সমুদ্রতীরে এমনকি সমুদ্র মধ্যেও বিস্তৃত। এই খনিগুলির নিকটেই ক্লিভল্যাণ্ড অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায় এবং সুইডেন হইতে লৌহ আকরিক জলপথে আমদানি করাও সহজ। সুতরাং ভারী লৌহশিল্প এখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে জাহাজ, ইঞ্জিন, রেল, প্লেট, রড প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। প্রধান বন্দর ও শিল্প কেন্দ্রগুলির মধ্যে নিউক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড ও মিডল্সবরোই প্রধান।

(৪) **ল্যাঙ্কাশায়ার** কয়লাখনিটি বৃহৎ নহে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম কার্পাসশিল্প ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার, বারী, বোল্টন, প্রোষ্টন প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। লিভারপুলের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র এবং বার্কেনহেড ও ব্যারোর জাহাজশিল্পও এই কয়লাখনির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(৫) **স্কটল্যাণ্ডের কয়লাখনিগুলি** ক্লাইড নদীর উর্ধ্বপ্রবাহ অঞ্চলে আয়ারশায়ার, ল্যানার্কশায়ার ও ফাইফশায়ারে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জাহাজ

শিল্প পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ। ইহা ক্লাইড নদীর তীরে অবস্থিত। গ্লাসগোতে ইস্পাতশিল্প ও পেসলিতে বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ডাণ্ডির পাট ও লিনেন-শিল্প এই কয়লাখনিগুলির উপর নির্ভরশীল।

(৬) ইয়র্ক-ডার্বি-নটিংহ্যাম কয়লাখনি অঞ্চল ইংল্যাণ্ডের মধ্যভাগে ও পেনাইন পর্বতের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত এবং বিপুল কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। পেনাইন পর্বতের চুনমুক্ত জল, জলশক্তি ও স্থানীয় উচ্চশ্রেণীর মেষ লোম প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে পশম, কাগজ, রেয়ন এবং সিমেণ্ট-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়র্ক পশমশিল্পের কেন্দ্র। শেফিল্ড ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত দ্রব্যের এবং নটিংহাম সাইকেল ও হোসিয়ারি দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত।

প্রত্যেক কয়লাখনি অঞ্চলেই বৃহৎ রাসায়নিক শিল্প আছে। মোটকথা কয়লাই ব্রিটেনের সর্বপ্রধান খনিজসম্পদ। পৃথিবীতে কয়লা উৎপাদনে ব্রিটেনের স্থান রাশিয়া ও আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও চীনের পরেই।

**Q. 24. Several industries of Great Britain like Cotton Textile and Shipbuilding are said to be in a bad plight. Discuss the factors that have affected them adversely.**

**[ ব্রিটেনের কতকগুলি শিল্প, যথা—কার্পাসবস্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অবস্থা সুবিধাজনক নহে। উহাদের এইরূপ অবস্থার কারণ কি ? ]**

ইউরোপের মধ্যে ইংল্যাণ্ডেই প্রথম শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয় এবং ইহার ফলে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্রই বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের অধ্যবসায়শীল অধিবাসিগণ দেশের বিপুল কয়লা সম্পদের সুবিধা এবং পৃথিবীর অন্যত্র শিল্পিত পণ্যের চাহিদার সুযোগ লইয়া শিল্প-বিপ্লবকে সাফল্যের পথে লইয়া যায়। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড তাহার শিল্পিত পণ্যের বাজার বেশ ভালভাবে অধিকার করিয়া বসে এবং তাহার কলকারখানায় মজুরগণ ক্রমশঃ সুদক্ষ হইয়া উঠে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে ইংল্যাণ্ডের প্রধান শিল্পগুলির আন্তর্জাতিক প্রাধান্যের মূলে রহিয়াছে এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

উপরিউক্ত সুযোগ ইংল্যাণ্ডকে বহু সুবিধা দান করিলেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাহার পণ্যের চাহিদা শীঘ্রই কমিয়া যায়। কারণ, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ( economic nationalism ) প্রভাবে সকল দেশই ক্রমশঃ স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতে থাকে। এমন কি ফ্রান্স, জার্মানী এবং সর্বশেষে আমেরিকার শিল্পিত পণ্য সর্বত্রই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। পূর্ব এশিয়ায় জাপানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং

সমগ্র এশিয়ার জাতীয়তাবাদের বিকাশ আসন্ন হইয়া উঠে। এইসকল প্রতিকূল অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের শিল্পগুলি ক্রমশঃ পরাজিত ও তাহার পণ্য বিভিন্ন বাজার হইতে বিতাড়িত হইতে থাকে। ফলে বর্তমানে ইংল্যাণ্ড তাহার শিল্পগুলিকে নূতন ভাবে গঠন করিয়া পৃথিবীর বাজারে প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছে।

**কার্পাসবয়ন শিল্প**—এই শিল্পে ম্যাঞ্চেষ্টারের খ্যাতি জগৎবিখ্যাত। আর্দ্র জলবায়ু, ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লাখনির নিকট সুদক্ষ কারিগরের প্রচুর যোগান, ম্যাঞ্চেষ্টার সামুদ্রিক খালের মারফতে তুলা আমদানির সুবিধা এবং পেনাইন পর্বতের নির্মল জলধারায় সুতা ধৌত করিবার সুবিধা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ম্যাঞ্চেষ্টারকে বিখ্যাত কার্পাস দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু ইদানিং ম্যাঞ্চেষ্টারে উৎপন্ন তুলাজাত দ্রব্যের বাজার মিলিতেছে না। ভারত তাহার আপন চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়া দূর প্রাচ্যের ও মধ্য প্রাচ্যের বাজার অধিকার করিয়াছে। জাপান তাহার সস্তা জলবিদ্যুৎশক্তি ও সস্তা শ্রমিকের সাহায্যে ম্যাঞ্চেষ্টারের তুল্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য অনেক সস্তায় বাজারে পাঠাইতেছে। চীনও আপন তুলাজাত দ্রব্য সম্পর্কে স্বয়ংপূর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ব এশিয়ার বাজারের অনেকখানি দখল করিয়াছে। ফলে কেবলমাত্র উৎকৃষ্টতর উৎপাদন পদ্ধতি ও শিক্ষিত শ্রমিককে সম্বল করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার পৃথিবীর কাপড়ের বাজারে ক্রমশঃ হটিতেছে। অবস্থা এমন হইয়াছে যে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কাপড় উৎপাদন না করিয়া, অনেক ক্ষেত্রে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার প্রয়োজন হইয়াছে। বহু কাপড়ের কল এখন লিনেন, রেয়ন প্রভৃতি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের বাজারেও এখন সস্তাদামের জন্য ভারত, পাকিস্তান, হংকং এবং জাপানের বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে।

**জাহাজ-নির্মাণ শিল্প**—জাহাজ নির্মাণশিল্পে ব্রিটেন গত ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯৪২-৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্মাণ শিল্প ব্রিটেন অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া উঠে। যুদ্ধোত্তরকালে আবার ব্রিটেন জাহাজ নির্মাণ শিল্পের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল হইতেই জাপান জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে ছাড়াইয়া যায়। জার্মানী, ইটালি, ফ্রান্স, সুইডেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও তাহাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে খুব বাড়াইয়া তোলে। ফলে বিদেশের জন্য জাহাজ নির্মাণের প্রতিযোগিতায় ব্রিটেন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তবে এখনও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্রিটেনের খ্যাতি বিশ্ব জুড়িয়া রহিয়াছে। জাহাজ নির্মাণের পক্ষে যে সকল সুবিধার প্রয়োজন তাহার সবগুলিই ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে এবং সুবিধামত স্থানে পাওয়া যায়।

প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত এবং গভীর জলযুক্ত শিল্পোন্নত স্বাভাবিক

বন্দর নিকটে পাওয়া গেলে জাহাজ নির্মাণশিল্প গঠন করা সহজ হয়। ইংল্যাণ্ডে এই সকল সুযোগ বহুস্থানে মিলে। পৃথিবীতে এমন সুযোগ আর কোথাও নাই বলিলেই হয়। ইংল্যাণ্ডের জাহাজশিল্পে ক্লাইড নদীর মোহনাই অগ্রগণ্য। এখানকার প্রধান বন্দর **গ্লাসগো**। স্কটল্যাণ্ডের মধ্যসমভূমির ( Midland Valley of Scotland ) হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত নদীটি সর্বত্রই গভীর এবং উভয় তীরে জাহাজ নির্মাণযোগ্য প্রচুর স্থান রহিয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চল সহজেই জাহাজ-নির্মাণশিল্পে অগ্রণী হইয়াছে। ইহা ছাড়া **নিউক্যাসল, সাণ্ডারল্যাণ্ড, মিডলসবরো** অঞ্চলে **টাইন** ও **টি** নদীর মোহানায়ও ঠিক অনুরূপ সুবিধা রহিয়াছে। **লিভারপুল** ও **বার্কেনহেড** অঞ্চল এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের **বেলফাষ্ট** অঞ্চল জাহাজ নির্মাণের অপর দুইটি কেন্দ্র। ব্যারোতেও জাহাজ নির্মাণ করা হয়।

জাহাজ নির্মাণশিল্প ছাড়া **যানবাহন** নির্মাণশিল্প **রাসায়নিক শিল্প, পাট শিল্প** প্রভৃতিতেও **আমেরিকা, ভারত, জার্মানী, জাপান** প্রভৃতি দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের শিল্পগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আজ এই সকল শিল্পকে বাঁচাইবার একটিমাত্র পথ রহিয়াছে, তাহা হইল নব নব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উহাদের উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ইংরাজগণ আজ তাহাই করিতেছে।

**Q. 25. Point out and account for the chief features of the foreign trade of Britain. Name the most important commodities of import and export trade respectively and the ports which particularly deal with them.**

**[ ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বিষয়গুলি দেখাও ও তাহাদের কারণ ব্যাখ্যা কর। প্রধান প্রধান আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যগুলির বর্ণনা দাও এবং কোন্ বন্দরগুলি দিয়া ঐগুলি যাতায়াত করে তাহা উল্লেখ কর। ]**

**ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য**—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বর্তমানে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের স্থান আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের পরেই। **ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য** এই যে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি। **পুনঃরপ্তানি** ও **অলক্ষিত রপ্তানি** ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি যদিও কম তবুও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবস্থা দেশের অনুকূল নহে ( unfavourable balance of trade )।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বোঝা যায় যে, ব্রিটেনের কতকগুলি অলক্ষিত রপ্তানি (invisible export) আছে ; যেমন—জাহাজী, মহাজনী, বীমা প্রভৃতি লগ্নী কারবারে নিযুক্ত অর্থ ( Service rendered by British Shipping, Insurance, Banking etc. ) বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কর্মনৈপুণ্য ইত্যাদি ; এইগুলি ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করিয়াছে। এইগুলিকে একত্রিক করিলে মোট বাণিজ্য ব্যবস্থা ব্রিটেনের প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হয়। গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে অলক্ষিত রপ্তানিগুলিকে ধরিয়াও বাণিজ্যের গতি ব্রিটেনের প্রতিকূল। তাই ব্রিটেন এখন উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াইয়া এবং আমদানি কমাইয়া এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে।

(২) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রপ্তানি-বাণিজ্যকে মোটামুটি ভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, দেশীয় ও আনীত কাঁচামাল হইতে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি। যেমন—কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, কাগজ, বিভিন্ন প্রকার কলকব্জা, চর্মনির্মিত দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র, প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ, চা, রবার, বনস্পতি তৈল প্রভৃতি আমদানি দ্রব্যের বিশেষ কোন অবস্থান্তর না ঘটাইয়া **পুনরায় রপ্তানি** ( entrepot trade )।

(৩) গ্রেটব্রিটেন প্রধানতঃ **কাঁচামাল** এবং **খাদ্যদ্রব্য আমদানি** করিয়া থাকে। গম, ভুট্টা, বার্লি, ওট, চাউল, তামাক, মৎস্য, চিনি, মশলা ও নানাপ্রকার ফল, মাখন, পনির প্রভৃতি দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য ; মদ্য, চা, কোকো, কফি প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য এবং পাট, তুলা, পশম, শণ, তৈলবীজ, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, রবার, হস্তীদন্ত, চর্ম প্রভৃতি কাঁচামাল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান।

(৪) ব্রিটেন প্রধানতঃ শিল্পিত পণ্য (manufactured goods) **রপ্তানি** করিয়া থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যে বিমান, জাহাজ, মোটরগাড়ি ও তুলাজাত পণ্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেশমজাত, পশমজাত, চর্মনির্মিত, কাঁচনির্মিত ও চীনামাটি নির্মিত দ্রব্যাদি, কৃষিযন্ত্রাদি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্পিতদ্রব্য ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

**বাণিজ্যের গতি (direction of trade)**—**উত্তর আমেরিকা** হইতে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জন্য মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, ট্যানকরা চামড়া, মৎস্য, কাঁচাতুলা, গম, ভুট্টা, তামাক, কলকব্জা, খনিজ তৈল, তাম্র, দস্তা, রৌপ্য, রাসায়নিক উপকরণাদি আমদানি হয়। কলকব্জা, বিলাসদ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি, মদ্য প্রভৃতি ব্রিটিশ-দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তর আমেরিকাতে রপ্তানি হয়। প্রধানতঃ **লিভারপুল, গ্লাসগো, সাউদাম্পটন** এবং **লণ্ডন** বন্দর হইতে এই বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতেও গম, মাংস, রবার, কোকো, কফি, তুলা, তামাক, স্বর্ণ, খনিজ তৈল, তৈলবীজ ও মসলা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আমদানি করা হয়। তুলাজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র, ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, ট্রাক্টর প্রভৃতি উপরিউক্ত দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়।

চীন, পাকিস্তান ও ভারত হইতে চা, পাট, কাঁচা চামড়া, তৈলবীজ, বস্ত্রাদি; ভারত, জাপান ও হংকং হইতে কার্পাস বস্ত্র প্রভৃতি এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে পশম ও গম লণ্ডন প্রভৃতি বন্দর দিয়া গ্রেটব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে। জাপান হইতে রেশম, রেশমজাত দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি, খেলনা এবং দেশলাই; এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পালক, পশম, চর্মাদি, স্বর্ণ, তাম্র এবং বিভিন্ন প্রকার ফল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আমদানি হয় এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপান ও চীনে লৌহ-নির্মিত দ্রব্য, কলকব্জা, পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে কয়লা, বস্ত্রাদি, লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি, মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি হয়। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটা বড় অংশ কমনওয়েলথ ও ষ্টার্লিং অঞ্চলের সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ব্রিটেন যদি ইউরোপীয় কমন মার্কেটের সদস্য হয় তবে তাহার বাণিজ্যের গতি হয়ত অনেক বদলাইয়া যাইতে পারে।

# সোভিয়েট রাশিয়া

(U. S. S. R.)

**Q. 26. What are the important agricultural products of the Soviet Union? Under what climatic conditions are they grown? What agricultural system is followed?**

**[ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যগুলির নাম কি? কিরূপ অবস্থার জলবায়ুর মধ্যে ঐগুলি উৎপন্ন হয়? কৃষি ব্যবস্থা কিরূপ? ]**

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে বিশাল। পশ্চিমে বাল্টিক হইতে পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তরে তুন্দ্রাঞ্চল হইতে দক্ষিণে ককেসাস ও তুর্কিস্থানের মরুদ্যোষ্ণ অঞ্চলের মধ্যে বহুপ্রকার জলবায়ু, মাটি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখা যায়। সুতরাং নানাপ্রকার কৃষিপণ্যও উৎপন্ন হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষি উৎপাদক রাষ্ট্র। **গম, যব, রাই, বীট, আলু, ফ্লাক্স, শণ** প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে উহার স্থান পৃথিবীতে সর্বপ্রথম। জলবায়ু ও মাটির বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে উহাদের চাষ হয়। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই যান্ত্রিক। এই ব্যবস্থা স্থানীয় পরিবেশের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে। দেশে প্রচুর উর্বর জমি আছে এবং আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যাও অধিক নহে; সুতরাং যন্ত্রের প্রয়োজন। বড় বড় যৌথ-খামারে চাষবাস হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত শোভখোজ (Sovkhoz) নামক খামারগুলি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। উহারা চাষবাস ছাড়াও কৃষি শিক্ষা, যন্ত্র-রক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ে জোর দিয়াছে। কোলখোজ (Kolkhoz) নামক যৌথখামারগুলির সংখ্যাই অধিক (৯০%)। রাষ্ট্রোভের নিকট "জয়েন্ট" নামক খামার কয়েক লক্ষ একর জমি লইয়া গঠিত। ইহা বিশ্বের বৃহত্তম খামার। এখানে বারিপাত কম বলিয়া কতকাংশে জলসেচের সাহায্যে চাষবাস করা যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই গোমেষাদি চারণ করা হয়।

সোভিয়েট দেশের কৃষিজ দ্রব্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আঞ্চলিক ভিত্তিতেই তাহা করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নলিখিত কৃষি অঞ্চলগুলি উল্লেখ-যোগ্য :—

**(১) সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের কৃষিবলয়**—এই অঞ্চল মস্কোর উত্তরে অবস্থিত। এখানে জলবায়ু অত্যন্ত শীতল এবং মাটিও তেমন উর্বর নহে। অধিকাংশ স্থানেই হৈমবাহ বালুকা ও শিলাখণ্ড রহিয়াছে। অনুর্বর মাটিতে ওট, রাই ও আলু জন্মে। রাসায়নিক সারের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এখানে পশুপালনও করা হয়।

(২) **পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চলের কৃষিবলয়**—এই অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মকালে চাষবাস করা যায় ; কিন্তু এখানে মাটি অনুর্বর এবং বৃষ্টিপাত মাত্র ৫০ সেন্টিমিটার। সুতরাং, পশুপালনই অধিক প্রচলিত। রাই এখানকার প্রধান ফসল। যেখানে উর্বর জমি আছে সেখানে ফ্লাক্স, শণ এবং বীটের চাষ হয়। বাল্টিক অঞ্চলে বারিপাত কিছু অধিক বলিয়া উহা শণ ও ফ্লাক্স চাষের উপযুক্ত। ইউরাল পর্বতের পূর্বদিকে বারিপাত এত কম যে পশুচারণই প্রধান পেশা। সম্প্রতি এই অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার হওয়ায় নানা স্থানে গম, ওট এবং রাই চাষ হইয়াছে।

(৩) **ইউক্রেণ**—ইউক্রেণ বা ডন, নীপার ও নীষ্টার নদীত্রয়ের সমভূমিকে ইউরোপের শস্যাগার বলা হয়। এখানে পূর্বে তৃণভূমি ছিল। সুতরাং মাটি জৈবসারে সমৃদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই অসাধারণ উর্বর মাটি ও ইহার মৃদু শীতল জলবায়ু গম, যব, বীট প্রভৃতি ফসলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শীতকালেও চাষ-আবাদ করা চলে। দক্ষিণ ভাগে কৃষ্ণসাগর ও আজভ সাগর তটে যেখানে বারিপাত প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার এবং জলবায়ু উষ্ণতর সেখানে ভুট্টা ও কার্পাস তুলার চাষ হয়। পূবভাগে বারিপাত কম বলিয়া ভল্গা প্রভৃতি নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে চাষ করা হয়। পশুপালন এই অঞ্চলের অন্যতম বৃত্তি।

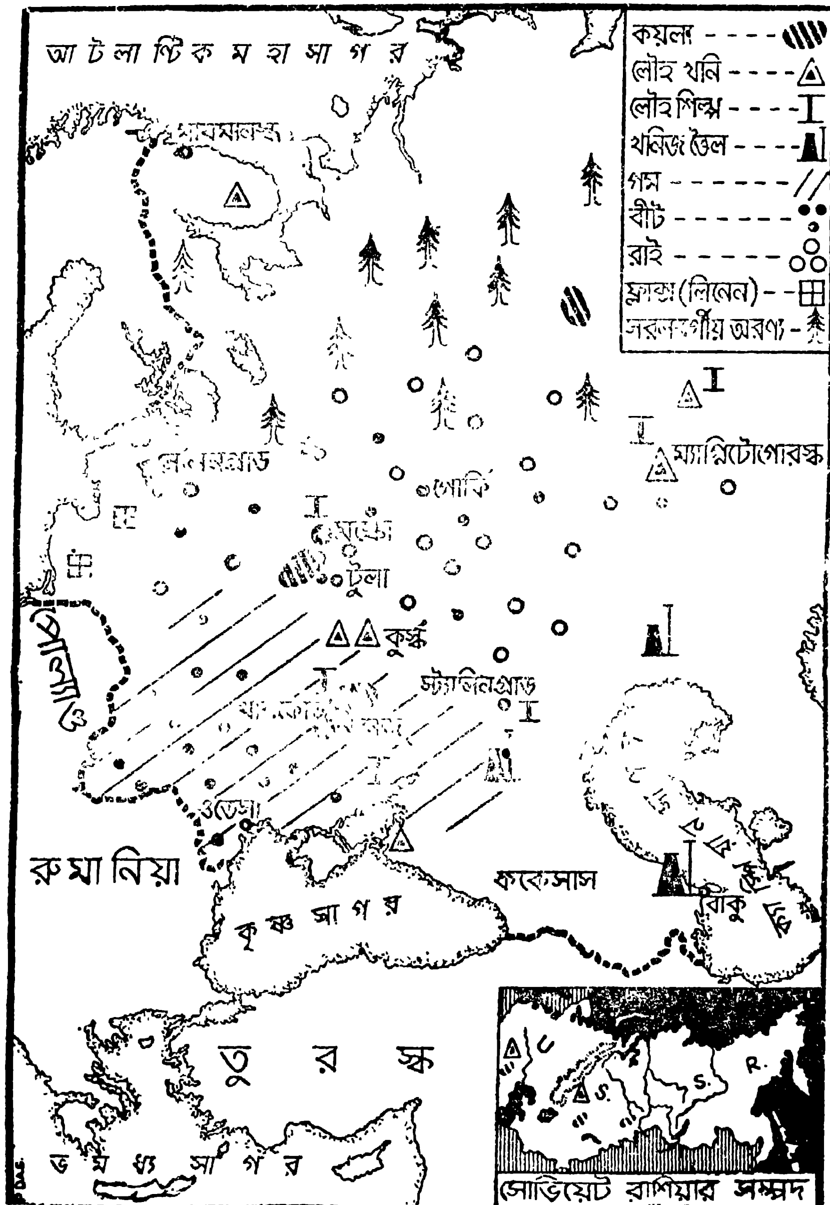
(৪) **ক্রিমিয়া ও কৃষ্ণসাগরের তটভাগ**—এখানে জলবায়ু অনেকটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মত। শীতকালে গমের চাষ হয়। ভুট্টা, তুলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ফসল এবং আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের চাষ হয়।

(৫) **ককেসাস অঞ্চল**—এখানকার উপত্যকাগুলিতে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর ধান ও ভুট্টার চাষ হয়। জলবায়ু উষ্ণ ভাবাপন্ন। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে বারিপাত অধিক সেখানে চা এর চাষ হয়।

(৬) **মধ্যএশিয়া**—উজবেগ, তুর্কোমান ও কজাক অঞ্চলে বারিপাত খুব কম। কিন্তু আমুদরিয়া ও শিরদরিয়া নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে এই অঞ্চলে প্রচুর উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করা হয়। মাটি অত্যন্ত উর্বর ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তুলা চাষের সুবিধা বর্তমান। অনুর্বর জমিতে বাজরা ও জোয়ার জাতীয় ফসল জন্মে।

(৭) **মধ্য সাইবেরিয়া**—এই অঞ্চল অতি শীতল বলিয়া চাষবাসের প্রায় অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এখানে এমন সব গম ও রাই ফলাইয়াছেন যাহা গ্রীষ্মকালে অল্পদিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে। উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ বরাবর যেখানেই কিছু লোকের বাস আছে ( যেমন খনি অঞ্চলগুলিতে ) সেখানেই চাষবাস হয়।

সোভিয়েট দেশ খাদ্য সম্পর্কে ১৯৬১ হইতে ১৯৬৬ পর্যন্ত কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কানাডা হইতে প্রচুর গম আমদানি করা হয়। তবে ইদানিং সেচকার্যের


আটলাণ্টিক মহাসাগর
কয়লা
লৌহ খনি
লৌহ শিল্প
খনিজ তৈল
গম
বীট
রাই
ফ্ল্যাক্স (লিনেন)
সরলবর্গীয় অরণ্য
ম্যাগ্নিটোগোরস্ক
গোর্কি
মস্কো
টুলা
কুর্স্ক
স্ট্যালিনগ্রাড
ওডেসা
রুমানিয়া
কৃষ্ণসাগর
ককেসাস
বাকু
তুরস্ক
ভূমধ্যসাগর
U. S. S. R.
সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পদ

প্রসারের ফলে নূতন নূতন জমিতে ক্রমশঃ চাষ-আবাদ হইতেছে। সুতরাং, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। এখনও প্রচুর জমি অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য ও বৃষ্টির অভাবে অনাবাদী রহিয়াছে।

**Q 27. What are the means adopted in Soviet Russia for the improvement of agriculture ?**

[ সোভিয়েট রাশিয়ায় কৃষির উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ? ]

১৯২৮ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর হইতে এ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির দিক দিয়া যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ। প্রথমতঃ, আধুনিক যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক অনাবাদি জমি চাষ হইতেছে এবং একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জমি একত্রিত করিয়া যৌথখামার প্রথায় চাষবাস হওয়ায় কৃষকের সংহতি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাশিয়ার পূর্বভাগে যে সকল অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে পূর্বে চাষ-আবাদ হইত না—কেবলমাত্র পশুচারণই কৃষকদের উপজীবিকা ছিল, সেই সকল অঞ্চলে বর্তমানে সেচব্যবস্থা প্রসারের ফলে গম, রাই ও কার্পাস প্রভৃতি উৎপন্ন করা হইতেছে। মধ্যএশিয়ার মরু অঞ্চলেও নানাপ্রকার ফল, গম ও কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে। চতুর্থতঃ, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ সাইবেরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলেও গ্রীষ্মকালে মাত্র দুইমাসের মন্দোষ্ণ আবহাওয়ার সুযোগে বিশেষ ধরণের গম, ওট এবং রাই উৎপন্ন করিতেছেন। ফলে, ঐ সকল জনহীন অঞ্চলেও বসতি বিস্তার হইতেছে। তাহা ছাড়া, কৃষি গবেষণার কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ, আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় যাহা কিছু প্রয়োজন রাশিয়ায় তাহার সকল ব্যবস্থাই রহিয়াছে।

**Q. 28. Write a concise account of the mineral wealth of the Soviet Union and show how it is utilized for the development of manufacturing industry** ( C. U B. Com 1969 )

[ সোভিয়েট রাশিয়ার খনিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ও উহা কিভাবে শ্রমশিল্পের উন্নতিতে ব্যবহৃত হয় তাহা দেখাও। ]

**খনিজ সম্পদ ও শিল্প**—সোভিয়েট রাশিয়ার ভূভাগ যেমন বিশাল সেইরূপ ইহার খনিজ সম্পদও অপরিমেয়। বিস্তৃত ভূভাগের বিভিন্নাঞ্চলে বিশেষ বিশেষ খনিজ সম্পদের খনন কার্য চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **লৌহ, কয়লা, খনিজ তৈল ও ম্যাঙ্গানীজ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **তাম্র, স্বর্ণ, এ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, ক্রোম, পারদ, দস্তা, প্লাটিনাম** প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য উৎপাদনে

সোভিয়েট-যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এতদ্‌বিষয়ে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পরেই সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থান। কয়লা ও লৌহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাশিয়া, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইউরাল পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চল, ককেশাস পর্বতমালা, কোলা উপদ্বীপ, ক্রিভয়রগ, বৈকাল হ্রদ অঞ্চল ও আমুর অববাহিকা বিভিন্ন খনি ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র।

সোভিয়েট কয়লাখনি অঞ্চলগুলির ভিতর **ডনেৎস** (Donetz) **নদীর অববাহিকা** প্রধান এবং রাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অংশ এই স্থান হইতে আসে। এই কয়লা খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ইহা ছাড়া, **কুজনেজ, কারাগাণ্ডা, ইউরাল** ও **টুলা** কয়লাখনি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য। কুজনেজ খনি সাইবেরিয়ায় এবং কারাগাণ্ডা মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। এই দুই অঞ্চলের কয়লা খুব উচ্চ শ্রেণীর, উৎপাদনও প্রচুর। মস্কোর নিকট টুলার কয়লা নিম্নশ্রেণীর। উত্তর রাশিয়ার **পেচরা** কয়লা খনির উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য।

লৌহশিলা উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান পৃথিবীতে প্রথম। প্রধান প্রধান খনিগুলি ইউক্রেণের **ক্রিভয়রগ,** মধ্যরাশিয়ার **কুস্ক** নামক স্থানে এবং **ইউরাল** পর্বত অঞ্চলে অবস্থিত। প্রথমোক্ত খনিগুলি হইতে লৌহ ডনেৎস কয়লাখনি অঞ্চলের ইস্পাতের কারখানাগুলিতে পাঠান হয়। কারাগাণ্ডার কয়লায় ইউরাল অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প চলে।

খনিজ তৈল উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার স্থান আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। **বাকু, গ্রজনী,** মাইকফ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ন হয়। বাকুতেই রাশিয়ার অধিকাংশ তৈল পাওয়া যায়। নলযোগে উহা কৃষ্ণসাগর তটে পাঠানো হয়। ইহা ছাড়া, **ইউরাল পর্বতের** দক্ষিণভাগে (এই অঞ্চলকে Second Baku বলা হয়) এবং উজবেকিস্তানে খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার ইউরাল, ককেশাস, ডনেৎস অববাহিকা ও বৈকালহ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে যথেষ্ট তামা, নিকেল, এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, প্লাটিনাম, দস্তা, সীসা, স্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। **ম্যাঙ্গানীজ** উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই রাষ্ট্রের ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের অধিকাংশই আরল হ্রদের উত্তরপূর্ব দিকে পাওয়া যায়। বলখাস হ্রদের উত্তরে স্টালিনগোরস্ক সীসা ও দস্তার জন্য বিখ্যাত। বৈকাল হ্রদের উত্তরে লেনা-ভিটিম রাশিয়ার বৃহত্তম স্বর্ণখনি (রাশিয়া পৃথিবীতে স্বর্ণ-উৎপাদনে দ্বিতীয়); ইউরাল পর্বত অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক খনিজ সম্পদ আছে। এখানে প্রচুর লৌহ, ক্রোমিয়াম (সার্ডেলোভস্ক), স্বর্ণ, এ্যাজবেস্টস, পটাস্ (সলিকামস্ক), প্লাটিনাম (ইউরালেটস্) -

ও নিম্নশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। দক্ষিণ ইউরালে প্রচুর তাম্র ও খনিজ তৈল পাওয়া যায়।

**শিল্প**—রাশিয়ার মস্কো ও আইভানভো অঞ্চলে **কার্পাস ও লিনেন** শিল্পের এবং টুলা রাসায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং **যন্ত্র শিল্পের** কেন্দ্রস্থল। টুলা অঞ্চলে **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প** এবং কৃত্রিম রবারের কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। ভল্‌গা নদীর তীরে ষ্ট্যালিনগ্রাড লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের (ট্রাক্টর প্রভৃতি) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ডনেৎস অঞ্চলের কয়লা এই সমস্ত স্থানের শিল্পোন্নতির সহায়ক হইয়াছে। বালটিক অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ, কাগজ, ইস্পাত, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্প লেনিনগ্রাড বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ডনেৎস কয়লাখনি অঞ্চল ও নিপ্রোপেট্রোভস্কের জলবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নিকটে থাকায় নীপার নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বিরাট লৌহ, ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম ও রাসায়নিক শিল্পের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। **ক্রিভয়রগ, ষ্ট্যালিনো** প্রভৃতি প্রধান ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। মস্কোয় মোটর ও বিমানের কারখানা আছে। গোর্কি মোটর শিল্পের কেন্দ্র এবং রাষ্টোভে কৃষিকার্যোপযোগী যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ইউরাল পর্বত অঞ্চলের **ম্যাগনিটোগোরস্ক** একটি উল্লেখযোগ্য ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর উচ্চ শ্রেণীর লৌহশিলা (ম্যাগ্নেটাইট) পাওয়া যায়। এখানে প্রধানতঃ নানাপ্রকার ভারী যন্ত্রাদি তৈয়ার হয়। এই শিল্প কেন্দ্রটি ইউরাল অঞ্চলের লৌহ ও কারাগাণ্ডার কয়লার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে যে **সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনা** (১৯৫৯-৬৫) অনুসারে কাজ শেষ হয় তাহাতে খনিজ দ্রব্য ও শিল্পজ দ্রব্যের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্পোৎপাদন ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করা।

**Q. 29 Give an idea of the industries in the principal industrial regions of U. S. S. R. (C. U. B. Com. 1958).**

**[সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের শিল্পগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]**

**Or, Comment on the geographical distribution of industries in the U. S. S. R. with reference to the raw material position. (B. Com. 1962)**

**[কাঁচামালের অবস্থানের ভিত্তিতে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর।]**

সোভিয়েট দেশ বর্তমানে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। জারের আমলে সোভিয়েট রাশিয়া ছিল পশ্চাৎপদ দেশ। কিন্তু বিগত

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সাফল্য লাভ করায় এখন রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। রাশিয়ার শিল্পগুলির অধিকাংশই একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়লার সরবরাহ ও বাজারের নৈকট্যই শিল্প গঠনের স্থান নির্বাচনে প্রধানতঃ সাহায্য করিয়াছে। রাশিয়ায় কাঁচামালের অভাব নাই তবে উহা সর্বত্র একত্রে পাওয়া যায় না। ইউরাল অঞ্চলে যথেষ্ট ভাল লৌহ আছে, কিন্তু দেড়হাজার মাইলের মধ্যে কোথাও অধিক পরিমাণে ভাল কয়লা পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় রেলব্যবস্থার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নাই। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতারও ভয় নাই। সুতরাং, শিল্প গঠন খুব দ্রুত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় হইয়াছে। রাশিয়ায় নিম্নলিখিত শিল্পাঞ্চলগুলি ও তৎসন্নিহিত কয়লাখনি অঞ্চলগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

(১) **মস্কো-টুলা অঞ্চল**—মস্কোয় বস্ত্রাদি শিল্প, মোটরগাড়ী, ইঞ্জিন ও বিমান শিল্প আছে। দক্ষিণে টুলার বিশাল কয়লাখনি। এখানে নিম্নশ্রেণীর কয়লার উপর নির্ভর করিয়া রাসায়নিক শিল্প গঠিত হইয়াছে। টুলার কয়লা হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। গোর্কি মোটরগাড়ী নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। আইভানভোর লিনেন ও বস্ত্রশিল্প খুব বড়। মধ্য এশিয়া ও ইউক্রেণের তুলা এবং বাল্টিক অঞ্চলে উৎপন্ন ফ্লাক্স এখানকার প্রধান কাঁচামাল। রেলপথের সাহায্যে উহা সরবরাহ করা হয়।

(২) **ডন অববাহিকা**—ইউক্রেণের ডন অববাহিকায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম কয়লাখনি ডনেৎস ও লৌহখনি ক্রিভয়রগ থাকায় খারকোভ হইতে ষ্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি লৌহশিল্পের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে কৃষিযোগ্য জমি খুব বেশি বলিয়া কৃষি যন্ত্রের চাহিদা অধিক। ষ্ট্যালিনগ্রাড (ভল্গোগ্রাড) ট্রাক্টরের জন্য বিখ্যাত। ওডেসার জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র খুব বড়। রস্টোভ কৃষিযন্ত্রের জন্য বিখ্যাত। ষ্ট্যালিনো ও খারকোভ ভারী লৌহশিল্পের কেন্দ্র। নিপ্রোপেট্রোভস্কের বিশাল বাঁধের জলবৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এখানে কৃষিজ দ্রব্য-ভিত্তিক শিল্প ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) **লেনিনগ্রাড**—এই বিশাল নগর বহুকাল হইতেই লিনেন, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র। জলবৈদ্যুতিক শক্তি ও নিকটস্থ সরলবর্গীয় অরণ্যের কাঠ ইহার প্রধান অবলম্বন। বহুদূর হইতে কয়লা আনিতে হয়।

(৪) **ইউরাল অঞ্চল**—ইউরাল পর্বতের অফুরন্ত খনিজ ভাণ্ডার বর্তমানে কাজে লাগান হইয়াছে। এই অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিন, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি শিল্প আছে। সার্ডলোভস্ক ও ম্যাগনিটোগোরস্ক এখানকার প্রধান শিল্প কেন্দ্র।

(৫) **ককেসাস**—এই পার্বত্য অঞ্চলে জলবৈদ্যুতিক শক্তির অভাব নাই।

বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। বাকু ও গ্রজনীর খনিজ তৈল এই অঞ্চলের রাসায়নিক শিল্প গঠনে সাহায্য করিয়াছে।

(৬) **কুজনেজ**—এই বিখ্যাত কয়লা খনিকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমানে মধ্য সাইবেরিয়ায় বড় বড় ইস্পাতের ও যন্ত্রাদির কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৭) **তুর্কিস্তান**—এই অঞ্চলের নিকটেই কার্পাসক্ষেত্র ও কারাগাণ্ডার বিখ্যাত কয়লাখনির কয়লা থাকায় শিল্প গঠন সম্ভব হইয়াছে। টাসকেণ্ট প্রভৃতি শহরে বহু বস্ত্রশিল্প ও রাসায়নিক সারের কারখানা গঠিত হইয়াছে।

**Q. 30. Discuss the position of the U. S. S. R. as a self-supporting economic unit. What are the commodities which India is in a position to supply to the U. S. S. R ?**

**[ এক স্বয়ংভর অর্থনৈতিক একক হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থার আলোচনা কর। কোন্ কোন্ দ্রব্য ভারত সোভিয়েট রাশিয়াকে সরবরাহ করিতে পারে ? ]**

একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে পৃথিবীতে অপর কোন দেশ রাশিয়ার মত বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। এক কথায় বলিতে গেলে দেশের ২৩ কোটি লোকের প্রায় সকল চাহিদা মিটাইবার মত সম্পদ রাশিয়ার আছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা **প্রায় ⅔ ভাগ বীট,** অর্ধেকের বেশি **ফ্লাক্স, প্রচুর তুলা,** সর্বাপেক্ষা অধিক **ম্যাঙ্গানীজ এবং প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লৌহ, তাম্র, স্বর্ণ** প্রভৃতি ধাতু এখানে পাওয়া যায়। **লৌহ ও কয়লা উৎপাদনে** পৃথিবীতে রাশিয়ার স্থান প্রথম, **পেট্রোল ও স্বর্ণ উৎপাদনে** দ্বিতীয় এবং **ক্রোম** উৎপাদনে তৃতীয়। খনিজের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ায় টিন, অভ্র ও নিকেলের অভাব।

কৃষিজ সম্পদের দিক হইতে রাশিয়া প্রায় স্বাবলম্বী। গম উৎপাদন ও রপ্তানিতে চিরদিনই রাশিয়ার স্থান উচ্চে। অবশ্য মাঝে মাঝে ঘাটতিও দেখা যায়। **ইউক্রেণের** উর্বর জমিতে তো **গম** জন্মেই, ইদানিং উত্তর রাশিয়ার **মধ্যভাগে সাইবেরিয়াতেও** প্রচুর পরিমাণে গমের চাষ হইতেছে। তবে অনুর্বর মালভূমি অঞ্চলের প্রধান খাদ্য ফসল **রাই**। গত কয়েক বৎসরে জমি একত্রীভূত করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করায় রাশিয়াতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। প্রয়োজনীয় কৃষিজ সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র কিছু গম, পাট, রবার ও চা আমদানি করিতে হয়।

শিল্পের দিক হইতে গত কয়েকটি পঞ্চ ও সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের ফলে রাশিয়ার অসাধারণ উন্নতি ঘটিতেছে। **লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বস্ত্র, কাগজ, পশম** প্রভৃতি শিল্পে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী ; এমন কি, এই সমস্ত শিল্পের প্রায় প্রত্যেকটি কাঁচামালই রাশিয়ায় পাওয়া যায়।

আজ রাশিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক রাজনৈতিক কারণে আর সীমাবদ্ধ নহে। পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গেই তাহার এখন প্রচুর বাণিজ্যিক লেনদেন চলে। ইটালি ও ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমশঃ খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে ভারত অকমিউনিষ্ট বিশ্বের পথ প্রদর্শক। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে।

জনসংখ্যায় ও সম্পদে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ সমৃদ্ধ। ভারত তাহার নিকট প্রতিবেশী, এমন কি কাশ্মীরের উত্তরে এক স্থানে উভয়ের সীমান্ত দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশিখরের মাঝে মিলিত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় হিন্দুকুশ পর্বতের উপর দিয়া বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত তুষারাচ্ছন্ন পথে উভয় দেশের দুই জনহীন ও অনুন্নত অংশের যোগাযোগে স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু ইহা স্বভাবতঃই যুদ্ধোত্তর কালে বিশেষ কোন কাজে আসে নাই। উভয় দেশের মধ্যে যাহা কিছু বাণিজ্য তাহা সমুদ্র মারফত সুয়েজ খাল হইয়া রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরস্থিত বন্দরগুলির সহিত চলে। রাশিয়া ভারত হইতে প্রধানতঃ **তামাক, চামড়া, জুতা, জামা, গালা, চা, কফি, পাট** এবং কাতা ( coir ) আমদানি করিয়া থাকে। বর্তমানে ভারতীয় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা রাশিয়ায় খুবই রহিয়াছে। খনিজের মধ্যে রাশিয়ায় কেবলমাত্র প্রয়োজনমত অভ্র প্রভৃতি কয়েকটি খনিজের অভাব। ইহার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং রাশিয়া ইহা ভারত হইতে লইতে পারে। রাশিয়ার তৈলবীজের কিছু চাহিদা রহিয়াছে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তির ফলে রাশিয়ায় নির্মিত **ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিকযন্ত্রাদি ও ইস্পাত** দ্রব্য ভারতে আমদানি করা হইয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়া যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কারিগর দিয়া সাহায্য করিয়াছে। ভিলাইয়ের ইস্পাত কারখানার জন্য হাজার হাজার টন প্রয়োজনীয় উপকরণ ভারতে আমদানি করা হইয়াছে। রাঁচি এবং বোকারোর জন্যও হইতেছে। তাহা ছাড়া, ভারতে মূল্যবান পাথর উৎপাদনের জন্য, তৈল অনুসন্ধানের জন্য এবং অন্যান্য বহু কাজে রাশিয়ার যন্ত্র ও যন্ত্রীগণ কাজ করিতেছে। ভারত হইতেও বহু প্রকার কাঁচামাল রাশিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভারত হইতে রাশিয়া ইস্পাত, জুতা এবং রেল ওয়াগনও আমদানি করে।

**Q. 31. Discuss the exports and imports of Russia. What do you know of the present Indo-Russian trade ?**

**[ রাশিয়ার আমদানি-রপ্তানির বিবরণ দাও। বর্তমান রুশ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ]**

**সোভিয়েট রাশিয়ার বহির্বাণিজ্য**—সোভিয়েট রাশিয়ার বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে জাতিপুঞ্জের মারফত সকল খবর পাওয়া যায় না। মোটামুটিভাবে এ কথা বলা চলে যে, পরপর কয়েকটি পরিকল্পনায় সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ক্রমশঃ রাশিয়ার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ **গম-রপ্তানিকারক** দেশ ছিল। এখনও রাশিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদক দেশ; কিন্তু ১৯৬৪ ও ৬৫ সালে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে বৎসরে ২০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গম আমদানি করে। পরে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হয়।

খনিজের মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে ও রপ্তানিতে রাশিয়া উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারত ইহার অন্যতম ক্রেতা। রাশিয়ার ইস্পাত ও খনিজ দ্রব্যই অকমিউনিষ্ট বিশ্বে অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্তমানে রাশিয়ায় নির্মিত যন্ত্রাদি, লৌহদ্রব্য, যানবাহন প্রভৃতি মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হইতেছে। সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব-জার্মানীর বাণিজ্য সবচেয়ে বেশি। পূর্ব ইউরোপের পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও মধ্য ইউরোপের চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। মঙ্গোলিয়াতেও বহু বড় বড় কারখানা ও রেলপথ রুশ যন্ত্রী ও যন্ত্রাদির সাহায্যেই গঠিত হইতেছে। রাশিয়ার আমদানির মধ্যে প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য হইতে নানাপ্রকার কলকব্জা, যন্ত্রপাতি এবং ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে তুলা, কার্পাস বস্ত্র, পাট বস্ত্র, জুতা, রবার, চা প্রভৃতি আমদানিই প্রধান। বর্তমান রাশিয়া শিল্পক্ষেত্রে এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে যন্ত্রপাতি প্রায় সমস্তই দেশের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং তুলা, চা এবং রবারই এখন প্রধান আমদানি দ্রব্য। ইহাদের মধ্যে তুলার বিষয়ে রাশিয়া প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে। মিশর হইতে সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট তুলা আমদানি করিতে হয়। চাও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাবলম্বনের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। সুতরাং, দেশের আয়তন ও বিপুল লোকসংখ্যা ও সম্পদের তুলনায় বহির্বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু সম্প্রতি এশিয়ার গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহল রাশিয়ায় নানা প্রকার কাঁচামাল রপ্তানি করিতেছে। ইটালি ও ব্রিটেনও রাশিয়ার সঙ্গে উন্নততর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। আশা করা যায় যে, অকমিউনিষ্ট দেশ-গুলির সঙ্গে রাশিয়ার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। ভারত কম সুদে

রাশিয়ার নিকট প্রচুর টাকা ঋণ লইয়াছে এবং ভারতীয় টাকার দ্বারাই প্রধানতঃ ভারত রাশিয়া হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে। সুতরাং, ভারত-রুশ বাণিজ্য প্রতি বৎসরই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পরেই ভারতের বাণিজ্য তালিকায় রাশিয়ার স্থান। ভারত হইতে রাশিয়া গ্রহণ করে পাটজাত দ্রব্য, বস্ত্রাদি, ইস্পাত, রেলওয়াগন, চা, চামড়া, জুতা, কফি, ফল প্রভৃতি। ভারত আমদানি করে ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, বড় বড় যন্ত্র, খনিজ তৈলজাত দ্রব্য ও নিউজপ্রিন্ট।

**Q. 32. Write a brief account of the economic geography of the Asian portion of the U. S. S. R.**

**[ সোভিয়েট এশিয়ার আর্থিক ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা কর। ]**

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকাংশই এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। ইহাকে সোভিয়েট এশিয়া বলা হয়। পূর্বে ইহাকে সাইবেরিয়া, ককেশিয়া ও তুর্কিস্তান বলা হইত। বর্তমানে এই অঞ্চলে অনেকগুলি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল রহিয়াছে; যথা—কজাক রাজ্য, উজবেক রাজ্য, কিরঘিজ রাজ্য, টাজিক রাজ্য এবং আর, এস, এফ, এস, আর (Russian Soviet Federated Socialist Republic)। তাহা ছাড়া ককেশাস অঞ্চলে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান নামে তিনটি রাজ্য আছে।

সোভিয়েট এশিয়াকে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করিয়া উহাদের আর্থিক সম্পদের বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **ককেশাস অঞ্চল** সুউচ্চ পর্বতের দেশ। এখানে শীতকালে কিছু বৃষ্টি হয়। কৃষিকার্যের মধ্যে পর্বতগাত্রে স্থানে স্থানে চা চাষ হয়। উপত্যকায় ধান, ভুট্টা, তুলা ও ফলমূল উৎপন্ন হয়। এখানে প্রচুর জলবিদ্যুৎশক্তিও উৎপন্ন করা হয়। উহার সাহায্যে অনেক রেলপথ চলে। ক্যাস্পিয়ান সাগরতটে বাকুর তৈলখনি বিশ্ববিখ্যাত। ক্যাস্পিয়ান তটে লবণ পাওয়া যায়।

(২) **মধ্য এশিয়ার পার্বত্যভূমি**—টাজিক ও কিরঘিজ রাজ্য এবং আর, এস, এফ, এস, আর, অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে সুবিশাল, সুউচ্চ পর্বতগুলি রহিয়াছে। এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে স্বর্ণ ও তাম্র পাওয়া যায়। টাজিক ও কিরঘিজ রাজ্যে সীসা ও দস্তা প্রভৃতি ধাতু এবং কিছু তুলা ও গম পাওয়া যায়। তবে পার্বত্য-অঞ্চলে মেষচারণ অধিক প্রচলিত।

(৩) **মধ্যএশিয়ার স্তেপভূমি**—কজাক, উজবেক প্রভৃতি রাজ্যে বিশাল তৃণভূমি দেখা যায়। বিশেষতঃ আরল হ্রদের নিকট তৃণভূমি পশুচারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। স্থানে স্থানে মরুভূমিও আছে। কিন্তু বর্তমানে শির ও আমুদরিয়া নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা, গম প্রভৃতি

উৎপন্ন করা হয়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে বিখ্যাত **কারাগাণ্ডার কয়লাক্ষেত্র** অবস্থিত। এখানে লক্ষ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট কয়লা উৎপন্ন হয় এবং রেলযোগে ম্যাগ্নিটোগোরস্কের ইস্পাতের কারখানায় চালান যায়। টাসকেণ্ট প্রভৃতি বড় বড় শহরে বহু কার্পাস বস্ত্রের কারখানা আছে।

(৪) **সাইবেরিয়ার** মধ্যভাগ দিয়া ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ মস্কো হইতে পূর্বদিকে ব্লাডিভষ্টক পর্যন্ত গিয়াছে। উহার উত্তরভাগে সুবিশাল **টাইগা অরণ্য** লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল স্থান লইয়া অবস্থিত। এখানে **নরম কাঠ** হইতে কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানকার জন্তুর **লোম** ( fur ) উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। এই অঞ্চলের মধ্যভাগে সমগ্র সোভিয়েট দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কয়লাখনি **কুজবাস** অঞ্চল অবস্থিত। এখানে লৌহশিলাও পাওয়া যায়। কুজবাস বর্তমানে একটি বৃহৎ শিল্পাঞ্চল। এখানে ইস্পাত যন্ত্রাদি, কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা আছে। এখানে বহু রেলপথ ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এখানে লোকবসতি বিরল হইলেও বহু নূতন নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে জলবায়ুর তীব্রতার জন্য কয়েক প্রকার বিশেষ ধরণের গম, ওট এবং রাই ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন করা সম্ভব নহে। এই অঞ্চলে বৎসরে নয় মাস প্রচণ্ড শীত পড়ে।

(৫) **তুন্দ্রাভূমিতেও** ক্রমশঃ মানুষ বাস করিতেছে। এই অঞ্চলের মধ্যদিয়া উত্তর বাহিনী, ইনেসি, ওব ও লেনা নদী প্রবাহিত। গরমকালে বরফ গলিলে এই সকল নদী দিয়া কাঠ ভাসাইয়া সমুদ্র পথে রপ্তানি করা হয়। এই বসতি বিরল তীব্র শীতার্ত অঞ্চলে কতকগুলি স্বর্ণ ও তৈলখনিতে কিছু লোক কাজ করে।

সোভিয়েট এশিয়ার মোট জনসংখ্যা প্রায় দু'কোটি। তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোকই মধ্য-এশিয়ার সেচভূমিতে বাস করে। শ্রমিকের অভাবে বহু প্রকার খনিজ এখনও ব্যবহৃত হয় নাই। বর্তমানে এই অঞ্চলে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি হইতেছে।

**নগর ও বন্দর ঃ**

**Q. 33. Write short notes on :—**

**(1) London (2) Birmingham (3) Manchester (4) Sheffield (5) Hull (6) Bristol (7) Edinburgh (8) Dundee (9) Sunderland (10) Aberdeen (11) Rotterdam (12) Cardiff (13) Belfast (14) Paris (15) Bordeaux (16) Lille (17) Milan (18) Istambul (19) Leningrad (20) Baku (21) Kharkov (22) Dneipropetrovosk (23) Moscow (24) Naples (25) The Hague (26) Stalingard (27) Lyon (28) Berlin (29) Nurenburg (30) Bonn (31) Frankfurt.**

(১) **লণ্ডন**—ইহা টেমস্‌নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। লণ্ডন নগর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সমুদ্র

বন্দরও বটে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহুপণ্য এখান হইতে রপ্তানি করা হয়। লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম আঁতরিপত (ভারতের চা, মালয়ের রবার প্রভৃতি ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রধান দ্রব্যগুলি লণ্ডন মারফত পৃথিবীর বাজারে পৌঁছায়)।

(২) **বার্মিংহাম**—ইহা ব্রিটেনের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি বৃহৎ শিল্প প্রধান নগর। নিকটেই মিডল্যাণ্ডে বহু কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৩) **ম্যাঞ্চেষ্টার**—ইহা ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র। সমগ্র পৃথিবীতে বস্ত্রশিল্পে ম্যাঞ্চেষ্টার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও বহু শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্যন্ত একটি জাহাজ খাল খনন করা হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের একটি বিশিষ্ট বন্দর।

(৪) **শেফিল্ড**—ইহা মধ্য ইংল্যাণ্ডের একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্র। এখানে লৌহ এবং ইস্পাতের বড় বড় কলকারখানা আছে। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহ শিল্পজ দ্রব্যাদির জন্যও ইহা বিশ্ববিখ্যাত।

(৫) **হাল**—হাম্বার নদীর মোহানায় একটি উল্লেখযোগ্য পোতাশ্রয় ও ব্রিটেনের অন্যতম প্রাচীন বন্দর। অদূরেই উত্তরসাগরের মধ্যে বিখ্যাত 'ডগার ব্যাঙ্ক' নামক মাছ ধরার চর থাকায় মৎস্য শিকার এখানকার প্রধান ব্যবসা।

(৬) **ব্রিষ্টল**—ইহা স্যভর্ন নদীর মোহানায় অবস্থিত এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের একটি পুরাতন বন্দর। নিকটে একটি কয়লা খনি ও নানা প্রকার কারখানা আছে। তামাকের বাণিজ্যের জন্যও এই বন্দর বিখ্যাত।

(৭) **এডিনবরা**—ইহা স্কটল্যাণ্ডের একটি প্রধান বন্দর। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্র। এডিনবরা মারফত বহু দ্রব্য দেশের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করা হয়।

(৮) **ডান্ডি**—ইহা স্কটল্যাণ্ডের পাট শিল্পের কেন্দ্রস্থল। পাকিস্তান হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পাট এখানে আমদানি করা হয়। এখানে পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। নিকটেই সমুদ্রে বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য ধরা হয়।

(৯) **সাণ্ডারল্যাণ্ড**—ইহা উত্তর সাগরের নিকট উইয়ার নদীর মুখে অবস্থিত একটি বন্দর। ইহা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র।

(১০) **অ্যাবার্ডিন**—ইহা স্কটল্যাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য মাছধরা বন্দর। এইস্থানের শিল্পবাণিজ্যও খুব উন্নত।

(১১) **রটারডাম**—ইহা হল্যাণ্ডে রাইন নদীর মোহানায় অবস্থিত বৃহৎ বন্দর। এখান হইতে যন্ত্রপাতি ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয় এবং চিনি, খনিজ তৈল প্রভৃতি এখানে আমদানি করা হয়। সমগ্র রাইন নদীর অববাহিকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি।

(১২) **কার্ডিফ**—ইহা ওয়েলসের প্রধান শহর ও বন্দর। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে রাসায়নিক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং অন্যান্য লৌহশিল্প বেশ উন্নত। কাঁচ, কাগজ, কার্পেট প্রভৃতি বহু দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়।

(১৩) **বেলফাষ্ট**—ইহা ব্রিটিশ অধিকৃত আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান শহর। এখানে একটি সুবৃহৎ জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে।

(১৪) **প্যারিস**—ইহা সীন নদীর তীরে অবস্থিত এবং ফ্রান্সের রাজধানী। সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। বিলাসদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্যারিস নগরী বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত বয়নশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে দৃষ্ট হয়।

(১৫) **বোর্দো**—ইহা গ্যারোণ নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের তৃতীয় বন্দর। মদ্য উৎপাদন এবং জাহাজ নির্মাণ এখানকার প্রধান শিল্প।

(১৬) **লিঁল**—ইহা ফ্রান্সের উত্তর ভাগে অবস্থিত কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ইহা পাটজাত দ্রব্যাদির জন্যও প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সের প্রধান কয়লা খনিগুলি ইহার নিকটে অবস্থিত।

(১৭) **মিলান**—ইহা আল্পস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত ইটালির সর্বপ্রধান রেশম শিল্পের কেন্দ্র। এখানে যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানাও আছে। এই অঞ্চলে জল-বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়।

(১৮) **ইস্তাম্বুল**—(কনষ্ট্যান্টিনোপল)—তুরস্কের সবচেয়ে বড় শহর। ইহা ভূমধ্যসাগর এবং কৃষ্ণসাগরের ভিতর জাহাজ চলাচল পথের প্রবেশ মুখে বসফোরাস প্রণালীতে অবস্থিত একটি বন্দর।

(১৯) **লেনিনগ্রাড**—বাল্টিক সাগরের তীরে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট বন্দর। বৎসরে চারমাসেরও বেশি এই বন্দর বরফাবৃত থাকে। জাহাজ, ধাতবদ্রব্য এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ এখানকার প্রধান শিল্প। অন্যান্য উৎপাদনের মধ্যে, এ্যালুমিনিয়াম, সেলুলোজ এবং কাগজের নাম করা যাইতে পারে। ইহা রাশিয়ার একটি প্রান্তীয় বন্দর এবং রেল জংসন।

(২০) **বাকু**—ক্যাস্পিয়ান সাগর উপকূলে অবস্থিত ইহা সোভিয়েট রাজ্যের বৃহত্তম খনিজ তৈল অঞ্চল। এখান হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। বাকুর তৈল নল দ্বারা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে আনা হয়।

(২১) **খারকোভ**—ইহা ইউক্রেণ অঞ্চলে অবস্থিত একটি বৃহৎ শহর। এই শহরটি বর্তমানে রাশিয়ার একটি বড় ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। এখানে মোটরগাড়ি এবং ট্রাক্টর প্রভৃতি কৃষিকার্যোপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়।

(২২) **নিপ্রোপেট্রোভস্ক**—ইহা নীপার নদীর উপকূলে অবস্থিত। বর্তমানে নীপার নদীতে একটি বাঁধ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে জলবৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া এই অঞ্চলের শিল্পে নিয়োগ করা হইতেছে। রাশিয়ার শিল্পোন্নতির সহায়ক হিসাবে ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

(২৩) **মস্কো**—ইহা রাশিয়ার রাজধানী ; এখান হইতে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল অভিমুখে রেলপথ গিয়াছে। ইহা রাশিয়ার সর্বপ্রধান কার্পাস ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কেন্দ্র। বস্ত্রাদি, ধাতবদ্রব্যাদি, চর্মনির্মিত দ্রব্যাদি, কাগজ প্রভৃতি এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বর্তমানে ইহার জনসংখ্যা ৪০ লক্ষেরও অধিক।

(২৪) **নেপলস**—ইহা ইটালীয় উপদ্বীপের একটি অতি প্রাচীন সুবিখ্যাত বন্দর। বর্তমানে ইহা ইটালির একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও জাহাজশিল্পের কেন্দ্র।

(২৫) **দি হেগ**—ইহা হল্যাণ্ডের প্রধান শহর। এখানে আন্তর্জাতিক আদালত অবস্থিত।

(২৬) **ষ্ট্যালিনগ্রাড** ( ভলগোগ্রাড )—ইহা রাশিয়ার ভল্গা নদীর উপর অবস্থিত একটি আধুনিক শিল্প কেন্দ্র। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিশেষতঃ ট্রাক্টর, কমবাইন প্রভৃতি শিল্পে ইহার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভল্গানদী পথে বিভিন্ন কাঁচামাল অল্প ব্যয়ে এখানে সমবেত করা যায় বলিয়াই নগরটির এত শ্রীবৃদ্ধি।

(২৭) **লিঁয়**—ফ্রান্সের রোণ ও শোন নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত রেশম শিল্পকেন্দ্র। পাশাপাশি অঞ্চলের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় হওয়ায় রেশম উৎপন্ন করার পক্ষে স্থানটি অনুকূল। কিন্তু স্থানীয় রেশম ছাড়াও চীন, জাপান ও ইটালির কাঁচা রেশমও এখানে বোনা হয়। ইহা পৃথিবীর রেশম শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সেণ্টইটিনির কয়লা খনি ইহার অদূরেই অবস্থিত।

(২৮) **বার্লিন**—ইহা জার্মানীর ভূতপূর্ব রাজধানী এবং একটি প্রধান শিল্প এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। সমগ্র জার্মানীর রেলপথের ইহা একটি কেন্দ্রস্থল। শহরটি বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব বার্লিন বর্তমানে পূর্ব জার্মানী বা জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের রাজধানী।

(২৯) **নুরেনবার্গ**—ইহা জার্মানীর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পনগর। এই অঞ্চল কাষ্ঠশিল্প, খেলনা এবং পেন্সিল তৈয়ারির কারখানার জন্য বিখ্যাত।

(৩০) **বন**—পশ্চিমজার্মানী বা জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের রাজধানী। এই শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(৩১) **ফ্রাঙ্কফুর্ট**—পশ্চিম জার্মানীর রাইন-উপত্যকায় অবস্থিত রাসায়নিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ইহা একটি বিখ্যাত নদীবন্দর ও বিমানবন্দর।

---

## জাপান

(JAPAN)

**Q. 34. Give an account of the geographical location and the natural resources of Japan.**

**[ জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা দাও। ]**

**Or, Q. What physical and social factors have been responsible for the economic development of Japan?**

**[ জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে? ]**

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সামাজিক চেতনা ও সরকারের সহায়তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির জন্য জাপানের বর্তমান আর্থিক উন্নতি সম্ভব হইয়াছে—

(১) জাপানের জলবায়ু নাতিশীতল বলিয়া অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ।

(২) বৎসরে দুইবার বর্ষা হয় বলিয়া জাপানে প্রায় বারমাস চাষবাস করা চলে। উত্তরভাগ ভিন্ন অন্যত্র তুষারপাত খুব বেশি হয় না।

(৩) জাপানের তটভাগ ভগ্ন হওয়ায় সুন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের অভাব নাই; সুতরাং; মৎস্যশিল্প ও বহির্বাণিজ্য বাড়িয়া উঠিয়াছে।

(৪) জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরের তটভাগে "কুরোশিয়ো" নামক উষ্ণ স্রোত থাকায় বন্দরগুলিতে শীতকালে বরফ জমে না। তাহা ছাড়া, ঐ অঞ্চলে মৎস্য-শিকারও সহজ হইয়াছে।

(৫) নদীগুলি বেগবতী হওয়ায় ঐগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। জাপানের প্রায় ৯০ ভাগ বাড়ীতে তড়িৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়। নদীগুলি নাব্য নহে তবে দেশে বহু উপসাগর ও খাঁড়ি থাকায় নৌবাহনের জন্য নদীর প্রয়োজন হয় না।

(৬) জাপানে খনিজের মধ্যে প্রচুর নিকৃষ্ট কয়লা, তাম্র ও গন্ধক পাওয়া যায়।

(৭) জাপানে শতকরা ৬০ ভাগের অধিক জমিতে অরণ্য আছে। প্রচুর কাষ্ঠ থাকায় কাগজ, দেশলাই, কৃত্রিম রেশম ও খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

জাপানীরা যেমন কষ্টসহিষ্ণু তেমন কর্মঠ। দায়িত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সর্ববিষয়ে জাতীয় উন্নতির সহায়তা করেন। জাপানে জমির পরিমাণ

খুব কম। সুতরাং গবেষণার দ্বারা জমির উৎপাদন শক্তি বাড়াইতেই জাপান ব্রতী হয়। কৃষিতে সকলের কর্মের সংস্থান না হওয়ায় জাপান শিল্পের দিকে অধিক জোর দিতে থাকে। বর্তমানে জাপান শিল্পের এতদূর উন্নতি করিয়াছে যে সেখানে বেকার সমস্যা নাই এবং শিল্প শ্রমিক সমস্যা খুব কম। কারণ প্রথমতঃ, মজুরগণ লভ্যাংশের অংশ পাওয়ায় ধর্মঘট করিতে ইচ্ছুক নয়। দ্বিতীয়তঃ, এক এক জন মজুর তাহার অবসরমত নানা শিল্প-বাণিজ্যে কার্য করে। ফলে কোন কর্মেই লোকাভাব অনুভূত হয় না। জাপানে দক্ষতার অনুপাতে মজুরদের মজুরী কম হওয়ায় জন্য শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য কম। অপর পক্ষে, মজুরদের দৈনিক আয়ও বেশি। এই উপায়ে অল্প সময়ে জাপান পৃথিবীর প্রধানতম শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয়। জাপানের নিজ জাহাজ থাকায় রপ্তানি কার্যের বিশেষ সুবিধা আছে। ইহার ফলে সত্বর অল্প খরচে যে কোন চাহিদা মিটাইবার সুবিধা হইয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে সরকারের দান কোন অংশেই কম নয়। কাঁচা মাল, ইন্ধন, লৌহ ও ইস্পাত সংগ্রহের জন্য সরকার বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দ্রুতগামী জলযানের সাহায্যে ঐ সব দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করা হয়। ঐ দ্রব্যাদির বণ্টন ব্যবস্থাও সরকার নিজেই করিতেন; অনেক সময় রপ্তানি ও মাল বিক্রয়ের ভার সরকার নিজ হাতেই রাখিতেন। ইহার ফলে শিল্প-বাণিজ্যগুলির অবস্থা সকল সময় নিরাপদ থাকিত। পরিশেষে সমগ্র জাতির জাতীয়তাবোধ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতির উন্নতিকল্পে প্রত্যেক জাপানীই অগ্রণী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে পরাজিত জাপান পুনরায় তাহার বিশাল ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সম্পূর্ণ নূতনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। যুদ্ধকালের তুলনায় বর্তমানে জাপানের সকল শিল্পই অনেক বেশি উন্নতি লাভ করিয়াছে।

জাপান এশিয়া ভূ-খণ্ডের পূর্বপ্রান্তের অদূরে জাপান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত একটি বৃহৎ দ্বীপমালা (অর্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বীপপুঞ্জ)। হনসু, হোক্কাইডো, সিকোকু ও কিউসু দ্বীপ বৃহদাকার। এগুলি এবং আরও বহু ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া জাপান দেশটি গঠিত। জাপানে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হওয়ায় আমেরিকা-এশিয়ার সংযোজক প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের প্রান্তে ইহার অবস্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে জাপান সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। কিন্তু জাপান প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নহে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দেশের শিল্পসমৃদ্ধি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়ুর উপর নির্ভর

করে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে খুব সমৃদ্ধ না হইয়াও জাপান উন্নতিশীল দেশ। ইহার কারণ জাপানীদের অদম্য উৎসাহ ও স্বদেশপ্রেম।

**জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ—**

**বনজ**—জাপানের অধিকাংশ স্থানই পর্বতময়। এই পর্বতগাত্রে প্রচুর অরণ্য সম্পদ রহিয়াছে। জাপানে মোট আয়তনের প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে অরণ্য রহিয়াছে। উত্তর ও মধ্যভাগে সরলবর্গীয় অরণ্য এবং দক্ষিণ ভাগে ওক, কর্পূর প্রভৃতি বৃক্ষ ও প্রচুর বাঁশ জন্মে। সরলবর্গীয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষরাজীর প্রাচুর্য এবং তুঁত ও বাঁশ উৎপাদনের উপযোগী জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় জাপানে কাগজ, দেশলাই ও রেশমশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রচুর কাগজ, দেশলাই ও কাষ্ঠের খেলনা রপ্তানি হইতেছে।

**খনিজ সম্পদ—কয়লা**—জাপানের খনিজ সম্পদের ভিতরে কয়লাই প্রধান। এখানকার কয়লার খনিগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। বৎসরে ৫ কোটি টনের মত কয়লা উৎপন্ন হয়। **হোক্কাইডো** ও **কিউস্যু** দ্বীপে প্রধান খনিগুলি অবস্থিত। জাপানের কয়লা খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ঐ দেশের সুবৃহৎ শিল্প ব্যবস্থার পক্ষেও উহা যথেষ্ট নয়। সুতরাং জাপান, ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে কয়লা আমদানি করে। তবে নদীগুলি খরস্রোতা হওয়ায় জাপানীরা জলবিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে অনেকটা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। **তাম্র**—জাপানের খনিজ সম্পদের ভিতরে কয়লার পরেই তাম্রের স্থান। পৃথিবীর মধ্যে তাম্র উৎপাদনে জাপান উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। আসিয়ো, হিটাচি, বেসহি ( Besshi ) ও সাগানোসেকিতে প্রধান তাম্রখনিগুলি অবস্থিত। জাপানের তাম্র প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। **লৌহ**—জাপানে ভাল লৌহমৃত্তিকা খুব কম পাওয়া যায় ; যাহা পাওয়া যায় তাহাও মধ্যম শ্রেণীর। হন্‌স্যু ও হোক্কাইডো দ্বীপে মাত্র দুইটি লৌহখনি অঞ্চল আছে ; কিন্তু এইসকল খনির উৎপাদন ক্ষমতা এতই নগণ্য যে জাপানকে লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনের জন্য প্রধানতঃ বৈদেশিক আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। **গন্ধক**—জাপানের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কৃষিকার্যের জন্য সার ( fertiliser ) প্রস্তুত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

জাপানের অন্যান্য খনিজদ্রব্যের ভিতরে খনিজ তৈল উল্লেখযোগ্য। জাপানের তৈলখনিজগুলি হন্‌স্যুতে অবস্থিত। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় জাপানের উৎপাদন অত্যন্ত কম। প্রয়োজনীয় তৈল মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়া হইতে আমদানি করিতে হয়। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ভিতর স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, ম্যাঙ্গানীজ ও দস্তা কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে চীনামাটি ( Kaolin ) যথেষ্ট পাওয়া যায়। উহা মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত হয় ; চীনামাটির দ্রব্যের জন্য জাপান বিখ্যাত।

**জলবিদ্যুৎশক্তি**—জাপানের অন্যতম প্রধান সম্পদ উহার খরস্রোতা নদীগুলি। এই নদীগুলি বারমাস প্রচুর জল বহন করে এবং জাপানীরা এই নদীগুলি হইতে বিপুল পরিমাণে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন করিয়াছে। পৃথিবীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে জাপানের স্থান তৃতীয়। জাপানে শতকরা ৯০-টিরও অধিক গৃহে বৈদ্যুতিকশক্তি ব্যবহৃত হয়। রেলপথও অনেকাংশে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। জাপানীরা তাহাদের দেশের তামার সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদ্যুতিক টারবাইন, ট্রান্সফরমার যন্ত্র ও তার প্রস্তুত করে। হনসু দ্বীপের খরস্রোতা নদীগুলি হইতেই অধিক তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। জাপান সাগরে পতিত সিনানো ( Shinano ), আকানো ( Akano ) প্রভৃতি নদী হইতে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরগামী নদীগুলির মধ্যে কিসো এবং টেনরু হইতেই অধিক তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়। অন্যান্য নদীর মধ্যে ফুজি, টোন, কিনো, সো প্রভৃতি তড়িৎ-উৎপাদনের জন্য উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত নদীগুলিই টোকিও-ইয়োকোহোমা শিল্পকেন্দ্র এবং ওসাকা-কোবে নাগোয়া শিল্পকেন্দ্রের নিকট অবস্থিত।

**Q. 35. What are the principal industries of Japan? Where are they situated? State the sources of supply of the raw materials of these industries.**

**[ জাপানের প্রধান শিল্প কি কি? ঐগুলির অবস্থান কোথায়? এই শিল্পগুলির কাঁচামালের উৎস কোথায়? ]**

জাপান এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পপ্রধান দেশ। যে কোন পশ্চিমের দেশের সহিত এ বিষয়ে জাপান প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম। জাপানের শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্রশিল্প, রেশমশিল্প, ইস্পাতশিল্প, রাসায়নিকশিল্প, কাগজশিল্প, দেশলাই শিল্প এবং মৎস্যশিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**জাপানের বস্ত্রশিল্প**—বিগত মহাযুদ্ধের পর জাপানের কার্পাসশিল্প আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। হনসুদ্বীপের মধ্যভাগে কোয়ানটো ( Kwanto ) সমতলভূমিতে সামান্য তুলার চাষ হয়। ইহা ছাড়া আরো দুই একটি অঞ্চলে তুলা জন্মে। কিন্তু দেশের চাহিদার তুলনায় উহার পরিমাণ খুব কম; সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান এবং মিশর হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর তুলা আমদানি করিতে হয়। জাপানের প্রধান কাপড়ের কলগুলি **ওসাকা, নাগোয়া ও টোকিও** অঞ্চলে অবস্থিত। জাপানের বস্ত্রশিল্প সাধারণতঃ সস্তা জলতড়িৎ শক্তির সাহায্যে ছোট ছোট কারখানা দ্বারা চলে। ওসাকা এবং নাগোয়ায় বড় বড় কাপড়ের কল আছে। ঐগুলি প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর ছাপা কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করে। মজুরী কম লাগায় জাপানীবস্ত্র খুব সস্তা; তাই দক্ষিণ-এশিয়ার দরিদ্র জনগণ উহা আগ্রহের সহিত ক্রয়

করে। ওসাকাকে জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার বলা হয়; বাস্তবিক পক্ষে ওসাকা ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেষ্টার অপেক্ষা অনেক বড় শহর এবং কার্পাসশিল্পের কেন্দ্র। পৃথিবীর বাজারে বস্ত্র রপ্তানিতে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পরই চীন ও ভারতের স্থান।

**রেশমশিল্প** ( Silk-industry )—পরবর্তী 37 নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

**পশমশিল্প**—জাপানের পশমশিল্প প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি করা পশমের উপর নির্ভরশীল। হন্‌সু এবং হোক্কাইডোর উচ্চভূমিতে মেষ পালন করা হয়। ওসাকা জাপানের পশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

**লৌহ এবং ইস্পাতশিল্প**—কিউসু অঞ্চল জাপানের লৌহ এবং ইস্পাতশিল্পের কেন্দ্র। লৌহমৃত্তিকা এবং উৎকৃষ্ট কয়লার অভাব থাকায় এই শিল্পের নানা অসুবিধা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাপান এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান ইস্পাত উৎপাদক দেশ। বর্তমানে জাপানের ইস্পাত উৎপাদন ব্রিটেন অপেক্ষা অধিক (১৯৬৯)—ব্রিটেন ২৪ ও জাপান ৬২ মিলিয়ন টন। **ইয়াওয়াটার** বিশাল ইস্পাত কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এই কারখানাটি কিউসু দ্বীপের পশ্চিম তটে অবস্থিত। নিকটেই বৃহৎ কয়লার খনি রহিয়াছে; তবে ঐ কয়লা লৌহ গলাইবার উপযুক্ত নহে। মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন ও ভারত হইতে লৌহশিলা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হইতে কয়লা আমদানি করিয়া জাপানে এই শিল্প গঠন করা হইয়াছে। হোক্কাইডো দ্বীপে **মোরোরাণ** এবং হন্‌সুদ্বীপের উত্তর ভাগেও কয়েকটি ইস্পাতের কারখানা আছে। ঐগুলি অংশতঃ স্থানীয় কাঁচা মালের উপর নির্ভর করে। জাপানের প্রধান বন্দরগুলিতেও বড় বড় ইস্পাতের কারখানা আছে। ওসাকা, কোবে, ইয়োকোহামা প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার ইঞ্জিন, কল-কারখানার যন্ত্রাদি, যানবাহন প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভারত, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও জাপানের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কাঁচা মালের অভাব সত্ত্বেও জাপান সস্তায় ইস্পাত উৎপাদন করে।

জাপানে সর্বপ্রকার লৌহ ও ইস্পাতজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বড় বড় জাহাজ, রেল ইঞ্জিন, ভারী যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, মোটরগাড়ি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ছুঁচ এবং পেরেকও জাপানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং দেশের চাহিদা মিটাইয়া নানা দেশে রপ্তানি হয়।

**জাহাজ নির্মাণ শিল্প**—জাপানে নাগাসাকি, ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোবে ( Kobe ) অঞ্চলে প্রচুর জাহাজ নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। জাহাজ নির্মাণের সর্বপ্রধান কাঁচামাল ইস্পাতের চাদর জাপানের কারখানাগুলিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। কারখানাগুলি সমুদ্রতীরে স্থাপিত হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের জন্য

প্রয়োজনীয় ইস্পাত যন্ত্রাদি জাপানে সহজলভ্য। জাপানী জাহাজ শ্রমিকগণ অত্যন্ত দক্ষ এবং উহাদের মজুরি ইউরোপ ও আমেরিকার মজুরীর তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীতে জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে জাপান সকল দেশকে—এমন কি ব্রিটেনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বড় বড় লক্ষ-টনের জাহাজ বহুসংখ্যায় প্রস্তুত হয়। আমেরিকার জন্য অধিকাংশ তৈলবাহী জাহাজ জাপান প্রস্তুত করে। জাপান হইতে ভারত প্রভৃতি বহু দেশ জাহাজ ক্রয় করে।

**কাগজ এবং দেশলাই শিল্প**—হোক্কাইডো দ্বীপ এবং হনসু দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বন আছে; এই সকল বৃক্ষের কাঠ হইতে কাগজ নির্মাণোপযোগী মণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া জাপানে প্রচুর বাঁশ জন্মে। এই বাঁশ এবং কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ তৈয়ারী হয়। বনের নরম কাষ্ঠ হইতে দেশলাইয়ের কাঠিও প্রস্তুত হয়। কাগজ ও দেশলাই রপ্তানি হয়।

**রাসায়নিক শিল্প**—জাপানে প্রচুর লবণ ও গন্ধক উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ এই দুটি কাঁচামাল ও কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া জাপানে বিরাট রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রাসায়নিক সার, রং, ভারী রসায়ন, পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্যাদির উৎপাদনে জাপান অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

**মৎস্যশিকার**—মৎস্য শিকার ও মৎস্য চাষ জাপানের উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান অবলম্বন। জাপানে ১৫ লক্ষ লোক সমুদ্রবক্ষে মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহা ছাড়া আরও কয়েক লক্ষ অধিবাসী মৎস্য ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জন করে। মৎস্য শিকারের ব্যাপারে জাপান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। জাপানের মহীসোপান অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। জাপানী মাছধরা ট্রলার জাহাজগুলি সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে, এমন কি সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলেও মাছ ধরিতে যায়। মৎস্য জাপানীদের প্রাত্যহিক খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। জাপানীরা মাথাপিছু বৎসরে প্রায় ৩০ কিলোগ্রাম মাছ খায় (ভারতীয়েরা মাত্র দুই কিলোর কম খায়) কারণ মাছই জাপানীদের খাদ্যে প্রধান জান্তব প্রোটিন। জমির অভাবে মাংস বা দুগ্ধ উৎপাদন জাপানে খুব কম। তাহা ছাড়া জাপানে মাছভাত জনপ্রিয় সুখাদ্য। জাপানীরা প্রধানতঃ সামুদ্রিক মৎস্যই খায়। সামান্য মাছ রপ্তানিও হয়। প্রধানতঃ হেরিং, স্যামন, সার্ডিন, ম্যাকরেল প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্য শিকার এবং হাঙর-শিকার জাপানে খুব প্রসারলাভ করিয়াছে। জীবন্ত ঝিনুক পুষিয়া তাহা হইতে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদনও জাপানের আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। মৎস্য, হাঙর ও ঝিনুক জাপানে শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

**অন্যান্য শিল্প**—জাপানের সিমেণ্ট ও বৈদ্যুতিকযন্ত্র শিল্প খুব উন্নত হইয়াছে; বিশেষতঃ রেডিও, বেতার প্রেরকযন্ত্র, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি শিল্পে জাপান বর্তমান

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশ। জাপানে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের মান খুব উচ্চ। ভারতে জাপানী জীপ ও ট্রাক সামরিক বাহিনীর জন্য এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। জাপানের তৈরী 'টয়টা' মোটরগাড়ি সারা পৃথিবীতে লাখে লাখে রপ্তানি হয়। কৃত্রিম রেশম শিল্প জাপানে একটি সুবৃহৎ শিল্প। ইহা ছাড়াও এখানকার বিভিন্ন-প্রকার ধাতব দ্রব্যাদি, ছাতা, খেলনা প্রভৃতি শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

**Q. 36 Discuss the nature of industrial development of Japan. Name the principal industrial regions of Japan.**

**[ জাপানে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর। প্রধান শিল্পাঞ্চল কোন্‌গুলি ? ]**

জাপান এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান শিল্প সমৃদ্ধ দেশ। সারা বিশ্বে জাপান কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পরেই। বিগত অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে জাপানের অসাধারণ শিল্পোন্নতি বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে। এই শিল্প সমৃদ্ধির প্রধান কারণ জাপানের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, জাপানীদের অসাধারণ দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। জাপান ইউরোপ এবং আমেরিকার উন্নত দেশগুলির নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহায্য লইয়াছে সত্য কিন্তু জাপানের শিল্পগুলি ঠিক পশ্চিম দেশের মত নয়। বড় বড় কারখানা এবং তাহাদের ভীষণ শব্দ ও ধূম্রজাল পশ্চিমী দেশগুলির মত জাপানে খুব বেশি নেই। অধিকাংশ কারখানাই মাঝারি আকারের। অনেক বাড়ীর পশ্চাৎভাগে ছোট ছোট কারখানায় কয়েকজন লোক আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে কাজ করে। ইহাতে শ্রমের জন্য ব্যয় হয় না, কারণ পরিবারের লোকেরাই কাজ করে। ওসাকা, কোবে, নাগোয়া, টোকিও, ইয়োকোহামা, মোজি, ইয়াওয়াটা, নাগাসাকি, মোরোরাণ, কামাইসি প্রভৃতি শহরে বড় বড় কারখানা আছে। কিছুদিন পূর্বেও অধিকাংশ কারখানাই মাত্র কয়েকটি অর্থবান পরিবার দ্বারা পরিচালিত হইত ( যথা—মিৎসুই, মিৎসুবিশি ও সুমিটোমো পরিবার)। এমনকি ক্ষুদ্র ও হস্তচালিত শিল্পগুলির উপরেও ইহাদের প্রভাব ছিল। এখনও জাপানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকিলেও ঠিক পূর্বের মত নাই। কয়েকটি বড় বড় ইস্পাত কারখানা এবং তিন চতুর্থাংশ রেলপথ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

জাপানে কয়লা থাকিলেও ভাল কয়লার খুব অভাব। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে জাপান কয়লা আমদানি করে। খনিজতৈল প্রায় সমস্তই আমদানি করিতে হয়। লৌহশিলা নিতান্তই কম। বস্তুতঃ, কেবলমাত্র তাম্র, গন্ধক এবং রেশম ছাড়া অন্য কাঁচামাল জাপানে নাই বলিলেই চলে। জাপান বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করে ( যথা—তুলা, লৌহশিলা, পাট, পশম প্রভৃতি ) এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। জাপানে উৎপন্ন বস্ত্র ব্রিটেন হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই রপ্তানি

হয়। বস্ত্রশিল্প জাপানের বৃহত্তম শিল্প। ইস্পাত, যন্ত্রাদি, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, খেলনা প্রভৃতিও রপ্তানি হয়।

**শিল্পাঞ্চল**—জাপানে প্রধান শিল্পাঞ্চল চারিটি, যথা—(১) ওসাকা-কোবে-কিওটো অঞ্চল, (২) টোকিও-ইয়োকোহামা অঞ্চল, (৩) নাগোয়া অঞ্চল, (৪) ইয়াওয়াটা-নাগাসাকি অঞ্চল। ইহা ছাড়া, হনসুদ্বীপের উত্তরভাগে কমাইসি এবং হোক্কাইডো দ্বীপের দক্ষিণভাগে মোরোরাণ বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র।

**ওসাকা-কোবে-কিওটো অঞ্চল**—জাপানের মধ্যস্থ সাগরের তীরে একটি অগভীর উপসাগরের প্রান্তভাগে জাপানের বৃহত্তম কার্পাস শিল্পনগর ওসাকা অবস্থিত। উপসাগরটিকে ড্রেজার দ্বারা কাটিয়া গভীর করা হইয়াছে। সুতরাং, এখন বড় জাহাজও ওসাকায় পৌছিতে পারে। এই সকল জাহাজ বিদেশ হইতে তুলা, কয়লা, লৌহশিলা খনিজ তৈল প্রভৃতি ওসাকার বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রে সরবরাহ করে এবং কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্র এবং ইস্পাতজাত দ্রব্য রপ্তানি বাজারে লইয়া যায়। কোবে ওসাকার বহির্বন্দরের কাজ করে। ইহা উপসাগরের প্রবেশমুখে অবস্থিত গভীর জলযুক্ত পোতাশ্রয় এবং জাপানের সর্বপ্রধান বন্দর। এখানে অনেক কারখানা আছে তবে সমতল ভূমির অভাবে অধিক শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। এখানকার জাহাজ নির্মাণের কারখানা খুব বড়। ওসাকাতেও জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। ওসাকা হইতে রেলপথে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার দূরে বিওয়া হ্রদের দক্ষিণ ভাগে জাপানের প্রাচীন রাজধানী এবং বিখ্যাত রেশম শিল্পের কেন্দ্র কিওটো শহর অবস্থিত। এখানকার শিল্পকলা এবং কারুশিল্প বিখ্যাত।

**টোকিও-ইয়োকোহামা অঞ্চল**—টোকিও এবং ইয়োকোহামার অবস্থান অনেকটা ওসাকা এবং কোবের মত; টোকিও উপসাগরটি এখনও পলি কাটিয়া গভীর করা হইয়াছে। তবুও অধিকাংশ জাহাজই ইয়োকোহামায় থামে। মাঝারি জাহাজগুলি টোকিওতে যায়। ইয়োকোহামা জাপানের দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর এবং বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এখানে ইস্পাতশিল্প, ভারী যন্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্মাণের সুবৃহৎ কারখানা আছে। কয়লা ও লৌহশিলা এখানে বিদেশ হইতে আসে এবং নানা প্রকার যন্ত্রাদি এখান হইতে রপ্তানি হয়। টোকিও এবং উহার উত্তরে অবস্থিত কোয়ানটো সমভূমি কার্পাস, রেশম, কৃত্রিম রেশম, বৈদ্যুতিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিখ্যাত। শহরতলিসহ টোকিও পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চল হইতে সস্তায় জলবৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। এখানে বড় বড় বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারখানাও আছে। কোয়ানটো সমভূমি রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। কাঁচা রেশম ও যন্ত্রাদি রপ্তানি করা হয়।

**নাগোয়া অঞ্চল**—ওসাকা এবং টোকিও উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর

একটি উপসাগরের প্রান্তে নাগোয়া বন্দর এবং শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত। নাগোয়ার সমভূমিতে ( নোবি সমভূমি ) রেশম উৎপন্ন হয়। বিদেশ হইতে পশম, তুলা ও কয়লা আমদানি করা হয়। এখানে জলবৈদ্যুতিক শক্তিও সহজলভ্য। ফলে নাগোয়ায় রেশম, পশম ও কর্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। নাগোয়ার বহির্বন্দর ইয়োকাইচি।

**ইয়াওয়াটা-নাগাসাকি অঞ্চল**—কিউসুদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে মোজি হইতে ইয়াওয়াটা পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার ভগ্ন তটভাগে একটি সুবৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐসমুদ্রতটের ধারে ধারে বহু ডক এবং কয়লা ও লৌহ-শিলার জন্য জেটি রহিয়াছে এবং বড় বড় কারখানা, ব্লাস্ট ফার্নেস, কাগজ, কাঁচ ও রাসায়নিক, চিনির কারখানা, তৈল-শোধনাগার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। চিকুহোর বৃহৎ কয়লা খনি এই শিল্পাঞ্চলের নিকটেই অবস্থিত। কয়লা সাববিটুমিনাস হইলেও জাহাজে ব্যবহার করা চলে। ভারত, মালয়েশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে ভাল লৌহশিলা ও কয়লা আমদানি করা হয়। ইয়াওয়াটা এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাতের কারখানা। নাগাসাকি জাহাজ নির্মাণের বৃহত্তম কেন্দ্র।

উপরিউক্ত শিল্পকেন্দ্রগুলি ছাড়া হোক্কাইডো দ্বীপের বৃহৎ কয়লা খনি ও লৌহ খনির নিকট অবস্থিত মোরোরাণের বৃহৎ ইস্পাতের কারখানা স্থানীয় লৌহশিলা এবং কয়লা ব্যবহার করে। জোবানের কয়লাও ব্যবহার করা হয়। হনসুদ্বীপের জাপান সাগর তটে অবস্থিত কানাজাওয়া রেশম শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র।

**Q. 37. Give an account of (a) the climatic conditions and (b) the natural resources of Japan and show how they have affected her development.**

**[ জাপানের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দাও এবং কিভাবে ঐগুলি তাহার আর্থিক প্রগতির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দেখাও। ]**

(a) জাপানের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্প স্থাপনের পক্ষে উপযোগী। এই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যে জাপান অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। কাঁচামাল কিনিবার ও শিল্পিত পণ্য বেচিবার জন্য পৃথিবীতে সর্বপ্রধান বাজার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের নিকটে হওয়াতে তাহার শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের খুব সুবিধা হইয়াছে। জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রেশম এবং অন্যান্য কাঁচামাল জাপানে উৎপন্ন হয় এবং পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এখানে সস্তায় সুদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়।

**জলবায়ু**—জাপান মৌসুমী অধ্যুষিত দেশ। শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। সেইজন্য

শীতকালে পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত অধিক হয় এবং গ্রীষ্মকালে পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত অধিক হয়। হোক্কাইডো দ্বীপের উত্তরাংশ খুব শীতল; আবার জাপানের দক্ষিণাংশ বেশ উষ্ণ। জাপানের উত্তর-পূর্বদিকের সমুদ্রে কুরোশিয়ো ( Kurosiwo ) নামক উষ্ণ জলপ্রবাহ আছে; এই উষ্ণ জলস্রোত জাপানের পোতাশ্রয়গুলিকে বরফমুক্ত রাখে। জলবায়ুর প্রভাবে জাপানীরা খুব স্বাস্থ্যবান ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছে।

হোক্কাইডো এবং উত্তর হন্‌সুর শীতল জলবায়ুতে সরলবর্গীয় বনরাজি জন্মে। গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে দক্ষিণ হন্‌সুর সমতল ভূমিতে বৃষ্টিপাত হয়। সেইজন্য এই অঞ্চলের তুঁতগাছে বৎসরে দুইবার পত্রাগম হয়; এবং ইহার ফলে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। দেশটি খুব পর্বত-সংকুল; এইজন্য কৃষিকার্যও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র ভূমির মাত্র ১৫ ভাগ পরিমাণ অংশে কৃষিকার্য সম্ভব হয়। কৃষিজ উৎপাদনের ভিতর ধান প্রধান। গম, ডাইল, সয়াবীণ, বার্লি, চা প্রভৃতিও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার পার্বত্য জল-প্রবাহগুলির গতিবেগ তীব্র। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নদীগুলি সর্বদাই জলপুষ্ট থাকে। সেইজন্য এগুলি হইতে অল্প ব্যয়ে জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

(b) এই অংশের জন্য 34নং প্রশ্নের উত্তরে "জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ" দেখ।

**Q. 38. Give an account of the methods of cultivation and the crops cultivated in Japan as related to the geographical condition of the country.**

[জাপানের কৃষিব্যবস্থা এবং ফসল চাষের বিবরণ দাও এবং দেখাও যে ঐগুলি জাপানের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।]

*জাপানের কৃষি—কৃষিবিদ্যায় জাপানীরা অত্যন্ত পারদর্শী। জাপান পর্বতময় দেশ, অসংখ্য আগ্নেয় পর্বত ও ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বত ( fold mountain ) এই দ্বীপে মেরুদণ্ডের মত অবস্থান করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর মুখে বালুকাময় ব-দ্বীপ ও আগ্নেয় ভস্ম সম্বলিত মৃত্তিকাই জাপানের একমাত্র কর্ষণোপযোগী ভূমি। অধ্যবসায়শীল জাপানী কৃষক চাষের জমির এক ইঞ্চিও কখনও ফেলিয়া রাখে না। জাপানের জমিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) নদী উপত্যকা ও উপকূলের সমভূমি—এই জমি খুব উর্বর এবং অনেক স্থানে জলসেচও আছে। এই উর্বর জমিতে দুইবার ধান ও একবার গম অথবা যব চাষ করা হয়। (খ) উচ্চভূমির সমতল স্থান বিশেষতঃ নদীর প্লাবনভূমির ( flood plain ) উচ্চের

* জাপানে মাত্র ৩০% লোক চাষ-আবাদ করে। প্রতি পরিবারের ২ হইতে ৫ একর জমি আছে। গড়ে একর প্রতি ৬০ মণ ফসল উৎপন্ন হয়। ২ একর জমি হইতে একটি জাপানী পরিবারের সচ্ছলভাবে চলিয়া যায়। জীবনধারণের মান ব্রিটেন ও জার্মানীর সমপর্যায়ের।

সমভূমি ও আগ্নেয়লাভা বা ভস্ম সম্বলিত মালভূমি—এই জমিতে প্রচুর সার ব্যবহার করিতে হয়। এখানে বর্ষাকালে ধান এবং শীতকালে সয়াবীন, গম বা ডাল জাতীয় ফসল উৎপন্ন হয়। (গ) পর্বতের ঢালুগাত্র এবং সোপান কৃষিভূমি ( terraced agriculture )—দক্ষিণ জাপানে এই পার্বত্য ভূমিতে চা গাছ, তুঁতগাছ ও কর্পূর গাছ জন্মে। মধ্য জাপানে আপেল ও কমলালেবুর বাগান অধিক। জাপানের অধিকাংশ পার্বত্যস্থানেই অরণ্য রহিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে জাপানে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন উভয় মৌসুমী বায়ু হইতেই বারিপাত হয়; ফলে, জাপানে বারমাসই জমিতে চাষ-আবাদ হইতে পারে। জাপানের সর্বপ্রধান ফসল ধান। ইহা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে অপর কোন ফসলের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। প্রতি হেকটরে উৎপাদনের হিসাব ধরিলে জাপানে যত অধিক ধান হয়, এত ধান আর অপর কোন অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদনকারী দেশে হয় না। জাপানের জমি অনুর্বর হওয়ায় অধিকাংশ জমিতে বিশেষ করিয়া আগ্নেয় ভস্ম সম্বলিত মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক এবং জৈব সার দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া, ব-দ্বীপ অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থাও আছে। জাপানের সমগ্র আয়তনের ১৫% মাত্র চাষের জমি। এত অল্প জমি হইতে জাপানের কিছু বেশি নয় কোটি অধিবাসীর খাদ্য উৎপন্ন করা সহজ নহে। অতি উৎপাদক কৃষির যে বিশিষ্ট রূপ জাপানে দেখা যায় তাহা সত্যই অতুলনীয়। প্রত্যেক খণ্ড জমি যত্নের সহিত চাষ করা হয়। প্রচুর শ্রমিক ঐ সকল ক্ষেত্রে দেখাশুনা করে। রাসায়নিক সার ( যথা—এ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, ফসফেট ) এবং জান্তবসার ( যথা—মাছের আঁশ ও কাঁটা হইতে উৎপন্ন সার ) ব্যবহারের ফলে, ধান, গম ও যবের উৎপাদন খুব বেশি। কেবল হোক্কাইডো দ্বীপের উত্তরভাগে অত্যধিক শীতের জন্য চাষ-আবাদ বারমাস সম্ভব হয় না। জাপানের অবশিষ্টাংশে প্রায় প্রত্যেক জমিতেই বৎসরে একাধিক ফসল জন্মে। সমভূমি ও নদী উপত্যকায় ৩।৪টি ফসল প্রতি বৎসরই উৎপন্ন হয়।

জাপানে তুঁত গাছের চাষ ৩৬° উত্তর দ্রাঘিমার উত্তরে হয় না। চা ও কর্পূরের গাছ ৩৪° উত্তর দ্রাঘিমার দক্ষিণেই সীমাবদ্ধ। জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ইহাদের মধ্যে হওয়ায় উহা তুঁত, চা ও কর্পূর উৎপাদনের সুবিধা লাভ করিয়াছে। হনসু প্রভৃতি দ্বীপে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়, এইজন্য এই সকল অঞ্চলের তুঁত গাছে বৎসরে দুইবার করিয়া পত্রাগম হয় এবং ইহার ফলে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। রেশম জাপানের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং ইহা প্রধানতঃ জাপানের মধ্য-উপসাগরের ( Inland Sea of Japan ) চারিপাশেই হয়। সর্বদক্ষিণের দ্বীপগুলিতে কদলী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোত্তরের দ্বীপগুলিতে শীতপ্রধান দেশের ফসল ওট পর্যন্ত চাষ হয়। ইহা ছাড়া ডাইল, গম, বার্লি, তামাক, সয়াবীন প্রভৃতিও কিছু কিছু

উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অপর কোন এত ক্ষুদ্র দেশে জলবায়ুর ও কৃষি-উৎপাদনের এত পার্থক্য দেখা যায় না। উত্তর-দক্ষিণে জাপানের দ্বীপগুলি অনেকখানি স্থান লইয়া অবস্থিত বলিয়া জলবায়ু এবং কৃষিজ পণ্যের এই বিভিন্নতা দেখা যায়। বর্তমানে জাপানের জনসংখ্যা অত্যধিক হইয়া উঠিতেছে। এই পার্বত্যদেশে প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৬০০ লোক স্বভাবতঃই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাপান তাহার প্রয়োজনের প্রায় ৮০ ভাগ খাদ্যই যোগাইতে সক্ষম।

জাপানে পশুচারণ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে কারণ তৃণভূমি খুব কম এবং পশুখাদ্য উৎপাদনের জমি কম। হোক্কাইডোর উচ্চভূমিতে মেষচারণ অবশ্য উল্লেখযোগ্য। জাপান দুগ্ধজাতদ্রব্য প্রধানতঃ নিউজিল্যাণ্ড হইতে আমদানি করে।

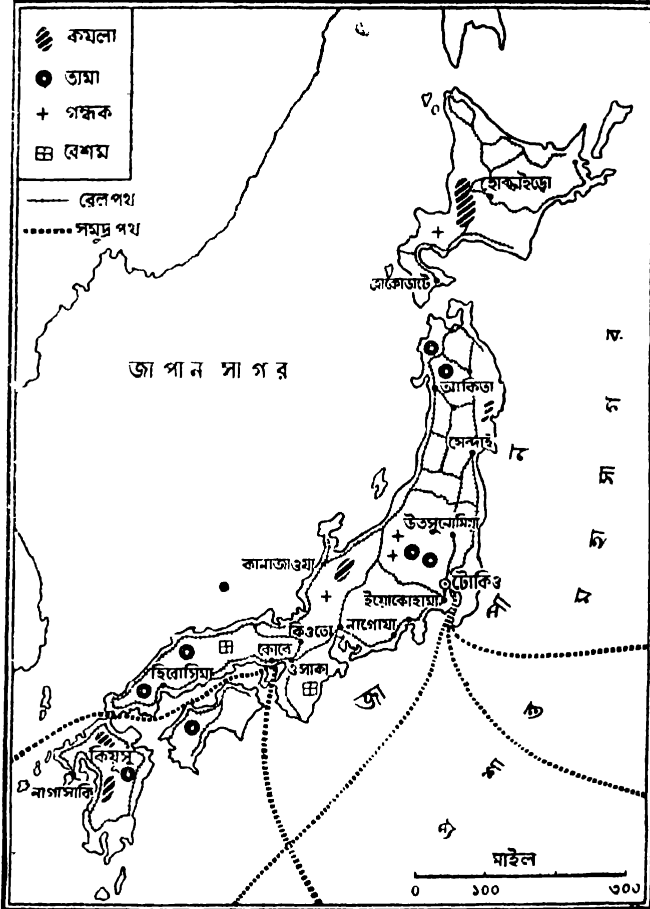
**Q. 39 Evaluate the importance of sericulture in the economic life of the Japanese people.**

**[ জাপানীদের অর্থনৈতিক জীবনে রেশম চাষের গুরুত্ব কতদূর বর্ণনা কর। ]**

**জাপানের রেশম উৎপাদন**—জাপান বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান রেশম উৎপাদক দেশ। জাপানী কৃষকের আর্থিক জীবনে রেশম কীট পালন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কৃষক যখন ক্ষেত্রে কাজ করে তখন তাহার স্ত্রী-পুত্র গৃহে রেশম কীট পালন করিয়া অর্থোপার্জন করে। জাপানের এই সুলভ ও সুদক্ষ শ্রমিকই রেশমকীট পালনের ( Sericulture ) প্রধান অবলম্বন।

**কাঁচামাল**—জাপানের জলবায়ু রেশমকীট উৎপাদনের উপযোগী। রেশমকীট তুঁত গাছের পাতা খাইয়া স্বল্পকাল জীবন ধারণ করে। পোকাগুলির ক্ষুধা অসাধারণ বেশি। আধসের ডিম হইতে যত রেশমকীট বাহির হয় সেগুলিকে পালন করিতে ১০ টন কচি তুঁত পাতা প্রয়োজন হয়। বসন্তকালে এবং শরৎকালে এই পাতা প্রচুর পাওয়া যায়। জাপানে বৎসরে দুইবার বর্ষা হওয়ায় পাতার অভাব হয় না। তুঁত গাছ অনুর্বর পার্বত্য জমিতেও ভালই জন্মে। সুতরাং, জাপানের খাদ্য উৎপাদন মোটেই ব্যাহত হয় না। ১ টন পাতা উৎপন্ন করিতে ৩০-টিরও বেশি তুঁত গাছ প্রয়োজন হয়। রেশমকীট পালনের জন্য ১৬° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপ প্রয়োজন। জাপানে বসন্তকালে ও শরৎকালে দুইবার রেশমগুটি ( cocoon ) উৎপন্ন করা হয়। প্রয়োজন মত ঘরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রেশম উৎপাদন জাপানের সর্বপ্রধান কুটীর শিল্প। বর্তমানে রেশমের সুতা যন্ত্রের সাহায্যেই প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং, রেশম শিল্পের কাঁচামাল জাপানেই উৎপন্ন হয়। মধ্য হন্‌সু ও কিউসু দ্বীপের অধিবাসীরাই অধিক রেশম উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ কোয়ানটো সমভূমি ও বিওয়া হ্রদের তটভাগ এই শিল্পের কেন্দ্র। উপকূলভাগে ফুকুই ও ইশিকাওয়া অঞ্চলে রেশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

**রেশম শিল্পকেন্দ্র**—জাপানের রেশম শিল্পকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) মূল্যবান ভারী রেশম দ্রব্য যাহা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হনসু ও কিউসু দ্বীপের গ্রামাঞ্চলে প্রধানতঃ হস্তচালিত অথবা জলবৈদ্যুতিক শক্তিচালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। (২) হাল্কা "ফ্যান্সি" রেশম (প্রধানতঃ কৃত্রিম




রেশম সূতায় প্রস্তুত) যাহা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অনেক সময় ওসাকা এবং নাগোয়ায় কার্পাস বস্ত্রশিল্পের অঙ্গ হিসাবেও এই শিল্প পরিচালিত হয়। তাহা ছাড়া, জাপানের হনসু দ্বীপের পশ্চিম তটে অবস্থিত ফুকুই ও কানাজাওয়াতে বড় বড় আধুনিক যন্ত্র সজ্জিত রেশমের কারখানাও আছে।

জাপানের বিশাল কৃত্রিম রেশম শিল্প মহাযুদ্ধের সময় ধ্বংস হয় ; কিন্তু উহা পুনরায় গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পের কাঁচামাল নরম কাঠ জাপানেই প্রধানতঃ পাওয়া যায়। জাপানের কিওটো নানা প্রকার রেশমের কাজের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

**কাঁচা রেশম ও রেশম দ্রব্যের বাজার**—রেশম অত্যন্ত মূল্যবান দ্রব্য, সুতরাং আমেরিকার মত অর্থবান দেশই স্বভাবতঃ ইহার প্রধান ক্রেতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপানে উৎপন্ন রেশমের সূতার ( reeled silk ) ৮৫ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইত। এই ব্যবসা বর্তমানে পুনরায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তবে জাপান এখন অধিক পরিমাণে রেশম বস্ত্রও রপ্তানি করিতেছে ; জাপানের রেশম ও রেশম বস্ত্রের প্রধান ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র। অপরাপর ক্রেতা ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রিটেন প্রভৃতি। ফ্রান্স কিছু কাঁচা রেশম ক্রয় করিয়া থাকে। প্রধানতঃ জাপানী কাঁচা রেশমের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া এবং ফ্রান্সের লিঁয় নগরে বড় বড় রেশমের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশূরের রেশম শিল্পও অংশতঃ জাপানী রেশমসূতার উপর নির্ভরশীল।

*বর্তমানে জাপানে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ পাউণ্ড রেশম সূতা প্রস্তুত হয়। ৪১৯ কোটি বর্গগজ খাঁটি রেশম বস্ত্রও প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া, কার্পাস শিল্পেও কিছু কিছু রেশম ব্যবহার করা হয়।

**Q. 40. Japan is often described as the Britain of the East. Justify the statement in the light of what you have read about economic geography of these two countries.**

**[ অনেক সময় জাপানকে প্রাচ্যের ব্রিটেন বলা হয়। ঐ দুই দেশের আর্থিক ভূগোল পাঠ করিয়া যাহা বুঝিয়াছ তাহার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত মন্তব্যকে সমর্থন কর। ]**

জাপানকে প্রাচ্যের ব্রিটেন বলা হয়। যদিও দুইটি দেশের মধ্যে দৃশ্যতঃ খুবই মিল আছে তবু গরমিলের অভাব নাই। দুই দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে নিম্নলিখিত তুলনা করা যাইতে পারে—

| জাপান | ব্রিটেন |
|---|---|
| (১) জাপান এশিয়া ভূ-খণ্ডের অদূরে অবস্থিত একটি পর্বতসংকুল দ্বীপপুঞ্জ। পর্বতশ্রেণী জাপানের মেরুদণ্ডের মত অবস্থান করিতেছে। | (১) ব্রিটেন ইউরোপ ভূ-খণ্ডের অদূরে অবস্থিত একটি পর্বতময় দ্বীপপুঞ্জ, তবে জাপানের মত ব্রিটেন তত পর্বতময় নহে। |

Asia—L. D. Stamp (1957)

## জাপান

(২) জাপানের জলবায়ু সমুদ্রদ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে এখানে বৎসরে দু'বার বর্ষাকাল। কুরোসিয়ো নামক উষ্ণস্রোতের অবস্থানের ফলে শীতের তীব্রতা কম। বন্দরগুলিতে বরফ জমে না।

(৩) জাপানের তটভাগ খুব ভগ্ন। দক্ষিণাংশে হন্‌সু, কিউসু ও সিকোকু দ্বীপত্রয়ের চতুষ্পার্শে ও মধ্যে সমুদ্র থাকায় বন্দর গঠনের সুবিধা বিদ্যমান।

(৪) জাপানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের কাঠ হইতে কাগজ, খেলনা ও রেয়ণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঁশ গাছও কুটীরশিল্পের একটি প্রধান অবলম্বন। জাপানের অর্ধেকের অধিক জমিতে অরণ্য আছে।

(৫) জাপানে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ও নৌবিদ্যার খুব প্রসার হইয়াছে। ভগ্ন উপকূল, অরণ্যের প্রাচুর্য ও নিকটস্থ মৎস্য ক্ষেত্রগুলি এজন্য দায়ী। জাপানের বাণিজ্য জাহাজ বহর খুব বড়। তবে ব্রিটেনের বাণিজ্য জাহাজ বহর আরও বড়। মৎস্য জাপানীদের প্রিয় খাদ্য।

(৬) জাপানে জমির অভাবে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নহে। প্রধান ফসল ধান। কৃষি পদ্ধতি খুব উন্নত এবং ফসল অধিক ; কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় খাদ্য ও কৃষিজ কাঁচামাল ( রেশম বাদে ) উৎপাদন যথেষ্ট নহে। জাপানের শতকরা ৩০ জন চাষী।

(৭) জাপান শিল্প-প্রধান দেশ ; জাপানে রেশম, তাম্র, লৌহ ও গন্ধক

## ব্রিটেন

(২) ব্রিটেনের জলবায়ু জাপানের জলবায়ু অপেক্ষা সমুদ্রবায়ুর দ্বারা অধিক প্রভাবিত হওয়ায় এখানে বারমাস বৃষ্টি হয়। শীতের তীব্রতাও কম থাকে এবং বন্দরে বরফ জমে না।

(৩) ব্রিটেনের তটভাগও ভগ্ন এবং নদীগুলির মুখ খুব গভীর ও চওড়া হওয়ায় বন্দর গঠনের খুব সুবিধা হইয়াছে।

(৪) ব্রিটেনে পেনাইন পর্বতগাত্রে তৃণভূমি আছে। এই স্থানে পশুচারণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। উচ্চ পর্বতগাত্রে সরলবর্গীয় বৃক্ষ দেখা যায়। নিম্নভূমিতে পর্ণমোচী গাছই অধিক। ব্রিটেনে অরণ্য নিতান্তই কম।

(৫) ব্রিটেন জাহাজ নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। ভগ্ন তটরেখা ও প্রচুর ইস্পাত এবং ওক কাঠের সহজলভ্যতা ও উত্তর সাগরের মৎস্য ক্ষেত্রই ইহার প্রধান কারণ। তবে ব্রিটেনের মৎস্যশিল্প জাপানের ন্যায় এত বড় নহে। মৎস্য ইংরাজদেরও প্রিয় খাদ্য।

(৬) ব্রিটেনে উর্বর জমি কম বলিয়া কৃষি অপেক্ষা গোমেষাদি পালনেই অধিক জোর দেওয়া হয়। ফলে, প্রয়োজনীয় খাদ্যের একতৃতীয়াংশও উৎপন্ন হয় না। লোকসংখ্যা খুব বেশি। কিন্তু মাত্র দশ ভাগ লোক চাষের কাজে লিপ্ত আছে।

(৭) ব্রিটেনের ৯০ ভাগ লোক শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। উপনিবেশ-

ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কাঁচামালই আমদানি করিতে হয়।

(৮) জাপানে কয়লা আছে তবে উহা যথেষ্ট নহে ; ভালও নহে। খনিজ তৈল ও লৌহ আকরিক যাহা আছে তাহা অতি সামান্য। কার্পাস উৎপাদন নগণ্য। জাপানীরা জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করিয়া এবং কয়লা, তৈল, লৌহ, তুলা প্রভৃতি আমদানি করিয়া শিল্প গঠন করিয়াছে। জাপানে মজুরী ব্রিটেনের তুলনায় কিছু কম ও কুটিরশিল্পে খরচ কম বলিয়া জাপানীরা সস্তা জিনিসে এশিয়ার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে।

(৯) ওসাকা জাপানের বস্ত্রশিল্পের খুব বড় কেন্দ্র ; ইহাকে জাপানের ম্যাঞ্চেষ্টার বলা হয়।

(১০) জাপানের রপ্তানি দ্রব্যগুলি প্রায় সমস্তই শিল্পজাত।

গুলি হইতে কাঁচামাল আনিয়া উহা পুনরায় রপ্তানি করা ও উহার সাহায্যে শিল্প গঠন করা ব্রিটেনের প্রধান কাজ।

(৮) শিল্পগঠনের দিক দিয়া ব্রিটেনের সুযোগ সুবিধা জাপান অপেক্ষা অনেক বেশি। দেশে ভাল কয়লার অভাব নাই। লৌহ যথেষ্ট না হইলেও প্রচুর আছে। অন্যান্য কাঁচামালের বেশির ভাগই কম দামে কমনওয়েলথ হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু মজুরীর হার বেশি হওয়ায় শিল্পদ্রব্যের দাম অনেক বেশি। দামী শিল্পিত পণ্য লইয়া ব্রিটেন প্রতিযোগিতায় জাপানের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না।

(৯) ম্যাঞ্চেষ্টার অঞ্চল ব্রিটেনের যন্ত্র শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র কিন্তু এই শিল্পটির পূর্বের ঐতিহ্য আর নাই।

(১০) ব্রিটেনের রপ্তানিদ্রব্য সমস্তই শিল্পজাত।

**Q. 41. Write short notes on—(i) Osaka & (ii) Tokyo,**

(১) **ওসাকা**—ইহা জাপানের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন প্রকার কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাসজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত এখানকার প্রধান শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লৌহ এবং ইস্পাত নির্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত এবং কাগজশিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহাকে জাপানের 'ম্যাঞ্চেষ্টার' বলা হয়।

(২) **টোকিও**—ইহা হন্‌সু দ্বীপের উপকূলে অবস্থিত জাপানের রাজধানী। ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। ইহার বন্দর অগভীর বলিয়া ইয়োকোহামা ইহার বহির্বন্দরের কাজ করে। প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও লৌহাদি নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত উল্লেখযোগ্য। লোকসংখ্যা প্রায় ৯৮ লক্ষ।

# ব্রহ্মদেশ

## BURMA

**Q. 42. Describe the influence of relief and Climate of Burma on the features of agriculture and the crops produced there.** **( B. Com. 1969 )**

**[ ব্রহ্মদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য এবং ফসল চাষের উপরে ঐ দেশের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। ]**

ব্রহ্মদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু দেশের সর্বত্র চাষ-আবাদ হয় না। আরাকান, লুসাই, পাতকই, পেগু ও টেনাসেরিম পর্বতমালা এবং শান মালভূমি অত্যন্ত অরণ্যসংকুল এবং অতিবৃষ্টিপাতের জন্য ঐ সকল স্থানে পর্বতগাত্রেও চাষ-আবাদ করা প্রায় অসম্ভব। তাহা ছাড়া, ঐ সকল স্থানে শ্রমিকেরও খুব অভাব। সুতরাং, বিরাট দেশটির মাত্র দুটি অঞ্চলের সংকীর্ণ উপত্যকায় ও সমভূমিতে যাহা কিছু চাষ-আবাদ হয়। এই দুইটি অঞ্চল হইল (১) ইরাবতী-চিন্দুইন উপত্যকা ও ইরাবতী নদীর উর্বর বদ্বীপ এবং (২) আরাকান পর্বতমালা এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ সমভূমি। প্রথমোক্ত অঞ্চলটিকে আবার জলবায়ু ও ফসল অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) উত্তর ভাগের শুষ্কবলয় যেখানে বৃষ্টিপাত মাত্র ৬০।৮০ সেন্টিমিটার সেখানকার ফসল গম, যব, জোয়ার, বাজরা ও কার্পাস তুলা, এবং (খ) নিম্ন ইরাবতী উপত্যকা ও বদ্বীপ যেখানে বৃষ্টিপাত ২০০ সেন্টিমিটারের মত সেখানকার একমাত্র ফসল ধান। আরাকান উপকূলেও বৃষ্টি ঐরূপ বেশি এবং একমাত্র ফসল ধান। বস্তুতঃ ধানই ব্রহ্মদেশের সর্বপ্রধান ফসল এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানিও হয়। টেনাসেরিমে চা ও রবার আবাদ আছে। অল্প পরিমাণে পাট, তৈলবীজাদিও চাষ হয়।

কৃষির ব্যবস্থা অনেকটা ভারতের মত; বরং আরও অনেক বেশি অনুন্নত। লোকসংখ্যা কম বলিয়া ধান রপ্তানি করা সম্ভব হয়।

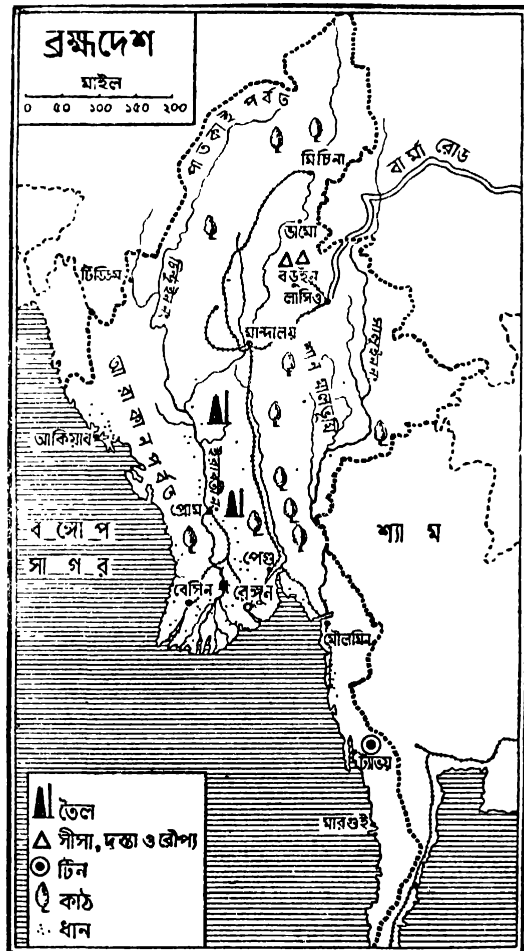
**Q. 43. Give an idea of the economic resources of Burma and suggest the industries which the country can develop.**

**[ ব্রহ্মদেশের আর্থিক সম্পদ বিষয়ে যাহা জান লিখ এবং কয়েকটি শিল্পের নাম কর যাহা ঐ দেশের পক্ষে বাড়াইয়া তোলা সম্ভব। ]**

**ব্রহ্মদেশ** ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত উহারা একই শাসকের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের মত ইহাও ব্রিটিশ অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে ব্রহ্মদেশ খুবই সমৃদ্ধ। কিন্তু এই সকল সম্পদের প্রায় কোনটিই আজও সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয় নাই। ব্রহ্মদেশের সম্পদগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা—বনজ, কৃষিজ ও খনিজ।

**বনজ সম্পদে** ব্রহ্মদেশের মত সমৃদ্ধ দেশ খুব কমই আছে। এই দেশের সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ জুড়িয়া বৃষ্টিপাত অতিরিক্ত পরিমাণে হয়। স্থানেস্থানে বৃষ্টিপাত বৎসরে ২৫০ সেঃ মিঃ-এর অধিক। অতিবৃষ্টি অঞ্চলে অর্থাৎ আরাকানইয়োমা ও টেনাসেরিম অঞ্চলে গভীর অরণ্য থাকিলেও মূল্যবান কাঠ কম পাওয়া যায়। অভ্যন্তর ভাগে মধ্যম বৃষ্টি অঞ্চলেই সেগুণগাছ বেশি পাওয়া যায়। **পেগুইয়োমা** ও পূর্বদিকের **সাইলুম** নদী অঞ্চলে পর্বতগাত্রে **সেগুণ, মেহগনি, লৌহ কাষ্ঠ** ও অন্যান্য গাছের সীমাহীন নিবিড় অরণ্য। এই সমস্ত অরণ্য হইতে হাতীর সাহায্যে কাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া পার্বত্য নদীতে ভাসাইয়া রেঙ্গুন ও মৌলমেন বন্দর মারফত বিদেশে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। কাঠ; বিশেষতঃ সেগুণ কাঠ ব্রহ্মদেশের অর্থনীতির একটি প্রধান অবলম্বন। লক্ষ লক্ষ লোক ইহা হইতে জীবিকা নির্বাহ করে। এমন কি উহাদের আসবাব ও ঘরবাড়ী পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত।




**কৃষিজ সম্পদের** মধ্যে ধানই প্রধান। কেবলমাত্র উত্তর ব্রহ্মের এক সীমাবদ্ধ ভূভাগ ( Dry belt ) বাদ দিলে অপর সকল অঞ্চলেই বৃষ্টিপাতের নিশ্চয়তার জন্য

ধানের চাষ ভাল হয়। বিশেষতঃ, ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও আরাকান উপকূল অঞ্চল ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। এই সমস্ত অঞ্চল হইতে রেঙ্গুন, বেসিন ও আকিয়াব মারফত বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন ধান ও চাউল বিদেশে রপ্তানি হয়। মান্দালয় নগরের চারিপাশের শুষ্ক অঞ্চলে গম, ভুট্টা, বার্লি ও নানা প্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, রেশম এবং তুলা ব্রহ্মদেশে উৎপন্ন হয়। রেশম ব্রহ্মদেশে নরনারীদের পোশাকের একটি অপরিহার্য উপকরণ।

**খনিজ সম্পদেও** ব্রহ্মদেশ বেশ সমৃদ্ধ। দেশের আয়তনের তুলনায় ইহার **পেট্রোলিয়াম** উৎপাদন কম নয়। খনিগুলি অধিকাংশই ইরাবতী উপত্যকায় অবস্থিত। খনিজ তৈলের পরেই **ট্যাভয়ের টিন** ও **বডুইন** অঞ্চলের (শান ষ্টেট) **তাম্র, সীসা** ও **রৌপ্যই** প্রধান। **সীসা** উৎপাদনেও ব্রহ্মদেশ বিখ্যাত। তাহা ছাড়া এই অঞ্চলে বহুপ্রকার **মূল্যবান প্রস্তর** পাওয়া যায়। ইরাবতী উপত্যকার নানা স্থানে প্রচুর নিম্ন শ্রেণীর **কয়লাও** রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও নিপুণ শ্রমিকের অভাবে উহা কার্যকরী হইতেছে না।

**শ্রমশিল্পে** ব্রহ্মদেশ আজিও যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠে নাই। যাহা কিছু শিল্প আছে তাহা কুটীর-শিল্পের পর্যায়ভুক্ত। অথচ কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তির উৎস ও সম্ভাবিত জলবিদ্যুৎশক্তির প্রচুর সংস্থান রহিয়াছে। বর্তমানে কয়েকটি **চাউলের কল** ও **তৈল পরিশোধনাগার** ব্যতীত আধুনিক কোন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। **কাঠ চেরাই** একটি প্রধান কাজ বটে কিন্তু কাষ্ঠজাত কাগজ, রেয়ন, দেশলাই প্রভৃতি আধুনিক শিল্প কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। শান ষ্টেটের খনিগুলি হইতে যে সীসা, তাম্র, রৌপ্য ও ট্যাভয় অঞ্চল হইতে যে টিন পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাও বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইয়াছে; কিন্তু উহা গৃহযুদ্ধে মত্ত থাকায়, বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য চেষ্টার অভাব দেখা যাইতেছে। এমন কি গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানী ও ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণে যে সকল শ্রম শিল্প ধ্বংস হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হইতেছে না।

# পাকিস্তান

## PAKISTAN

**Q. 44. Give a brief account of the irrigation system of West Pakistan.**

**[ পশ্চিম পাকিস্তানের জলসেচ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ]**

পশ্চিম পাকিস্তানে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেন্টিমিটারেরও কম। অনেকস্থানে বৎসরে ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিও হয় না। সুতরাং, জলসেচ ব্যতীত চাষ-আবাদ সম্ভব নয়। সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদ ও তাহার বামতটে বড় বড় তিনটি উপনদী—ঝিলাম, চেনাব ও রাবি—প্রবাহিত। এই নদীগুলি হইতে জলসেচ দেওয়ার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ( বর্তমানে প্রদেশ বলিয়া কিছু নাই ) প্রচুর গম, তুলা ও ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে সিন্ধু অববাহিকার প্রাচীন সেচব্যবস্থা আমূল সংস্কৃত ও পুনঃনির্মীত হয়। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে শতদ্রু ও বিপাশার জল এখন পাকিস্তান খুব কমই পায়। তাই অনেকস্থানে জলাভাব দেখা দিয়াছে। অবশ্য বৈদেশিক সাহায্যের ফলে পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা প্রসারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সম্প্রতি পাকিস্তানে জলসেচ দেওয়ার জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে **মঙ্গলা** বাঁধের পশ্চাতে বিরাট জলাধার নির্মাণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সিন্ধু উপত্যকার সুবিশাল **টারবেলা** বাঁধের নির্মাণ কার্য চলিতেছে। এই বাঁধ শেষ হইলে জলসেচের জন্য প্রচুর জল ঐ বাঁধে ধরিয়া রাখা যাইবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের নিম্নলিখিত খালগুলি উল্লেখযোগ্য—(ক) **আপার চেনাব খাল**—ইহা শিয়ালকোট ও গুজরাণওয়ালা অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করে। (খ) **লোয়ার চেনাব খাল**—ইহা বিখ্যাত লয়ালপুর উপনিবেশ অঞ্চলে জল সরবরাহ করে। (গ) **আপার ঝিলাম খাল**—ইহা পাকিস্তানের গুজরাট ও শাহপুর জেলায় জল সরবরাহ করে। (ঘ) **লোয়ার ঝিলাম খাল**—ইহাও শাহপুর অঞ্চলে জল যোগায়। (ঙ) **লোয়ার বারি দোয়াব খাল**—ইহা লাহোর অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার সহায়ক।

সিন্ধুনদের উচ্চ প্রবাহে **থল বাঁধ** এবং নিম্ন প্রবাহে বহু বিখ্যাত **সুক্কুর বাঁধ** বিপুল পরিমাণ জমিতে জল যোগায়। এগুলি পৃথিবীর বৃহত্তম সেচ-ব্যবস্থাগুলির সমকক্ষ। পশ্চিম পাকিস্তানে নলকূপ হইতেও অনেক স্থানে সেচের জল সরবরাহ করা হয়।

**Q. 45. Mention the agricultural resources of Pakistan. Is Pakistan self-sufficient in food and raw materials ?**

**[ পাকিস্তানের কৃষিজ সম্পদের উল্লেখ কর। পাকিস্তান কি খাদ্য ও কাঁচামালের বিষয়ে স্বয়ংপূর্ণ ? ]**

পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় এই দুই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের কৃষিজাতদ্রব্য উৎপন্ন হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে নরম পলিমাটি এবং অত্যন্ত আর্দ্র জলবায়ুর জন্য ঐ অঞ্চলে জলসেচের প্রয়োজন প্রায় নাই। এখানে প্রধান ফসল ধান—পাকিস্তানের প্রায় ৯০ ভাগ ধান পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়—অবশিষ্ট দশ ভাগ হয় সিন্ধুর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর পাট, তামাক ও চা এবং কিছু পরিমাণ ইক্ষু, তৈলবীজ ও ডাল জন্মে। বরিশাল ধানের জন্য এবং মৈমনসিংহ পাটের জন্য বিখ্যাত। রংপুরে তামাক এবং চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে চা উৎপন্ন হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বপ্রধান ফসল গম। গম উৎপাদনে সিন্ধুর সেচ অঞ্চল ও পাঞ্জাবের সেচ অঞ্চল প্রধান। গম শীতকালের ফসল। অল্প যবও উৎপন্ন হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষতঃ লয়ালপুর ও পেশোয়ার অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। পেশোয়ার নানা প্রকার ফলের জন্য বিখ্যাত। সিন্ধু বদ্বীপে ধান চাষ হয়।

তুলা উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান খুব উল্লেখযোগ্য। তুলার আঁশ বেশ দীর্ঘ ও সুন্দর। তবে এখন দেশে বস্ত্রশিল্পের খুব উন্নতি হওয়ায় তুলা রপ্তানি হ্রাস পাইতেছে।

ধান উৎপাদনে পাকিস্তান চীন এবং ভারতের পরে এবং জাপানের সমকক্ষ। যে বৎসর পূর্বপাকিস্তানে মৌসুমী বায়ুর কিছু তারতম্য হয় সেই বৎসর ব্রহ্মদেশ হইতে ধান আমদানি করিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ধান রপ্তানি করিলেও যুক্তরাষ্ট্র হইতে নিয়মিতভাবে প্রচুর গম আমদানি করে। পাকিস্তান চিনিও আমদানি করে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাকিস্তান নিজ দেশের কলকারখানার চাহিদা মিটাইয়াও প্রচুর পাট ও তুলা রপ্তানি করিতে সক্ষম। যথেষ্ট চাও রপ্তানি হয়।

**Q. 46. What do you know of the recent industrial developments in Pakistan?**

**[ পাকিস্তানের সাম্প্রতিক শিল্পোন্নতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ]**

দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তান ছিল শিল্পের দিক দিয়া অত্যন্ত পশ্চাদপদ দেশ; কিন্তু আজ সেখানে বহু নূতন কলকারখানা বিশেষতঃ কার্পাসবস্ত্র, পাটবস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ভারী শিল্প এখনও পাকিস্তানে গড়িয়া উঠে নাই। যন্ত্রশিল্পে পাকিস্তান খুব পশ্চাদপদ দেশ। ইহার কারণ পাকিস্তানে কয়লা ও লৌহের একান্ত অভাব। শিল্পের দিক দিয়া পাকিস্তানের প্রধান সম্বল তাহার কাঁচামাল; যথা—পাট, তুলা, ইক্ষু ও চর্ম এবং শক্তির উৎসের মধ্যে সামান্য নিম্নমানের কয়লা, কিছু তৈল ( সিন্ধু উপত্যকায় ) ও স্বাভাবিক গ্যাস ( সুই )। পূর্ব পাকিস্তানে জলশক্তি সহজলভ্য।

বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে খুব আধুনিক ধরণের ১৫টি বড় পাটকল আছে। এগুলি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। ১০৫টি ছোট ও বড় কাপড়ের কলের মধ্যে ৮৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে। নারায়ণগঞ্জ ও লাহোরে বেশির ভাগ কাপড়ের কল অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানে ৮ ও পশ্চিমে ৬টি চিনির কল এবং চট্টগ্রামের নিকট একটি কাগজের কল আছে। এখানে একটি ছোট ইস্পাতের কারখানাও আছে। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অনেক স্থানে বড় বড় সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কয়েকটি সিমেণ্ট ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাও আছে। এগুলি অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত।

### এশিয়ার নগর ও বন্দর

**Q. 47. Write short notes on—(i) Osaka (ii) Tokyo (iii) Shanghai (iv) Calcutta (v) Karachi (vi) Rangoon (vii) Singapore (viii) Yokohama (ix) Akyab (x) Hongkong (xi) Kobe, (xii) Chittagong, (xiii) Chalna.**

[ (১) ও (২) নম্বরের জন্য ২য় খণ্ডের ৪১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য। ]

(৩) **সাংহাই**—ইহা ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত। ইহা চীনের সর্বপ্রধান শহর বন্দর ও শিল্প-কেন্দ্র। ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পাস ও রেশমজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত এখানকার প্রধান শিল্প। ইহা চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সর্বপ্রধান বন্দর ও জাহাজ নির্মাণশিল্পের কেন্দ্র।

[ ৫ হইতে ১১ নম্বরের জন্য ১ম খণ্ডের ১১৭নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য। ]

(১২) **কোবে**—জাপানের দ্বিতীয় বন্দর। ওসাকা হইতে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় এবং জাহাজ-নির্মাণ ক্ষেত্র। রবার, দেশলাই ও রেশম শিল্পের কেন্দ্র হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

(১৩) **চট্টগ্রাম**—পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত পাকিস্তানের দ্বিতীয় বন্দর। সমুদ্র হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ১৮ কিলোমিটার। এই বন্দর মারফত পূর্ব পাকিস্তানের চা ও পাট রপ্তানি ও অন্যান্য পণ্য আমদানি করা হয়।

(১৪) **চালনা**—পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত খুলনা জেলায় পুসুর নদীর তীরে সমুদ্র সন্নিহিত ব-দ্বীপ অঞ্চলে একটি নব গঠিত নোঙরঘাঁটি। ব-দ্বীপ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্য এবং চট্টগ্রামের বন্দরের অতিরিক্ত চাপ কমাইবার জন্য এই বন্দর নির্মাণ করা হইয়াছে। কাঁচা পাট ও পাটবস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হয়।

---

# তৃতীয় খণ্ড

## ভারত পরিচয়

**INDIA AT A GLANCE**

প্রকৃতির সীমারেখায় ঘেরা আমাদের এই ভারতভূমি। উত্তরে সুউচ্চ পর্বত-মালা, দক্ষিণে সমুদ্রের তরঙ্গমালা। এদেশের প্রাকৃতিক অখণ্ডতা ভৌগোলিকের দৃষ্টিতে যেমন সহজেই ধরা পড়ে তেমনি ইহার সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাও সর্বজন-স্বীকৃত। অথচ এই অখণ্ড মহাভারতের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে, প্রাকৃতিক অঞ্চল আছে, বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুও দেখা যায়। এ দেশে নানা জাতি ( race ) ও নানা ভাষা রহিয়াছে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে রহিয়াছে এক চিরন্তন মূলগত ঐক্য।

আজ ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। স্বতন্ত্র রাজ্য হইলেও নেপাল এবং ভুটানের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ আজও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় ভারতের সঙ্গে ভারতের যে প্রাচীন সংস্কৃতিগত আদান-প্রদান ছিল তাহা আজও অব্যাহত আছে। অতি প্রাচীন ভূ-প্রকৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, একদা ভারত ও সিংহল একই ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হিমালয় পর্বতমালারই দক্ষিণ-পূর্ব শাখাগুলি ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া সমুদ্রতল দিয়া ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতি সুস্পষ্ট। উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী সমগ্র ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশকে এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের দক্ষিণভাগ একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। ইহার পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

যুগে যুগে ভারতে বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হইয়াছে। আর্য, মঙ্গোল, শক, হুণ প্রভৃতি কত জাতি উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলি বাহিয়া সমৃদ্ধ ভারত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া এবং অবশেষে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ভারতীয় হইয়াছে। আজ আর কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই।

বহু জাতি ও বহু ধর্মের মিলনক্ষেত্র এই ভারতভূমি। দীর্ঘ দুই শতাধিক বৎসর ইংরাজের অধীন থাকার পর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়া আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ১৯৫০ সালে ভারত আপনাকে সাধারণতন্ত্র ( Republic ) বলিয়া ঘোষণা করে। অতঃপর ১৯৫৬ সালের নভেম্বর

মাসে ভারতের রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই রাজ্যটি দ্বিধাবিভক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যদ্বয় গঠন করা হয়। ইহার পরে পাঞ্জাব রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য গঠন করা হয়। আজ বিশ্বের দরবারে ভারতের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহাতে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রভাব এবং ভারতীয়দের গঠনধর্মী প্রতিভার প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ভিন্ন সফল হইতে পারে না। তাই আজ দিকে দিকে জাতিগঠনের কার্য চলিয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার ফলে অনেক অগ্রগতি হইয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়াই এই সকল পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের ভৌগোলিক অবস্থান ও তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবহারের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে এই অংশে আলোচনা করা হইয়াছে।

**ভারতের রাজ্যগুলির ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় :—**

**Q. 1. Give a short account of the geo-economic importance of any two of the following states of India.**

**[ ভারতের নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি হইতে যে কোন দুইটির ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ]**

বর্তমানে ভারতে মোট ১৭টি অঙ্গরাজ্য আছে ; যথা—জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান ( উত্তরাঞ্চল ), উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ ( মধ্যাঞ্চল ), বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও নাগাভূমি ( পূর্বাঞ্চল ), অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও কেরল ( দক্ষিণাঞ্চল ) এবং মহীশূর, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য ( পশ্চিমাঞ্চল ) এবং কয়েকটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলও রহিয়াছে। নিম্নে রাজ্যগুলির আয়তন, ১৯৬১ সালের লোকসংখ্যা ও ঘনবসতি দেওয়া হইল :

(১) **জম্মু ও কাশ্মীর**—এই রাজ্যটি ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ অধিক ৮৬ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। রাজ্যটি আয়তনে বিশাল হইলেও অত্যন্ত পর্বতময় এবং লোকবসতি বিরল। ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা সুন্দর রাজ্য। ভ্রমণবিলাসীদের নিকট হইতে এই রাজ্যে প্রচুর অর্থের সংস্থান হয়। পীরপাঞ্জল পর্বতের আড়ালে কাশ্মীর উপত্যকায় রাজধানী শ্রীনগর অবস্থিত। ইহা ঝিলাম নদীর তীরে। এ অঞ্চলে আপেল প্রভৃতি ফল জন্মে। জম্মু অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয়। কিছু ধানের চাষও আছে। রিয়াসিতে কিছু নিকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। কাশ্মীরে অন্যান্য খনিজও আছে তবে অধিকাংশই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ব্যবহারের অযোগ্য। পার্বত্য অরণ্যে প্রচুর পাইন, ফার প্রভৃতি

সরলবর্গীয় কাঠের সংস্থান রহিয়াছে। ভবিষ্যতে এই রাজ্যে জলশক্তি উৎপাদন ( বর্তমানে বারমূলায় একটি ছোট জলতড়িৎ কেন্দ্র আছে ), কুটীর শিল্প ( যথা—শাল ও কারু শিল্প গঠন ) এবং কাগজ, রেয়ন প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বানিহাল সুড়ঙ্গপথে বর্তমানে কাশ্মীর হইতে পশম, শাল ও নানা প্রকারের ফল ভারতের অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়। কাশ্মীর ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যে বুরজিল ও জোজিলা গিরিপথ মারফত বাণিজ্য চলে।

(২) **পাঞ্জাব**—এই রাজ্যটি উত্তর ভারতে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশই শতদ্রু নদী বিধৌত উর্বর সমভূমি। পাঞ্জাব কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাত প্রায় ৬৫ সেন্টিমিটার এবং শীতকালেও সামান্য বারিপাত হয়। কৃষিকার্য প্রধানতঃ জলসেচের উপর নির্ভর করে। শিরহিন্দ খাল এবং নাঙ্গাল খাল হইতে রাজ্যের প্রায় সমগ্র সমভূমি অঞ্চলে জলসেচ দেওয়া হয়। প্রধান ফসল গম, যব, ছোলা, কার্পাস ও ইক্ষু। শতদ্রু নদীতে অবস্থিত ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা হইতে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইতেছে। ফলে নাঙ্গালে একটি বড় সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে অমৃতসরে কাপড ও পশমের কারখানা আছে। পাঞ্জাবের বিশিষ্ট শিল্প হইল পশম শিল্প ও খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুত। পাঞ্জাবে প্রস্তুত পশম দ্রব্য, খেলার জিনিস, সাইকেল প্রভৃতি এবং তুলা ও গম ভারতের অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়। পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় সুন্দর ও আধুনিক শহর। অমৃতসর শিল্পকেন্দ্র ও শিখ তীর্থ। জলন্ধর সেনানিবাস।

(৩) **হরিয়ানা**—এই রাজ্যটি দিল্লী ও পাঞ্জাবের মধ্যে অবস্থিত। শতদ্রু ও যমুনা নদীদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুষ্ক সমভূমি লইয়া রাজ্যটি গঠিত। ইহার রাজধানীও চণ্ডিগড় ( পাঞ্জাবের সঙ্গে একত্রে )। রাজ্যটি কৃষিপ্রধান। প্রধান ফসল গম ও যব। তুলা এবং ইক্ষুও উৎপন্ন হয়। পশ্চিম ভাগ অনুর্বর। যমুনা নদীর নিকটে ভাল সেচব্যবস্থা আছে। বড় কলকারখানা খুব কম।

(৪) **রাজস্থান**—রাজস্থান ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ রাজ্য। ইহার আয়তন ১ লক্ষ ৩২ হাজার বর্গমাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ২ কোটি। লোকবসতি কম ( প্রতি বর্গমাইলে ১৫১ জন ) হইবার কারণ রাজস্থানে বৃষ্টিপাত খুব কম—পশ্চিম ভাগে ৩০ সেঃ মিঃ এরও কম। বস্তুতঃ রাজ্যটির দক্ষিণ-পূর্বভাগ ছাড়া অবশিষ্টাংশ মরুভূমি বা মরুপ্রায় অঞ্চল। এখানকার মাটি বালুকাময়। কেবল মধ্যভাগে কঠিন শিলায় গঠিত বিশাল আরাবল্লী পর্বতমালা স্থানে স্থানে অরণ্যময়। নদী নাই বলিলেই চলে, তবে কয়েকটি লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে। ইহাদের মধ্যে সম্বর হ্রদ প্রধান। এই হ্রদ ভারতীয় লবণের অন্যতম প্রধান সংস্থান। রাজস্থানের বিকানির রাজ্যে প্রচুর জিপসাম খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা সার ও সিমেণ্ট শিল্পে

লাগে। তাহা ছাড়া রাজস্থানে প্রচুর অভ্র এবং অল্প পরিমাণ তাম্র, সীসা, দস্তা এবং নিকৃষ্ট কয়লাও আছে। রাজস্থানের উত্তরভাগে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে কিছু পরিমাণ কার্পাস তুলা এবং জোয়ার-বাজরাও উৎপন্ন হয়। বাজরা এই রাজ্যের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। রাজস্থানের সর্বত্রই মেষ পালন করা হয়। রাজস্থানে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। এই রাজ্যের প্রধান শহর জয়পুর ও যোধপুর। জয়পুর ইহার রাজধানী।

(৫) **উত্তরপ্রদেশ**—আয়তনে (১ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গমাইল) ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহৎ হইলেও উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা (৭ কোটি ৩০ লক্ষ) ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি বর্গমাইলে এখানে ৬৫০ জন লোকের বাস। উত্তর প্রদেশের উত্তর ভাগে কুমায়ুন অঞ্চলে হিমালয় পর্বত ও উহার শাখা-প্রশাখা অবস্থিত। এখানে প্রচুর অরণ্য-সম্পদ রহিয়াছে। দেরাদুন ও নৈনিতাল এখানকার পার্বত্যনগর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। এই অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ স্থান গঙ্গা ও যমুনা নদীর সমভূমি। হিমালয় নিঃসৃত আরও বহু নদী (গঙ্গার উপনদী) উত্তর প্রদেশের বিশাল উর্বর সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, রাপ্তি ও সারদা প্রধান। এই নদীগুলি হইতে সেচখালের এবং কূপ ও বিদ্যুৎশক্তি চালিত নলকূপের সাহায্যে জমিতে প্রচুর জলসেচ দেওয়া হয়। রাজ্যটির পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত মাত্র ৭৫ সেঃ মিঃ। এই অঞ্চলে প্রচুর গম, কার্পাস, যব ও ছোলা জন্মে। উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর ধান, গম, পাট, সরিষা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইক্ষু উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যে ৮০টির অধিক চিনির কল আছে। তাহা ছাড়া কানপুরে বহু কাপড়ের কল, চামড়া, পাট, পশম প্রভৃতির কারখানাও আছে। কানপুর উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শহর। উত্তর প্রদেশের রাজধানী সুরম্য 'লক্ষ্ণৌ' নগরী সংস্কৃতির কেন্দ্র। গঙ্গাতীরে বারাণসী পবিত্র তীর্থ ও কুটীর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদ একটি সুন্দর শহর। তাহা ছাড়া আলিগড়, মোরাদাবাদ, মীরাট প্রভৃতি আরও অনেক বড় শহর আছে। উত্তর প্রদেশের সমভূমি অঞ্চলে রেলপথ ঘনজাল বিস্তার করিয়াছে।

উত্তর প্রদেশের দক্ষিণভাগ অনুর্বর মালভূমি। এই অঞ্চলটিতে খনিজ সম্পদ কিছু পরিমাণে আছে। বিপুল পরিমাণে জলতড়িৎশক্তিও উৎপন্ন হইতে পারে। রাজ্যটির উত্তর ভাগে হিমালয় এবং তরাই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া কাগজ

শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। বর্তমানে এই রাজ্যে কার্পাস, পাট, কাঁচ, সিমেণ্ট, চিনি, কাগজ ও বোর্ড শিল্প রহিয়াছে।

(৬) **মধ্যপ্রদেশ**—মধ্যপ্রদেশ আয়তনে ( ১ লক্ষ ৭১ হাজার বর্গমাইল ) বিশাল, কিন্তু পাহাড় ও অরণ্যে ঢাকা বলিয়া এখানে লোকসংখ্যা ( ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ) কম ( প্রতি বর্গমাইলে ১৮৯ জন )। মধ্যপ্রদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ু খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে বিন্ধ্য, মহাকাল, মহাদেও প্রভৃতি উন্নত গিরিশ্রেণী আছে; আবার ছত্রিশগড় প্রভৃতি উর্বর সমভূমিও আছে। এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বভাগে বৃষ্টিপাত ১২৫ সেঃ মিটারেরও অধিক কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা অত্যধিক। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ উত্তাপ ৪৫° সেঃ গ্রেঃও উঠে, আবার শীতকালে খুব শীত পড়ে। এই সকল কারণে মধ্যপ্রদেশে লোকবসতি খুব বেশি হয় নাই। এখনও এই অঞ্চলের বিস্তৃত অংশ গভীর অরণ্যে ঢাকা। এই অরণ্যে মূল্যবান সেগুণ কাঠ পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান জন্মে। তাহা ছাড়া গম, জোয়ার, বাজরা এবং প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ খনিজ সম্পদে অতিশয় সমৃদ্ধ। এখানে ভূ-গর্ভে ও পর্বতগাত্রে প্রচুর উৎকৃষ্ট জাতীয় লৌহশিলা আছে। ইহা মধ্যপ্রদেশের **ভিলাই** ইস্পাত কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। দুরুগ অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আছে। তাহা ছাড়া, **করবা** ও **উমারিয়া** কয়লাখনি খুব বড়। প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। **পান্নার** হীরকখনি বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশের বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত খনিজ সম্পদের সম্যক ব্যবহার সম্ভব হইলে রাজ্যটি শিল্প প্রধান হইয়া উঠিতে পারে। বর্তমানে এখানে কয়েকটি কাপড়, কাগজ, সিমেণ্ট ও ইস্পাত কারখানা আছে। এখানকার প্রধান শহর—জব্বলপুর, ইন্দোর, ভূপাল। ইহার রাজধানী ভূপাল।

(৭) **বিহার**—বর্তমানে বিহারের আয়তন ৬৭ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ৬৯১ জন বাস করে। বিহারের উত্তরভাগে গঙ্গানদীর উর্বর সমভূমি। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১২৫ সেঃ মিঃ। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান, ইক্ষু, পাট এবং কিছু পরিমাণ গম ও ভুট্টা উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। এখানে গঙ্গাতটে বিহারের রাজধানী পাটনা শহর অবস্থিত। উত্তর বিহারের কুশীনদীতে ভয়াবহ প্লাবন হয়। বিহারের দক্ষিণভাগে ছোটনাগপুরের অনুর্বর মালভূমি অবস্থিত। ইহা পর্বতময়, রুক্ষ এবং স্থানে স্থানে অরণ্যাবৃত। এখানকার প্রধান শহর রাঁচি। এই মালভূমি হইতে দামোদর নদ ও উহার উপনদীগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। দামোদরের উপত্যকায় ঝরিয়া অঞ্চলে ভারতের এক বৃহৎ কয়লাখনি অবস্থিত। ধানবাদ ও সিন্দ্রি এখানকার শিল্পপ্রধান শহর। মালভূমির উত্তরভাগে গয়া ও হাজারিবাগ জেলায় প্রচুর অভ্র উৎপন্ন হয়। কোডারমা

অভ্র শিল্পের কেন্দ্র। বোকারো এবং করণপুরায় কয়লাখনি আছে। বিহারের দক্ষিণভাগে সিংভুম অঞ্চলে লৌহশিলার বিপুল ভাণ্ডার রহিয়াছে। ঐ লৌহশিলা জামসেদপুরের কারখানায় ব্যবহার করা হয়। ঘাটশিলার নিকট তাম্রখনি ও তাম্রের কারখানা আছে। বিহারের প্রধান প্রধান নগর—পাটনা, ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, গয়া, ডালমিয়ানগর (বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র—সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি প্রভৃতি), ধানবাদ, জামসেদপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি (ভারী যন্ত্র) ও সিন্ধ্রি (সারের কারখানা)। বিহারের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, ইক্ষু, অল্প চা (রাঁচি), গম, লাক্ষা (রাঁচি), অভ্র, কয়লা, লৌহ ও তাম্র।

(৮) **পশ্চিমবঙ্গ**—আয়তন প্রায় ৩৪ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং প্রতি বর্গমাইলে ১০৩১ জন বাস করে। এই রাজ্য কৃষি প্রধান। ফসল—ধান, পাট, ডাল, তামাক প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গে চায়ের আবাদ আছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে রেশম উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শিল্প প্রধান অঞ্চল হুগলী নদীর অববাহিকা। রানীগঞ্জের কয়লার খনি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আসানসোলের কাছেও অনেক কল-কারখানা আছে। ইহার রাজধানী কলিকাতা একটি বিখ্যাত বন্দর।

(৯) **আসাম**—আসামের আয়তন ৮৪ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষ (প্রতি বর্গমাইলে ২৫২ জন)। রাজ্যটির আয়তন বৃহৎ হইলেও ইহার অধিকাংশ স্থানই পর্বতময়, অতি-বৃষ্টিপাতযুক্ত এবং অরণ্যময়। আসামে দুইটি সংকীর্ণ উর্বর অঞ্চল আছে—একটি উত্তর আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং অপরটি কাছাড় অঞ্চল। এই দুই উর্বর স্থানে প্রচুর ধান ও পাট উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থানে বৃষ্টিপাত ২০০ সেঃ মিঃ এর বেশি। পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। চা উৎপাদনে আসাম ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। লখিমপুর, শিবসাগর, দড়ং ও কাছাড় অঞ্চলে চা বাগানগুলি অবস্থিত। গারো পাহাড় অঞ্চলে তুলা ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। বিমানপথে আসামের লেবু কলিকাতায় চালান যায়। আসামের অরণ্য সম্পদ প্রচুর, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় মাত্র কয়েকটি স্থানে কাঠের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারখানায় চায়ের বাক্স ও রেলের স্লিপার প্রস্তুত হয়। আসামে ভবিষ্যতে কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে আসামের বন্য রেশম খুব উল্লেখযোগ্য। এণ্ডি ও মুগা শিল্প হইতে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে। আসামে প্রচুর খনিজ সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। বর্তমানে ডিগবয় ও নাহোরকাটিয়ায় প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় এবং উহা নূনমাটি (গৌহাটি) ও ডিগবয়ের তৈল শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়। মিকির ও গারো পাহাড়ে প্রচুর কয়লাও রহিয়াছে, তবে বর্তমানে উৎপাদন কম। আসামে প্রচুর চুনাপাথরও পাওয়া যায়। উহার উপর নির্ভর

করিয়া বর্তমানে এখানে সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। আসামের রাজধানী শিলং সুরম্য পার্বত্য শহর। ব্রহ্মপুত্র তটে গৌহাটি, ধুবড়ি ও ডিব্রুগড় বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র। আসামের পার্বত্য জেলাগুলির আলাদা শাসন ব্যবস্থা।

(১০) **উড়িষ্যা**—ইহার আয়তন ৬০ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ (প্রতি বর্গমাইলে ২৯২ জন)। উড়িষ্যা রাজ্যের তটভাগে মহানদীর সুবিশাল ব-দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর স্থান। ঐ অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় (প্রয়োজনের অতিরিক্ত)। তাহা ছাড়া ইক্ষু, পাট প্রভৃতির চাষও হয়। এই অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। তটভাগে পুরীর নিকট হইতে চিল্কা উপহ্রদ পর্যন্ত অঞ্চল সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। উড়িষ্যার পশ্চিম ও উত্তরভাগ পর্বতময় এবং গভীর অরণ্যে ঢাকা। এই অঞ্চলে আদিম অর্ধসভ্য উপজাতিগুলি বাস করে। পার্বত্য অঞ্চল খনিজ সম্পদে খুব সমৃদ্ধ। তালচর ও রামপুরে বড় বড় কয়লা খনি আছে এবং কেওনঝর ও বোনাই অঞ্চলের লৌহখনিগুলি হইতে উৎকৃষ্ট লৌহশিলা পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ম্যাঙ্গানীজ, চীনামাটি, কাঁচ প্রস্তুতের উপকরণ প্রভৃতিও পাওয়া যায়। উড়িষ্যার তাঁতশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিখ্যাত। কটকের নিকট কাপড়ের কল আছে। উত্তর উড়িষ্যার **রাউরকেলায়** বিরাট ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজ্যের অন্তর্গত মহানদীর উপর **হীরাকুঁদ বাঁধ** নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ বাঁধ হইতে প্রচুর জলসেচ ও তড়িৎশক্তি পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর স্বাস্থ্যকর তীর্থস্থান। কটক বৃহত্তম শহর। পুরী সমুদ্রতটে অবস্থিত একটি ভ্রমণকেন্দ্র ও তীর্থস্থান। বারিপদা ও বালেশ্বর বাণিজ্যকেন্দ্র।

(১১) **অন্ধ্র**—ভূতপূর্ব মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তর ভাগের নাম অন্ধ্র রাজ্য। ইহার সঙ্গে তেলেঙ্গানা যুক্ত হইয়াছে (আবার বিভক্ত হওয়ার কথাও চলিতেছে)। অন্ধ্রের বর্তমান আয়তন ১ লক্ষ ৬ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ বর্গমাইলে ৩৩৯ জন লোকের বাস। অন্ধ্র রাজ্যের তটভাগ দীর্ঘ। এই অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসা ও লবণশিল্প উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপতনম্ একটি বৃহৎ বন্দর। ইহার পোতাশ্রয় সুন্দর এবং এখানে জাহাজ নির্মাণ ও তৈল শোধনের কারখানা আছে। তটভাগে মসুলিপতনম্ ও কাকিনদা উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং গোপালপুর স্বাস্থ্যকর স্থান। তটভাগের জমি লবণাক্ত হইলেও মোটামুটি উর্বর। এখানে ১০০ সেঃ মিঃ বারিপাত হয়। ধান এখানকার প্রধান ফসল, তবে জোয়ার, বাজরা ও চীনাবাদামের চাষ আছে। পুকুর হইতে জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। বর্তমানে **কৃষ্ণা** ও **তুঙ্গভদ্রার সেচ** পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীদ্বয় অন্ধ্র রাজ্যের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদীদ্বয়ের ব-দ্বীপ দুইটি অসাধারণ উর্বর। এখানে সেচের খাল থাকায় প্রচুর ধান ও তামাক এবং কিছু কার্পাস

উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে পূর্বঘাটের পার্বত্য অঞ্চলে ও রয়ালসীমা এবং তেলেঙ্গানায় জমি রুক্ষ ও প্রস্তরময়। বৃষ্টিপাতের নিশ্চয়তা না থাকায় ঐ অঞ্চলে লোকবসতি কম। খনিজের মধ্যে নেলোরের অভ্রখনিগুলি প্রসিদ্ধ। পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর লৌহশিলা ও চুনাপাথর রহিয়াছে। বিশাখাপতনমের ম্যাঙ্গানীজ খনিগুলি প্রসিদ্ধ। অন্ধ্র রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদ একটি বৃহৎ শিল্প-নগর। বিজয়ওয়াদা শিল্পপ্রধান স্থান। কার্নুল ভূতপূর্ব রাজধানী।

(১২) **মহীশূর**—বর্তমান মহীশূর রাজ্য ভূতপূর্ব মহীশূর রাজ্য এবং ভূতপূর্ব বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদের অংশবিশেষ লইয়া গঠিত। এই রাজ্যটির বর্তমান আয়তন ৭৪ হাজার বর্গমাইল (প্রতি বর্গমাইলে ৩১৮ জন) এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৩৫ লক্ষ। মহীশূর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশবিশেষ অবস্থিত। আরবসাগর তটে সংকীর্ণ সমভূমি আছে। এখানে বৃষ্টিপাত ২৫০ সেঃ মিঃ এবং ধান সর্বপ্রধান ফসল। এই অঞ্চলে মাঙ্গালোর, ভাটকল ও কারোয়ার বন্দর অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বদিকে উচ্চ মহীশূর মালভূমির জলবায়ু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর। এখানে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, চুনাপাথর, স্বর্ণ, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কোলারের স্বর্ণখনি সুবিখ্যাত। মহীশূরে নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগ জলপ্রপাত, শিবসমুদ্র প্রভৃতি জলতড়িৎ কেন্দ্রে উৎপন্ন শক্তির সাহায্যে ভদ্রাবতীর বিরাট কাগজের কল ও ইস্পাত কারখানা, কোলারের স্বর্ণখনি ও বিরাট শিল্পকেন্দ্র বাঙ্গালোরের বহু কাপড় ও রেশম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, বিমান ও রাসায়নিক শিল্পাদি পরিচালিত হয়। রেশমশিল্প মহীশূরের প্রধান কুটীরশিল্প। চন্দন তৈল, ধূপ ও সাবান শিল্পও উল্লেখযোগ্য। মহীশূরে জলসেচের সাহায্যে প্রচুর বাজরা, রাগি, জোয়ার, ইক্ষু ও কার্পাস উৎপন্ন হয়। মহীশূরের উর্বর লাল মাটি কফি ও চা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিছু কোকো ও রবার গাছও চাষ করা হয়। মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোর সর্বপ্রধান নগর। মহীশূর, ধারোয়ার ও রাইচুর অন্যান্য শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

(১৩) **তামিল নাড়ু**—বর্তমান তামিল নাড়ু রাজ্য ভূতপূর্ব মাদ্রাজ রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এই রাজ্যটির আয়তন ৫০ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ (প্রতি বর্গমাইলে ৬৭১ জন)। ইহার তটভাগের সমভূমি ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ খুব উর্বর। এই অঞ্চলে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি হয় এবং শীতকালের গোড়ার দিকেই বেশি বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত যথেষ্ট নহে বলিয়া এখানে খাল ও পুকুর হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধান প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হয়, তবে ব-দ্বীপ অঞ্চলে ইহার চাষ বেশি। কার্পাস ও ইক্ষু চাষও প্রায় সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে হয়। তাহা ছাড়া পশ্চিম

ভাগের পার্বত্য অঞ্চলে কফি ও চা উৎপন্ন হয়। নীলগিরি চা ও কফি চাষের কেন্দ্র। তামিলনাড়ুতে প্রচুর চীনা বাদাম এবং জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। অনুর্বর মাটিতেই এই ফসলগুলির চাষ হয়। কৃষি-ব্যবস্থা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় মাদ্রাজ শহর খুব ঘনবসতি অঞ্চল, কিন্তু এখানে খাদ্যে ঘাটতি পড়ে। এখানকার তটভাগে মৎস্য শিকার ও লবণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়। কুটীর শিল্পের মধ্যে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন, কাজুবাদামের তৈল উৎপাদন এবং ক্যাসাভা "সাগু" প্রস্তুত উল্লেখযোগ্য। বড় শিল্পের মধ্যে মাদ্রাজ, মাদুরাই ও কোইম্বাটুরের বড় বড় কাপড়ের কলগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিচেরীতেও কাপড়ের কল আছে। ত্রিচিনাপল্লীর (তিরুচিরাপল্লী) তামাক শিল্প বিখ্যাত। মাদ্রাজের প্রধান খনিজ সম্পদ সালেম অঞ্চলের লৌহশিলা ও আর্কট জেলার লিগনাইট কয়লা। আর্কটের লিগনাইট হইতে বৈদ্যুতিকশক্তি উৎপাদন এবং রাসায়নিক সার উৎপন্ন করা হয়। মাদ্রাজ একটি বৃহৎ শহর ও ভারতের তৃতীয় বন্দর। পণ্ডিচেরি ও তুঁতিকেরিণ (মুক্তা তোলা এখানকার অন্যতম শিল্প) অন্যান্য বন্দর।

(১৪) **কেরল রাজ্য**—এই রাজ্যটি ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কিন্তু ইহার লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন—বর্গমাইলে ১১২৫ জন। ইহার আয়তন মাত্র ১৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ। কেরল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের তটে অবস্থিত। এই রাজ্যের তটভাগে সংকীর্ণ সমভূমি আছে। অদূরেই সুউচ্চ আন্নামালাই পর্বতমালাই পবতশ্রেণী গভীর অরণ্যে ঢাকা। এখানে বৎসরে ২৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়। কেরলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তটভাগে নারিকেল প্রধান ফসল। তাহা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা, কফি, রবার ও গোলমরিচ উৎপন্ন হয়। নারিকেলের দড়ি এখানকার কুটীরশিল্পের প্রধান উপকরণ। কেরলের তটভাগে সমান্তরাল যে স্বাভাবিক খালগুলি (Backwater) আছে সেগুলি নৌবাহনযোগ্য। কেরলের প্রধান খনিজ সম্পদ তটভাগের পারমাণবিক ধাতু সংবলিত মোনাজাইট বালুকা। উহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। লৌহও আছে। কেরলের প্রধান বন্দর কোচিন। এখান হইতে প্রধানতঃ চা, মাছ, কাজু ও গোলমরিচ রপ্তানি হয়। ইহার রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম।

(১৫) **মহারাষ্ট্র**—এই রাজ্যটি ভারতের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১ লক্ষ ১৮ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ (বর্গমাইলে ৩৩২ জন)। মহারাষ্ট্র দেশটি পর্বতময়। ইহার পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগর ও তটসন্নিহিত সংকীর্ণ উর্বর সমভূমি। এই সমভূমিতে ধান উৎপন্ন হয়। তটভাগে প্রচুর লবণ প্রস্তুত করা হয়। সমুদ্রে মাছধরা এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম

প্রধান পেশা। তটভাগে সুপ্রসিদ্ধ বন্দর বোম্বাই অবস্থিত। ইহা মহারাষ্ট্রের রাজধানী। রত্নগিরি বন্দরও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই সুবৃহৎ শিল্প-কেন্দ্র। এখানকার বস্ত্রশিল্প বিখ্যাত। মহারাষ্ট্র রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় গঠিত। এই অঞ্চলে প্রচুর তুলার চাষ হয়। জোয়ার ও বাজরা এখানকার প্রধান খাদ্য ফসল। গমের চাষ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যান্য ফসল ইক্ষু, কমলালেবু প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ কম নয়। চান্দায় কয়লাখনি আছে, ভাণ্ডারা ও রত্নগিরিতে প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ ও লৌহ পাওয়া যায়। পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে প্রচুর জল-বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র রাজ্যে বহু রেলপথ ও ভাল রাস্তা আছে। এই রাজ্যে নাগপুর, পুণা, শোলাপুর প্রভৃতি বড় বড় শিল্প-প্রধান শহর অবস্থিত। রাজ্যটি বেশ উন্নতিশীল।

(১৬) **গুজরাট**—এই রাজ্যটির আয়তন ৭২ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ২৮৬ জন বাস করে। গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমভাগে বৃহৎ কাথিয়াওয়ার উপদ্বীপ। উহার উত্তরভাগে কচ্ছ উপসাগর ও 'র‍্যাণ অব কাচ' নামক বিশাল লবণ-জলাভূমি ও দক্ষিণে ক্যাম্বে উপসাগর—নর্মদা, তাপ্তি ও সবরমতী নদীত্রয় এই অগভীর উপসাগরে মিশিয়াছে। উপকূল-ভাগে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হয় এবং মাছ ধরা হয়। এখানকার লবণের উপর নির্ভর করিয়া ওখা বন্দরে বিরাট সোডার কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। গুজরাটে বহু বন্দর আছে। উহাদের মধ্যে কান্দলা সর্বোৎকৃষ্ট। এই রাজ্যের উপকূলভাগের মাটি বেশ উর্বর কিন্তু এখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত। এই অঞ্চলে খুব ভাল তুলা জন্মে। গম ও বাজরা প্রায় সর্বত্র জন্মে, তবে উৎপাদন অধিক নয়। গুজরাটিরা ব্যবসা বাণিজ্যে খুব পটু। আমেদাবাদ এখানকার সর্বপ্রধান শহর এবং বিশাল বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। খনিজ তৈল ও রাসায়নিক শিল্পে বরোদা বিশেষভাবে উন্নত। সুরাট বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। গুজরাটের নূতন রাজধানী আমেদাবাদের নিকট সবরমতী নদীর তটে নির্মাণ করা হইবে। বর্তমানে আমেদাবাদই রাজধানী। অন্যান্য প্রধান শহর রাজকোট, বরোদা, ব্রোচ, ভাবনগর, ভারভাল ও ভুজ প্রভৃতি।

(১৭) **নাগাল্যাণ্ড**—এই রাজ্যটি ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশ। লোকসংখ্যা মাত্র ৩½ লক্ষ। এখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশি। অধিবাসীরা আঙ্গামী, সেমা, আও প্রভৃতি নাগাজাতীয় উপজাতি। বেশিরভাগ লোকই খৃষ্টান। নাগাভূমিতে পাহাড়ের গায়ে কিছু ধান চাষ হয়। এই রাজ্যের রাজধানী কোহিমা।

**কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্য**—ভারতে কয়েকটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল আছে; যথা:—(১) দিল্লী (২৬ লক্ষ), (২) হিমাচল প্রদেশ (১৩ লক্ষ), (৩)

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ( ৬৩ হাজার ), (৪) মণিপুর ( ৭ লক্ষ ), (৫) ত্রিপুরা ( ১১ লক্ষ ) এবং (৬) লাক্ষাদ্বীপ আমিনদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপ। আসামের উঃ পূর্বভাগে অবস্থিত পর্বতময় North-East Frontier Agency ( N. E. F. A. ) অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম গভর্নর উভয়েরই কর্তৃত্ব আছে।

তাহা ছাড়া, আসামের গাড়ো, খাসি, জয়ন্তীয়া ও মিজো পাহাড় অঞ্চলগুলিকে খানিকটা স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

---

# ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চল সমূহ, জলবায়ু ও মৃত্তিকা

## PHYSICAL REGIONS, CLIMATE AND SOIL OF INDIA

**প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ :—**

**Q. 2. To what extent do the physical features and climate influence economic activities in the different parts of India ? Give suitable examples. ( C. U. B. Com. 1967 )**

**[ ভারতের বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপরে ভারতের ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ুর প্রভাব কতটা ? উপযুক্ত উদাহরণ দাও । ]**

( পরবর্তী Q. 3. এর কতকাংশ এবং Q 9. 2nd para ও Q. 10 last para দ্রষ্টব্য )

**✓ Q 3. Describe the physical regions of India and mention their influence on the economic activities of the people.**

**[ ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির বর্ণনা দাও এবং আর্থিক কার্যকলাপের উপর উহাদের প্রভাব বর্ণনা কর । ]**

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে চাহিলে মোটামুটি চারিটি প্রাকৃতিক অঞ্চল দেখা যায় ; যথা :—(১) উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল এবং (৪) উপকূলের সমভূমি।

১। **উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল**—হিমালয় পর্বতমালা তাহার শাখাপ্রশাখা সহ ভারতের সমগ্র উত্তরভাগ জুড়িয়া বিরাজমান। ইহা ভারত পাকিস্তান অঞ্চলকে এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পর্বতমালাকে আবার প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) পূর্বাঞ্চল, (খ) মধ্যাঞ্চল ও (গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ( ইহা বর্তমানে প্রধানতঃ পাকিস্তানের অন্তর্গত )।

(ক) পূর্বাঞ্চল—ভারতের পূর্বাঞ্চলবর্তী বিহার, বাংলা এবং আসামের উত্তরে নেফায় অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার অংশ পূর্বাঞ্চলের অন্তর্গত। এই পার্বত্য অঞ্চলের সর্বোচ্চ অংশ ২৫০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। বহু শৃঙ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার জলবায়ু খুব আর্দ্র। এই অঞ্চল বনজ সম্পদে খুব সমৃদ্ধ এবং এই অরণ্যের শাল, সেগুন, বাঁশ এবং পাইন নামক কাষ্ঠ উল্লেখযোগ্য। আসাম ও বাংলার পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ধাপের উপর অনেক স্থানেই ধান এবং আলু উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া কালিম্পং হইতে তিব্বতের লাসা যাইবার বাণিজ্যপথ জালেপ্লা ও নাথুলা গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। *এই পথে তিব্বতের সহিত পূর্বে বাণিজ্য চলিত।*

(খ) মধ্যাঞ্চল—এই অঞ্চলের ( কুমায়ুন ) কোন কোন অংশ উচ্চতায় পূর্বাঞ্চলের

উচ্চতা অপেক্ষাও (২৫০০০ ফুটের) বেশি হইবে। সর্বোচ্চ শিখরগুলি নেপালে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু শীতল ও স্যাঁতসেঁতে। এই অঞ্চলে প্রচুর সরলবর্গীয়




এই মানচিত্র দেখিলে পর্বত মালভূমি ও উপত্যকার অবস্থান বুঝা যায়
ইহাকে Visual Relief Map বলে।

বৃক্ষ দেখা যায়। উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলের নানাজাতীয় পাইন বনের গাছ হইতে কাষ্ঠ, তারপিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। শিল্পবাণিজ্যের ভিতর মেষ ও ছাগ

পালনই প্রধান। এই পর্বতমালা অত্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য। তবু ভারত হইতে তিব্বতে যাইবার দুই একটি গিরিপথ আছে। এই পথে বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস বাণিজ্য চলিত। রাজনৈতিক কারণে উহা এখন বন্ধ আছে।

(গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল—পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের অন্তর্গত হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমাংশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া কতকগুলি গিরিপথের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল। কাশ্মীর হইতে প্রচুর নরম কাঠ ও উৎকৃষ্ট মেষলোম পাওয়া যায়। হিমাচলের পাহাড়ে চা বাগান আছে। কাশ্মীরের মধ্য দিয়া সিকিয়াং ও তিব্বত যাইবার দুইটি গিরিপথ আছে; যথা—**বুরজিল ও জোজিলা**। পাহাড়ের গায়ে ধাপের উপর গম, আলু প্রভৃতি চাষ হয়। প্রচুর আপেল, ন্যাশপাতি ও আঙ্গুর ফলে।

ভারতের পূর্বসীমান্তের পর্বতগুলি অরণ্যময়। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হওয়ায় পর্বতগুলি ঘন অরণ্যে ঢাকা। পূর্ব সীমান্তে আরাকান, লুসাই, চীনহীল পর্বত ৮০০০ হইতে ৯০০০ হাজার ফিট উচ্চ। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া বিখ্যাত ষ্টিলওয়েল রোড প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর রাস্তা ব্রহ্মদেশের মান্দালয়, মিচিনা প্রভৃতি শহর পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। ঐগুলি এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সীমান্ত বাণিজ্য এখন নাই বলিলেই চলে।

হিমালয়ের পর্বতমালাকে কয়েকটি পর্বতশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—

(১) হিমালয়ের অত্যুচ্চ চূড়াগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের নাম **মুখ্য হিমালয়** (The Great Himalayas)। এভারেষ্ট (২৯,১৪১ ফুট), কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮২০০ ফুট), গৌরীশঙ্কর, মাকালু, ধবলগিরি, কামেট প্রভৃতি হিমালয়ের গগনভেদী শিখরগুলি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। (২) অপেক্ষাকৃত অল্প উচ্চ শৃঙ্গগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের নাম **গৌণ হিমালয়** (The Lesser Himalayas)। (৩) গৌণ হিমালয়ের দক্ষিণদিকে **বহির্হিমালয়াঞ্চল** (The Outer Himalayas)। এই অঞ্চলটি সমতল ভূমির সহিত মিশিয়াছে। শিবালিক পর্বতমালা, ডুন উপত্যকা ও প্রসিদ্ধ তরাইয়ের বনভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত।

২। **সিন্ধু গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল**—এই সমভূমি সিন্ধু ও গঙ্গা নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা গঠিত। ইহা পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। আরবসাগর ইহার দক্ষিণ পশ্চিম এবং বঙ্গোপসাগর ইহার দক্ষিণ পূর্ব সীমায় অবস্থিত। এই সমতল ভূমিরই প্রাচীন নাম আর্যাবর্ত। ভারতের বিশ্ববরেণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎপত্তি এই স্থানেই হইয়াছিল। শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি ভারতের বড় বড় নদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া

প্রবাহিত। এখানকার জমি খুব উর্বর (এখানে আধুনিক ও প্রাচীন যুগের পলিমাটি দেখা যায়—শেষোক্ত প্রকার মাটির উর্বরতা কম) কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে—বস্তুতঃ জীবনের প্রায় সকল দিকেই এই সমভূমি অঞ্চলের লোক ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। এই অঞ্চলকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) শতদ্রুর অববাহিকা, (২) উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা, (৩) মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা, (৪) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ ও (৫) আসাম উপত্যকা। সিন্ধু উপত্যকার অধিকাংশই বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অঞ্চলের জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য কৃষিজ ও বনজ সম্পদ বিভিন্নরূপ।

সমভূমি অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান ও আর্দ্র ভাবাপন্ন। এই সমভূমির উত্তরভাগে হিমালয় পর্বতমালা বিরাজমান। পর্বতমালার ঠিক দক্ষিণেই যে নিম্নভূমি উহা অধিক আর্দ্র ভাবাপন্ন। মৌসুমী বায়ুর প্রভাব যে সমস্ত অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম, সে সমস্ত স্থানে মরুভূমির তুল্য জলবায়ু বর্তমান। আসামের জলবায়ু অত্যন্ত আর্দ্র (বৃষ্টি ২০০ সেঃ মিঃ এর বেশি) এবং পাঞ্জাবের জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক (বৃষ্টিপাত ৬০ সেঃ মিঃ মাত্র)। বৃষ্টিপাত ও মাটি অনুসারে ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, ইক্ষু, পাট, শণ, তিসি, তিল, চীনাবাদাম প্রভৃতি নানাজাতীয় কৃষিজদ্রব্য এই সমভূমির বিভিন্নস্থানে চাষ হয়। এই সমভূমির পূর্বভাগে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগে বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিটারের বেশি হওয়ায় ঐ অঞ্চলে ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আসাম ও উত্তর বঙ্গে হিমালয় পর্বতমালায় এবং উহার দক্ষিণের সমভূমিতে যেখানে বারিপাত অত্যধিক সেখানে চা জন্মে (যথা—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে)। গাঙ্গেয় সমভূমির পশ্চিমভাগ শুষ্ক। এই অঞ্চলে চাষ-আবাদের জন্য জলসেচ একান্ত প্রয়োজন। উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগে গম ও যব প্রধান ফসল। তৈলবীজ, তুলা এবং ছোলাও জন্মে। বৃক্ষলতাদিও বৃষ্টিপাত অনুসারে পরিবর্তনশীল। যদিও সমভূমিতে অরণ্য নাই বলিলেই হয় তবু যেটুকু আছে তাহাও পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে। আসামের সমভূমি অঞ্চলে চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়; উত্তরবঙ্গেও তাই। অপর পক্ষে, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগে শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়। বিহারের শালবন অধিক।

এই সমভূমিতে নানাপ্রকার বনজ, বাগিচাজাত দ্রব্য এবং অল্প পরিমাণ খনিজ সম্পদও পাওয়া যায়। বাঁশ, শাল, সেগুণ প্রভৃতি নানাজাতীয় বনজ দ্রব্য; আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু প্রভৃতি ফল; কিছু পরিমাণ কয়লা, অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। মেষ, ছাগল, গরু, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী এখানে দৃষ্ট

হয়। কাঁচামালের ও যাতায়াতের সুবিধা থাকায় ভারতে যত কলকারখানা আছে তাহার বেশির ভাগই এই অঞ্চলে অবস্থিত। কানপুর, কলিকাতা, আগ্রা, আলিগড় প্রভৃতি শিল্পপ্রধান নগর এই অঞ্চলে অবস্থিত। রেশম, পশম, কাচ, চিনি, চর্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার কুটীর-শিল্পও এখানকার গৌরবময় ঐতিহ্যের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান। সমভূমির যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত শ্রেণীর। সর্বত্রই ঘন রেলপথ-জাল রহিয়াছে।

৩। **দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল**—দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপের উপকূলভাগে সমভূমি এবং অভ্যন্তরভাগে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া এক প্রাচীন যুগের শিলায় গঠিত মালভূমি রহিয়াছে। বহু ক্ষয়জাত পর্বত ও নদী উপত্যকা লইয়া এই মালভূমি গঠিত। পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট, সাতপুরা, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্বত, বহু অনুর্বর উচ্চভূমি এবং উর্বর নদী উপত্যকা এই মালভূমির অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতের শিলাগুলির তুলনায় দক্ষিণ ভারতের শিলাগুলি সুপ্রাচীন। এই মালভূমির গড় উচ্চতা প্রায় ২০০০ ফুট। আরাবল্লী ইহার উত্তর সীমায়, (বিন্ধ্য পর্বত ইহার উত্তরসীমা বলিয়া যে ধারণা প্রচলিত আছে তাহা ভূতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমর্থনযোগ্য নয়), পূর্বসীমায় পূর্বঘাট ও পশ্চিম সীমায় পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অবস্থিত।

মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, তাপ্তি প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান নদী। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদীই পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। মালভূমির মাটি সাধারণতঃ অনুর্বর। কেবল পশ্চিমভাগে বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে কালো মাটি দেখা যায়। কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষতঃ কার্পাস চাষের পক্ষে ঘোর **কৃষ্ণবর্ণ মাটি** খুব উপযুক্ত। মালভূমির কৃষ্ণ মৃত্তিকায় জোয়ার ও বাজরা ভাল জন্মে। দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্টাংশের মাটি লাল। কোন কোন নদী উপত্যকার মাটি ঘোর লাল। উহা বেশ উর্বর ও ধান চাষের উপযুক্ত। অন্যত্র মাটি ঘোলাটে বর্ণ ও অনুর্বর। অনেক স্থানই তৃণ ও কাঁটা গাছে ঢাকা। কোথাও কোথাও জোয়ার, বাজরা, রাগি, চীনাবাদাম ও আলুর চাষ ভাল হয়। পুকুর ও কৃত্রিম হ্রদ হইতে জলসেচ দেওয়া হয়। নীলগিরি অঞ্চলে **চা, কফি** এবং মহীশূর ও কেরলে **কোকো ও রবার** চাষ হয়। পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণভাগে **গোলমরিচ** ও অন্যান্য মশলা উৎপন্ন হয়। সেগুণ, চন্দন, আবলুস্ প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ এ অঞ্চলের বনজ সম্পদ। ভারতের খনিজ সম্পদের বেশীর ভাগই দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে সীমাবদ্ধ। উত্তর-পূর্বদিকের নদী উপত্যকাগুলিতে প্রচুর **কয়লা** পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে **ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ,** অভ্র, **স্বর্ণ,** গ্রাফাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিন্ধ্য অঞ্চলে হীরকও মিলে। মহীশূরে কোলারের স্বর্ণখনি অবস্থিত। বাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদে বহু শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

৪। **উপকূলের সমভূমি**—ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমভূমি আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর ভাগ মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহার নাম **কোঙ্কন উপকূল** এবং দক্ষিণ ভাগ মহীশূর ও কেরল রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার নাম **মালাবার উপকূল**। মালাবার উপকূলের সমভূমি সংকীর্ণ হইলেও উর্বর এবং এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। স্থানে স্থানে উপহ্রদ এবং ব্যাকওয়াটার (কোচিনে) আছে। কোঙ্কন উপকূল ভারতের লবণ শিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। মালাবার উপকূলেও লবণ প্রস্তুত হয়। প্রায় সর্বত্রই লবণাক্ত মাটি দেখা যায়। উপকূলের সমভূমিতে সর্বত্রই প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির ফলে মাটির লবণাক্ততা হ্রাস পাইয়াছে। এই অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল। নারিকেল প্রচুর ফলে। মৎস্য শিকার তটভাগের উল্লেখযোগ্য বৃত্তি। এখানে বিখ্যাত কোচিন ও মার্মাগাও বন্দর অবস্থিত।

**পূর্ব উপকূলের** দক্ষিণভাগ বা করোমণ্ডল উপকূল (কাবেরীর বিশাল উর্বর ব-দ্বীপ সমেত) বেশ প্রশস্ত ও কৃষি সমৃদ্ধ। ধান প্রধান ফসল। উত্তরভাগের নাম সার্কাস উপকূল। উহার অল্প অভ্যন্তর ভাগে খণ্ড খণ্ড পূর্বঘাট পর্বতমালা। গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর স্থান। এখানে ধান ও তামাক প্রচুর জন্মে। আরও উত্তরে মহানদীর ব-দ্বীপও খুব উর্বর। এখানেও ধান খুব ভাল জন্মে। পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ ও বিশাখাপতনম্ বৃহৎ বন্দর। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভীর বন্দরও আছে। এই অঞ্চলের সমুদ্রে নৌকা ও ট্রলারে করিয়া মাছ ধরা হয়; মাছ ও মাছের তৈল ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি করা হয়।

ভারতের **দুই উপকূলের মধ্যে তুলনা** করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। (ক) পশ্চিম উপকূল সংকীর্ণ এবং উহার পশ্চাদ্‌ভূমিতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীরের মত অবস্থিত। কিন্তু পূর্ব উপকূলের সমভূমি অনেক প্রশস্ত এবং উহার পশ্চাদভূমিতে পূর্বঘাট পর্বতমালা অনুচ্চ এবং খণ্ড খণ্ড। মাঝে মাঝে নদীর বড় বড় উর্বর ব-দ্বীপ এবং নদী উপত্যকা। (খ) পশ্চিম উপকূলে জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রবল বারিপাত হয় (২০০ সেঃ মিঃ এর অধিক) অপর পক্ষে, পূর্ব উপকূলে শীত ও গ্রীষ্মে দুইবার মাঝারি রকম বৃষ্টি হয়। (গ) উভয় উপকূলই অভগ্ন, তবে পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি স্থানে পোতাশ্রয় গঠনের সুবিধা থাকায় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌচালনা ও মৎস্য শিকারে অধিক নিপুণ। (ঘ) উভয় উপকূলেই কতকগুলি লবণাক্ত উপহ্রদ (Lagoon) আছে। (ঙ) পশ্চিম উপকূলের নদীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অধিকাংশই খরস্রোতা বলিয়া উহাদের ব-দ্বীপ নাই; কিন্তু পূর্ব উপকূলে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণ ও কাবেরী নদীর বড় বড় ব-দ্বীপ আছে।

**Q. 4. Describe fully the environmental features that help or hinder the economic development of the Peninsular Interior of India.** (C. U. B. Com. Part I 1962)

[ **পরিবেশের যে সকল উপকরণ ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যভাগের অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে সাহায্য করে অথবা ব্যাহত করে তাহাদের বর্ণনা দাও।** ]

[ Q. 3. (৩) হইতে দাক্ষিণাত্য মালভূমির বর্ণনা লইয়া তাহার সঙ্গে নিম্নলিখিত অংশ যোগ করিতে হইবে। ]

**দাক্ষিণাত্য মালভূমির আর্থিক প্রগতি**—দাক্ষিণাত্য মালভূমির মৃত্তিকা সাধারণভাবে অনুর্বর বলা চলে। নর্মদা, তাপ্তী, কৃষ্ণা ও গোদাবরী উপত্যকার পাললিক কৃষ্ণমৃত্তিকা খুব উর্বর ; কিন্তু মালভূমির কৃষ্ণমৃত্তিকা তেমন উর্বর নহে। মালভূমির অবশিষ্টাংশের লাল কঙ্করময় মাটি মোটেই উর্বর নহে। সুতরাং, মালভূমিতে কৃষিকার্য তেমন উন্নত নয়। মেষ ও ছাগ চারণ অনেক স্থানে অধিবাসীদের জীবিকার উপায়। ফসলের মধ্যে তূলা, জোয়ার, রাগি ও চীনাবাদাম উল্লেখযোগ্য।

এই মালভূমির খনিজ সম্পদ বিপুল। এই খনিজ দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার শিল্পও গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় ঐ অঞ্চলে প্রচুর জলবৈদ্যুতিক-শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্রা ও কাবেরীর উপত্যকার নানাস্থানে বাঁধ দিয়া জলসেচ ও জলবৈদ্যুতিক-শক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শক্তির সাহায্যে বহু কাপড়ের কল, এ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত ইত্যাদি ধাতুশিল্প, কাগজ, সিমেণ্ট প্রভৃতি কলকারখানা চলিতেছে। দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলে কয়লা খুব কম। এইজন্যই এই অঞ্চলে ভারী শিল্প গঠনের অসুবিধা রহিয়াছে।

**Q. 5. Analyse the geographical environment of either the Kashmir valley or the Brahmaputra valley in Assam, and indicate how man has adapted to it.** ( C. U. B. Com. 1961 )

[ **হয় কাশ্মীর উপত্যকা নতুবা আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভৌগোলিক বাতাবরণের বর্ণনা দাও এবং দেখাও কেমনভাবে মানুষ উহার সঙ্গে নিজেদের মানাইয়া লইয়াছে।** ]

**কাশ্মীর উপত্যকা**—ভারতের উত্তর প্রান্তে বহির্হিমালয় ও মধ্য হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে ভূস্বর্গ নামে কথিত কাশ্মীর উপত্যকা অবস্থিত। ইহা বেশ প্রশস্ত ও উর্বর উপত্যকা। এই উপত্যকার উত্তর ভাগে উলার হ্রদ এবং দক্ষিণ ভাগে শ্রীনগর শহর—উভয়ের মধ্য দিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিত। ঝিলাম এখানে

বেশ শান্ত এবং নৌবাহন যোগ্য। সমগ্র উপত্যকাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। লক্ষ লক্ষ দেশী ও বিদেশী পর্যটক কাশ্মীর উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী তুষারমণ্ডিত পর্বত ও পাইন-চেনার বনের শোভা দেখিবার জন্য প্রতি বৎসর কাশ্মীরে আসেন। তাঁহারা ঐ উপত্যকার অধিবাসীদের নিকট হইতে মূল্যবান পশমের শাল এবং কাঠের কাজ-করা জিনিস ক্রয় করেন। এই ভ্রমণ ব্যবসা (tourist industry) কাশ্মীর রাজ্যের উন্নতির কারণ।

কাশ্মীরের জলবায়ু নাতিশীতল। শীতকালে এখানে খুব তুষারপাত হয়। গরম-কালে জলবায়ু খুব আরামদায়ক। উপত্যকার উর্বর মাটিতে গম ও ধান আবাদ হয়। পাহাড়ের গায়ে আপেল, ন্যাসপাতি ও পীচফলের বাগান। অন্যান্য ফলও পাওয়া যায়। অরণ্য হইতে প্রচুর নরম কাঠ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে অল্প কয়লা আছে, কিছু পরিমাণ জলবৈদ্যুতিক-শক্তিও উৎপন্ন হয়।

ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে কাশ্মীরে প্রবেশ করার মাত্র একটি পথ। পাঠানকোটে ট্রেন হইতে নামিয়া বাসে জম্মু এবং সেখান হইতে বাসেই উচ্চ পীরপাঞ্জল পর্বতমালা পার হইয়া (বানিহাল নামক স্থানে "জওহর সুড়ঙ্গ" দিয়া পর্বতমালার অতি উচ্চ অংশটুকু ভেদ করিয়া) কাশ্মীর উপত্যকায় অবতরণ করিতে হয়। দিল্লী হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে নিয়মিত বিমান যাতায়াত করে। কাশ্মীর উপত্যকা হইতে আবার তুষারাবৃত জোজিলা গিরিপথ দিয়া মোটর যোগে লাদাক অঞ্চলে যাওয়া যায়। কাশ্মীর ভারতের উত্তর সীমান্ত রাজ্য বলিয়া সামরিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা**—ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বত হইতে যেখানে আসামে প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে পূর্বপাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত মোট প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং গড়ে প্রায় ৮০ কিলোমিটার প্রশস্ত উপত্যকার নাম ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। এই উপত্যকা আসাম রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এই উপত্যকার জমি অত্যন্ত উর্বর। এখানে বৃষ্টিপাতও প্রচুর পরিমাণে হয়। সুতরাং, অধিবাসীরা অধিকাংশই চাষবাস করিয়া জীবিকা অর্জন করে। বহিরাগত লক্ষ লক্ষ লোক এই অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে কার্যোপলক্ষে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদী সুনাব্য। এই নদীপথে নৌকা ও ষ্টীমারযোগে যথেষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। ব্রহ্মপুত্র নদীর তটে ধুবড়ি, ডিব্রুগড়, গৌহাটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রধান শহর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে নাহোরকাটিয়া, মোরান, ডিগবয় প্রভৃতি স্থানে প্রচুর খনিজ-তৈল পাওয়া যায়।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাকে আসাম উপত্যকাও বলা হয়। এখানে লোকবসতি অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও উর্বর পতিত জমি রহিয়াছে। এই অঞ্চলে ধান সর্ব-

প্রধান ফসল। পাটও প্রচুর উৎপন্ন হয়। ধান সম্পর্কে এই উপত্যকা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাট এবং চা নদীপথে ও বিমানপথে কলিকাতায় রপ্তানি করা হয়।

**ভারতীয় সভ্যতার উপর হিমালয়ের প্রভাব**

**Q. 6. Discuss the influence of the Himalayas on the economic life of the Indians.**

**[ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের উপরে হিমালয়ের প্রভাব কতদূর তাহা বর্ণনা কর। ]**

বিশাল হিমালয় পর্বতমালা ভারতের সমগ্র উত্তরভাগ জুড়িয়া বিস্তৃত। এই পর্বতমালা ভারতের জলবায়ু এবং সামাজিক জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

(১) হিমালয় পর্বতমালার অবস্থানের জন্য এশিয়ার মহাদেশীয় অঞ্চলের মঙ্গোল, তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতের অধিবাসীদের একটা প্রকাণ্ড ভৌগোলিক ব্যবধান রচিত হইয়াছে। এই জন্যই এই উভয় অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবাধ মিশ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। হিমালয় না থাকিলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। (২) এই পর্বতশ্রেণী একদিকে যেমন মধ্য এশিয়া ও তিব্বত অঞ্চলের শীতল বায়ুপ্রবাহের হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছে; তেমনি অপরদিকে ভারত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ুর গতিপথে বাধা দিয়া ভারতীয় ভূ-খণ্ডে প্রচুর বারিপাত ঘটাইয়া দেশে শস্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। (৩) এই পর্বতশ্রেণী প্রাকৃতিক সীমার সৃষ্টি করিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতেছে। অবশ্য নাথুলা, জালেপ্‌লা, জোজিলা প্রভৃতি সংকীর্ণ গিরিপথগুলি থাকাতে একদিকে যেমন তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যাতায়াতের পথ রচিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি উত্তরাঞ্চলের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের আক্রমণে বারে বারে ভারতবর্ষ বিপন্ন ও পর্যুদস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিমালয়ের উপযোগিতা কিছু কম অনুভূত হয় নাই। হিমালয় না থাকিলে ভারতের জলবায়ু হইতে সুরু করিয়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। তাহা হইলে ভারতে আর্যসভ্যতার এত অভাবনীয় উন্নতি হইত কিনা তাহা বলা কঠিন। (৪) হিমালয় পর্বতমালার অবস্থানই ভারতে এত নদনদী সৃষ্টির কারণ। হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত মৌসুমীবায়ু বাহিত জলধারা ও হিমালয় শিখরসমূহের গলিত তুষারের ধারা ভারতের নদীগুলিকে অফুরন্ত জলের যোগান দিয়া থাকে। ইহা একদিকে যেমন দেশের জমিকে উর্বর করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি অপরদিকে এই সকল সুনাব্য নদী দেশের মধ্যে সুন্দর জলপথের সৃষ্টি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

শতদ্রু নদী হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। অন্যান্য নদী হইতেও বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। (৫) এই সকল পার্বত্য অঞ্চলের বনজ সম্পদ দেশের সমৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। (৬) এই সকল পর্বতে যথেষ্ট খনিজ সম্পদ (কয়লা, তৈল, তাম্র, লবণ ও জিপ্‌সাম) নিহিত আছে বলিয়াই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস। (৭) হিমালয় পর্বতের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া এখানে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই জঙ্গল ঘন ঘাসে সমাচ্ছন্ন। এই ঘাস কাগজ তৈয়ারির জন্য ভারতের বিভিন্ন কাগজের কলে চালান দেওয়া হয়। হিমালয়ের উচ্চস্থানগুলিতে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি গাছের বন জঙ্গল আছে। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে গম, ধান, আলু, আপেল, কমলালেবু, চা ও সিনকোনা প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। এই অঞ্চল অসমতল হওয়ায় এখনও শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাদপদ।

**ভারতের নদ নদী**

**Q. 7. Write an account of the Indian rivers as (a) highway of commerce, (b) source of water for irrigation and (c) hydroelectricity.**

**[(ক) নদীপথ হিসাবে, (খ) জলসেচের উপায় রূপে এবং (গ) বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারতীয় নদীগুলির অবদানের বিষয় বর্ণনা কর।]**

ভারত নদীমাতৃক দেশ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই অসংখ্য নদী, উপনদী ও শাখানদী ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। মানুষের জীবনের উপর এই সকল নদীর প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলপথকে আশ্রয় করিয়া।

ভারতের নদীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) উত্তর ভারতের নদী—এগুলি অধিকাংশই হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত অঞ্চলে উৎপন্ন এবং বারমাস প্রবাহমান। সমভূমি অঞ্চলে এই নদীগুলি নাব্য। এই নদীগুলির মধ্যে **গঙ্গা** এবং তাহার গোষ্ঠী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **ব্রহ্মপুত্র** নদীগোষ্ঠী পূর্বভারতে প্রবাহমান। **সিন্ধু** অববাহিকার মধ্যে কেবল শতদ্রু এবং বিপাশা (Beas) নদীদ্বয় ভারতের অন্তর্গত। (২) দক্ষিণ ভারতের নদী—এই নদীগুলি অনুচ্চ পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়া মালভূমির বন্ধুর পথে প্রবাহিত হইয়াছে। এগুলিতে বারমাস জল থাকে না এবং নদীগুলি কেবলমাত্র নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে অর্থাৎ ব-দ্বীপের নিকট নাব্য। গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা প্রভৃতি এই শ্রেণীর নদী।

**(ক) নদীপথ**—উত্তর ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত নদীগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ক্রমশঃ জলসেচের জন্য অধিক জল ব্যবহৃত হওয়ায় গঙ্গা ও উহার উপনদী এবং শাখানদী-

গুলিতে বহু বালুচর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে নৌবাহনের নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে। উত্তর ভারতে গঙ্গা ও উহার উপনদী যমুনা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক প্রভৃতি নদীর উপর বহু বড় বড় নদীবন্দর অবস্থিত। পাটনা, এলাহাবাদ, বারাণসী ও কানপুর উল্লেখযোগ্য নদীবন্দর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে নদী বন্দরগুলিতে আধুনিক জেটি প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদী আসাম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সর্বত্রই বড় বড় স্টীমার চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীই সর্বাধিক নৌ-যান বহন করে। আসামের পাট, চা প্রভৃতি এই নদীপথে কলিকাতায় আসে (সুন্দরবন হইয়া)। দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলি নাব্য।

(খ) **নদী ও জলসেচ**—ভারতের নদীগুলিই জলসেচের সর্বপ্রধান অবলম্বন। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া খাল কাটিয়া জলসেচ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার সাহায্যে এই প্রাচীন জলসেচ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। উত্তর ভারতের শতদ্রু নদী সমগ্র পাঞ্জাবে সেচের জল সরবরাহ করে। পশ্চিমবঙ্গে ময়ূরাক্ষী ও দামোদর, উড়িষ্যার মহানদী, অন্ধ্ররাজ্যে গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা এবং মাদ্রাজ ও মহীশূর রাজ্যে কাবেরী নদী প্রচুর সেচের জল সরবরাহ করে। নূতন বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে নদী হইতে জলসেচের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

(গ) **জলবৈদ্যুতিক-শক্তি**—পার্বত্য খরস্রোতা নদী হইতে জলবিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। বর্তমানে বিপাশা (Beas) নদী হইতে এবং শতদ্রু হইতে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হইতেছে। গঙ্গা খাল হইতেও কিছু বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। পশ্চিমঘাট অঞ্চলে প্রবল বারিপাত এবং ভূমি পার্বত্য প্রকৃতির হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি খরস্রোতা। এখানে কাবেরী, সরাবতী প্রভৃতি নদীতে বড় বড় জলপ্রপাত আছে। কাবেরী নদী হইতে প্রচুর তড়িৎ উৎপন্ন হয়। শিবসমুদ্রম, মেত্তুর প্রভৃতি বিদ্যুৎকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। দামোদর, মহানদী, চম্বল, রিহান্দ প্রভৃতি বৃহৎ নদী পরিকল্পনাগুলি হইতে এখন বিপুল পরিমাণ জল-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। নদীগুলি ভারতের প্রাণস্বরূপ।

## *মৃত্তিকা*

**Q. 8. What are the important varieties of soil found in India and how are they distributed ? Mention the measures that are being taken for prevention of soil erosion in the country.** (C. U. 1958)

**[ ভারতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ জাতীয় মাটি দেখা যায় এবং কোথায়**

**ঐগুলি দেখা যায়? এদেশে ভূমিক্ষয় রোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে?]**

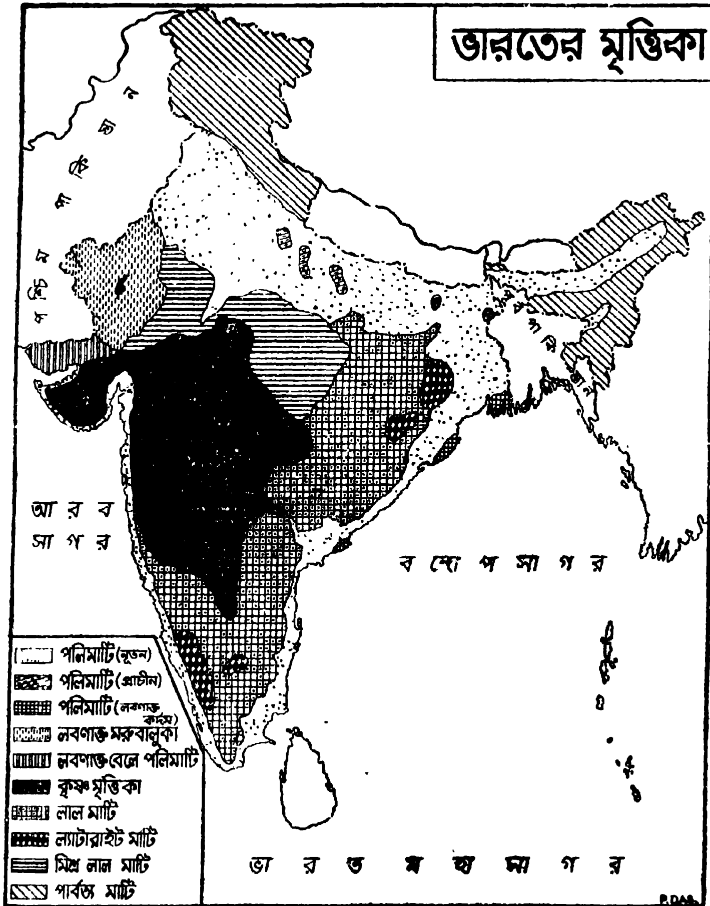
ভারতে বহুপ্রকার মাটি দেখা যায়। ভারতের মত বিশালায়তন দেশে যেখানে বিভিন্ন যুগের শিলাস্তর ও বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু রহিয়াছে সেখানে নানাপ্রকার মাটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই বহুপ্রকার মাটিকে মোটামুটি ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চারিভাগে ভাগ করা যায়; * যথা—(১) হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য মাটি, (২) গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটি, (৩) দাক্ষিণাত্য মালভূমির নানাপ্রকার মাটি ও (৪) তটভাগের পলিমাটি।

**হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য মাটি**—হিমালয় অঞ্চলে সাধারণতঃ হিমবাহ দ্বারা বাহিত প্রস্তরময় মাটি এবং অরণ্য অঞ্চলের অনুর্বর "পডলস" মাটি দেখা যায়। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে "গ্রে ও ব্রাউন" রঙের অপেক্ষাকৃত উর্বর মাটি দেখা যায়। সংকীর্ণ নদী উপত্যকায় স্থানে স্থানে পলিমাটি দেখা যায়, তবে উহাও বালুকা ও শিলাময়। তরাই অঞ্চলে কর্দমজাতীয় মাটি ও ভাবর অঞ্চলে বালুকাময় মাটি দেখা যায়। এই সংকীর্ণ তরাই ও ভাবর ভূমি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখান হইতেই গাঙ্গেয় সমভূমি আরম্ভ হইয়াছে। হিমালয় অঞ্চলের মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম এবং উহা তেমন উর্বর নহে। তবে আসাম ও দার্জিলিঙে অপেক্ষাকৃত উর্বর মাটিতে চায়ের চাষ হয়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের পাহাড়ে আপেল, ন্যাসপাতি, আখরোট প্রভৃতি ফল ভাল হয়।

**গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটি**—সমগ্র উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ও উহাদের অসংখ্য উপনদী দ্বারা আনিত পলিমাটিতে গঠিত। এই পলিমাটি নানাস্থানে নানা প্রকার। উত্তরবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে বিশেষতঃ দুই নদীর মধ্যস্থ দোয়াবগুলিতে একপ্রকার গৈরিক রঙের শক্ত মাটি দেখা যায়। উহা প্রাচীন পলিমাটি ( older alluvium )। উহার উর্বরতা কম। নদীর তীরে যেখানে প্রতি বৎসর পলিমাটি পড়ে সেখানে সর্বাপেক্ষা উর্বর মাটি ( newer alluvium ) দেখা যায়। উহা সাধারণতঃ দোআঁশ জাতীয় হয়; তবে কোথাও কোথাও বালিও থাকে। ব-দ্বীপ অঞ্চলে কর্দমাক্ত মাটি অধিক। ইহার মধ্য দিয়া জল সহজে মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং, এই অঞ্চলে খাল বিল অধিক। বাংলাদেশে ও উত্তর বিহারে খাল বিল বেশি। উত্তর প্রদেশের মাটি অপেক্ষাকৃত প্রবেশ্য। এখানে যব ও গমের চাষ ভাল হয়। অপরপক্ষে, বাংলাদেশে বিহার ও আসামে ধান ও পাট ভাল হয়। প্রাচীন পলিমাটিতে প্রচুর

*বর্তমানে রুশ বৈজ্ঞানিক সকোলস্কির ( Shokalsky ) মৃত্তিকা বিভাগ অনেকে অনুসরণ করেন। এই বিভাগগুলি অনেকাংশে জলবায়ুর প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া গঠন করা হইয়াছে।

সার দিলে ধান ও তৈলবীজ জন্মে; কিন্তু পাট জন্মে না। সমুদ্র সন্নিহিত লবণাক্ত পলিমাটিতেও ধান, নারিকেল ও সুপারি ভাল জন্মে; কিন্তু পাট জন্মে না।




কোন কোন স্থানের পলিমাটিতে চুনের ভাগ অত্যধিক বলিয়া চাষবাস হয় না। যে সকল নদী চুনা পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে তাহাদের অববাহিকায়

এই ধরণের মাটি দেখা যায়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এখন এই সকল অনুর্বর স্থানেও চাষ-আবাদ আরম্ভ হইয়াছে।

**দাক্ষিণাত্য মালভূমির মাটি**—দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নানা প্রকার প্রাচীন ও কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া জলবায়ুর কার্যকলাপের ফলে এই অঞ্চলে বহুপ্রকার মাটি সৃষ্টি হইয়াছে। মোটামুটিভাবে ইহাদের তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের **কৃষ্ণ মৃত্তিকা**। (২) ছোটনাগপুর, মহীশূর প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের **ল্যাটারাইট মাটি**। (৩) দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্ট অঞ্চলের গৈরিক রঙের পাথুরে মাটি এবং **লাল রঙের দোআঁশ মাটি** দেখা যায়। গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় প্রধানতঃ বাহিত কৃষ্ণমৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা খুব উর্বর।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা উর্বর মাটি। উহা লাভা ও আগ্নেয় ভস্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে; বিভিন্ন নদীর উপত্যকায় উহা ঘোর কালো রঙের এবং বেশি উর্বর। ইহা জল ধরিয়া রাখে বলিয়া তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উচ্চ-ভূমিতে জোয়ার ও বাজরা চাষ হয়। ল্যাটারাইট মাটিতে নাইট্রোজেন খুব কম এবং লৌহ বেশি। ইহা কফি চাষের পক্ষে ভাল হইলেও শস্যাদির পক্ষে ভাল নহে। লাল দোআঁশ মাটি অনুর্বর এবং উহার জল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা খুব কম। এখানে বালুকাময় মাটিই বেশি। আলু ও চীনাবাদাম কিছু কিছু চাষ হয়। নদী উপত্যকায় যেখানে এই মাটি জমিয়াছে সেখানে ধান, জোয়ার ও বাজরা জন্মে।

**তটভাগের পলিমাটি**—সমুদ্রতটের মাটি সাধারণতঃ বালুকাময় ও লবণাক্ত হয়। তবে সমুদ্র হইতে কিছু দূরের মাটির লবণ যেখানে বর্ষার জলে ধুইয়া গিয়াছে সেখানে ধান ভালই জন্মে। নারিকেল ও সুপারি এই অঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্ভিদ।

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার মাটি ছাড়া আরও কয়েক প্রকার মাটি ভারতে দেখা যায়; যথা—পাঞ্জাবের লোয়েস জাতীয় মাটি এবং রাজস্থানের লবণাক্ত মরুবালুকা।

**ভূমিক্ষয় ও তাহার প্রতিকার**—ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলেই ভূমিক্ষয় ( soil erosion ) সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে জমির ক্ষতিসাধন করিয়াছে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে আলগা নরম মাটি ধুইয়া যায়। উপরের মাটিই সর্বাপেক্ষা উর্বর। ঐ মাটি ধুইয়া গেলে নীচের অনুর্বর মাটি বাহির হইয়া পড়ে। উহাতে জৈব সার নাই বলিলেই চলে। সুতরাং, জমির উৎপাদিকা-শক্তি কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া রাজস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ধূলিঝড়ের ফলেও ভূমিক্ষয় হয়। এই ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণভাগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইতেছে—(১) ভূমির চারি-

দিকে বৃক্ষরোপণ, (২) ভূমিতে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ, (৩) ভূমিকে কর্ষণ করার সময় জমির ঢাল অনুসারে কর্ষণ করা ( contour furrowing ), (৪) ভূমি হইতে যে পথে মাটি ধুইয়া বাহির হইয়া যায় সেই পথ মাটি, পাথর বা গাছের গুঁড়ির বাঁধ দিয়া বন্ধন ও (৫) ভূমির প্রান্তভাগে সর্বদা কোন না কোন ফসল উৎপাদন প্রভৃতি। ব্যাপক ভাবে উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তন করিতে যে শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন এদেশে তাহার একান্ত অভাব। সুতরাং, এই পরিকল্পনায় ভূমিক্ষয় রোধের লক্ষ্য খুবই সীমাবদ্ধ।

## জলবায়ু

**Q. 9. Give an idea of the distribution of rainfall in India and account for the marked variations of rainfall in different parts of the country.** ( C. U.-1960 )

[ **ভারতের বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের বিবরণ দাও এবং বৃষ্টিপাতের সুস্পষ্ট বিভিন্নতার কারণ দেখাও।** ]

ভারত মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ হইতে ভারত প্রায় সমস্ত বৃষ্টি লাভ করে। ভারতের বৃষ্টিপাতের বিষয় জানিতে হইলে প্রথমেই বিভিন্ন ঋতুতে তাপমাত্রার প্রভেদ, সমুদ্র ও পর্বতের প্রভাব প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করা দরকার; কারণ, উত্তাপের পার্থক্যের ফলেই প্রধানতঃ বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং বায়ুপ্রবাহের সূত্রপাত হয়। বায়ুপ্রবাহ জলকণা বহন করিয়া আনে এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়।

গ্রীষ্মকালে ভারতের মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমভাগ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে আর্দ্র শীতল সমুদ্র বায়ু পৌঁছায় না। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপর জুন মাস নাগাদ অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। ভারত মহাসাগরের বায়ুপ্রবাহ তখন ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। ইহাই **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু**। এই বায়ুপ্রবাহ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতের দিকে ধাবিত হয়। (১) আরব সাগর হইতে জলকণা সংপৃক্ত বায়ুপ্রবাহ প্রবল বেগে পশ্চিমঘাট পর্বতের গাত্রে আছড়াইয়া পড়ে। ঐ বায়ু উপরে উঠিয়া শীতল হইলে উহার জলকণা ধরিয়া রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে পর্বতের সানুদেশে প্রবল বারিপাত হয়। বোম্বাই হইতে ত্রিবান্দ্রম পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই ২০০ সেন্টিমিটারের অধিক বারিপাত হয়। কিন্তু ঐ বায়ুপ্রবাহ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পার হইয়া যখন মালভূমিতে নামিয়া আসে তখন উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মহীশূর অঞ্চলে ( বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ) মাত্র ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া উত্তর প্রদেশে আঁধির (ধূলি ঝড়) সৃষ্টি

করে। (২) বঙ্গোপসাগর হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর যে শাখা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধাবিত হয় উহাও জলকণাপূর্ণ। আসাম ও উত্তরবঙ্গে হিমালয় পর্বতমালায় প্রতিহত হওয়ার ফলে এই বায়ুপ্রবাহ হইতে ঐ সকল অঞ্চলে প্রবল বারিপাত হয় (২৫০ সেঃ মিঃ-র অধিক)। তাহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যার সমতল ভূমিতেও মাঝারি রকম বৃষ্টি হয় (১০০—১৫০ সেঃ মিঃ)। মৌসুমী বায়ুদ্বারা বাহিত ঝঞ্ঝাগুলি বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অন্ধ্র, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়া ধাবিত হয়। এইগুলি হইতে আকস্মিকভাবে প্রবল বারিপাত ও জলপ্লাবনের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ সেপ্টেম্বর মাসে মৌসুমী বায়ু পিছাইয়া ( retreating monsoon ) যাইবার সময় ঝড়বৃষ্টি অত্যধিক তীব্র হয়। ঐ ঝঞ্ঝাগুলি হইতে তটভাগে অধিক এবং অভ্যন্তর ভাগে কম বৃষ্টিপাত হয়।

[ অবশিষ্টাংশের জন্য পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য ]

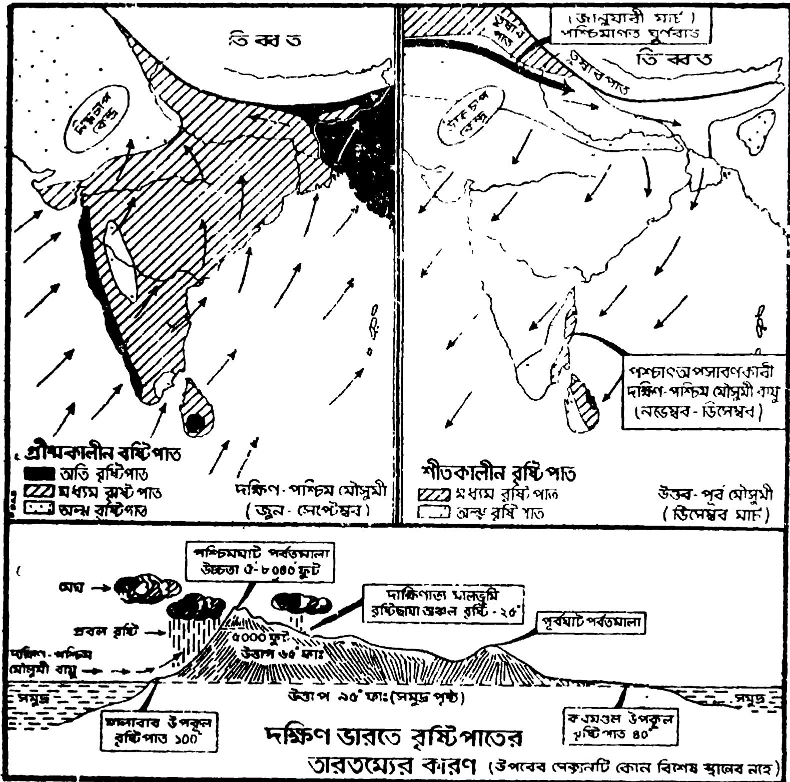
**Q. 10. Explain the factors accounting for the winter rainfall in India** ( B. Com. 1957 )

**[ ভারতে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের কারণসমূহ দেখাও। ]**

ভারতের প্রায় সকল স্থানেই বৎসরের মধ্যে জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস বর্ষাকাল। অন্যসময় সামান্যই বৃষ্টি হয়। কিন্তু উহার দুইটি ব্যতিক্রম আছে ; যথা—(১) তামিলনাড়ু রাজ্যের পূর্বভাগ ও (২) পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং কাশ্মীর। শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অত্যন্ত শীত পড়ে এবং ঐ অঞ্চলে তখন উচ্চ চাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। ঐ কেন্দ্র হইতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রথমে পূর্বদিকে ও পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এই উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ সময় ভারতের কোথাও বৃষ্টি হয় না। দক্ষিণ ভারতের পূর্বতটে এই বায়ুকে প্রতিরোধ করিবার মত উচ্চ পর্বত নাই। (পূর্বঘাট মাত্র ১০০০ মিটার উচ্চ), সুতরাং ইহা হইতে সামান্যই বৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া, এই বায়ু শীতল বলিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে সামান্য মাত্র জলকণা গ্রহণ করিতে পারে।

দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রবল বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণতঃই ঝড় হইতে হয় এবং ইহার জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর পশ্চাৎঅপসারণই দায়ী। উত্তর ভারত হইতে হটিয়া আসিলেও দঃ পঃ মৌসুমীবায়ু মাদ্রাজ উপকূলে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। ঐ সময় উত্তর ভারতে উঃ পুঃ মৌসুমী ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতে থাকে। বঙ্গোপসাগরে ঐসময় বহু ঝঞ্ঝাবাত সৃষ্টি হয়। ঐগুলি পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া মাদ্রাজ তটে বারিপাত (প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ) ঘটায়।

ভারতের উত্তরভাগে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয় পর্বতে প্রচুর তুষারপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত হয় শীতকালের শেষের দিকে ফেব্রুয়ারী মাসে। এই বৃষ্টিপাতের কারণ পশ্চিমাগত ঝড়। এই ঝড়গুলি ( western disturbances ) ইরাণ হইয়া পাকিস্তান ও ভারতে প্রবেশ করে এবং কয়েকদিন ধরিয়া সামান্য বারিপাত ঘটায়। পাঞ্জাবে ঐ সময় প্রায় ১২—১৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টি



দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণ (উপরের সেক্সনটি কোন বিশেষ স্থানের নহে)

হয়। এই বৃষ্টি পরিমাণে কম হইলেও চাষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই ঝড়গুলি ক্রমশঃ গঙ্গা উপত্যকা ধরিয়া পুর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পশ্চিমবঙ্গেও মাঘের শেষে সামান্য বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি কৃষিকার্যের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। পশ্চিমাগত ঝড়গুলি যে বৎসর দেরীতে আসে সে বৎসর গম ফসলের খুব ক্ষতি হয় এবং সমগ্র উত্তর ভারতে জলবায়ুর বিপর্যয় ঘটে।

আসামের পূর্বভাগেও শীতকালে হাল্কা বৃষ্টি হয়।

**Q. 11. Comment on the distribution and nature of the rainfall in India and its influence on agriculture and transport.**
( B. Com. 1962 )

**[ ভারতের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে মন্তব্য কর এবং কৃষি ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপরে উহার প্রভাবের বিষয় উল্লেখ কর। ]**

[ Q. 9. এবং কৃষিজ সম্পদ অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নোত্তর এর সারাংশ গ্রহণ করার পর নিম্নলিখিত অংশ যোগ করিতে হইবে। ]

**ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থার উপর বারিপাতের প্রভাব—**

ভারতের অনেক স্থানেই বর্ষাকালে অত্যন্ত প্রবল ধারায় বৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া যায়। যে সকল অঞ্চলে বর্ষাকালে প্রায়শঃই এরূপ বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে সেগুলি হইল—(১) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (২) উত্তরবঙ্গ (৩) উত্তর বিহার ও পূর্ব-উত্তর প্রদেশ (৪) পূর্ব-উপকূলে মহানদী ও কাবেরীর বদ্বীপ অঞ্চল প্রভৃতি।

বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা বর্ষাকালে ঝড় বৃষ্টির সময় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু রেলপথ ও পাকা রাস্তা বন্ধ হইলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় বিমান পরিবহণের ক্ষেত্রে তত হয় না।

---

# লোকবসতি

DISTRIBUTION OF POPULATION

**Q 12. Explain critically the distribution of population in India in the light of geographical resources.**

( C. U. B. Com. 1968 )

**[ ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে জনসংখ্যার বণ্টন সম্পর্কে সমালোচনা মূলক ব্যাখ্যা দাও। ]**

**Or, State the factors responsible for the concentration of population at certain places in India.** ( C .U. 1955 )

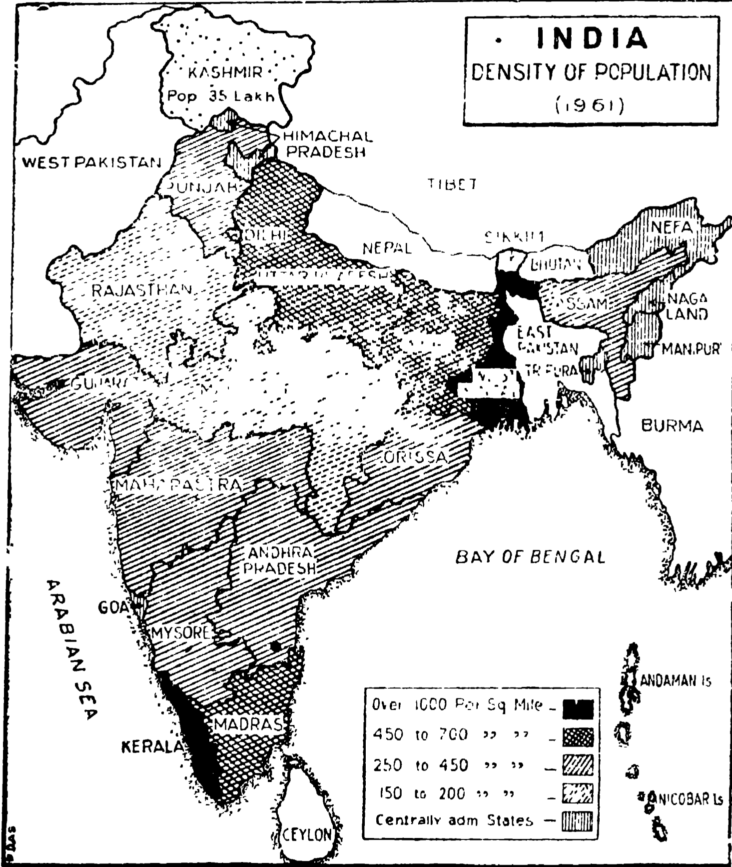
ভারতের লোকসংখ্যা মোটামুটি প্রায় ৫২ কোটি ( ১৯৬৯ )। এই বিপুল জনসংখ্যা দেশের সর্বত্র সমানভাবে বাস করিতেছে না। কোথাও লোকবসতি অত্যধিক ( যথা—দিল্লী, হাওড়া জেলা ও কেরল রাজ্যে ), আবার কোথাও লোকবসতি খুব কম ( যথা—বিকানীর, নেফা অঞ্চল ও মণিপুর রাজ্যে )।

লোকবসতি প্রধানতঃ কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (১) জলবায়ু এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রভাব, (২) ভৌগোলিক অবস্থান, (৩) খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং (৪) শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা।

ভারত সাধারণতন্ত্র কৃষিপ্রধান দেশ। যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ভূমি উর্বর, সে সমস্ত অঞ্চল কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। এই কারণে ভারতের গাঙ্গেয়-উপত্যকায় লোকবসতি খুব ঘন। উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ধান, গম, ভুট্টা, যব, জোয়ার প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের পাট, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে প্রচুর ইক্ষু এবং তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। জীবনযাত্রা খুব সহজ হওয়ায় এই অঞ্চলের লোকবসতি ঘন হইয়াছে। এই অঞ্চলে ঘন লোকবসতির দ্বিতীয় কারণ ইহার ভৌগোলিক অবস্থান। এখানে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও মাটি খুব উর্বর।

পার্বত্য অঞ্চলে ও মরুভূমির অতি নিকটে লোকবসতির ঘনত্ব নিতান্তই অল্প হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল স্থানে জলসেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে লোকবসতি খুব ঘন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমভাগের যে সকল স্থানে গঙ্গা ও যমুনা নদী হইতে জলসেচ দেওয়া হয় সে সকল স্থানে লোকবসতি খুব ঘন।

খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যে সমস্ত অঞ্চলে থাকে সে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ উত্তোলন প্রভৃতির সাহায্যে জীবিকা সংস্থান সম্ভব হয় বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলের




"জনবসতির ঘনত্ব"

জনবসতি খুব বেশি ঘন হয়। এই কারণে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলির জনসংখ্যা অধিক। ভারতের কোন কোন স্থানে লোকবসতি ঘন হইবার আর একটি কারণ শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি। পশ্চিমবাংলা, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প-সম্পদে খুব উন্নত হওয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভরশীল অগণিত জনসাধারণ এই সকল অঞ্চলে বাস করে। ইহা ছাড়া সুনাব্য

নদীর প্রভাবে জলপথে বাণিজ্য ও লোক চলাচলের সুবিধা আছে বলিয়া এবং নদীর তীরভূমিগুলি খুব উর্বর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া **ভারতের নদীতীরগুলিতে জনবসতি খুব ঘন।** অন্যান্য সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অস্বাস্থ্যকর স্থানের জনবসতি তত ঘন হয় না। ব্রহ্মপুত্র নদ ধরিয়া আমরা যতই উত্তর-পূর্ব দিকে যাইতে থাকিব জনসংখ্যার ঘনত্ব ততই কমিতে থাকিবে, ইহার প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। যে সমস্ত কারণগুলির জন্য গাঙ্গেয় উপত্যকার লোক-বসতি খুব ঘন হইয়াছে দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগে কেরল ও দক্ষিণ মাদ্রাজেও সেই সকল কারণগুলি বর্তমান থাকায় এই অঞ্চলের লোকবসতি এতটা ঘন হইয়াছে। এখানে ধান, নারিকেল, বাদাম, ইক্ষু ও বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। পশ্চিম-ঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় মহীশূর রাজ্যের উত্তরভাগে লোকবসতির ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় ও জলসেচের সুব্যবস্থা থাকায় মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বভাগে লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। তুলা, ধান, ইক্ষু, প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অরণ্যাচ্ছাদিত হওয়ায় ইহার নিকটে লোকবসতি ঘন নহে। তবে ইহার পশ্চিম উপকূলস্থ সমতলভূমির লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। ধান, মশলা এবং নারিকেল এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন-দ্রব্য। ভারতের মধ্যে **সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল কেরল রাজ্য।** **জমির উর্বরতা** এবং **পর্যাপ্ত বারিপাতই** এখানকার এই ঘনবসতির কারণ। **তাহার পরই পশ্চিমবঙ্গ** ( প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮৪০ জন ), উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের স্থান।

সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের ঘনবসতি প্রধানতঃ বারিপাত ও উর্বর মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। একমাত্র রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চল ব্যতীত ভারতের কোথাও খনিজ সম্পদ ঘনবসতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহে। বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোইম্বাটোর প্রভৃতি অঞ্চলের ঘনবসতির জন্য শিল্পোন্নতিই প্রধানতঃ দায়ী।

**Q. 13. Draw a map of India and show the density of population in the different regions. Critically analyse the pattern obtained.** ( C. U. B. Com. 1961 )

**[ ভারতের মানচিত্র আঁকিয়া তাহাতে লোকবসতির ঘনত্ব দেখাও। বৈশিষ্ট্যগুলির সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দেখাও। ]**

[ উত্তরের জন্য Q. 12 ও ভারতের লোকবসতি মানচিত্র দ্রষ্টব্য। ]

**Q. 14. Account for the concentration of the population in the Ganga Valley.**

**[ গঙ্গানদী অববাহিকায় অত্যধিক ঘনবসতি পূর্ণ হওয়ার কারণ আলোচনা কর। ]**

ভারতের গঙ্গানদী অববাহিকা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ এই সুজলা সুফলা ভূমিতে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে এই সুবিস্তৃত সমভূমিতে কোথাও কোথাও প্রতি বর্গমাইলে সহস্রাধিক মানুষের বাস। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, উত্তর বিহার এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি এলাকা। প্রত্যেক স্থানেরই ঘনবসতির কোন না কোন বিশেষ কারণ থাকে। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর তটে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠাই এখানকার অত্যধিক ঘনবসতির প্রধান কারণ। অবশ্য এই অঞ্চলের মাটি উর্বর এবং এখানে প্রচুর বারিপাত হয় বলিয়া ধান, পাট, নানাপ্রকার ডাল প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে। হুগলী নদীর নৌবাহন ক্ষমতা, রাণীগঞ্জ কয়লা খনির নৈকট্য এবং সমগ্র ভারতের রেলপথগুলির এখানে একত্র সমাবেশ ঘটায় শিল্প-বাণিজ্যের খুব সুবিধা হইয়াছে। এমন সুবিধা ভারতের আর কোথায় দেখা যায় না। উত্তর বিহার কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার উর্বর পলিমাটি এবং প্রচুর বারিপাত কৃষিব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দীর্ঘকালের শান্তিপূর্ণ ইতিহাসও এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলা যাইতে পারে। তবে এই অঞ্চলে কুখ্যাত কোশী নদী থাকায় স্থানে স্থানে লোকবসতি কম; আবার স্থানে স্থানে অত্যধিক। এখানকার উর্বর মাটিতেও যাহাদের কর্মসংস্থান এখন আর সম্ভব হইতেছে না, সেই সব উদ্বৃত্তেরা ঝরিয়ার কয়লা খনিতে বা কলিকাতার শিল্পকেন্দ্রে ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে। উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগের অবস্থাও কতকটা উত্তর বিহারেরই মত। অত্যধিক ঘনবসতির জন্য এখান হইতেও বহু শ্রমিক অন্যান্য রাজ্যে কর্মসংস্থানের জন্য যাইতেছে। তবে এই সকল অঞ্চলে সেচব্যবস্থার নবরূপায়ণ হইলে এই দেশত্যাগ কমিবে বলিয়া মনে হয়। গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে বারিপাত কম এবং অনিশ্চিত। সুতরাং, এই অঞ্চলে পূর্বে লোকের বাস খুব কম ছিল। কিন্তু সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে এ অঞ্চলের জনবসতি কোন কোন স্থানে দুই-তিন গুণ অধিক হইয়াছে। বর্তমানে গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরভাগে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত তরাই জঙ্গলের কতকাংশ পরিষ্কার করিয়া লোকবসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমির (ইহা সহস্রাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ ও গড়ে ১৫০ মাইল বা প্রায় ২৪০ কিলোমিটার প্রশস্ত) গড় জনবসতির পরিমাণ প্রতি বর্গমাইলে ৫০০ জনের বেশি। কিন্তু ইহার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রস্তরময় ভূভাগে লোকবসতির ঘনত্ব ১৫০ জনের বেশি নহে।

---

# অরণ্য সম্পদ

## FOREST RESOURCES

**Q. 15. Give an account of the forest products of India and state where they are found. What is Vanamohatsab ?**

**[ ভারতের বনজ সম্পদের বর্ণনা দাও এবং ঐগুলি কোথায় পাওয়া যায় বল। বনমহোৎসব কাহাকে বলে ? ]**

বন এবং বনজ সম্পদে ভারত সম্পদশালী হইলেও খুব সম্পদশালী বলা চলে না। ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ১১ ভাগ জমিতে অরণ্য আছে। সুতরাং, এদেশে আরও অধিক অরণ্য থাকা প্রয়োজন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর জন্য নানাপ্রকারের অরণ্য দেখা যায়। জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনুসারে অরণ্যগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) পার্বত্য অঞ্চলের সরলবর্গীয়, পর্ণমোচী প্রভৃতি অরণ্য, (২) অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্য, (৩) মৌসুমী অঞ্চলের মিশ্র পর্ণমোচী অরণ্য, (৪) অল্প বারিপাত অঞ্চলের "শুষ্ক" পর্ণমোচী (পাতা ঝরা) অরণ্য, (৫) মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) তটের "শুষ্ক" চিরসবুজ অরণ্য, (৬) মরু অঞ্চলের গাছপালা ও (৭) নোনা জলাভূমির অরণ্য।

(১) **পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য**—এই অরণ্য প্রধানতঃ হিমালয় পর্বতের উচ্চ শিখরগুলিতে, যে স্থানের জলবায়ু খুব শীতল সেখানে দেখা যায়। এই ধরণের শীতল পার্বত্য অঞ্চলের বনরাজিকে আল্পস অঞ্চলীয় (Alpine) অরণ্য বলে। ইহাকে পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্যও বলা যাইতে পারে। পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং ওক, এলম, বীচ প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যও দেখা যায়। এই অরণ্য-গুলি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে নিম্নভূমির আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্যের সহিত মিশিয়াছে। হিমালয়ের প্রায় ২০০০ হইতে ৫০০০ মিটারের মধ্যে উৎকৃষ্ট নরম কাঠ, তারপিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু কাশ্মীর ও কুমায়ুন অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র এই সকল সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ কম। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে জঙ্গল ও ঘাসবন দেখা যায়। ২০০০ মিটারের নিম্নে ওক, চেষ্টনাট, দেবদারু ও শালগাছ দেখা যায় এবং ৪০০০ মিটারের উচ্চে কেবল তৃণ জন্মে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হিমালয়ের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্ব অংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র হওয়াতে এই অংশে অরণ্য বেশি। বিশেষতঃ নেফার অরণ্য সম্পদ প্রচুর। হিমালয়ের অরণ্য হইতে কাঠ ছাড়া ঔষধ প্রস্তুতের উপকরণও পাওয়া যায়।

(২) **অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্য**—আসাম, হিমালয়ের পাদদেশ ও পশ্চিমঘাট পর্বতে চিরহরিৎ বৃক্ষের ঘন অরণ্য দেখা যায়। এই অরণ্যে

মেহগনি, রোজউড, আবলুস, চন্দন, চাপলাস, চালমুগরা, গর্জন, বাঁশ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বৃক্ষলতাদি জন্মে। আসামে কয়েকটি কাঠ চেরাইয়ের কারখানায় এই অরণ্যজাত কাঠ ব্যবহার করা হইতেছে। শিলিগুড়ি ও মার্গারিটায় প্যাকিং বাক্স ও প্লাইউড প্রস্তুত হয়।

(৩) **মৌসুমী অঞ্চলের অরণ্য**—ইহা প্রধানতঃ মৌসুমী বায়ুর গতিপথের অন্তর্ভুক্ত ( বৃষ্টিপাত ১০০-২০০০ সেঃ মিঃ ) গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। এই অরণ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে দেখা যায়। তবে এই অরণ্য সমভূমি অঞ্চলে নাই বলিলেই হয়, কারণ অধিকাংশ জমিতেই চাষ-আবাদ হয়। কৃষি অঞ্চলে মানুষ আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে। ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরের কতকাংশে সেই আদিম মৌসুমী মিশ্র পর্ণমোচী অরণ্য রহিয়াছে। শাল, সেগুণ, তাল, পলাস, হলদু, হরিতকী, বাঁশ, আম, জাম প্রভৃতি গাছ এ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। সাবাই ও কাস ঘাস এই অঞ্চলে আর একটি অরণ্য সম্পদ। বৃষ্টিপাত বারমাস না হওয়ায় চিরসবুজ বৃক্ষ ও পর্ণমোচী বৃক্ষ উভয়ই দেখা যায়। লাক্ষা এই অঞ্চলের বিশিষ্ট সম্পদ।

(৪) **অল্পবৃষ্টি অঞ্চলের "শুষ্ক" পর্ণমোচী অরণ্য**—এই অরণ্য সৌরাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের উত্তরভাগ ও দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে দেখা যায়। এই অরণ্যে শাল, সেগুণ, শিশু প্রভৃতি গাছ এবং সাবাই প্রভৃতি দীর্ঘ ঘাস দেখা যায়। ইহা অনেকটা সাভানা অরণ্যের মত।

(৫) **'শুষ্ক' চিরসবুজ অরণ্য**—এই অরণ্য তামিলনাড়ু ( মাদ্রাজ ) রাজ্যের পূর্বতটভাগে দেখা যায়। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে অনেক গাছই চিরসবুজ, কিন্তু এখানে জলবায়ু শুষ্ক। যদিও এখানে বৎসরে দু'বার বর্ষাকাল তবু মোট বৃষ্টির পরিমাণ ১০০ সেঃ মিঃ বা তাহার কম। সুতরাং, গাছগুলি ক্ষুদ্রাকার এবং গুল্মজাতীয় (scrub) অরণ্য সম্পদ নগণ্য।

(৬) **মরু অঞ্চলের কণ্টক অরণ্য**—এই প্রকার অরণ্য সাধারণতঃ দক্ষিণ পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি উষর মরুভাবাপন্ন অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। বাবলা, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষই এই অঞ্চলের একমাত্র অরণ্যসম্পদ বলিয়া গণ্য।

(৭) **নোনা জলাভূমির (ম্যানগ্রোভ) অরণ্য**—প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে, বাংলা ও উড়িষ্যা রাজ্যের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে, গঙ্গা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপে এই শ্রেণীর অরণ্য দেখা যায়। এ অঞ্চলে 'ম্যানগ্রোভ' জাতীয় অরণ্যই বেশি। সুন্দরী, গড়ান, পুশুর, বেত, হোগলা প্রভৃতির ঘন বনে বাংলার উপকূল বা সুন্দরবন পরিপূর্ণ।

**অরণ্য সম্পদ**—ভারতীয় অরণ্যের উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে **মুখ্য** ও **গৌণ** এই দুই

ভাগে ভাগ করা যায়। বৃক্ষ হইতে সাক্ষাৎভাবে যে কাষ্ঠ প্রভৃতি পাওয়া যায়, সেগুলিকে **অরণ্যের মুখ্য উৎপাদন** বলে। ভারতীয় অরণ্যের কাষ্ঠের মধ্যে পাইন, ফার, দেবদারু বৃক্ষের কাষ্ঠ, দেশলাই প্রস্তুত, প্যাকিং বাক্স প্রস্তুত ও জ্বালানি প্রভৃতি কাজে; সেগুণ, আবলুস, মেহগনি প্রভৃতি কাঠ মূল্যবান আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জা প্রস্তুত করিবার কাজে; শাল কাঠ আসবাবপত্র ও রেলওয়ের কাজে, বাবলা কাঠ লাঙল, ঢেঁকি ও চাকা প্রস্তুতের জন্য এবং তালগাছ ডোঙা, সালতি প্রভৃতি নির্মাণের কাজে লাগে। ভারতের বহু প্রকার গাছের কাঠ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক প্রকার কাঠের প্রয়োজনীয়তা আজও জানা সম্ভব হয় নাই। ফলে মাত্র কয়েক প্রকার প্রসিদ্ধ কাঠ এখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ভারতের কাঠের একটি চাহিদা "রেলপথের স্লিপার" ( Railway sleeper ) এর জন্যে। এজন্য ভারী ও শক্ত কাঠের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া কাগজ, দেশলাই ও রেয়নশিল্পের জন্য নরম কাঠের প্রয়োজন। কাঠের আকার, ওজন ও শক্তির উপর উহা কোন্ কাজে ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ভর করে। ভারতে ভারী শক্ত কাঠই অধিক। নরম কাঠের অভাবে দেশলাই ও কাগজ শিল্প ভালভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না, অথচ নরম কাঠ যে ভারতের জঙ্গলে নাই এমন নহে ( পাইন ও শিমূল কাঠ নরম )।

ইহা ছাড়াও রেশম ও লাক্ষা কীটপালন, চামড়া 'ট্যান' করিবার উপযুক্ত রস প্রস্তুত, নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, তৈল ও বার্ণিশের উৎপাদন ও নানাপ্রকার রাসায়নিক ভেষজ অরণ্যের **গৌণ উৎপাদন**।

বাংলা, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েক জাতীয় বৃক্ষে **লাক্ষাকীট** পোষণ করিয়া লাক্ষা উৎপাদন করা হয়। বার্ণিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করা, রেকর্ড প্রস্তুত, ছাপাখানার কাজ প্রভৃতি নানাকাজে এই লাক্ষা ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বাজারে লাক্ষা ব্যবসায়ে ভারতের প্রায় একচেটিয়া অধিকার বলিলেই হয়। অরণ্য পালিত এক জাতীয় কীট হইতে বন্য-রেশম উৎপন্ন হয়। নরম কাঠের গাছ হইতে প্রস্তুত কাষ্ঠমণ্ড কাগজ-শিল্পের প্রধান উপাদান। বাঁশের মণ্ড হইতেও কাগজ এবং কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হয়। ফার ও পাইন জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার রজনজাতীয় পদার্থ ও তারপিন তৈল উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ নানাপ্রকার শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান।

ম্যানগ্রোভ, বাবলা, হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, বিশেষতঃ চামড়া 'ট্যান' করিবার উপাদান প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া, বন্য পশুর লোম ও চর্ম এবং মধু প্রভৃতিও বিশেষ অরণ্য-সম্পদ।

নানাপ্রকার বনজ সম্পদ সরবরাহ করা ছাড়া বনভূমির অন্যান্য উপযোগিতাও

আছে। বনভূমির বারিপাত নিয়ন্ত্রণ, জল ও বায়ুপ্রবাহের তীব্রতা প্রশমন, গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা হ্রাস প্রভৃতি পরোক্ষভাবে দেশের আরও বেশি উপকার করে। ভারত সাধারণতন্ত্রের এই বিশিষ্ট সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য দেরাদুনে একটি অরণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ( Indian Forest Research Institute ) স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে—(১) গাড়ীর কামরা, স্লিপার, কাগজ ও জাহাজ নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ও (২) সস্তায় সংবাদপত্রের জন্য কাগজ তৈয়ারির কাষ্ঠ লইয়া পরীক্ষা করা।

সুপরিকল্পিত উপায়ে বনজ সম্পদের উৎকর্ষ এবং পরিমাণ বাড়াইবার যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহা সার্থক হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র খুব সম্পদশালী হইবে। এই বনসৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়া বর্ষাকালে সারা ভারতে **বন-মহোৎসব** পালন করা হয়। বৃক্ষরোপণ ভারতের অতি প্রাচীন উৎসব। বর্তমানে সরকারের সহায়তায় দেশবাসী ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ আরম্ভ করিয়াছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই একান্ত প্রয়োজনীয় অরণ্য-সম্পদ উৎপাদনের মত অরণ্য ভারতে সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। এই উৎসবের মাধ্যমে দেশের অরণ্য-সম্পদ রক্ষণ ও বৃদ্ধির পক্ষে দেশের জনমতকে গঠন করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

**Q. 16. Why is afforestation necessary in certain parts of India ? What steps are being adopted in India for the conservation of forest resources ?**

**[ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অরণ্যসৃষ্টি করার প্রয়োজন হইয়াছে কেন? ভারতে অরণ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে? ]**

**বৃক্ষ রোপণ**—মানুষের জীবনে অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা নানা দিক হইতে প্রত্যক্ষ করা যায়। খাদ্য, পরিধেয় এবং বাসগৃহের জন্য আদিম মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অরণ্যের উপর নির্ভর করিত। বর্তমানে অরণ্যের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা অনেকাংশে পরোক্ষ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অরণ্যের প্রয়োজন একেবারেই কমিয়া যায় নাই। যখন পৃথিবীতে লোকসংখ্যা অল্প ছিল তখন অধিক বারিপাতযুক্ত স্থানসমূহ গভীর অরণ্যে এবং অন্যান্য স্থান তৃণভূমিতে ঢাকা ছিল। কিন্তু কৃষিকার্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জঙ্গল অনেকস্থানে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। ভারতে ও ইউরোপের সমতলভূমিতে কোথাও আদিম অরণ্যের চিহ্নমাত্র নাই। আমেরিকার ইতিহাসে যত দ্রুত বিপুল অরণ্য সম্পদ ধ্বংসের বিবরণ পাওয়া যায় তত আর কোথাও নহে। আধুনিক যুগে অরণ্য ধ্বংস করিবার কয়েকটি কুফল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। (১) অরণ্য বৃষ্টিপাতে

সহায়তা করে এবং বৃষ্টির জল মাটিতে ধরিয়া রাখিয়া উহাকে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে সাহায্য করে। সুতরাং, যেখানে অরণ্য কাটিয়া ফেলা হইয়াছে সেইখানেই বৃষ্টিপাত কমিয়া গিয়াছে। (২) অরণ্য মাটির ক্ষয় নিবারণ করে, সুতরাং অরণ্য কাটিয়া ফেলায় আলগা মাটি অনায়াসেই বর্ষার জলে ধুইয়া নদীগর্ভে পতিত হয়। ফলে, মাটির সর্বাপেক্ষা উর্বর উপরের অংশ ( top soil ) কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অনুর্বর অভ্যন্তরের মাটি ( sub-soil ) বাহির হইয়া পড়ে। (৩) এইরূপ ক্ষয় চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা কমিয়া যায়, অপরদিকে তেমনি নদীগুলি অগভীর হইয়া যায় এবং বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি করে।

ভারতের বহুস্থানেই অরণ্য নিঃশেষ হওয়ার ফলে উপরিউক্ত সমস্ত কুফলগুলিই আজ দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য বর্তমান যুগের একমাত্র প্রতিকার **বৃক্ষরোপণ** ( afforestation )। অরণ্য শিকড়দ্বারা মাটিকে ধরিয়া না রাখিলে বৃষ্টির ফলে মাটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমতলভূমি অপেক্ষা পার্বত্য ভূমিতে মাটি ক্ষয় দ্রুত সম্পন্ন হয়। পার্বত্য অংশের মাটি ও পাথরের যোগানের উপর সমভূমি ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির কার্যকলাপ বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুতরাং, প্রথমে প্রয়োজন পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য অরণ্য রোপণ করা।

মানুষ নানাকারণে পার্বত্য বৃক্ষরাজি কাটিয়া ফেলে। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার প্রভাব যখন পার্বত্য অঞ্চল সমূহে পৌছায় নাই, তখন এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা ( সাঁওতাল, কোল, ভিল প্রভৃতি ) শিকার করিয়া ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিত। কিন্তু ক্রমশঃ যখন উহারা আর্যগণের নিকট হইতে কৃষিকার্য শিখিল তখন পার্বত্য অরণ্যে আগুন লাগাইয়া ঐ সকল ভস্মের উপর নানারূপ ফসল চাষবাস আরম্ভ করিল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্বতগাত্রের মাটি নদীগর্ভে পতিত হইয়া অধিক পরিমাণে সমতলভূমির দিকে নীত হইতে লাগিল। মহানদী ও দামোদরের ভয়ংকর বন্যা ও ভাগীরথী নদী মজিয়া যাওয়ার ইহাই মূল কারণ।

বর্তমানে বৃক্ষ পুনঃরোপণ সহজ নয়; কারণ অনেক স্থান হইতে ইতোমধ্যে সমস্ত মাটি ক্ষয় হইয়া প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবে অতি সত্বর যাহা বাড়িয়া উঠে এমন বৃক্ষ রোপণ করিলে ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। বৃক্ষের শিকড় প্রস্তর ফাটাইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মাটি সৃষ্টি করে। অরণ্যের অভাবে সেই মাটি মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমুদ্রে নীত হয়।

বৃক্ষরোপণ সবচেয়ে বেশি দরকার পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল স্থানে নদীর উপর ড্যাম ( dam ) নির্মাণ করিয়া জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে। অরণ্যের অভাবে ঐগুলি অকেজো হইয়া যাইতে পারে। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও অরণ্য রোপণের

প্রয়োজনীয়তা অপরাপর স্থানেও রহিয়াছে। রাজস্থানের মরুভূমির পূর্ব সীমান্তে ও সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ির উপরেও বৃক্ষরোপণ করা একান্ত প্রয়োজন। বালি বায়ুর দ্বারা ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এইরূপে থর মরুভূমির বালুকা উত্তর-প্রদেশের অনেক ক্ষেত্রকে অনুর্বর করিয়াছে এবং করিতেছে। অচিরাৎ ইহার প্রতিকারের জন্য এই সমস্ত স্থানে কাঁটা জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া কৃষি ক্ষেত্রগুলিকে রক্ষা করা দরকার।

ফ্রান্সের লাঁদ জেলার সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িগুলি এক সময় সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্সকে গ্রাস করিতে বসিয়াছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসরে একপ্রকার পাইন গাছ রোপণ করিয়া এই সঞ্চারমান বালিয়াড়িগুলির অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হইতেছে। ভারতের তটরেখার বিভিন্ন স্থানে ( যথা—উড়িষ্যার তটে ) ঝাউগাছ রোপণ করিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অরণ্য রোপণের আর একটি দিকও আছে। উহা অরণ্যের কাঁচামাল সরবরাহের উন্নতি সাধন। ভারতে মাত্র ২২ ভাগ জমিতে অরণ্য আছে তাহার মধ্যে ১১ ভাগ প্রকৃত ভাল অরণ্য। সুতরাং অরণ্য বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ অরণ্য হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া কাগজ, দেশলাই, রেয়ন, আসবাব-পত্র এবং কাঠ কয়লা প্রস্তুত করা গেলে উহা দেশের শিল্পোন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্যে করিবে। সুতরাং কেবলমাত্র অরণ্য রোপণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না, উহার সংরক্ষণের ( conservation ) প্রয়োজন হইবে। অরণ্যের সত্যকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াই প্রাচীন হিন্দুগণ বৃক্ষরোপণকে এক ধর্মানুষ্ঠানে পর্যবসিত করিয়াছিলেন।

**বনসংরক্ষণ** ( conservation of forest )—বর্তমানে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অরণ্য সংরক্ষণ কিজন্য একান্ত প্রয়োজন তাহা আজও মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতে শিখিতেছে। ভারতেও সরকার ও জনগণের মধ্যে এই চেতনার উন্মেষ ক্রমশঃ লক্ষ্য করা যাইতেছে। যে সকল ব্যবস্থা ভারত সরকারের বনবিভাগ এখন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল—(ক) অরণ্য হইতে যথেচ্ছ গাছ কাটা বন্ধ করা। (খ) অরণ্য অঞ্চলে পথ নির্মাণ করিয়া সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। (গ) দাবানল নিবারণের ব্যবস্থা করা। (ঘ) গাছ কাটা ও চারা গাছ রোপণ করার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। (ঙ) অরণ্য বিভাগের কর্মচারীগণ যে সকল অসুবিধার মধ্যে কাজ করেন সেগুলি ক্রমশঃ নিবারণ করা। (চ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা।

প্রয়োজনের তুলনায় এই সকল ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল সন্দেহ নাই তবু আজ এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহা খুবই আশার কথা।

**Q. 17. Bring out the relationship that exists between rainfall and the distribution of forest in India. What are the principal forest products of India ? Why the forest products are not being properly utilized at present ?**

**[ ভারতের বৃষ্টিপাত এবং অরণ্যের অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। ভারতে প্রধান প্রধান অরণ্যজাতদ্রব্য কোনগুলি ? অরণ্যজাতদ্রব্যগুলি ঠিক মত ব্যবহার হইতেছে না কেন ? ]**

বৃক্ষমাত্রেই বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন বৃক্ষের জলের প্রয়োজনের তারতম্যও যথেষ্ট। কোন গাছ অতিবর্ষণ অঞ্চলে জন্মে। শুষ্ক অঞ্চলে উহার অঙ্কুর উদ্গম পর্যন্ত হয় না, আবার কোন গাছ শুষ্ক অঞ্চলেই ভাল হয়। অতি বর্ষণযুক্ত স্থানের বৃক্ষের পাতা ঝরে না এবং বৃক্ষ দীর্ঘ হয়। অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে সাধারণতঃ পাতা ঝরা গাছ দেখা যায়।

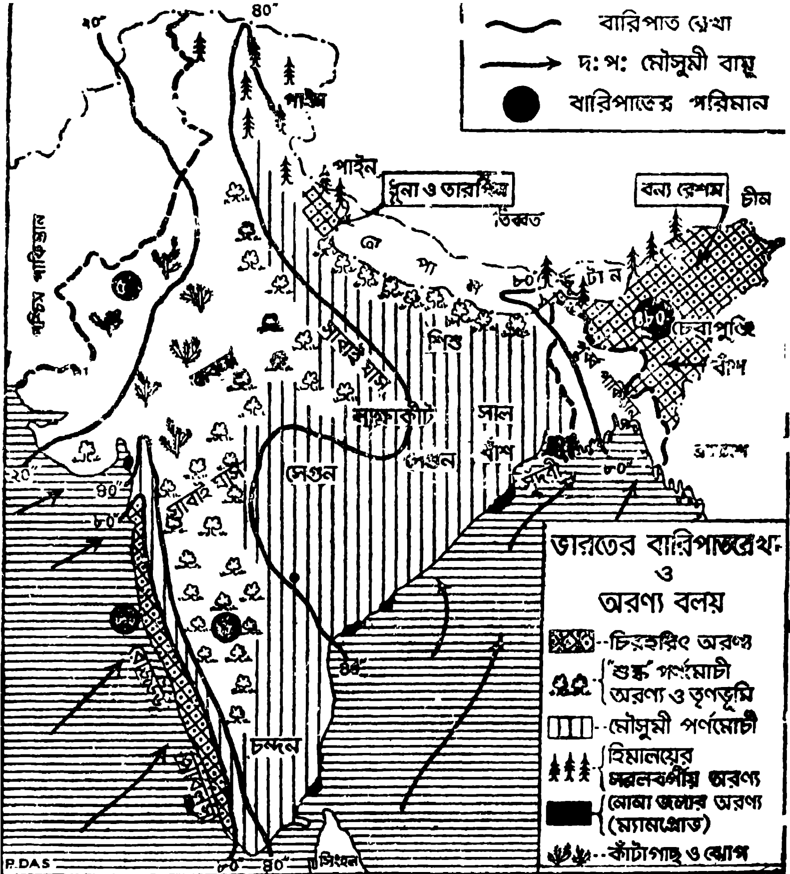
### বৃষ্টিপাত এবং ভারতের উদ্ভিদ জীবন

| | | |
|---|---|---|
| (১) | ২০০ সেন্টিমিটার ও ততোধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে | চিরহরিৎ অরণ্য |
| (২) | ১০০ হইতে ২০০ সেন্টিমিটার " | মৌসুমী-মিশ্র পাতাঝরা অরণ্য |
| (৩) | ৯০ হইতে ১০০ " " ( প্রধানতঃ শীতকাল ) | "শুষ্ক" চিরহরিৎ অরণ্য |
| (৪) | ৫০ হইতে ১০০ " বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে | "শুষ্ক" পাতাঝরা গাছ ও দীর্ঘ তৃণযুক্ত ভূমি |
| (৫) | ৫০ সেন্টিমিটারের কম " " | কাঁটাগাছ ও ঝোপ |

**উষ্ণমণ্ডলের চিরহরিৎ অরণ্য** আসাম, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের পাদদেশে দেখা যায়। এই অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ৭ মাস ধরিয়া প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং আবহাওয়া বেশ উষ্ণ। গাছগুলি উচ্চ ও সতেজ এবং লতাপাতায় ঢাকা। **গর্জন, চাপলাস্, জারুল, আবলুস, চন্দন** প্রভৃতি গাছ ঐ অরণ্যে দেখা যায়। গর্জন গাছের **তৈল**, চাপলাসের **মজবুত ও ভারী কাঠ**, জারুলের **নৌ-নির্মাণ** উপযোগী কাঠ, আবলুসের **কৃষ্ণবর্ণ** সুন্দর ক্যাবিনেট কাঠ ও চন্দনের **সুগন্ধি তৈলই** এ অরণ্যের প্রধান সামগ্রী। তাহা ছাড়া, **চালমুগরার তৈল,** নানা প্রকার পাম তৈল, **বন্য রেশম, মধু** এবং কাগজ প্রস্তুতের জন্য **বাঁশ** প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

**মৌসুমী পাতাঝরা** বন বাংলাদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কেরল, মহীশূরের কতকাংশ প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। এই অঞ্চলে জুনের শেষ হইতে

সেপ্টেম্বরের আরম্ভ পর্যন্ত বর্ষাকাল। **শীতকাল শুষ্ক ও শীতল এবং গ্রীষ্মকালে গরম** খুব বেশি। **শাল, সেগুণ, শিরিষ, শিশু, পলাশ, মহুয়া** প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষ এই অরণ্যে দেখা যায়। শাল কাঠ মজবুত ও ভারী বলিয়া ঘরবাড়ী নির্মাণের কাজে লাগে। **সেগুণ** পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঠ; আসবাব, **জাহাজ নির্মাণ,**




বিঃ দ্রঃ—মাদ্রাজের পূর্বতটে বারিপাত ৯০ হইতে ১৫০ সেন্টিমিটার। ঐ অঞ্চলে একপ্রকার 'শুষ্ক' চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়।

**রেলগাড়ির বগি ও রেলের স্লিপার** নির্মাণ প্রভৃতি যে কোন কাজেই ইহা শ্রেষ্ঠ। মধ্যপ্রদেশ ও নেপালেই অধিক সেগুণ কাঠ পাওয়া যায়। অবশ্য ব্রহ্মদেশের

সেগুণ কাঠ সর্বোৎকৃষ্ট। **শিশু** কাঠে আসবাবপত্র ভালই হয়। **পলাশ** গাছের শাখায় উৎপন্ন **লাক্ষা** এই অরণ্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ।

মাদ্রাজ উপকূলে বৃষ্টিপাত মাত্র ১০০ সেন্টিমিটার কিন্তু অধিকাংশ বৃষ্টিই শীতকালে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হয়। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অল্প বৃষ্টি হয়। এত কম বৃষ্টিতে চিরহরিৎ অরণ্য সৃষ্টি হওয়া খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এই অরণ্য বর্তমানে লুপ্তপ্রায়, কারণ এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতেই চাষ-আবাদ হইতেছে।

**"শুষ্ক" পাতাঝরা অরণ্যের** মাঝে মাঝে ছাডা ছাড়া অরণ্য এবং **দীর্ঘ ও কর্কশ তৃণযুক্ত ভূমি** ( Savanna ) দেখা যায়। অরণ্যের গোড়া পরিষ্কার এবং শীতকালে কোন গাছেই পাতা থাকে না। এই অরণ্য মধ্যভারতে, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের কতকাংশে দেখা যায়। এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীত ও গ্রীষ্ম দুইই বেশি এবং বৃষ্টি কম। শাল ও সেগুণ গাছ এই অরণ্যে যথেষ্ট জন্মে। ইহা ছাড়া আরও বহুপ্রকার বৃক্ষ দেখা যায়। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে এই প্রকার তৃণভূমি ও অরণ্য দেখা যায়। জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ অপেক্ষা পশুচারণ ও সাবাই ঘাস রপ্তানিই এই অরণ্যাঞ্চলের প্রধান ব্যবসায়। বহু কাগজের কল মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার সাবাই ঘাস সরবরাহের উপর নির্ভরশীল।

**কাঁটাগাছ ও ঝোপ** সাধারণত: রাজস্থান মরুভূমির প্রান্তে ও মধ্য দাক্ষিণাত্যের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে দেখা যায়। এখানকার গাছের মধ্যে **বাবলা** গাছই প্রধান। বাঁবলা কাঠ খুব মজবুত ও শক্ত। লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি নির্মাণে ইহা উৎকৃষ্ট। বহুপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় তাল জাতীয় গাছ এবং কাঁটা গাছও এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়।

উপরিউক্ত অরণ্যগুলি ছাড়াও ভারতে আরও দুইটি অরণ্যাঞ্চল আছে, যথা—*** হিমালয়ের অরণ্য ও ম্যানগ্রোভ অরণ্য**। কিন্তু ঐগুলি বৃষ্টিপাত অপেক্ষা ভূমির উচ্চতা ও মাটির গঠন দ্বারাই অধিক নিরূপিত হয়।

হিমালয়ের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা বদলাইতে থাকে। নিম্ন হইতে উচ্চে ক্রমশঃ শাল ও সেগুণ হইতে ফার, পাইন এবং দেবদারু প্রভৃতি বহুপ্রকার গাছ দেখা যায়। এই অরণ্যই ভারতে কাগজ উৎপাদনের উপযোগী নরম কাঠের

* চাম্পিয়ান ( Mr. H. S. Champion ) সাহেব হিমালয়ের অরণ্যকে উচ্চতা অনুসারে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(1) Sub-trop. Pine ( পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উঃ প্রদেশ, পঃ বঙ্গ ও আসাম-হিমালয় ) (2) Moist temperate ( মধ্য হিমালয় অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত মুখ্য হিমালয় অংশ ) (3) Dry temperate ( সমগ্র উত্তর হিমালয় )। (4) Alpine ( লাদাক ও তিব্বত সীমান্ত অঞ্চল—প্রধানতঃ তৃণভূমি ও সরলবর্গীয় অরণ্য )।

( স্প্রুস, হেমলক, পাইন প্রভৃতি ) প্রধান সংস্থান। কিন্তু এই সম্পদের সামান্য মাত্র এখনো পর্যন্ত কাজে লাগানো হইয়াছে।

ম্যানগ্রোভ অরণ্য ( tidal forest ) ব-দ্বীপ অঞ্চলে বা সমুদ্রতটে, নদীর মোহনার ও খাড়ির ধারের লবণাক্ত জলাভূমিতে দেখা যায়। এই অরণ্যে গরাণ, সুন্দরী, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বহুপ্রকার প্রয়োজনীয় বৃক্ষ জন্মে। এই সকল অরণ্যাঞ্চল হইতে নৌ-নির্মাণের কাঠ, জ্বালানী কাঠ, দেশলাই তৈয়ারীর কাঠ, মধু, নারিকেল ও সুপারী পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অপরাপর দেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতের অরণ্য সম্পদ খুব কম ( মোট জমির ২২ ভাগ )। ব্রেজিল, কানাডা ও রাশিয়ার অরণ্য সম্পদ ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষত: কতকগুলি অসুবিধার জন্য ভারত এখনও বহুপ্রকার অরণ্যজ দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী। (১) ভারতের অধিকাংশ অরণ্য এমন স্থানে অবস্থিত যে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ঐ অরণ্যজ কাঁচামাল আমদানি করা ব্যয়সাধ্য। (২) ভারতীয় অরণ্যে এত অধিক জাতীয় বৃক্ষ আছে যে উহাদের সম্যক ব্যবহার ঠিক করা সময়সাধ্য। (৩) এক জাতীয় বৃক্ষ প্রায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। শাল ও সেগুণ ইহার ব্যতিক্রম। সুতরাং ঐ দুই প্রকার বৃক্ষ প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। অথচ বহুপ্রকার বৃক্ষ কোন কাজেই লাগিতেছে না। (৪) ভারতের পাইন, ফার প্রভৃতি নরম কাঠের গাছগুলি হিমালয়ের এত উচ্চ ( ২০০০ হইতে ৪০০০ মিটার ) স্থানে অবস্থিত যে উহার প্রায় কোন কাজেই লাগিতেছে না। চায়ের প্যাকিং বাক্স কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত।

## ভারতের অরণ্যসম্পদ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

### বিভিন্ন রাজ্যে অরণ্যের পরিমাণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| অন্ধ্র | ১২ লক্ষ একর | কেরল | ২ লক্ষ একর |
| আসাম | ১৫ ,, ,, | মাদ্রাজ | ৪·৭ ,, ,, |
| বিহার | ৮ ,, ,, | মহীশূর | ৬·৪ ,, ,, |
| মধ্যপ্রদেশ | ৩৩ ,, ,, | পাঞ্জাব | ·৮ ,, ,, |
| উড়িষ্যা | ১০ ,, ,, | পশ্চিমবঙ্গ | ২ ,, ,, |
| রাজস্থান | ৩ ,, ,, | জম্মু ও কাশ্মীর | ১·৩ ,, ,, |
| ত্রিপুরা | ১·৫ ,, ,, | মোট | ১২৮·০২ ,, ,, |

## জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পনা

## IRRIGATION, HYDRO-ELECTRIC POWER & MULTIPURPOSE PROJECTS

**Q. 18. Give an account of the progress in the field of irrigation in India since independence.** ( C.U.B. Com. 1969 )

**[ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জলসেচের বিষয়ে যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও। ]**

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে বিরাট এবং ব্যাপক সেচব্যবস্থা ছিল ; বিশেষতঃ পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পূর্ব-উপকূলে অনেক বড় বড় সেচখাল ছিল। তাহা ছাড়া, দক্ষিণ ভারতের পূর্বভাগে পুষ্করিণী হইতে সেচ ব্যবস্থা এবং উত্তর ভারতের সমভূমিতে বলদের সাহায্যে কূপ হইতে সেচব্যবস্থা মোটামুটি ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা ছিল খুব কম। স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে সেচযুক্ত এলাকার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করা হয় এবং দামোদর, কোশি, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, ভাকরা-নাঙ্গাল, গণ্ডক, চম্বল, তাপ্তি, মহানদী, তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুনকোণ্ডা প্রভৃতি বহুসংখ্যক সেচ প্রকল্প হইতে বহু লক্ষ একর জমিতে বারোমাস সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া বর্ষায় সেচের জন্য প্লাবন খালগুলিও আছে।

কিন্তু নদীর জলসরবরাহ যথেষ্ট নহে এবং সমস্ত জল সেচের জন্য লইলে জলবিদ্যুৎ এবং নৌবাহনের অসুবিধা হইতে পারে। তাই ভারতে বর্তমানে সেচের প্রসারের প্রধান অবলম্বন হিসাবে ভূ-নিম্নের বিপুল জলভাণ্ডারকে কাজে লাগানো হইতেছে। কেবল পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতেই ৫০।৬০ হাজার বিদ্যুৎ চালিত নলকূপ সেচের কাজে ব্যবহার করা হইতেছে। উত্তর প্রদেশেও নলকূপ সংখ্যাতীত। বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রেও বহু সহস্র গভীর নলকূপ সেচের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। এবং বিদ্যুৎশক্তি ক্রমশঃ যত সহজলভ্য হইবে সেচের জন্য নলকূপের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইবে। সাম্প্রতিক "সবুজের বিপ্লবে" (green revolution) সেচের ভূমিকাই মুখ্য। তাহা ছাড়া, লক্ষ লক্ষ পাম্পের সাহায্যে নদী ও খাল-বিল হইতেও জমিগুলিতে প্রয়োজনমত জলসেচ দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এ সকল কিছুই ছিল না। [ ইহার সঙ্গে পরবর্তী প্রশ্নোত্তরের শেষ প্যারা যোগ কর। ]

**Q. 19. Describe the various methods of irrigation practised in India. Indicate the regions where each is practised.**

**[ ভারতে যে বিভিন্ন প্রকারের জলসেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাদের বর্ণনা দাও। কোন্ কোন্ স্থানে ঐগুলি প্রচলিত ? ]**

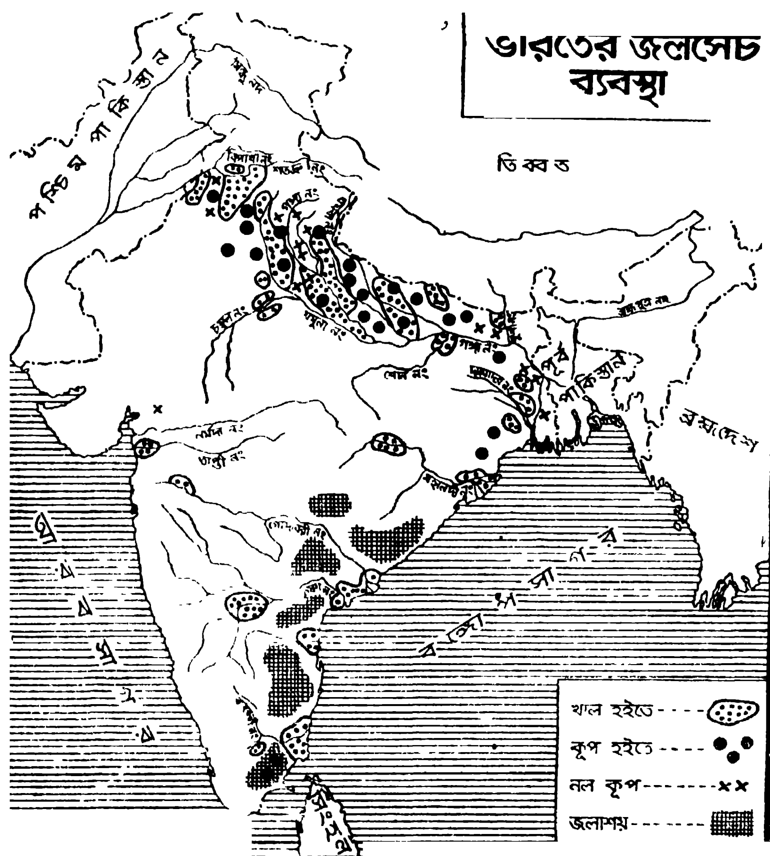
ভারতের সর্বত্র বৃষ্টিপাত সমানভাবে হয় না এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তাও খুব বেশি। বৃষ্টিপাতের এই অনিশ্চয়তার জন্য অজন্মা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা যায়। এইজন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে ; যথা—(১) নদী হইতে খাল কাটিয়া (২) পুকুর বা কৃত্রিম জলাশয় স্থাপন করিয়া এবং (৩) কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া।

(১) **খাল**—জলসেচের উপায়গুলির মধ্যে নদী হইতে খাল দ্বারা জলসেচ ব্যবস্থাই প্রধান। আধুনিক কালে বাঁধের ( barrage ) সাহায্যে নদীর জলের তল ( level ) উচ্চ করিয়া উহার জল খাল দিয়া চাষের জমিতে সরবরাহ করা হয়। উত্তর ভারতের নদীগুলিতে বার মাস জল থাকায় এই অঞ্চলে নদী হইতে কাটা খালের প্রচলন হইয়াছে। নদী হইতে কাটা খালগুলি আবার দুই রকমের হয় ; যথা—প্লাবন খাল ( inundation canal ) এবং নিত্যবহ খাল ( perennial canal )।

প্লাবন খাল—এই খাল সাধারণতঃ নদী হইতে বাহির হইয়া জমির উপর বা পাশ দিয়া চলিয়া যায়। বন্যার সময় এই সমস্ত খাল জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। নদী শুকাইয়া গেলে বা নদীর জল কমিয়া আসিলে যখন জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় তখনও এই ধরণের অস্থায়ী খালে যথেষ্ট বদ্ধ জল সঞ্চিত থাকে। তবে এই খালগুলি অনাবৃষ্টির সময় খুব নির্ভরযোগ্য হয় না।

নিত্যবহ খাল—নদীর জল বাঁধের সাহায্যে উচ্চ করিয়া খালে সরবরাহ করা হয় বলিয়া এই ধরণের খালে বৎসরের সকল সময়েই প্রয়োজন মত জল থাকে। ভারতের নিত্যবহ খালগুলির অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে বিপাশা এবং শিরহিন্দ খাল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের অনেকগুলি খালই প্লাবন খাল। ভারতের গঙ্গা এবং যমুনা নদীর নিকটে অবস্থিত পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলের খালগুলির প্রায় সবই নিত্যবহ খাল। উত্তরপ্রদেশের সার্দাখাল, উচ্চ ও নিম্ন গঙ্গা খাল, যমুনা খাল প্রভৃতি খাল হইতে বহু লক্ষ একর জমি জলসেচ লাভ করে। পাঞ্জাবের শিরহিন্দ খালও কয়েক লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করে। এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের মেথুর বাঁধ এবং কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের গ্র্যাণ্ড এ্যানিকাটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানেও খাল হইতে ( কাবেরী নদীর জল ) জল সেচ দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া, কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপে ভাল জলসেচ ( খাল হইতে ) ব্যবস্থা আছে।

দাক্ষিণাত্যে নদীগুলির উপর আড়াআড়ি ভাবে 'ড্যাম' বা বাঁধ নির্মাণ করিয়া জল ধরিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। পরিশেষে সঞ্চিত জল নিত্যবহ খাল দিয়া জমিতে প্রয়োজনমত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এগুলিকে ষ্টোরেজ ( Storage ) খাল




বলে। দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত দুর্গাপুরে বাঁধ ও ময়ূরাক্ষী নদীর তিলপাড়া হইতে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ একর জমি খালের জল পাইতেছে। মহানদীর হীরাকুঁদ বাঁধ এবং অন্ধ্র রাজ্যের তুঙ্গভদ্রা বাঁধ হইতে কয়েক লক্ষ একর জমি জলসেচ পাইতেছে। পাঞ্জাবে নাঙ্গাল খালগুলি হইতেও কয়েক লক্ষাধিক একর জমি জলসেচ পাইতেছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত খালগুলি হইতে রাজস্থানের উত্তর

ভাগেও জলসেচ দেওয়া যাইতেছে। কোশী পরিকল্পনা হইতে বিহারের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থারও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

(২) **পুষ্করিণী বা হ্রদের** সাহায্যে সেচকার্য সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যে এবং বাংলা ও বিহারের কোন কোন অংশে প্রচলিত আছে। যে সকল অঞ্চলে জমি সমতল নহে সেখানে খালদ্বারা সেচকার্য পরিচালনা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং, নালার মুখে বাঁধ দিয়া অথবা পুষ্করিণী খনন করিয়া জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। প্রয়োজনের সময় ঐ জল ক্ষেত্রে নালার সাহায্যে প্রবাহিত করা হয়। অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে কয়েকটি সুবৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ আছে। এইগুলি এবং এইরূপ আরও শত শত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় হইতে প্রায় সমগ্র অন্ধ্র, মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যে জলসেচ দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলায়ও এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়।

(৩) **কূপের** সাহায্যে সেচ-কার্যের প্রচলন সাধারণতঃ উত্তর ভারতেই বেশি দেখা যায়। ভারতের মোট সেচযুক্ত ভূমির এক চতুর্থাংশে কূপের সাহায্যে সেচকার্য পরিচালিত হয়। কূপ হইতে বলদের সাহায্যে জল তোলা হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে ভূমি নরম থাকে অথচ বর্ষায় কূপ সহজে ধ্বসিয়া পড়ে না বা ভূগর্ভের সামান্য নীচেই জল থাকে, কূপ খনন করিয়া সেচকার্য পরিচালনা করা সেই সমস্ত অঞ্চলেই সহজ। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের অনেকাংশে কূপের সাহায্যে সেচকার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে কয়েক হাজার বিদ্যুৎ-চালিত নলকূপ আছে। এক একটি খুব বড় **নলকূপের** সাহায্যে বর্তমানে দুই তিন শত একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যায়।

জলসেচ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য পরিসংখ্যান :—

| | ১৯৫১ | ১৯৬১ | ১৯৬৬ |
|---|---|---|---|
| বৃহৎ ও মধ্যম সেচ ব্যবস্থা | ২২ ( নিযুত একর ) | ৩১ | ৪২.৫ |
| ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা | ২৯.৫ | ৩৯ | ৪৭.৫ |

১৯৫৭ সালে ভারতে মোট ৫৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হইত। ১৯৬১ সালে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ৭০০ লক্ষ একরে এবং ১৯৬৬ সালে উহা দাঁড়ায় ৯০০ লক্ষ একরে। এই সেচ ব্যবস্থা ২০০০ একরে পৌঁছাইয়া দিবার মত সংস্থান ভারতের আছে স্থির হওয়ায় ক্রমশঃ সেচের পরিমাণ বাড়ানো হইতেছে।

**Q. 20. Describe the irrigation system of West Bengal, Punjab and Uttar Pradesh.**

**[ পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের সেচ ব্যবস্থার বর্ণনা কর। ]**

ভারত বিভাগের পূর্বে পাঞ্জাবেই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল জলসেচ

ব্যবস্থা ছিল। প্রধানতঃ খাল দ্বারাই জলসেচের কাজ চলিত এবং তাহার সঙ্গে কূপ এবং নলকূপও কোন কোন অঞ্চলে ছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে এই সেচ ব্যবস্থার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই অসুবিধা হইয়াছে।

**পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা কম নয়। বীরভূম, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় এই অনিশ্চয়তা বেশি। বর্তমানে এই জেলাগুলি **দামোদর ও ময়ুরাক্ষী** হইতে সেচ পাইতেছে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর **কংশাবতী** হইতে সেচ পায়। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে টিউবওয়েল সেচ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার হইতেছে। বাঁকুড়ায় পুকুর হইতে সেচ উল্লেখযোগ্য।

**পাঞ্জাব**—এখানে চারিটি প্রধান খাল রহিয়াছে (১) আপার বারি দোয়াব খালের অধিকাংশ (২) শতদ্রু নদী হইতে উৎপন্ন বিখ্যাত **শিরহিন্দ খাল**—নাঙ্গাল খাল সহ। (৩) যমুনা নদীর পশ্চিম পারে **পশ্চিম যমুনা** (৮৫৫০০০ একর জলসেচ) **খাল**। এই খালটি এখন হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত। ইদানিং নাঙ্গাল নামক স্থানে শতদ্রু নদীতে এক বিশাল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধের পশ্চাৎ হইতে নাঙ্গাল হাইডেল ক্যানাল আসিয়া শিরহিন্দ খালে যুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে পাঞ্জাব রাজ্যের এক বিরাট অঞ্চলে সুন্দর জলসেচ ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাকরা বাঁধ নির্মাণ শেষ হওয়ায় এই অঞ্চলের জলসেচ ব্যবস্থা বারমাস চলিতেছে এবং জলবিদ্যুৎশক্তি পরিচালিত নলকূপ হইতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

**উত্তর প্রদেশ**—ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশের সেচ ব্যবস্থা সবচেয়ে ব্যাপক। এখানে খাল, কূপ ও নলকূপ এই তিন প্রকার সেচ ব্যবস্থাই বিশেষ উন্নত। প্রধান খালগুলির নাম (১) **পূর্ব যমুনা খাল**—ইহা দ্বারা চার লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। (২) **উচ্চ ও নিম্ন গঙ্গা খাল**—ইহা ভারতের বৃহত্তম জলসেচ ব্যবস্থা। এই খালগুলি হইতে মোট ৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। হরিদ্বারের নিকট উচ্চ খালটির ধারা আরম্ভ হইয়াছে। (৩) **আগ্রা খাল** প্রায় তিন লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছে। (৪) **সারদা খাল** হইতে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যস্থ দোয়াবে ১৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। এই খালটি আরও সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বিদ্যুৎশক্তিও পাওয়া যায়। (৫) তাহা ছাড়া **বেত্তোয়া, কেন** প্রভৃতি নদী হইতেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছে। গঙ্গা ও রামগঙ্গা নদীদ্বয়ের মধ্যে কয়েক হাজার নলকূপের সাহায্যে প্রচুর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। মোরাদাবাদ অঞ্চলে সহস্রাধিক নলকূপ আছে। অন্যত্র কূপ হইতে জলসেচ দেওয়া হয়।

**Q. 21. Give an account of the more important irrigation projects in India.** ( C. U. B. Com. 1957 )

[ **সাম্প্রতিক যে সকল সেচ প্রকল্প শেষ হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে লিখ।** ]

ভারত মৌসুমী বায়ুর দেশ; এখানে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচের একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ কেবলমাত্র আসাম, উত্তরবঙ্গ ও মালাবারের অতিবৃষ্টি অঞ্চল ব্যতীত সর্বত্রই বৃষ্টির অভাব দেখা যায় এবং তাহার ফলে শস্যহানি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র ভারতের ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ একর কৃষিজমির সর্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। দেশের সমস্ত নদী, কৃত্রিম জলাশয় ও ভূনিম্নস্থ জলসম্পদকে যদি কাজে লাগানো সম্ভব হয় তবু সম্ভবতঃ ১৫ কোটি একর জমিতে মাত্র বারমাস জলসেচ দেওয়া যাইতে পারে।

**পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির** প্রণেতাগণ কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। **দ্বিতীয় পরিকল্পনা** কালের শেষে ভারতে মোট ৭ কোটি একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচপরিকল্পনা-গুলির মধ্যে পুরাতন খাল ও মজা পুকুর সংস্কার, নূতন কূপ ও বিদ্যুৎচালিত নলকূপ স্থাপন বা ক্ষুদ্র জলাধার নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির অধিকাংশই জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমের সাহায্যে জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ার কথা। যে সকল বড় বড় নদী উন্নয়নমূলক বহুমুখী ( multipurpose ) পরিকল্পনার কাজ প্রথম পরিকল্পনাকালে আরম্ভ করা হয় সেগুলির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও চলিতে থাকে। ইহা ছাড়া কতকগুলি নূতন পরিকল্পনা, যথা—**নর্মদা, বিপাশা, গণ্ডক** প্রভৃতিও আরম্ভ করা হয়।

ভারতে যে সকল বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্যে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হইল—(১) দামোদর পরিকল্পনা (২) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (৩) মহানদী পরিকল্পনা (৪) তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা (৫) ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাগুলির জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল—

(১) **দামোদর**—দামোদর পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গে দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাইবে। দামোদর ও উহার উপনদীগুলিতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধগুলি তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেত নামক স্থানে অবস্থিত। ঐ বাঁধগুলির জল ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দুর্গাপুরে ব্যারেজের পশ্চাতে সঞ্চিত করা হয় এবং ঐ জলের সাহায্যে বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় জলসেচ দেওয়া হয়। বর্তমানে সাত লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া, বিহারের অন্তর্গত মাইথন, কোনার, তিলাইয়া

ও পাঞ্চেত জলাধার হইতেও পাম্পের সাহায্যে কিছু পরিমাণ জমিতে জলসেচ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) **ময়ূরাক্ষী**—পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে এই পরিকল্পনা হইতে জলসেচ দেওয়া হইতেছে। এই পরিকল্পনাটির কার্য শেষ হইয়াছে। তিলপাড়া ব্যারেজ হইতে সেচ খালগুলি আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ছাড়া দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর ও কোপাই নদীতেও ক্ষুদ্রাকার সেচ বাঁধ আছে। বিহারে মাসাঞ্জোরের কানাডা বাঁধে জল সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা আছে।

(৩) **মহানদী**—এই নদীটি উড়িষ্যায় অবস্থিত। এই নদীর ঊর্ধ্বপ্রবাহ অঞ্চলে হীরাকুঁদ বাঁধের কাজ শেষ হওয়ায় সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হইতেছে। মহানদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে টিকেরপাড়া ও নারাজ নামক স্থানে আরও দুইটি বাঁধ দিয়া ব-দ্বীপ অঞ্চলেও জলসেচ ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৪) **তুঙ্গভদ্রা ও নাগার্জুন সাগর**—কৃষ্ণা নদীর অববাহিকায় তুঙ্গভদ্রা নামক উপনদীর উপর তুঙ্গভদ্রা বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহা হইতে রয়ালসীমা অঞ্চলে প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়। কৃষ্ণা নদীর উপর নাগার্জুন সাগর বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। অন্ধ্ররাজ্যে কৃষ্ণা নদীর নিম্ন উপত্যকা এই বাঁধ হইতে সেচ পাইতেছে।

(৫) **ভাকরা-নাঙ্গাল**—পাঞ্জাবের শতদ্রু নদীতে ভাকরা বাঁধ ও নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাটি ভারতের বৃহত্তম সেচ পরিকল্পনা। মোট প্রায় ৩৭ লক্ষ একর জমি ইহার ফলে জলসেচ লাভ করিতেছে। নাঙ্গাল হাইডেল খাল পার্বত্যভূমি হইতে যেখানে পাঞ্জাবের সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে সেখান হইতে সেচখালগুলি আরম্ভ হইয়াছে। শিরহিন্দ খালের সঙ্গে এই খালগুলির যোগ আছে। ভাকরা জলাধার নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ায় এই সেচখালগুলি রাজস্থানের উত্তরভাগে বিস্তৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া, নাঙ্গালের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া বহু নলকূপও পাঞ্জাবে সেচের জল সরবরাহ করিতেছে।

---

## বহুমুখী পরিকল্পনা (MULTIPURPOSE PROJECTS)

**Q. 22. What is meant by the term multipurpose river porject ? Illustrate your answer with suitable examples from India.**

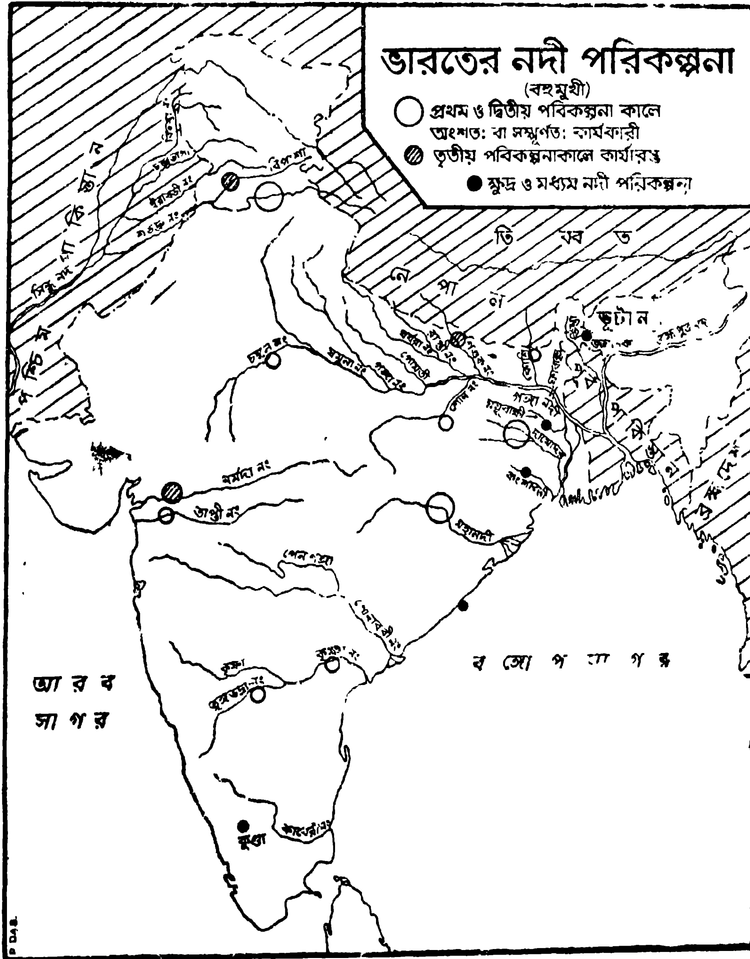
[ **বহুমুখী নদী প্রকল্প বলিতে কি বুঝায় ? উপযুক্ত উদাহরণসহ বুঝাইয়া লিখ।** ]

**বহুমুখী পরিকল্পনা**—যে নদী পরিকল্পনা হইতে দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হয় তাহাকে বহু উদ্দেশ্যসাধক বা বহুমুখী পরিকল্পনা বলা হয়। নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া নদীর ধ্বংস ক্ষমতাকে গঠনমূলক কার্যে ব্যবহার করাই এইরূপ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। নদী হইতে মানুষ যে এত প্রকার উপকার পাইতে পারে, তাহা এতদিন অজ্ঞাত ছিল। আমেরিকায় টেনিসী নদী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইলে আমাদের দেশে প্রথম অনুরূপ জলশক্তি নিয়ন্ত্রণের কথা শুনা যায়। বর্তমানে দামোদর, কংশাবতী, মহানদী, শতদ্রু, কোশী, বিপাশা, চম্বল, রিহান্দ, গণ্ডক, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীতে অনুরূপ কার্য চলিতেছে অথবা সমাপ্ত হইয়াছে। নদী হইতে জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তি, জলপথের সুবিধা, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বহু প্রকার সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া এই নদী পরিকল্পনা-গুলির নাম বহুমুখী বা বহু উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাগুলির শেষে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে :—

(১) যে সমস্ত নদী বর্ষার সময় **বন্যা** সৃষ্টি করে ও শীতের শেষে বালুরেখায় রূপান্তরিত হয় সেগুলিতে বারমাস কিছু পরিমাণ জলপ্রবাহ বজায় থাকিবে এবং প্রধান সেচ খালগুলিতে **নৌবাহনেরও** ব্যবস্থা থাকিবে। (২) বন্যা প্রায় বন্ধ হইবে। (৩) বড় বড় খাল কাটিয়া লক্ষ লক্ষ একর জমিতে বারমাস **সেচব্যবস্থা** করা যাইবে এবং (৪) জলবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহার সাহায্যে (ক) **টিউবওয়েল** পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা ও (খ) নানাপ্রকার শিল্প ; যথা—কাগজ, চিনি, কাপড়, এ্যালুমিনিয়াম এবং সারের কারখানা প্রভৃতি চালান সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া মাছের চাষ, পথ নির্মাণ, অরণ্য রোপণ এবং স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন প্রভৃতি করা যাইবে।

বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণকালে প্রথমতঃ নদীর পার্বত্য অংশে বিভিন্ন উপনদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকান হয়। বন্যার সময় জল জমিয়া বাঁধের ( Dam ) পশ্চাতে বিশাল জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ঐ জল কৃত্রিম জলাশয়ে যদি ধরিয়া

রাখা না হইত তবে নদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে বন্যা হইতে পারিত। এই জলাশয় হইতে বারোমাস প্রয়োজন মত জল, বাঁধের উপর হইতে জলপ্রপাত আকারে ছাড়িয়া নদীতে জল-সরবরাহ বজায় রাখা হয় এবং পাইপের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে




পাঠাইয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। নদী যখন প্রায় সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে তখন আর একটি বাঁধ ( Barrage ) দিয়া নদীর জলকে কয়েক ফুট উপরে উঠাইয়া লওয়া হয়। এই কৃত্রিম বন্যার জলঃ বারোমাস ধরিয়া শত শত

খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জমিতে সেচের জল যোগায়। অনেক সময় একটি বাঁধই dam ও barrage-এর কাজ করে অর্থাৎ জল ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিম হ্রদেরও সৃষ্টি করে; আবার খালগুলির মধ্য দিয়া ঐ জল ছাড়িয়া সেচ ব্যবস্থায়ও সাহায্য করে। ঐগুলিকে Composit dam বলা হয়; যথা—মাঙ্গাল বাঁধ।

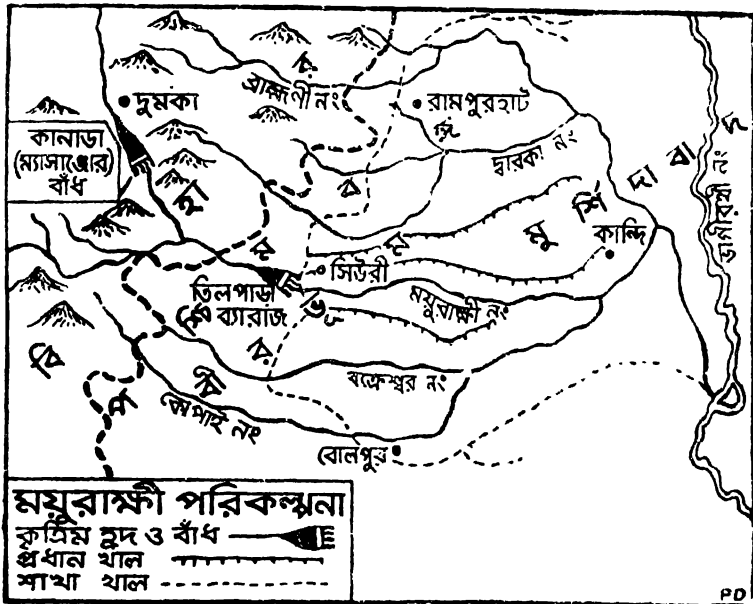
বহুপ্রকার কার্য একসঙ্গে করা হয় বলিয়া, এইরূপ পরিকল্পনার নাম **বহুমুখী পরিকল্পনা** (multipurpose project)। এইরূপ এক একটি পরিকল্পনা শেষ করিতে বহু কোটি টাকার প্রয়োজন হয়।

**কয়েকটি উদাহরণ—**

**মহানদীর হীরাকুঁদ** (Hirakud) **বাঁধ (উড়িষ্যা)**—মহানদী উড়িষ্যার বৃহত্তম নদী। বহু উপনদী এবং শাখানদী সহ ইহা সমগ্র উড়িষ্যার পার্বত্য ভূমি ও সমভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ইহা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে এবং বন্যার জলে বহু মাঠ ও গ্রাম ভাসাইয়া দেয়। সুতরাং ইহার এই ধ্বংসকারী শক্তিকে গঠন-মূলক কাজে লাগাইবার জন্য এই বাঁধ পরিকল্পনা করা হয়। **হীরাকুঁদ বাঁধের** নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতে বর্তমানে উড়িষ্যার সম্বলপুর ও বলাঙ্গির জেলায় সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া, প্রায় দেড় লক্ষ কিঃ ওঃ পরিমাণ জলবিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হইতেছে। ঐ বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর নিকটস্থ রাউরকেলার বিশাল ইস্পাত শিল্প এবং সম্বলপুরের এ্যালুমিনিয়াম কারখানা নির্ভর করিতেছে। হীরাকুঁদ ও মহানদীর অন্যান্য বাঁধের জল সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো হইলে বদ্বীপ অঞ্চলে প্রায় ১৬ লক্ষ একর জমিতে বারোমাস জলসেচ দেওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, হীরাকুঁদ এবং আরও দুইটি বাঁধ (নির্মিত হইয়াছে) হইতে আরও কয়েক লক্ষ কিলোওয়াট পরিমিত বিদ্যুৎ-শক্তিও পাওয়া যাইবে। হীরাকুঁদ বাঁধ ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ। মহানদীর নিম্ন প্রবাহ অঞ্চলে টিকেরপাড়া ও নারাজের বাঁধ দুইটিও নির্মাণ করা হইয়াছে। মহানদীর উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চলের সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ও বন্যানিরোধের জন্য ঐ বাঁধ দুইটি কাজে লাগে।

**ময়ূরাক্ষী** (**Mayurakshi**) **পরিকল্পনা (পশ্চিম বাংলা)**—ময়ূরাক্ষী নদী এবং উহার চারিটি উপনদী বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই নদীটি দেওঘরের অনতিদূরে ত্রিকুট পর্বত হইতে বাহির হইয়া কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। এই নদীর উপর দুইটি বাঁধ বাঁধিয়া ইহা দ্বারা ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, মাসাঞ্জোর বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে প্রায় ৪০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে। এই বিদ্যুৎশক্তি বীরভূমের নগর ও গ্রামগুলিতে সরবরাহ করা হইতেছে। সিউড়ির

নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি বৃহৎ সেচবাঁধ আছে এবং ১৯৫৩ সাল হইতে বীরভূম জেলায় জলসেচ দেওয়া হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণার ম্যাসাঞ্জোর নামক স্থানে কানাডা বাঁধ নামে একটি বাঁধ আছে। এই বাঁধটির জন্য কানাডা নানাপ্রকার যান্ত্রিক সাহায্য করে। কানাডা বাঁধ একটি বিশাল কৃত্রিম হ্রদের আকারে জল ধরিয়া রাখিয়াছে। তিলপাড়া বাঁধ ঐ জলকে সেচখালগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইতেছে। তিলপাড়া বাঁধ হইতে বীরভূম জেলা, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা ও বর্ধমান জেলার কতকাংশে ৬ লক্ষ একর ধান ও রবি শস্যের জমিতে জলসেচ দেওয়া যাইতেছে। ময়ূরাক্ষীর উপনদী কোপাই, বক্রেশ্বর, ব্রাহ্মণী ও দ্বারকার উপরেও ছোট ছোট সেচবাঁধ দেওয়া হইয়াছে। অনেকস্থানে বড় বড়




সেচখাল পুলের উপর দিয়া কতকগুলি নদীকে পার হইয়াছে। ঐগুলিকে Aquaduct বলে। ঐরূপ ব্যবস্থা কোপাই, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদীতে রহিয়াছে।

**কোশী ( Kosi ) পরিকল্পনা ( বিহার ও নেপাল )**—কোশী নদীকে বিহারের দুঃখ বলা হয়। কারণ পুনঃপুনঃ ইহার গতিপথ পরিবর্তনের জন্য উত্তর বিহার অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত খরস্রোতা ও বিশালকায়া নদী। নেপাল হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর বিহারের উপর দিয়া কোশী গঙ্গায় আসিয়া

পড়িয়াছে। নেপালের **ছাত্রা পরিখায়** (Chatra gorge) বাঁধ দিয়া এই দুর্দান্ত নদীটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্তু ঐ বাঁধ এখন নির্মাণ করা হইবে না। নেপাল-বিহার সীমান্তের নিকটে **ভীমনগরে** একটি সেচ-বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। উহা বন্যাকে আংশিকভাবে কমাইতেছে এবং বিহারে মোট ১৪ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করিতেছে। বর্তমানে কোশীনদীর বন্যার হাত হইতে উত্তর বিহারকে রক্ষার জন্য নদীর উভয় তীরে দুইটি প্রায় ১৫০ মাইল দীর্ঘ মাটির বাঁধ গাঁথা হইয়াছে।

**তুঙ্গভদ্রা (Tungabhadra) ও নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনা (অন্ধ্র)**—তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার একটি বড় উপনদী। স্বাধীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুবিশাল **তুঙ্গভদ্রা** বাঁধের সমাপ্তি। উহা অন্ধ্র রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। এই বাঁধের পশ্চাতের হ্রদ হইতে সেচ-খালগুলি আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদ্যুৎযন্ত্র বসানো হইতেছে। তুঙ্গভদ্রা হইতে বর্তমানে তিন লক্ষাধিক একর জমিতে সেচ দেওয়া হইতেছে। ইহা বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম কংক্রিট নির্মিত বাঁধ। কৃষ্ণা নদীর উপর আর একটি সুবিশাল বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। উহার নাম **নাগার্জুনসাগর** বাঁধ। এই বাঁধ সমগ্র কৃষ্ণা উপত্যকার নিম্নভাগে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। ইহাদের মধ্যে **সঙ্গমেশ্বরমে** কৃষ্ণার উপর একটি বাঁধ নির্মাণের কথাও আছে।

**কংসাবতী পরিকল্পনা (পশ্চিমবঙ্গ)**—এই নদী পরিকল্পনাটির কাজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের মধ্যে আরম্ভ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই ইহা প্রায় সমাপ্ত হয়। পুরুলিয়া জেলার পার্বত্য অঞ্চল হইতে কাঁসাই বা কংসাবতী (Kansabati) নদী বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর এই নদীটি মেদিনীপুর জেলার শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হলদি নাম ধারণ করিয়া হুগলী নদীর মোহানায় মিশিয়াছে। এই নদীর মুখেই হল্‌দিয়া বন্দর অবস্থিত। মেদিনীপুর জেলায় কাঁসাই নদীর কয়েকটি সেচখাল আছে; কিন্তু ঐ খালগুলি তেমন কার্যকর নয়। এই কারণে পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলার কয়েক স্থানে এই নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া প্রচুর জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে কালক্রমে এই নদী হইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে মোট প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া যাইবে। বাঁকুড়া জেলার **জোড়াবাড়িতে** কংসাবতী নদীর উপর এক বিরাট বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহা বন্যারোধ করিবে এবং জল ধরিয়া রাখিবে। প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে ক্রমশঃ সেচ দেওয়া সম্ভব হইবে। এই পরিকল্পনাটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্য সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে।

**অন্যান্য পরিকল্পনা**—উপরিউক্ত পরিকল্পনাগুলি বাদে পাঞ্জাবের **বিপাশা** (Beas Project—এটি ভারতে সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা, পঙ্গ এবং পাণ্ডোতে বাঁধ গাঁথা হইতেছে।) মধ্য প্রদেশের নর্মদা এবং বঙ্গ-বিহার সীমান্তে ফারাক্কার গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনার (Ganga Barrage Project) নির্মাণ কার্য চলিতেছে। অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষের দিকে সমাপ্ত হইতে পারে। শোন নদের উপনদী **রিহান্দ** নদীতে একটি ও মধ্য ভারতে **চম্বল** নদীতে দু'টি সুবিশাল বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলিতে প্রচুর জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই বাঁধগুলির উদ্দেশ্য। গুজরাট রাজ্যে **তাপ্তি নদীর** সেচ বাঁধটিও (কাকড়াপাড়া) শেষ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের সুবিশাল কোয়ানা (Koaana) পরিকল্পনার কার্যও শেষ হইয়াছে। মাদ্রাজের কুণ্ডা পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। উত্তর প্রদেশে কয়েকটি ছোট ও মাঝারি আকারের কংক্রিটের বাঁধের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। ঐগুলি গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত অনুর্বর অঞ্চলে জলসেচ দেওয়ার কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

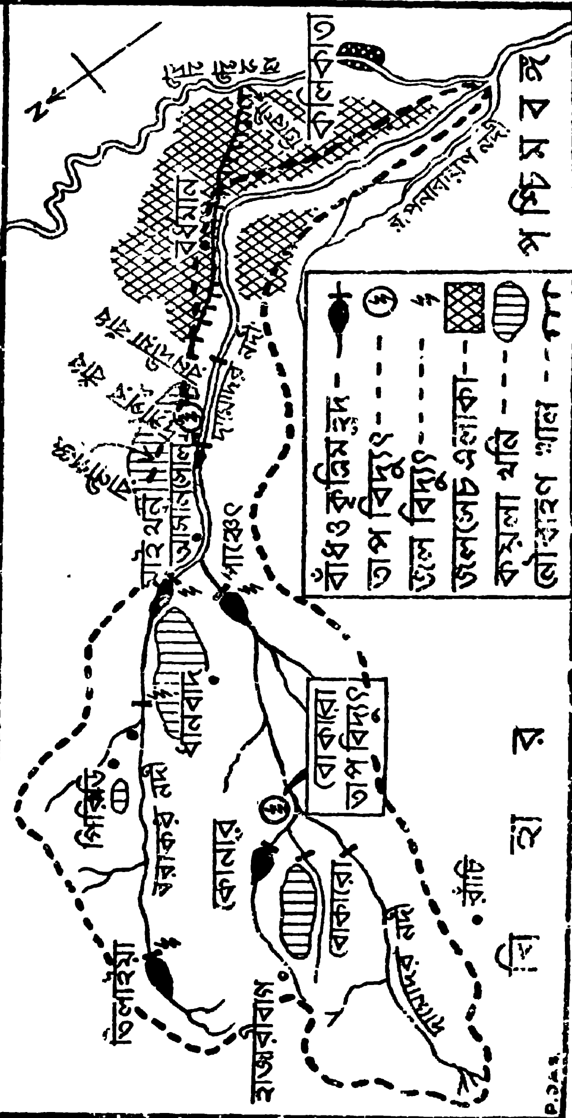
বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলি আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সুগম করিয়া দিতে পারে। কারণ খাদ্যশস্য ও কাঁচা মাল আমদানি বন্ধ করিতে পারিলে তবে সেই অর্থ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্যে লাগিতে পারিবে। সুতরাং, উক্ত পরিকল্পনাগুলিই ভবিষ্যতে ভারতবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে একথা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

**Q. 23. Discuss the importance of the Damodar Valley Project in the well-being of West Bengal and Bihar. Also, write a critical account of its implementation.**

**[পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের উন্নয়নে দামোদর প্রকল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ইহার রূপায়নের সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য কর।]**

**দামোদর পরিকল্পনা**—বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে বাহির হইয়া দামোদর পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর মোহানায় মিশিয়াছে। দামোদরের ভয়াবহ বন্যা রোধ করার জন্য দামোদর উপত্যকা প্রতিষ্ঠানের (D. V. C.) তত্ত্বাবধানে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বন্যার জলকে বাঁধের সাহায্যে পার্বত্য অঞ্চলে হ্রদের আকারে ধরিয়া রাখা এবং উহা হইতে জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও মৎস্য চাষ করা। তাহা ছাড়া, নৌবাহনযোগ্য খাল কাটা, অরণ্য রোপণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যও আছে।

দামোদরের প্রধান উপনদীগুলি বিহারে অবস্থিত। তিনটি প্রধান উপনদী হইল, **বরাকর, কোনার** এবং **বোকারো**। এগুলি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া




মানচিত্রে বাঁধগুলির সঙ্গে যে কৃত্রিম হ্রদগুলি রহিয়াছে ঐগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বোকারোর নিকটে নতুন তেনুঘাট বাঁধ অবস্থিত।

প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বামতীরে বরাকর নদী সর্বপ্রধান। এই নদীতে **তিলাইয়া** বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে যে হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দামোদরের বন্যাকে কতক পরিমাণে দমন করিতেছে, তাহা ছাড়া ঐ ৩২ মিটার উচ্চ বাঁধের উপর হইতে যে জল নামিতেছে তাহা হইতে ৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। বর্তমানে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের সমস্ত তাপ-বিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি একটি ব্যাপক সরবরাহ ব্যবস্থায় (grid) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—ইহার পশ্চিম সীমা ডালমিয়ানগর এবং পূর্ব সীমা কলিকাতা।

বরাকর নদী যেখানে বঙ্গ-বিহার সীমান্তে দামোদরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে তাহার অদূরে বিহারের মধ্যে বরাকরের উপর **মাইথন** নামক প্রধান বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। উহা ৬০ হাজার কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে। অদূরে দামোদরের উপর **পাঞ্চেত** বাঁধও মাইথনেরই মত বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ (৪০ হাজার কিঃ ওঃ) উৎপাদন করিতেছে। বিহারের বোকারো কয়লাখনির মধ্য দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। ঐ স্থানে বোকারো ও কোনার উপনদীদ্বয় অবস্থিত। কোনার নদীর উপর **কোনার** বাঁধ দেওয়া হইয়াছে (পূর্ব পরিকল্পিত কোনার ২ ও ৩নং বাঁধ নির্মাণ করা হইবে না)। কোনার বাঁধ বেশ উচ্চ। বোকারো বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকট একটি জলসঞ্চয়ের ব্যারাজও আছে। কোনার বাঁধটি **বোকারো তাপ-বিদ্যুৎ** কেন্দ্রকে (অর্থাৎ যে বিদ্যুৎ কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়) শীতল রাখিবার জল যোগাইতেছে। বোকারো বিদ্যুৎকেন্দ্রে খারাপ ও গুঁড়া কয়লা হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিঃ ওঃ তাপ-বিদ্যুৎ প্রস্তুত হইতেছে। আরও অধিক তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহা ছাড়া, চন্দ্রাপাড়া এবং দুর্গাপুরেও আর দুইটি অনুরূপ তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। দামোদর উপত্যকায় ভারতের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ একত্রেই ব্যবহার করিতে হইবে। দামোদর পরিকল্পনার প্রথম অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে শেষ হইলেও দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। বর্তমানে ডালমিয়ানগর, জামসেদপুর, আসানসোল ও খড়্গপুরের কারখানাগুলিতে ও কলিকাতার চারিদিকে রেলপথের জন্য দামোদর উপত্যকার তাপ ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে।

বাংলাদেশের মধ্যে দামোদর নদীর উপর দুর্গাপুরে একটি বিশাল সেচ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধের পশ্চাতে যে জল জমিয়াছে তাহা বণ্টন করিবার জন্য শত শত মাইল খাল কাটা হইয়াছে। উহার সাহায্যে বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইতেছে। একটি খাল

দিয়া **জলপথে** রাণীগঞ্জের কয়লা হুগলী নদী হইয়া কলিকাতায় পৌছিবে। দামোদর হ্রদগুলিতে ( যথা— তিলাইয়া, মাইথন ও কোনার ) **মাছের চাষ করা** হইয়াছে। এই হ্রদগুলি হইতে বিহার রাজ্যে কিছু পরিমাণ জমিতে জলসেচ দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া পথ নির্মাণ, জমি উদ্ধার ও অরণ্য রোপণ কার্যও চলিতেছে।

দামোদরের উপর বোকারো নদী-সঙ্গমের নিকটে **তেনুঘাটে** আর একটি জল সঞ্চয় বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য বোকারো ইস্পাত কারখানায় জল সরবরাহ করা।

দামোদর পরিকল্পনার সমালোচনা—সাম্প্রতিক কালে ভারতে দামোদর পরিকল্পনার নানা সঙ্গত ও অসঙ্গত সমালোচনা হইয়াছে। যাঁহারা সমালোচনা করেন তাঁহারা বলেন যে পরিকল্পিত সমস্ত বাঁধগুলি নির্মাণ করা না হওয়ায় দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন প্রবল বন্যা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হন নাই—তাহা ছাড়া অধিক লাভজনক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অধিক নজর দেওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলসেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই। দামোদর নদীর নিম্নপ্রবাহ দ্রুত মজিয়া যাইতেছে এবং হুগলী নদীর মোহানায় দামোদরের জল সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ায় কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হইতেছে।

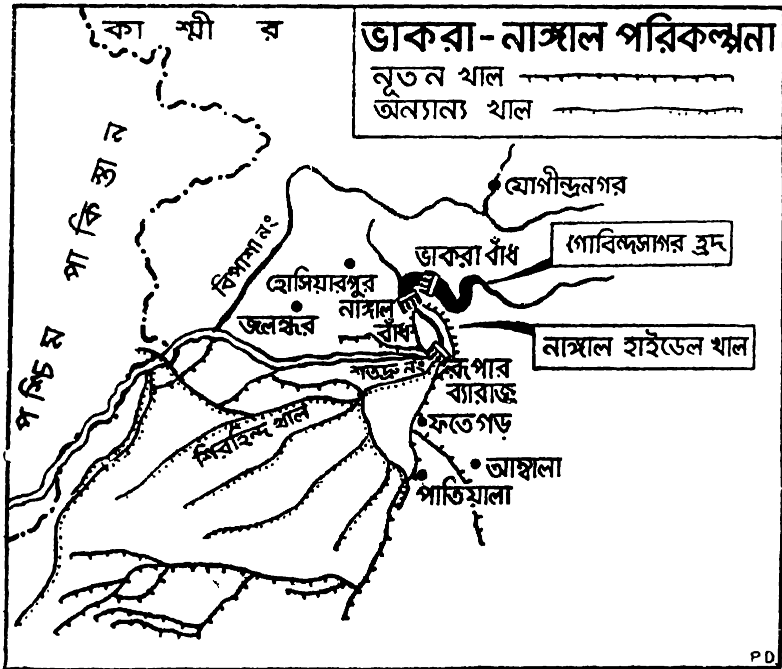
**Q. 24. What do you know of the Bhakra-Nangal Project? What areas have been benefited from this Project? What do you know of Rajasthan Canal Project?**

**[ ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প সম্পর্কে কি জান? এই প্রকল্প হইতে কোন্ কোন্ অঞ্চল উপকৃত হইয়াছে? রাজস্থান খাল প্রকল্প সম্পর্কে কি জান? ]**

হিমাচল প্রদেশের যে অংশে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত সেখানে শতদ্রু নদীর বিরাট গিরিখাত আছে। এই গিরিখাত দিয়া বিশাল শতদ্রু নদী হিমালয় পর্বতমালাকে ভেদ করিয়া তিব্বত হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই গিরিখাতে শতদ্রু নদীর জল কনক্রিটের বাঁধ দিয়া আটকাইয়া বর্ষার বাড়তি জলকে এক সুবিশাল ও সুগভীর হ্রদের আকারে ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উদ্বৃত্ত জল পাঞ্জাবের শুষ্ক জমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইতে পারিলে দেশে গম ও কার্পাস তুলার আর অভাব থাকিবে না। বর্তমানে শতদ্রু নদীতে দুটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। একটি বাঁধ রহিয়াছে গভীর গিরিখাতের মধ্যে —উহার নাম **ভাকরা বাঁধ**। অপরটি যেখানে শতদ্রু নদী পর্বত হইতে সমভূমিতে নামিতেছে তাহার ঠিক আগেই—ইহার নাম **নাঙ্গাল বাঁধ**।

নাঙ্গাল বাঁধ প্রায় ৩০ মিটার উঁচু। এই বাঁধের পশ্চাতে বর্ষার জল জমিয়া এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের

স্বাভাবিক প্রাচীর। এখান হইতে একটি বড় খাল কাটা হইয়াছে। এই খালটি প্রায় ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ইহার নাম **নাঙ্গাল হাইডেল খাল**। এই খাল এখন শিরহিন্দ খালে মিশিয়া উহার প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছে এবং প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব রাজ্য এবং রাজস্থানের উত্তরভাগের মরুপ্রায় অঞ্চলে জল সরবরাহ করিতেছে। শিরহিন্দ খালে পুরাতন জলসেচ ধরিলে মোট ৫৮ লক্ষ একর জমি সেচ পাইতেছে, বহু কোটি টাকার বাড়তি খাদ্য ফসল ফলিতেছে। তাহা ছাড়া, নাঙ্গাল হাইডেল ক্যানেল হইতে ( গঙ্গোয়াল ও কোটলা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ) বর্তমানে ৯৬ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। উহা দ্বারা কয়েক হাজার




পশ্চিমের সেচ খালটি রাজস্থান খাল

সেচের নলকূপ ও বহু শিল্প কারখানা চলিতেছে। সিমলা হইতে দিল্লী পর্যন্ত ছোট-বড় বহু গ্রামে ও শহরে আলোও জ্বলিতেছে।

শতদ্রুর গিরিখাতের উপর **ভাকরা বাঁধ** নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাঁধটি **পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম বাঁধ ( ৭৪০ ফুট )। উহার পশ্চাতে গোবিন্দসাগর** ( শুরু-

গোবিন্দের লীলাভূমি ) নামক প্রায় ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বাঁধ হইতে প্রায় ১০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। বর্তমানে কিছু বেশি ৭ লক্ষ কি: ও: বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শতদ্রুর দক্ষিণতীরে আরও ৩ লক্ষ কি: ও: শক্তিবিশিষ্ট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হইতেছে। বাঁধ প্রস্তুত কার্যের জন্য শতদ্রু নদীকে দুইটি বিরাট সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া বড় বড় পর্বত ভেদ করাইয়া অন্যদিকে প্রবাহিত করানো হইয়াছিল।

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি বড় সেচ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা। ইহার অল্প দূরে বিপাসা ( Beas ) নদীর উপরে আরও বড় এক পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। এই সকল বড় বড় পরিকল্পনার প্রভাবে পাঞ্জাবের মানচিত্রই বদলাইয়া যাইতেছে।

**রাজস্থান খাল পরিকল্পনা**—রাজস্থান মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তান সীমান্তের প্রায় সমান্তরাল এই সেচখাল সম্প্রতি নির্মাণ করা হইয়াছে। আশা করা যায়, যে প্রায় ২৬ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য জমি জলসেচ পাইবে। এই খাল বিপাশা ও শতদ্রুর সম্মিলিত ধারা হইতে উৎপন্ন। রাজস্থানের মরুপ্রান্তরে এই খাল ফসল ফলাইতে সাহায্য করিতেছে। সীমান্তের নিকটবর্তী এই অঞ্চলটিতে জল-সেচের ফলে জনসংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে সীমান্ত সুরক্ষিত হইবে। এই জনবিরল অঞ্চলে বাড়তি খাদ্যও ফলিবে।

**Q. 25. What do you know of the Ganga Barrage Project? Do you think it will help to improve the port of Calcutta and the waterway of the Hooghly?**

**[ গঙ্গা বাঁধ প্রকল্প সম্পর্কে কি জান? তুমি কি মনে কর যে ইহার ফলে কলিকাতা বন্দর এবং হুগলী নদীর নৌবাহনের সুবিধা হইবে? ]**

**ফারাক্কার গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা**—এই পরিকল্পনা ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৭১ সালে ইহা শেষ হইবে। ইহা পশ্চিমবঙ্গের তথা সমগ্র পূর্ব ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রধান কারণ দুইটি, যথা—(১) **পরিবহণের সুবিধা**—পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগকে গঙ্গানদীর বিশাল প্রবাহ পরস্পর হইতে পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ফারাক্কার নিকটে প্রস্তাবিত বাঁধ ( Barrage ) নির্মাণ করা হইলে উহার উপর দিয়া রেলপথ ও রাস্তা প্রস্তুত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দুই অংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হইবে [ মানচিত্র দেখ ]। (২) **নৌবাহনের সুবিধা**—বর্তমানে ফারাক্কার অদূরে ধুলিয়ানের কাছে যেখান হইতে ভাগীরথী গঙ্গানদীর প্রধান শাখারূপে

দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে সেখানে নদীটি স্বাভাবিক কারণে ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে। ফলে, বর্তমানে কেবলমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় গঙ্গানদীর সঙ্গে ভাগীরথীর কোন যোগই থাকে না—অন্ততঃ নৌবাহনের মত যোগাযোগ জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত কয়েক মাস ছাড়া অন্য সময় থাকে না। ইহার ফলে হুগলী ও ভাগীরথী হইয়া পূর্বের মত ষ্টীমারগুলি বার মাস উত্তর ভারতের পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি নদী বন্দরগুলিতে যাতায়াত করিতে পারিতেছে না। কলিকাতার নিকট হুগলী নদীতে ক্রমশঃই অধিক কাদামাটি ও বালুচর পড়িতেছে এবং সমুদ্রের নোনা জলের প্রভাবে এবং নদীর স্বাদু জলের অভাবে হুগলীর সুপেয় জল ক্রমশঃ এত অধিক পরিমাণে লবণাক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, কলিকাতা মহানগরীতে পানীয়-জল সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পানীয় জল দূষিত হওয়ায় নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। **কলিকাতা বন্দরটিও** ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে, কারণ ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে দামোদর, অজয় প্রভৃতি যে সকল নদী ভাগীরথী ও হুগলীতে মিশিয়াছে ঐগুলি কেবল মাত্র বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় নামমাত্র জলধারা আনিয়া দেয়। দামোদরের জল বর্তমানে সেচের কাজে খরচ হওয়ার ফলে হুগলীর মোহানায় গুরুতর জলাভাব দেখা যাইতেছে। অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী যে বালি ও কাদা ভাগীরথী ও হুগলী নদীতে নিক্ষেপ করে তাহার কতকটা জোয়ার ভাটায় ধুইয়া সমুদ্রে গেলেও অধিকাংশই নদীবক্ষে থাকিয়া যায় ও নৌ-চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কলিকাতা বন্দর হইতে সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত নদীপথ বড় জাহাজের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। অনেকগুলি 'ড্রেজার' জাহাজ সর্বদা পলি কাটিয়া নদীপথ পরিষ্কার করিতেছে। তবু নৌ-চলাচলের অসুবিধার

গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা

অন্ত নাই। কলিকাতা বন্দর রক্ষার ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া যাইতেছে। জাহাজগুলি শিক্ষিত পথ-প্রদর্শকের ( Pilot ) অধীনে ধীরে ধীরে বন্দরে প্রবেশ করে। জাহাজ যাতায়াত করিতে অনেক বেশি সময় লাগে। ইহাতে বন্দর হিসাবে কলিকাতার সুনামের হানি হইতেছে। সুতরাং, হুগলী নদীর উন্নতি সাধিত না হইলে ভবিষ্যতে কলিকাতা মহানগরী ও বন্দরের যথেষ্ট অবনতির সম্ভাবনা আছে।

উপরিউক্ত সমস্তাগুলির স্থায়ী সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে। তাহা হইল —গঙ্গা নদীর উপর বঙ্গ-বিহার সীমান্তের অদূরে ( পাকিস্তান সীমান্তের নিকট ) পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কায় একটি সুবিশাল কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই বাঁধ গঙ্গা নদীর কতকটা জল আটকাইয়া অবশিষ্টাংশ পাকিস্তানের পদ্মা নদীতে ছাড়িয়া দিবে। ফারাক্কা বাঁধের জল একটি খালের সাহায্যে গঙ্গা হইতে ভাগীরথীর উৎস মুখের কিছু দক্ষিণে সরবরাহ করা হইবে। এ নির্মল জল ( প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ হাজার ঘনফুট ) মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর শহরের উপকণ্ঠে ভাগীরথী নদীতে ( এখানে একটি সেতু-বাঁধ নির্মিত হইবে—যাহাতে ভাগীরথীর জল উজানে না চলিয়া যায় ) বারমাস সমানভাবে সরবরাহ করা হইতে থাকিলে ইঞ্জিনিয়ারগণ আশা করেন যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাগীরথীর ও হুগলী নদীর বালুচরগুলি ধুইয়া সাগরে চলিয়া যাইবে—নদী গভীর এবং বারমাস ষ্টীমার চলাচলের উপযুক্ত হইবে। এইরূপে কলিকাতা বন্দরের গভীরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং নদীগর্ভ হইতে পলিমাটি কাটার প্রয়োজন হয়ত আর নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া, কলিকাতায় নির্মল স্বাদু জল সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে শহরের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে। ফারাক্কার বাঁধে বর্ষার যে বাড়তি জল পাওয়া যাইবে তাহাতে হয়ত সেচের জলও সরবরাহ করা যাইতে পারে।

অবশ্য ফারাক্কা বাঁধের সাফল্য সম্পর্কে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে—কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে দেশের ঢাল বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া গঙ্গার জল ভাগীরথীতে প্রবাহিত করা সহজ হইবে না।

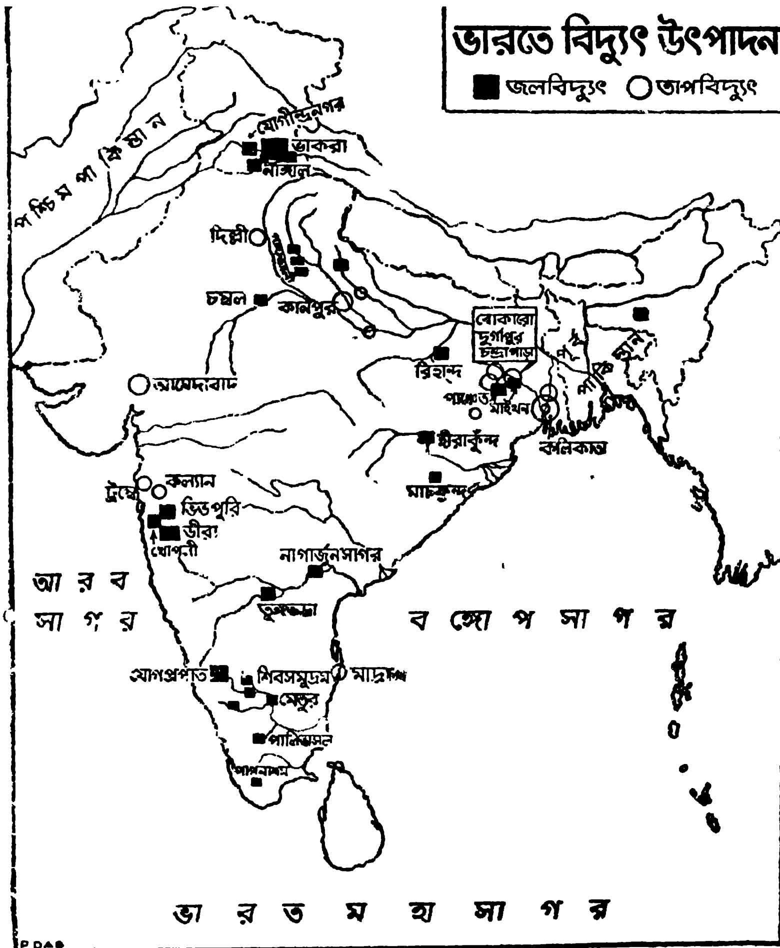
জলবিদ্যুৎ শক্তি ( Hydro-electric Power )—

**Q. 26. Write an account of the development of the waterpower resources in India. Discuss the benefits of such development in our economic life.**

**[ ভারতে জলশক্তির উন্নয়নের বিবরণ দাও। আথিক জীবনের উপরে ইহার কি সুফল দেখা যাইতেছে ব্যক্ত কর। ]**

ভারত জলবিদ্যুৎ শক্তিতে সমৃদ্ধ। ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ্য শক্তির ১০ ভাগের বেশি কাজে লাগানো হইয়াছে এবং আরও বহুসংখ্যক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ

চলিতেছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন (১) স্বাভাবিক জলপ্রপাত যাহার জল বারমাস প্রায় সমানভাবে পড়িতে থাকিবে এবং শীতে জমিবে না; (২) প্রবাহমান পার্বত্য নদী, যেখানে নদীতে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম জলপ্রপাতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন




করা যায়; (৩) প্রচুর বর্ষার জল যাহা বাঁধের সাহায্যে পার্বত্য অঞ্চলে আটকাইয়া রাখা যায় এবং তাহা হইতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়; (৪) সেচ-বাঁধ হইতে সমভূমি অঞ্চলেও বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা যায়। এই সকল প্রাকৃতিক সুবিধা ছাড়া কতক-

গুলি অর্থনৈতিক বিষয়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে প্রচুর মূলধন ও সুদক্ষ যন্ত্রবিদ প্রয়োজন। উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অবশ্য প্রাকৃতিক সুবিধা না থাকিলে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন **প্রচুর বারিপাত ও খরস্রোতা নদী**। ভারতে উহাদের কোনটিরই অভাব নাই। তবে মৌসুমী বৃষ্টি বৎসরে বারমাস হয় না বলিয়া নানা প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বারা জল সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন হইতে পারে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার ( India 1960 ) যে মোটামুটি রিপোর্ট দাখিল করেন তাহা হইতে জানা যায় যে ভারতে মোটামুটিভাবে ৪ কোটি ১০ লক্ষ কিলোওয়াটের মত জল বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্য মালভূমির নদীগুলি হইতে মোট ১ কোটি ৪৭ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব। ১৯৬৯ সালে ভারতে মোট ৪২ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কাজেই মোটামুটি মাত্র ১০ ভাগের ১০ ভাগ জলশক্তি এ পর্যন্ত কাজে লাগান যাইতেছে। ভারতে প্রথম ১৯০২ সালে মহীশূরের **শিবসমুদ্রমে** ৫০০০ কি: ও: জলবিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইত। বর্তমানে ৫০০০০ কি: ও: শক্তি পাওয়া যাইতেছে। মহীশূরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত **যোগ** জলপ্রপাত হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার কি: ও: এবং **সারবতী** প্রকল্প হইতে আরও বেশী তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করা হইতেছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপর অবস্থিত **ভিভপুরি, খোপোলি** ও **ভীরাতেও** জল-বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। এই তিনটি স্থানে মোট উৎপাদন বর্তমানে ১৮০০০০ কিলোওয়াট। তাহা ছাড়া, **কয়না** বাঁধ হইতে আরও ২½ লক্ষ কি: ও: বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে। উহা দ্বারা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল ও রেলপথ পরিচালিত হয়। মহীশূর ও মাদ্রাজ রাজ্যে কাবেরী নদীর নানা স্থানে বাঁধ দিয়া জলশক্তি উৎপন্ন করা হইয়াছে। উহার মধ্যে **মেথুর** নামক স্থানে উৎপন্ন ৩০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উল্লেখযোগ্য। কেরল অঞ্চলে **পাপনাসম** ও **পালিভাসল** জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের বিতস্তা তীরের **যোগীন্দ্রনগরে** ৪৮০০০ কিলোওয়াট, **নাঙ্গাল হাইডেল খাল** হইতে ৯৬০০০ কিলোওয়াট, **ভাক্রা বাঁধ** হইতে প্রায় ৯ লক্ষ কিলোওয়াট, উত্তর-প্রদেশের **গাঙ্গেয় অঞ্চলে** কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রে মোট প্রায় ৪৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। উত্তরপ্রদেশে জলবিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে নলকূপ-দ্বারা জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিহারে **মাইথন** ও **পাঞ্চেত** এবং উড়িষ্যার **হিরাকুঁদের** নাম উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরের বারমুলায় ও আসামে কয়েকটি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র আছে। **কোয়না, চম্বল, রিহান্দ,** অন্ধ্রের **তুঙ্গভদ্রা** এবং উড়িষ্যার **মাচকুন্দ** তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রেও লক্ষ

লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা নদী হইতে ২৭০০০ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ পাওয়া যাইতেছে।

ভারতের শিল্প, পরিবহণ ও পল্লী-উন্নয়ন কার্যের জন্য জলবিদ্যুৎশক্তির সহায়তা অত্যাবশ্যক। ভারতের কয়লা সম্পদ দেশের পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ। ফলে, দক্ষিণ ভারতকে মূলতঃ জলবিদ্যুৎ-শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় এবং অন্যত্রও অনুরূপ নির্ভরশীলতা অনিবার্য। খনিজ তৈল ভারতে সম্ভবতঃ যথেষ্ট নাই। তাহা ছাড়া, জলবৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আছে। জলবিদ্যুৎ অল্প খরচে ৩০০ মাইল পর্যন্ত লইয়া যাওয়া যায় বলিয়া শিল্প বিকেন্দ্রীকরণে ইহা সাহায্য করিবে। গ্রীড ব্যবস্থার সাহায্যে উহা আরও ব্যাপক অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। জলবিদ্যুৎশক্তি কখনও শেষ হইবে না; উহা প্রকৃতির অফুরন্ত দান। জলবিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারে শিল্পকেন্দ্র সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, অল্প শব্দযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হইবে। শিল্প ও জল-সেচের জন্য এবং স্থান বিশেষে রেলওয়ের জন্য ভবিষ্যতে আরও অধিক জলবিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

## *কৃষিজ সম্পদ

## AGRICULTURAL RESOURCES

**Q. 27. Describe the effects of climate on the distribution of agricultural crops in India.**

**[ ভারতে বিভিন্ন ফসলের বিন্যাসের উপরে জলবায়ুর প্রভাব কতটা তাহা বর্ণনা কর । ]**

ভারতবাসীর জীবনে জলবায়ুর প্রভাব যত বেশি লক্ষ্য করা যায় তত আর কোন সুসভ্য দেশে লক্ষ্য করা যায় না। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, ভারতবাসীগণ অদৃষ্টবাদী বলিয়া জলবায়ুর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক চেষ্টা এদেশে অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। ইদানিং অবশ্য কৃত্রিম হ্রদ, ছোট ছোট নদী, খাল ও নলকূপ মারফত জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়।

মৌসুমী বায়ু ভারতীয় কৃষকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। যদি পরিমাণমত এবং সময়মত বৃষ্টি হয় তবে ফসল উৎপন্ন হয়। যদি প্রকৃতির নিয়মে কোন সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে তবে ভারতীয় কৃষকগণ হতাশ হইয়া পড়েন। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ভারতীয় কৃষকের জীবনকে এতই অসহায় করিয়া রাখিয়াছে যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার মত মনোবলের তাহার একান্ত অভাব। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব অনিবার্য। মাঠের পাকা ফসল কয়েক দিনের বৃষ্টিতে বিনষ্ট হইতে পারে অথবা ভীষণ ঝড়ে সমস্ত ধান ও গম গাছ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় আছাড় খাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ভারতে কৃষিকার্যের উপর বৃষ্টিপাতের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি।

কতকগুলি ফসলের উপর বৃষ্টিপাতের প্রভাব প্রত্যক্ষ, যথা—(১) ধানের জন্য ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি ( এই বৃষ্টির অধিকাংশ মাত্র চার মাসের মধ্যে ) হওয়া প্রয়োজন, সুতরাং সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র সান্নিধ্যযুক্ত অঞ্চলের ইহা প্রধানতম ফসল। (২) যেখানে বৃষ্টিপাত ১০০ সেন্টিমিটারের কম সেখানে মৌসুমী ফসল বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি ; সুতরাং দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগ ও পশ্চিম ভারতের উহাই প্রধান "খারিফ" ফসল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রবিশস্য গম ও যব ( অবশ্য

---

* ভারতের কৃষি উৎপাদন ১৯৬৮-৬৯

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধান | ৩৮·০ নিযুত টন | কার্পাস তুলা | ৫৯ লক্ষ গাঁট |
| গম | ১৭·০ " " | পাট ও মেস্তা | ৭৫ " " |
| মোট শস্য | ৯৭·০ " " | চিনি | ৩৮ লক্ষ টনে |

( ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, যব, বাজরা, রাগী, ডাল, ছোলা )

যেখানে মাটি ও উত্তাপ উপযুক্ত )। (৩) রবার ও কফি চাষের জন্য, দীর্ঘকাল ধরিয়া বারিপাত ও উষ্ণতার প্রয়োজন। সুতরাং, দুইবার বারিপাতযুক্ত ভারতের দক্ষিণতম অংশেই ঐ দুইটির আবাদ দেখা যায়। (৪) আঙুর, আপেল প্রভৃতি ফল চাষের জন্য শীতল জলবায়ু ও শীতকালের বৃষ্টি বিশেষ উপযোগী ; সুতরাং কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে ঐ সকল ফসল ভাল জন্মায়।

ভারতের জলবায়ু সাধারণভাবে সর্বত্র উষ্ণ হইলেও শীতকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে উত্তাপের পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। উত্তর ভারতে যত শীত পড়ে দক্ষিণ ভারতের উপকূল ভাগে তাহা অপেক্ষা উত্তাপ অনেক বেশি থাকে। ফলে গম, ছোলা, যব প্রভৃতি ফসল দক্ষিণের উপকূলভাগে কোথাও জন্মে না। তুলা চাষের জন্য নির্দিষ্ট তাপের প্রয়োজন ২০° সেঃ গ্রেঃ হইতে ৩০° সেঃ গ্রেঃ ( কেবল ৭ মাসের জন্য )। ভারতের উপকূল হইতে দূরে যে সকল স্থানে তুলার চাষ হয়, ( যথা—মধ্যপ্রদেশ ) সেখানে উত্তাপ ইহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া অল্পদিনে চাষ করা যায় এমন তুলা চাষ করা হয়। এই তুলা সাধারণতঃ নিকৃষ্ট জাতীয়।

**খাদ্যফসল ( food crops )**

**Q. 28. Under what type of geographical environment (a) rice, (b) wheat, (c) millets and (d) maize are cultivated in India ?**

**[ কি প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে ভারতে—ধান, গম, জোয়ার-বাজরা এবং ভুট্টার চাষ হয় ? ]**

(a) **ধান ( Rice )**—ধান ভারতের শ্রেষ্ঠ ফসল। নানাপ্রকার মাটিতে ধানের চাষ করা সম্ভব। সাধারণতঃ দোআঁশ পলি মাটির মধ্যে শিকড়ের পক্ষে রস গ্রহণ সহজসাধ্য বলিয়া এই জাতীয় মাটিতেই ধান সবচেয়ে ভাল হয়। ইহা ছাড়া, প্রবল তাপযুক্ত আর্দ্র জলবায়ু ( ১০০ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ) ধানের জন্য প্রয়োজন। জমিতে জল না দাঁড়াইলে এবং সমগ্র চাষের সময় জল দাঁড়াইয়া না থাকিলে আমন ধান ভাল হয় না, কারণ ধানের শিকড় মাটির নিম্নস্তরের রস গ্রহণে অক্ষম। লাঙ্গল বা ট্রাক্টর দিয়া জমি ধান রোপণের উপযোগী করিয়া লইয়া ধান ছিটাইয়া দিলেই উহা হইতে ধানের চারা জন্মায়। ভারতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ( নানা-স্থানের উপযোগী প্রায় সহস্রাধিক প্রকার ধান ভারতে জন্মে ) ধান চাষ হয়। (১) **আউস**—ইহা সাধারণতঃ মে হইতে জুলাই বা আগস্ট মাসের মধ্যে চাষ হয়। ইহার জন্য জল কম দরকার হয় এবং নদীর পলিযুক্ত সমভূমিতে, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে ইহার চাষ হয়। (২) **আমন** ধান ভারতের প্রধান ফসল। চাষের সময় জুলাই হইতে ডিসেম্বর। প্রচুর বারিপাত এবং কর্দমযুক্ত

মাটির উপর একস্তর দোআঁশ মাটি ইহার জন্য প্রয়োজন। আমন ধানের চারাগুলি পুনঃ রোপণ করা হয় বলিয়া ইহার শীষের সংখ্যা অধিক হয় এবং ফসল অধিক ফলে। (৩) **বোরো** ধান শীতকালে নিম্ন জলাভূমিতে চাষ হয়। ইহার উৎপাদন কম। যদি উপযুক্ত জমি, সার ও বারমাস বৃষ্টি বা জলসেচ পাওয়া যায় তবে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসামে এক জমিতে দুইটি ধানের ফসল তো পাওয়া যায়ই, এমনকি তিনটি ফসলও পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং, ধান উৎপাদক দোফসলী অঞ্চলগুলির উপর নির্ভর করিয়া অধিক লোক জীবনধারণ করিতে পারে। ভারতের ব-দ্বীপগুলির জনসংখ্যা এইজন্যই অত্যধিক। পার্বত্য অঞ্চলেও এক প্রকার ধান চাষ হয়। ইহার উৎপাদন কম। সম্প্রতি ভারতের সর্বত্র তাইচুং, তাইনান, আই, আর-৮, পদ্মা, জয়া প্রভৃতি **অধিক ফলনের ধান** ব্যাপক ভাবে আবাদ হইতেছে। কৃষকরা বারোমাসই এই সকল ফসল চাষ করেন এবং বিঘাপ্রতি ফলন স্থানে স্থানে ৪।৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। ধান ভারতের জনগণের প্রধান খাদ্যশস্য। পৃথিবীর মোট ধান চাষের উপযুক্ত জমির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু একরপ্রতি ফলন খুব কম হওয়ার জন্য ইহা বিদেশে রপ্তানি করা যায় না। স্থানীয় চাহিদা মিটাইতেই সব নিঃশেষ হইয়া যায়।

ধান উৎপাদনে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভিতর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাম উল্লেখযোগ্য।

যদিও বর্তমানে ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধান উৎপন্ন হয়, তবু অতিরিক্ত ঘনবসতির জন্য এবং সময়মত বৃষ্টির অভাবে এই রাজ্যে প্রচুর ধান ঘাটতি পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়। (খুব ভাল আবহাওয়া থাকায় ১৯৬০-৬১ সালে ৫৪ লক্ষ টনের বেশি ধান উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৮ লক্ষ টন হয়। ১৯৬৮ সালে আবার উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ লক্ষ টন হয়। রাজ্যের মোট শস্যের চাহিদা ৬৫ লক্ষ টন)। আমদানি হয় সাধারণতঃ ৪।৫ লক্ষ টন। উৎপাদনের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের পরেই বিহার, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের স্থান। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভিতর উড়িষ্যা, অন্ধ্র এবং মধ্যপ্রদেশে উৎপন্ন চাউল স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। অন্ধ্রের চাউল দক্ষিণ ভারতে কেরল প্রভৃতি ঘাটতি অঞ্চলের চাহিদা অংশতঃ মিটাইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কিছু ঘাটতি পড়ে। সুতরাং ভারত তাহার মোট প্রয়োজনের দিক হইতে স্বয়ংপূর্ণ নয়। এজন্য প্রতি বৎসর ভারতকে ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া এবং

থাইল্যাণ্ড হইতে কিছু পরিমাণ চাউল আমদানি করিতে হয়। ধানের অভাব গম আমদানির দ্বারা মিটানো হয়; কারণ পৃথিবীর বাজারে গমের দাম কম এবং উহা ধারে পাওয়া যায়। ধান রপ্তানিকারক দেশগুলি দরিদ্র, উহারা ধার দিতে পারে না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, প্রতি বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধান চাষ ভারতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। এই পদ্ধতিতে ধানের বীজগুলি বপনের পূর্বে লবণাক্ত জলে ডুবাইয়া উহাদের মধ্য হইতে রোগমুক্ত বীজগুলি (যেগুলি ডুবিয়া যায়) বাছিয়া

দেওয়া হয়। জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও জৈবসার একত্রে দেওয়া হয় এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে ধান রোপণ করা হয়। ইহাতে বীজ ধান কম লাগে এবং প্রায় দ্বিগুণ ফসল পাওয়া যায়।

ভারতে ধান উৎপাদন মৌসুমী-বায়ুর তারতম্যের ফলেই প্রধানতঃ কমবেশি হয়। ১৯৫৬ সালে ২৮০ লক্ষ টন এবং ১৯৫৭ সালে ২৪০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। সেই তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতে অনেক বেশি চাউল উৎপন্ন হয়—প্রায় ৩৮০ লক্ষ টন।

বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভূমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করিলে এবং পরিকল্পিত উপায়ে ধানের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভারতের প্রয়োজন মিটাইয়াও ধান উদ্‌বৃত্ত থাকিতে পারে।

**(b) গম ( Wheat )**—গম উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান খাদ্য ফসল। ভারতে ইহা শীতকালে চাষ করা হয়; কারণ ঐ সময় জলবায়ু শুষ্ক ও নাতিশীতল থাকে। গম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় গমের চাষ করা যাইতে পারে। দোআঁশ পলিমাটি গম চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। গম উৎপাদনের সময় প্রথমে কিছুদিন শীতল ও আর্দ্র জলবায়ু আবশ্যক। তবে ফসল সংগ্রহের কিছুদিন পূর্ব হইতে উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু বিশেষভাবে প্রয়োজন। খুব বেশি বৃষ্টিপাত হইলে গম ভাল হয় না। ৫০ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থান গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতে শীতকালে সামান্য বৃষ্টি হয় এবং আকাশ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। এইজন্য ভারতে উৎপন্ন গম খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। অবশ্য এখন পর্যন্ত ভারতে একরপ্রতি* উৎপাদন খুব কম 'মাত্র ১২ বুশেল ( এক বুশেল ৩০ সের গম )। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং বিহারে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমির শুষ্ক ও উচ্চতর সমতল স্থানে বেশি পরিমাণে গম জন্মে। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে যে সকল স্থানে খাল হইতে ভাল জলসেচ ব্যবস্থা আছে সেই সকল স্থানে ভাল গম চাষ হয়। পাঞ্জাবের গম উৎপাদন ইদানীং খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঞ্চলে নাঙ্গাল পরিকল্পনার খালগুলি হইতে বহু লক্ষ একর জমিতে জলসেচ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং, এই অঞ্চল এখন ভারতের অন্যত্র উদ্‌বৃত্ত গম পাঠাইতে সক্ষম। উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে এবং সার্দা খাল অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ উত্তর প্রদেশেই গমের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি; স্থানীয় প্রয়োজনের পক্ষে উহা যথেষ্ট। উষ্ণ জলবায়ুর জন্য দক্ষিণ ভারতে গমের চাষ খুব

* ২'৪৭ একরে ১ হেক্টর। আজকাল সরকারী কাগজপত্রে ক্রমশঃ একরের বদলে হেক্টর ব্যবহার করা হইতেছে।

কম। পশ্চিমবঙ্গে গম চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। গম শীতকালের ফসল বা রবিশস্য। শীতকালে উত্তর ভারতে কিছু পরিমাণ বৃষ্টি হয় এবং ঐ অঞ্চলে শীতও অধিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ঐ বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি হইলে পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ বাড়িবে সন্দেহ নাই। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের বহু লক্ষ লোকের প্রধান খাদ্য গম। সুতরাং, পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা হইতে আমদানিকৃত গমের উপরে ভারতীয় খাদ্যাবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারের ফলে ক্রমশঃ গম উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু এখনও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে প্রচুর গম (৬২ লক্ষ টন—১৯৬৪, ৫০ লক্ষ টন ১৯৬৮) আমদানি করা হয়। বোম্বাই বন্দর দিয়াই অধিক গম আমদানি হয়।

দিল্লীর পুষা ইনিষ্টিটিউট ভারতের প্রধান গম গবেষণাগার। এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় এবং কমিউনিটি প্রজেক্ট ও অন্যান্য সংস্থার চেষ্টার ফলে গমের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েক বৎসরে ভারতে গমের উৎপাদন ৬৭ লক্ষ টন (১৯৫১) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭০ লক্ষ টন (১৯৬৯) হইয়াছে। বিশেষতঃ পাঞ্জাবে সম্প্রতি গমের একর প্রতি ফলন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে উহাকে "গম বিপ্লব" বলা হইতেছে। ১৯৬৯ সালে অমৃতসর জেলার গড় একর-প্রতি গম উৎপাদন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ একর-প্রতি উৎপাদক দেশ হল্যাণ্ডের সমান হয়। ঐ বৎসর পাঞ্জাব ১৫ লক্ষ টন গম বাহিরে পাঠায়। উত্তর প্রদেশও গম উৎপাদনে স্বয়ংপূর্ণ হইয়াছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৬৯ সালে প্রায় ৪ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়—পাঁচ বৎসর পূর্বের উৎপাদনের তুলনায় উহা পাঁচগুণ বেশি। মেক্সিকো হইতে আমদানি করা উৎকৃষ্ট গমবীজ এই সবুজ বিপ্লব ঘটাইয়াছে। এখন ভারত গম সম্পর্কে স্বয়ংভরতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

(c) **জোয়ার-বাজরা অথবা মিলেট (Millets)**—ভারতের এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রধান খাদ্য জোয়ার ও বাজরা জাতীয় নিকৃষ্ট শস্য। ভারতের কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চলে যেখানে মাঝারি বৃষ্টিপাত, সেখানে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে জোয়ার চাষ হয়। বাজরা আরও খারাপ মাটিতেও চাষ করা যায়। অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত ও অনুর্বর মৃত্তিকাযুক্ত স্থানের পক্ষে এই ফসল উপযোগী। ভারতে যত জমিতে ধান জন্মে মিলেটগুলিও প্রায় তত জমিতে চাষ হয়। তবে ইহার ফলন কম। মিলেট জাতীয় ফসলগুলির উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু সহ্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি বহুপ্রকার মিলেট ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে জন্মে। বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলের ইহা সর্বপ্রধান খাদ্য। অন্ধ্র,

মাদ্রাজ, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ইহা প্রধান খাদ্য-ফসল। ফসল হিসাবে নিকৃষ্ট হইলেও জোয়ার ও বাজরা বেশ পুষ্টিকর।

(d) ভুট্টা (Maize)—ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই কম-বেশি ভুট্টা জন্মে। ভারতে প্রায় ৪০ লক্ষ টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়। ইহা প্রধানতঃ উত্তর ভারতেই বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভুট্টার পক্ষে খুব উষ্ণতা এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজনীয়। ভুট্টার জমি খুব উর্বর এবং জলনিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত হওয়া চাই। যে সমস্ত অঞ্চলে বৎসরে কমপক্ষে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় সেই সমস্ত অঞ্চলেই ভুট্টা জন্মে। জমিতে জল দাঁড়াইলে ভুট্টা জন্মে না। ইহার উৎপাদন প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত। উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় ইহা সর্বাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীরেও প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা জন্মে। প্রধানতঃ স্থানীয় প্রয়োজনেই ইহা ব্যবহৃত হয়। এক একর জমিতে যত অধিক পরিমাণে ভুট্টা ফলে অন্য কোন খাদ্যশস্য তত অধিক পরিমাণে হয় না। খাদ্য হিসাবে ইহার প্রচলন কম হইলেও খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

**Q. 29. What are the causes of the low output of Indian agriculture and the present food problem in India? Do you think this problem can be solved in the near future?**

**[ভারতে কৃষির উৎপাদন কম কেন? খাদ্য সমস্যারই বা কারণ কি? শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কি?]**

ভারতের খাদ্য সমস্যা ভারতীয় কৃষির অনুন্নত মানের প্রত্যক্ষ ফল। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের প্রায় ৬৫ ভাগ অধিবাসী ভরণ-পোষণের জন্য কৃষিকার্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু ভারত খাদ্য সম্পর্কে স্বয়ংপূর্ণ নহে। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টন ধান ও গম আমদানি করিতে হয়; তবু সাধারণ মানুষের সমগ্র চাহিদা মিটে না। *ভারতের এই শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি অবশ্য নূতন নহে। ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতেই ভারত ব্রহ্মদেশের উপর নির্ভরশীল ছিল; সে অবস্থার আজিও কোন প্রতিকার হয় নাই।

ভারতের খাদ্য সমস্যার কারণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) প্রাকৃতিক ও (খ) অর্থনৈতিক।

---

* ভারতে মাথাপিছু দৈনিকমাত্র ১৩½ আউন্স খাদ্যশস্য এবং ৬ আউন্স অন্যান্য খাদ্য খরচ হয়—বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক প্রায় ২০০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়। মানুষকে সুস্থ থাকিতে হইলে অন্ততঃ, ২৮০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী গড়ে দৈনিক ৩০০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য পায়। এই তারতম্যের ফলেই ভারতে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল মাত্র ৫০ বৎসর দাঁড়ায়। সেই তুলনায় নরওয়েতে ৬৫ বৎসর। (U. N. O.)

(ক) প্রাকৃতিক কারণ—(১) ভারত মৌসুমী বায়ুর দেশ। এদেশে বৃষ্টির নিশ্চয়তা নাই। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিত্যকার ঘটনা। সুতরাং কৃষক ভাল ফসল বড় একটা পায় না। বন্যা অপেক্ষা অনাবৃষ্টিতেই অধিক ক্ষতি হয়।

(২) ভারতের মাটি মোটামুটি উর্বর; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত চাষ-আবাদের ফলে এবং ভূমিক্ষয়ের ফলে উহার উর্বরতা হ্রাস পাইয়াছে।

(৩) অনেক স্থানে জমির বন্ধুরতার জন্য জলসেচ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব নহে; সুতরাং অধিক ফসল ফলে না।

(৪) ভারতে অতিরিক্ত অরণ্যধ্বংস করার ফলে কেবল যে বৃষ্টি কমিয়াছে এবং ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাই নহে; পরন্তু বাস্তুচ্যুত জীবজন্তু শস্যক্ষেত্রের গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। বানর, শূকর, হরিণ, পঙ্গপাল ও পাখীর উপদ্রবেও বহু শস্য নষ্ট হয়।

(খ) অর্থনৈতিক কারণ—(১) ভারতের কৃষক দরিদ্র। ভাল কৃষিযন্ত্র, ভাল সার ও বীজ কিনিবার সামর্থ্য তাহার নাই। দেশে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা ভাল নাই এবং জমির উপর কৃষকের অধিকার সম্প্রতি মাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখনও ভাগচাষীর সংখ্যা কম নহে। চাষের কাজে তাহাদের উৎসাহ কম।

(২) অর্থাভাবে ভারতের সর্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না।

(৩) ভারতীয় কৃষক অধিকাংশই নিরক্ষর। আধুনিক কৃষিবিদ্যা-আয়ত্ত করা তাহার সাধ্যাতীত। কুসংস্কার তাহার সমাজজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

(৪) ভারতে কৃষিপণ্যের মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষককে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করে; কারণ এদেশে সমবায় কৃষি ব্যবস্থা বা বাজারজাত করার ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত হয় নাই বলিলেই হয়।

(৫) ভারতের বিচিত্র সামাজিক নিয়মের ফলে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল জনতার অতিবৃদ্ধির ফলে জমিগুলি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ফলে উহাদের একর প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এবং উৎপাদনের ব্যয়ও অধিক।

(৬) ভারতের জনসংখ্যা বৎসরে প্রায় এক কোটির মত বৃদ্ধি পাইতেছে; ফলে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ লক্ষ টন বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন। অথচ আর নূতন জমি চাষ করাও সম্ভব নহে। [ শেষাংশের জন্য পরবর্তী প্রশ্ন দ্রষ্টব্য। ]

**Q. 30. Discuss the demand and supply position of the Chief food crops of India. What measures can be adopted for improving the domestic supply of these crops?**

( C. U. B. Com. 1965 )

**[ভারতের প্রধান খাদ্যশস্যগুলির চাহিদা এবং সরবরাহের বিষয় আলোচনা কর। এদেশে এই সকল শস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করার উপায় কি ?]**

ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য হইল ধান, গম ও জোয়ার-বাজরা। ধান ভারতের অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য, গম প্রায় এক-তৃতীয়াংশের এবং জোয়ার-বাজরা বাকী লোকের প্রধান খাদ্য।

ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৪ কোটি টনে চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহা ভারতের ক্রতবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় কিছু কম। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কেরলে চাউলের ঘাটতি রহিয়াছে। অপর পক্ষে, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র কিছু চাউল ও ধান রপ্তানি করিতে পারে। আসাম প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাঞ্জাব অল্প রপ্তানি করে।

ভারতে ১৯৬৯ সালে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টনে গম জন্মে। ঐ বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টনে খাদ্যশস্য আমদানি হয় এবং তাহার প্রায় সবটাই যুক্তরাষ্ট্রের গম। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ টনের মজুদ ভাণ্ডার সৃষ্টি করা হয়।

পাঞ্জাব বাড়তি গম উৎপাদন করে (১৫।.৬ লক্ষ টনে)। সবচেয়ে বেশি ঘাটতি মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে। পশ্চিম বাংলায় ঘাটতি ১০ লক্ষ টনে। উত্তর প্রদেশ স্বয়ংভর।

জোয়ার-বাজরার উৎপাদন দুই কোটি টনে এবং ভারত এ সম্পর্কে স্বয়ং নির্ভরশীল।

খাদ্য সমস্যা চিরকালের মত দূর করিবার জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা করা যায়, যথা—(১) অল্প দিনের জন্য ব্যবস্থা ও (২) দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যবস্থা।

(১) খাদ্যাভাবের সময় ভারত সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া ও ভারতে যতদূর সম্ভব নানা প্রকার খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ভারতের মত বিশাল দেশের এক স্থান হইতে অপর স্থানে আমদানিকৃত খাদ্য সরবরাহ করা সহজ নয়। সুতরাং, বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিজনিত খাদ্যাভাব নানাস্থানে প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। খাদ্য উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মজুতদারদের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ, এবং বড় উৎপাদনকারীদের অতিলোভ অবস্থার উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। প্রায়শঃই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নানাস্থানে সাময়িকভাবে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হইতেছে।

(২) দীর্ঘকালের মত এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে :—(ক) পতিত জমি আবাদে আনা, (খ) সিন্ধ্রির মত শত শত বড় বড় কৃত্রিম সারের কারখানা হইতে প্রচুর সার সরবরাহ করা। ইদানিং ভারতে ১০।১২টি

খুব বড় সারের কারখানা হইয়াছে। তবে আরও সার এবং কীটনাশক দ্রব্য চাই। সার আমদানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে ২০ লক্ষ টনে সার দরকার কিন্তু ১৯৬৯ সালে উৎপাদন ছিল মাত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ। (গ) নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা-গুলি যতদূর সম্ভব দ্রুত শেষ করিয়া কৃষির কাজে জলসেচ ও বিদ্যুৎশক্তি নিয়োগ করা এবং (ঘ) কৃষি গবেষণাগারে বীজ ও খাদ্য সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়ে ভারত খুব সাফল্যলাভ করিয়াছে।

স্বাধীনতার পরে ভারতের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার চিত্র মোটামুটি এই— ১৯৫৩ সালে ভাল বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে এবং কতকটা জাপানী প্রথায় ধান চাষ, প্রচুর চাষের জমির উদ্ধার সাধন, সারের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের ফলে ভারতে খাদ্য উৎপাদন আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়। কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণে সুবৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের মত অতিরিক্ত ঘনবসতিযুক্ত রাজ্যও খাদ্য বিষয়ে প্রায় স্বয়ংপূর্ণ হইয়া উঠে। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান ও গম উৎপাদন করে। ফলে খাদ্য আমদানির পরিমাণ খুব কমিয়া যায়। ১৯৫৪ সাল হইতে ভারতকে খাদ্য সম্পর্কে প্রায় স্বয়ং নির্ভরশীল রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইত। ১৯৫৫ সালের গুরুতর বন্যা সত্ত্বেও ভারতের খাদ্যাবস্থার অবনতি হয় নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের শেষে ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য ফসল উৎপন্ন করার কথা ছিল ১৯৫৪ সালে অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের নির্দিষ্ট সময়ের দুই বৎসর আগেই তাহার অনেক বেশি খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ফলে, খাদ্যের কণ্ট্রোল ব্যবস্থা বাতিল করা সম্ভব হইয়াছিল। উত্তর ভারতে বন্যার জন্য ১৯৫৫ সালে খাদ্যোৎপাদন সামান্য কিছু হ্রাস পাইলেও কোথাও গুরুতর খাদ্যাভাব দেখা দেয় নাই; কিন্তু ১৯৫৬ সালের ভয়াবহ বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে ফসলের গুরুতর ক্ষতি ও তাহার ফলে মূল্য বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ হইতে ৬১ সালের মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে কয়েক লক্ষ টন ধান ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টনের মত গম আমদানি করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১৯৫৭ সালে উত্তর ভারতে যে ভয়াবহ জলাভাব দেখা দেয় তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে অতিরিক্ত গম আমদানি করিতে হয়। ১৯৬০ সালে PL 480 নামক এক চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ফল, মৎস্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতিও আমদানি করা হয়। পাকিস্তান হইতে ফল ও মৎস্য এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

১৯৫৮ সালের পর হইতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ভারতে খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আর বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ

জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে। সুতরাং, ১৯৬৩-৬৪ সালে ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির ফলে ভীষণ মূল্য বৃদ্ধি হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্য ব্যবস্থার জন্য সরকার সচেষ্ট হন।

১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত ৭২ লক্ষ টনে খাদ্যশস্য আমদানি করে। ইহা সর্বকালের রেকর্ড আমদানি। ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ টনে গম আমদানি করা হয়। কিন্তু ঐ বৎসর ঘাটতি ছিল খুব কম, বেশির ভাগই মজুদ ভাণ্ডার গঠনের কাজে লাগে। ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে অসাধারণ বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকিলে স্বয়ংভরতা লাভের বিলম্ব নাই।

**বাণিজ্য ফসল ( Commercial Crop or Cash Crop ) :**

**Q. 31. Under what geographical conditions cotton and jute are grown in India ? Name the producing areas.**

**[ কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে ভারতে তুলা এবং পাটের চাষ হয় ? উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম দাও। ]**

**তুলা ( cotton )**—তূলা উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারত খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের উৎপন্ন তুলা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ( short staple cotton ), মধ্যম আঁশযুক্ত তুলা ( medium staple cotton ) এবং দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলা ( long staple cotton )। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে ক্ষুদ্র ও মধ্যম আঁশযুক্ত তুলা এবং মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের বিভিন্নাংশে দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবে ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘ আঁশযুক্ত আমেরিকান তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

বিভিন্নপ্রকার জলবায়ুতে বিভিন্ন জাতীয় তুলা উৎপন্ন হয়। তবে আর্দ্র ও মন্দোষ্ণ ( ২০° হইতে ৩০° ডিগ্রী ফাঃ ) জলবায়ুতে ইহা সর্বাপেক্ষা ভাল উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের বাতাসে ও উজ্জ্বল সূর্যালোকে তুলার আঁশ উৎকৃষ্ট হয়। কার্পাস উৎপাদনের প্রথম স্তরে অত্যন্ত আর্দ্রতার প্রয়োজন। পরে শুষ্ক ( তুষারপাত ও কুয়াশা বিহীন ) আবহাওয়া ইহার উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী। আগ্নেয় কৃষ্ণমৃত্তিকাই তূলা উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। পলিমাটিতেও তুলার চাষ ভাল হয়।

ভারতে তিনটি অঞ্চলে প্রধানতঃ তুলার চাষ কেন্দ্রীভূত—(১) পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, মহারাষ্ট্র-গুজরাটের সমতলভূমিগুলি ও দক্ষিণ রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশ—(২) পাঞ্জাব ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ও (৩) মহীশূর ও দক্ষিণ

তামিলনাড়ুর সমভূমি। দাক্ষিণাত্যের দুইটি স্থানে তুলা চাষ অধিক হয়। মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কৃষ্ণমৃত্তিকায় প্রচুর তুলা জন্মে। আবার দক্ষিণ তামিলনাড়ুর উপকূলের সমভূমিতেও ভাল তুলা প্রচুর জন্মে। মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র রাজ্যে তুলার চাষ হয়। পাঞ্জাব, গুজরাট ও তামিলনাড়ুর তুলা উৎকৃষ্ট। ভারতে নাতিদীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার চাষ খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্বে ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর তুলা জাপান, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইত; কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর উৎকৃষ্ট তুলা হইতে ভারত বঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং, এখন অতি অল্প পরিমাণ ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ব্রিটেন ও জাপানে রপ্তানি হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর ভারতকে ৪।৫ লক্ষ গাঁট তুলা (প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব আফ্রিকা হইতে) আমদানি করিতে হয়। কারণ ভারতের কার্পাস শিল্প এখন পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে।

**১৯৬৯ সালে** ভারতে প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁট কার্পাস উৎপন্ন হয়। ভারতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশ তুলার চাষ হইতেছে। ফলে একর প্রতি উৎপাদনও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২ সালে প্রতি একরে যেখানে গড়ে মাত্র ৯২ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইত সেখানে এখন গড়ে প্রায় ১১০ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে তুলা সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হইতেছে। তবে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাস এখনও পর্যন্ত এদেশে যথেষ্ট উৎপন্ন হয় না।

**পাট** ( Jute )—ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্য। পলিমাটিতে পাট ভাল জন্মায়, ইহার সহিত প্রবল তাপ এবং প্রচুর বারিপাত ( ১৫০ হইতে ১৭৫ সেঃ মিঃ ) পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; তন্তু নিষ্কাশনের জন্যও প্রচুর জলের প্রয়োজন। ভারতের গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাটচাষের কেন্দ্র। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশেও মেস্তা জন্মে। সুলভ ও সুদক্ষ শ্রমশক্তি পাট উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য।

১৯৫৯ সালে সাময়িকভাবে ভারত পৃথিবীর পাট উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু ১৯৬০ সালে পাট উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৬৪ সালে ভারতে রেকর্ড পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয়। আবার ১৯৬৮ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১৯৬৯ সালে অনেক বৃদ্ধি পায়। হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানতঃ জলবায়ুর উপরে। ভারত বিভাগের পরে ভারতে পাট চাষের অভূতপূর্ব প্রসার হইয়াছে। দেশবিভাগের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও হুগলী জেলা ছাড়া অন্যত্র পাট চাষ খুব কম হইত। এখন পার্বত্য

ও লাল মাটি অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেই পাট চাষ হইতেছে। অবশ্য এই পাট তেমন উৎকৃষ্ট নহে। বিহারের পূর্ণিয়া, উড়িষ্যার বালেশ্বর, আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও উত্তর প্রদেশের উত্তরপূর্ব ভাগে ব্যাপকভাবে পাট চাষ হইতেছে।

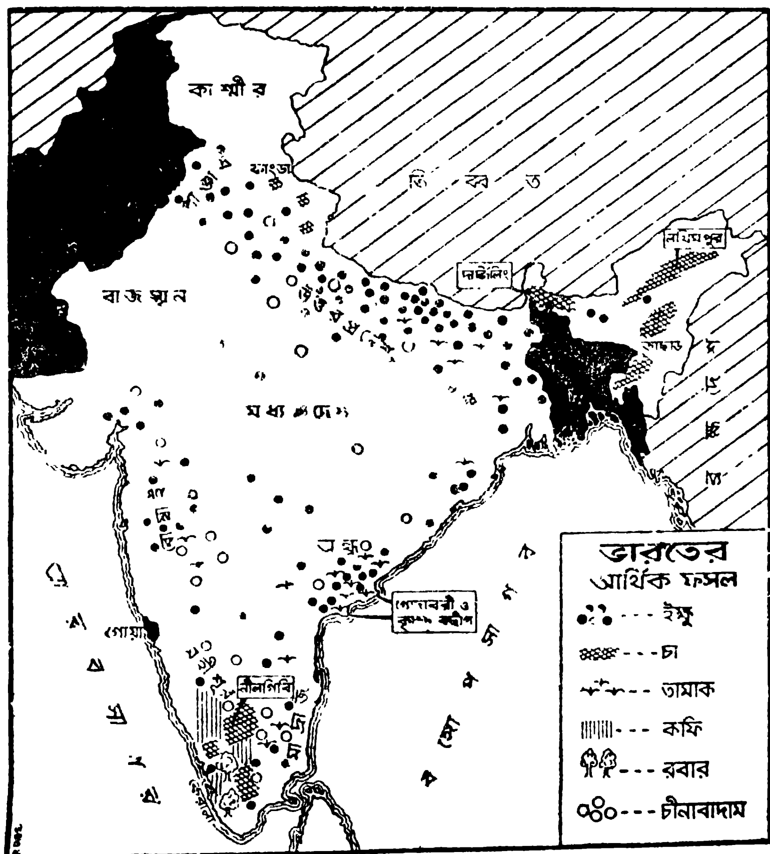
শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভারতীয় পাট উৎকৃষ্টতর হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে মেস্‌তা বা **ম্যাসতা (Mesta)** নামক (বস্তুতঃ ইহা ম্যাসতা নহে "রোজেল" তন্তু) পাটজাতীয় এক প্রকার দীর্ঘ ও কর্কশ তন্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। উহার বিঘা প্রতি উৎপাদনও বেশি এবং দামও কিছু কম। চটকলে পাটের সঙ্গে উহা মেশানো হয়।

ভারত বিভাগের ফলে প্রধান পাট উৎপাদক জেলাগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং ভারতে কাঁচা পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে প্রয়োজনের চাপে ভারতের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ১৬ লক্ষ গাঁট উৎপাদনের তুলনায় ১৯৬৯ সালে ৬০ লক্ষ গাঁট পাট ও প্রায় ১৫ লক্ষ গাঁট মেসতা উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৫৯ সালেই প্রথম ভারত কাঁচা মাল রপ্তানি করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। ১৯৬০ সালে পাট উৎপাদন হ্রাস পাইয়া মাত্র ৪০ লক্ষ গাঁট হওয়ায় ভারতের পাটকলগুলি কাঁচা মালের অভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়। ১৯৬১-৬৪ সালে পুনরায় পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। পুনরায় ১৯৬৮ সালে পাটের উৎপাদন, মেসতা সহ—মাত্র ৬৫ লক্ষ গাঁটের মত হয়। সুতরাং, থাইলাণ্ড ও সিঙ্গাপুর (পাকিস্তানের পাট) হইতে কাঁচা পাট ও মেসতা আমদানি করিবার প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভারতে ১০২টি পাটের কল আছে, তাহাদের জন্য বৎসরে ৭২ লক্ষ গাঁট পাট ও ম্যাসতা প্রয়োজন হয়। পাটশিল্পে হুগলী অববাহিকার স্থান সর্বোচ্চে। ভারতে মোট ১১২টি পাটকলের ভিতরে প্রায় ৯০টি বড় কল (মাত্র ৮০টি চলিতেছে) এবং কয়েকটি ছোট কল হুগলী নদীর তীরে, ৪টি অন্ধ্ররাজ্যে এবং ৩টি বিহারে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন পাট বর্তমানে ভারতীয় মিলগুলির চাহিদা মিটাইতে প্রায় সমর্থ একথা বলা চলে। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত পাট চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দিয়া বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। কলিকাতা বন্দর মারফত এখন পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়। বর্তমানে ভারত পাটের জন্য পাকিস্তানের উপর অল্প পরিমাণ নির্ভরশীল। পাটশিল্পের ক্ষেত্রে এখন ভারতের প্রধান প্রতিযোগী দেশ পাকিস্তান। সেখানে পাট ও মজুর খুব সস্তা এবং মিলগুলি খুব আধুনিক। অপরপক্ষে, ভারতে কয়লা সস্তা এবং শ্রমিক দক্ষতর। মিলগুলিও আধুনিক করা হইতেছে। এই শিল্পে এখন ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের স্থান নগণ্য।

**Q. 32. What factors influence the cultivation of Tea in North-East India and Coffee in the Mysore Plateau? Indicate the position of India in the world-trade in Tea.** ( C. U. '60 )

**[ কি কি কারণে চায়ের চাষ উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং কফির চাষ মহীশূর মালভূমিতে হয়? বিশ্বের চা বাণিজ্যে ভারতের অবস্থা কিরূপ? ]**

চা—উত্তর-পূর্বভারতে এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ চা উৎপন্ন হয়। চারটি অঞ্চলে এঅঞ্চলের প্রায় সমস্ত চা বাগান অবস্থিত। যথা—(১) নিম্ন আসামের কাছাড়




অঞ্চল (২) উত্তর আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (৩) পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল এবং (৪) দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতেই বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হয়। দার্জিলিংএর পাহাড়ে ২৫০ সেঃ মিঃএর বেশি বৃষ্টি হয়, আসামেও তাই।

সুতরাং, এই অঞ্চল চা-চাষের পক্ষে খুব উপযোগী। তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলে পর্বতগাত্রের মাটি বেশ উর্বর। উপত্যকার মাটিও ভাল। দীর্ঘকাল যাবত এই অঞ্চলে চা-চাষ হওয়ায় এখন এখানে শ্রমিকের অভাব নাই। এই অঞ্চলে রেলপথ ও রাস্তাও আছে। সুতরাং চা চালান দেওয়ার অসুবিধাও নাই। পুর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী পথেও প্রচুর চা চালান যাইত। এই অঞ্চলে বহু বিমান ক্ষেত্রও আছে।

**কফি**—মহীশূর মালভূমির পশ্চিমভাগে কফি চাষের পক্ষে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় (১২৫ সেঃ মিঃ)। এই অঞ্চলের মাটি লালরঙের, এই মাটি কফি চাষের উপযুক্ত। দক্ষিণ ভারতের শ্রমিকরা কফি উৎপাদনের পদ্ধতি খুব ভাল জানে। সর্বোপরি মহীশূর এবং তৎসন্নিহিত রাজ্যগুলির অধিবাসীরা খুব কফি-প্রিয়। এই সকল কারণেই মহীশূরে ভারতের বেশির ভাগ কফি উৎপন্ন হয়।

[ প্রশ্নের অন্যান্য অংশের জন্য পরবর্তী ৩৩নং প্রশ্নোত্তর (a) ও (c) দ্রষ্টব্য ]

**Q. 33. What geographical conditions are favourable for the growth of (a) Tea, (b) Sugarcane and (c) Coffee? Indicate the areas of India where they are grown.**

**[ চা, ইক্ষু এবং কফি চাষের জন্য কিপ্রকার ভৌগোলিক অবস্থা সুবিধাজনক? ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে এগুলি উৎপন্ন হয়? ]**

(a) চা (Tea)—চা গাছ চীনদেশ হইতে ভারতে আনা হয়; কিন্তু কিছুকাল পরে আসামের অরণ্যে ভারতীয় চা গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে যে চা গাছের চাষ হয় তাহা সাধারণতঃ ভারত-চীনীয় চা গাছ। চা গাছ পাহাড়ের ঢালু গাত্রে অথবা জলনিকাশের ব্যবস্থা আছে এমন সমভূমিতে (যথা—উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে ও আসামের ব্রহ্মপুত্র নদী তটে) চাষ করা হয়। ইহা চাষ করিবার জন্য অন্ততঃ ১৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলে ভাল হয়। আসাম ও দার্জিলিং অঞ্চলের চা লিকারে, স্বাদে ও গন্ধে খুব সুন্দর। তবে একজাতীয় পাতায় সকল প্রকার গুণ না থাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর চা-পাতা মিশ্রণ (blending) করিতে হয়। সাধারণতঃ নারী শ্রমিকগণ অতি দক্ষতার সহিত 'একটি পাতার কোরক ও দুটি কচিপাতা'—এইভাবে তুলিয়া পিঠের ঝুড়িতে সংগ্রহ করে। ঐ পাতা অল্প উত্তাপে কারখানায় বিশিষ্ট উপায়ে শুষ্ক করিলে কৃষ্ণবর্ণ চা প্রস্তুত হয়। অতঃপর উহা রাঙতায় মুড়িয়া (নতুবা গন্ধ বাহির হইয়া যায়) কাঠের বাক্সে করিয়া (এই বাক্সগুলি পূর্বে কানাডা হইতে আসিত; কিন্তু বর্তমানে শিলিগুড়ি, আসামের ডিব্রুগড়, মার্গারিটা প্রভৃতি স্থানে এগুলি প্রস্তুত হইতেছে) আসাম-লিঙ্ক রেলপথে অনেকটা পথ ঘুরিয়া কলিকাতা বন্দরে আসিয়া পৌছায়। বিমান পথেও গৌহাটি, ডিব্রুগড় ও বাগডোগরা বিমান বন্দর

হইতে কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরের বিমান বন্দরে চায়ের বাক্সগুলি চালান আসে। তামিলনাডুর নীলগিরিতে উৎপন্ন চা মাদ্রাজ বন্দর মারফত এবং কেরলে উৎপন্ন চা কোচিন বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। কলিকাতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চা-রপ্তানি বন্দর। ভারত পৃথিবীর মধ্যে চা উৎপাদন ও রপ্তানিতে সাধারণতঃ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া থাকে (মাঝে মাঝে সিংহল)। কিন্তু বর্তমানে ভারতের চা শিল্প বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীতে চায়ের উৎপাদন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় চায়ের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অতিরিক্ত কর ভারের ফলে এই শিল্প পূর্ব-আফ্রিকার চা শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি এই শিল্পকে কিছু রপ্তানি শুল্কের সুবিধা দেওয়া হইতেছে। তবুও চা রপ্তানির পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে না। উৎকৃষ্ট চায়ের বাজারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী রাজ্য সিংহল।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় চা শিল্প বর্তমানে অসুবিধার মধ্যে রহিয়াছে। সিংহল এবং পূর্ব-আফ্রিকার দেশগুলি ভারতের চায়ের বাজারে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতেছে। তবু ভারতীয় চায়ের বাজার যে খুব সংকুচিত হইয়াছে তাহা নহে। তাহা ছাড়া, ভারতীয় চা শিল্পের বিষয়ে একটি আশার কথা এই যে, ভারতে চায়ের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়িতেছে। ১৯৫০ সালে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে ১৭০০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ১৯৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ২২০০ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায় এবং পরে আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে মূল্যের দিক দিয়া চায়ের স্থান দ্বিতীয়।

বর্তমানে প্রায় আট লক্ষ শ্রমিক ভারতের চা বাগানগুলি হইতে জীবিকা অর্জন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের অধিকাংশ বড় বড় চা বাগান এখন পর্যন্ত ইউরোপীয়দের হাতে রহিয়াছে। অনেক চা বাগানে চা-গাছগুলি খুবই পুরাতন হইয়াছে ও উৎপাদন হ্রাস পাইবার আশংকা রহিয়াছে। বিদেশী মালিকগণ (দেশের মোট চা বাগানের যত জমি আছে তাহার প্রায় ৬০ ভাগ বিদেশীয়দের হাতে) ঐ সকল চা গাছ তুলিয়া নূতন গাছ রোপণ করিতেছেন না। চা-শিল্প জাতীয়করণের প্রধান আশংকা হইতেছে বাজার হারাইবার আশংকা—কারণ ব্রিটেনই ভারতীয় চায়ের সর্বপ্রধান ক্রেতা। লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম চায়ের বাজার এবং পুনঃরপ্তানি কেন্দ্র। ভারতে উৎপন্ন মোট চায়ের একটা বড় অংশ ব্রিটেনে রপ্তানি হয়। লণ্ডনের চায়ের বাজার ছাড়াও বর্তমানে কলিকাতার চায়ের নীলাম বাজারও বেশ বড়। ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর ও সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রচুর চা লইয়া থাকে। কলিকাতা, কোচিন ও মাদ্রাজ বন্দর হইতে চা রপ্তানি হয়।

ভারতের মধ্যে **আসাম** অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক চা উৎপন্ন হয়। এখানে ডিব্রুগড়, শিবসাগর, লখিমপুর ও কাছাড়ে চায়ের বাগানগুলি অবস্থিত। এই অরণ্যময় বৃষ্টিবহুল স্থানগুলি চা চাষের ফলে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। আসামের পরেই **পশ্চিমবঙ্গের** দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার স্থান। দার্জিলিং-এর চা গন্ধের জন্য বিখ্যাত। প্রায় ৬।৭ হাজার ফুট উচ্চ পর্বত গাত্রেও চা বাগান আছে। কেরলেও উচ্চ পর্বত গাত্রে চা জন্মে। কিন্তু আসাম ও ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি ঢালু সমতল জমিতে অবস্থিত। তামিলনাড়ু ও কেরলে ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন পাহাড় ও বিহারের রাঁচিতেও কিছু চা উৎপন্ন হয়।

(b) **ইক্ষু**—সংস্কৃত শর্করা শব্দ হইতে sugar কথাটির উৎপত্তি। সুতরাং, ইক্ষু গাছের আদি উৎপাদন স্থান যে উত্তর ভারতে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইক্ষু চাষের পক্ষে ভারতের জলবায়ু অপেক্ষা পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলির ( জাভা, মরিসাস ) জলবায়ু অধিক উপযুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে যেখানে একর প্রতি ৬২ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয় সেই তুলনায় ভারতে প্রতি একরে মাত্র ১৬।১৭ টনের মত ইক্ষু পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতে ইক্ষুর জমিতে যথেষ্ট সার এবং জলসেচও দেওয়া হয় না। উর্বর জমিতে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে ইক্ষু চাষ ভাল হয়। ইক্ষু চাষের পক্ষে জলনিকাশের সুব্যবস্থা এবং মৃত্তিকায় অম্ল ( acidic oil ) জাতীয় উপাদান থাকা প্রয়োজন। সমুদ্রের বাতাস ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সুলভ শ্রমশক্তি ইক্ষু চাষের পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গ।

ইক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম। সমগ্র ভারতেই ইক্ষুর চাষ হয়। তবে প্রধানতঃ মধ্য এবং উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় ও দাক্ষিণাত্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ইক্ষু ভারতের যে অঞ্চলে অধিক চাষ হয়, যথা—উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর বিহারে, সেখানে জলবায়ু ইক্ষু চাষের পক্ষে খুব উপযোগী নহে; কাজেই একর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও বাংলায় প্রতি একরে ইক্ষুর উৎপাদন বিহার বা উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা অনেক ভাল হয়। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র ইক্ষু মোটামুটি ভাল জন্মে। **উত্তরপ্রদেশে** সর্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশে ইক্ষুই সর্বপ্রধান আর্থিক ফসল। ইহার উপর নির্ভর করিয়া সেখানে প্রায় ৯০টি চিনির কল চলিতেছে। তাহার পরই মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, বিহার, মাদ্রাজ, গুজরাট ও পাঞ্জাবের স্থান।

বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতের কোয়েম্বাটোর ইক্ষু গবেষণাগারের নির্দেশ অনুযায়ী উৎপন্ন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইক্ষু চাষ করিয়া উত্তরপ্রদেশের কোন কোন জেলায় খুব

ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। ইক্ষু চাষ প্রসার লাভ করার ফলে বর্তমানে ভারত চিনির বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে। কিন্তু ভারতে মাথাপিছু চিনির খরচ যেরূপ কম (বৎসরে মাত্র ৫½ কিলো চিনি এবং ১২ কিলো গুড়, সেই তুলনায় ব্রিটেনে মাথা পিছু প্রায় আধ কুইন্টল চিনি খরচ হয়) তাহাতে জীবন ধারণের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষু উৎপাদনও কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে সন্দেহ নাই। নচেৎ যেমন ১৯৫৩-৫৪ সালে চিনির কণ্ট্রোল ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টন চিনি আমদানি করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই অবস্থা পুনরায় দেখা দিতে পারে। বর্তমানে জৈব ও রাসায়নিক সার ইক্ষুর জমিতে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। তাহার ফলে একর প্রতি ফলন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি ফলন বেশ ভাল—প্রায় ৩০।৪০ টন। ১৯৬১ সালে ভারতে ইক্ষু চিনি ও গুড়ের উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় ৪।৫ লক্ষ টন চিনি বাড়তি হয়—ঐ চিনির কতকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে সুবিধাজনক দরে রপ্তানি করা হয়। **১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতে ৩৮ লক্ষ টন চিনি এবং প্রায় ৪৩ লক্ষ টন গুড় উৎপন্ন হয়।** চিনি রপ্তানি করিয়া ঐ বৎসর ভারত বহু কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। তবে এজন্য সরকার কয়েক কোটি টাকা সাহায্য দেন।

(c) কফি—পরিমিত বৃষ্টিপাত (১২৫ সেঃ মিঃ), মৃদু উষ্ণ জলবায়ু এবং জলনিকাশের সুব্যবস্থা সমন্বিত উর্বর লৌহপ্রধান লাল মৃত্তিকায় কফির চাষ ভাল হয়। চায়ের মত কফির চাষও পর্বতগাত্রে ভাল হয়। ইহার প্রথম অবস্থায় প্রখর সূর্যকিরণ অনিষ্টকর। এইজন্য পার্শ্বে ছায়াযুক্ত অন্যান্য গাছ রোপণ করা হয়। চাষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কলাগাছ প্রভৃতি রোপণ করিয়া চারা উৎপন্ন করা হয়। চায়ের মত কফি চাষও সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে।

ভারতে কফির চাষ প্রধানতঃ দক্ষিণ-ভারতে সীমাবদ্ধ। তামিলনাডু ও মহীশূর (১ লক্ষ হেক্টর জমিতে কফি জন্মে) ভারতের প্রধান কফি উৎপাদন কেন্দ্র। কফি প্রধানতঃ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সারা ভারতে এখন 'কফি মার্কেট এক্সপ্যান্‌সন বোর্ড' কফি পান প্রচলিত করার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় কফি বেশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। ভারতের 'আরাবিকা' এবং 'রোবাষ্টা' উভয় জাতীয় কফিই উৎপন্ন হয়। বর্তমানে কফি উৎপাদন ও রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বৎসরে ভারতে প্রায় ৬৫ হাজার টন কফি উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর প্রচুর কফি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতীয় কফির প্রধান ক্রেতা ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। ভারত বর্তমানে কফি রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

**Q. 34. What climatic conditions favouor the growth of tobacco? Locate the chief production centres in India. Is India an important exporter of tobacco?**

**[ কি প্রকার জলবায়ু তামাক চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট? ভারতের প্রধান প্রধান উৎপাদক স্থানগুলির নাম লিখ। ভারত কি তামাক রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে? ]**

তামাক—তামাক প্রধানতঃ উষ্ণ জলবায়ুতেই উৎপন্ন হয়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে তামাক উৎপাদিত হইতেছে। তামাক উৎপাদনের জন্য খুব উর্বর পলিমাটি, উষ্ণ জলবায়ু, জলনিকাশের সুব্যবস্থা ও জমিতে চুন ও পটাশের অস্তিত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক। তামাক উৎপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, বিহারের মতিহারী ও গয়া, তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লী, অন্ধ্রের কাকিনাদা প্রভৃতি অঞ্চল ভারতের প্রধান তামাক উৎপাদন কেন্দ্র; গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলেও প্রচুর তামাক জন্মে।

উত্তর ভারতে উৎপন্ন তামাকের পাতা খুব মোটা ও কালো হওয়ায় সিগারেট শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহা হইতে সাধারণতঃ অন্যান্য উৎকৃষ্ট তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহাদের মধ্যে নস্য, চুরুট, বিড়ি, অম্বুরি তামাক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্ররাজ্যের গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর ব-দ্বীপের উর্বর পলিমাটিতে আমেরিকার "ভার্জিনিয়া" নামক স্বাদে, গন্ধে এবং বর্ণে অতুলনীয় তামাক উৎপন্ন হইতেছে। ইহা ভারতের সিগারেট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে তামাক উৎপাদনে ভারতের স্থান কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরেই। অন্ধ্রে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে একত্রে প্রায় ৫১ হাজার টন, মাদ্রাজে ২৭ হাজার টন, মহীশূরে ১৮ হাজার টন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে প্রত্যেক রাজ্যে ১১ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়। অন্যান্য রাজ্যেও তামাকের চাষ আছে। ভারতে উৎপন্ন তামাকের অধিকাংশই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। প্রচুর তামাক বিদেশে রপ্তানিও হইয়া থাকে। ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভারতীয় তামাক জাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা। ইহা জার্মানী, জাপান, হল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সেও রপ্তানি হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের তামাক জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

**Q. 35. Name the important oilseeds of India and point out the areas where they are grown. Indicate their economic uses. Does India export oil seeds?**

**[ ভারতের প্রধান তৈলবীজগুলির নাম কর এবং কোথায় ঐগুলি উৎপন্ন হয় তাহা উল্লেখ কর। উহাদের অর্থনৈতিক উপযোগিতা কি? ভারত কি তৈলবীজ রপ্তানি করে? ]**

ভারতে উৎপন্ন **তৈলবীজগুলির** মধ্যে তিসি, সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, কার্পাসবীজ ও রেড়ির নামই উল্লেখযোগ্য। তৈলবীজ খাদ্য প্রস্তুত করা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, সুগন্ধি, বার্ণিশ, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি তৈয়ারির কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য ও চাষের জমির সার।

(১) **তিসি** বা **মসিনা** ( **Linseed** )—তিসি বা মসিনা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণতঃ রং ও বার্ণিশ প্রস্তুতের কার্যে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ ইহার প্রধান উৎপাদক। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র রাজ্যেও সামান্য তিসিবীজ ( linseed ) জন্মে। ভারতে উৎপন্ন তিসি এবং উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্য যেমন তৈল, খৈল প্রভৃতি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। তিসি বা মসিনা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

(২) **সরিষা ও রাই** ( **Mustard & Rapeseed** )—সরিষা উত্তর প্রদেশেই সর্বাধিক পরিমাণে জন্মে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং পাঞ্জাবেও কিছু পরিমাণ সরিষা জন্মে। দাক্ষিণাত্যে খুব সামান্য পরিমাণ সরিষা উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশেই সমগ্র ভারতে উৎপন্ন সরিষার অর্ধেক জন্মে। সরিষার তৈল সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উহার উৎপাদন যথেষ্ট নহে বলিয়া উহা উত্তরপ্রদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়।

সরিষার খইল পশুর খাদ্য হিসাবে ও নানাকার্যে ব্যবহৃত হয়। লাল সরিষা অপেক্ষা সাদা সরিষার চাহিদা বেশি।

(৩) **চীনা বাদাম** ( **Ground nut** )— ভারতের তৈলবীজগুলির মধ্যে চীনা বাদাম সর্বপ্রধান। অল্প বৃষ্টিপাতে ও হাল্কা মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। ভারতে প্রায় ৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয় ; ইহা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র রাজ্যে ইহার উৎপাদন কেন্দ্রীভূত। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ হইতেছে। "বনস্পতি" প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয়। খাদ্য তৈল ও সাবান প্রভৃতিতেও বাদাম তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(৪) **তিল (Sesame)**—ভারতের প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি তিল জন্মে। কয়েক লক্ষ একর জমি ইহার চাষে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রধানতঃ ইহার উৎপাদন গুজরাট,

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত। পশ্চিম বাংলাতেও সামান্য পরিমাণ তিল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট তিল উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ একমাত্র ভারতে উৎপন্ন হয়। খাদ্য তৈল, ঔষধ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত কার্যে তিলের তৈল ব্যবহৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন তিল প্রধানতঃ বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ব্রিটেনে রপ্তানি হয়।

(৫) **রেড়ী** ( **Castor seed** )—রেড়ী হইতে 'ক্যাষ্টার অয়েল' প্রস্তুত হয়। ইহা ঔষধের জন্য প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। ভারতে ইহার সাহায্যে প্রদীপ জ্বালানো হয়। নানা শিল্পকার্যে, বিশেষতঃ বিমানের ইঞ্জিন পরিষ্কার করিতে, এই তৈল ব্যবহৃত হয়। রেড়ী উৎপাদন ভারতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়। বিহার, তামিলনাড়ু, অন্ধ্ররাজ্য, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশেই প্রধানতঃ রেড়ী উৎপন্ন হয়। ভারতের উৎপাদনের অধিকাংশই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের দেশগুলিতে ও আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়।

(৬ **নারিকেল** ( **Cocoanut** )—নারিকেল হইতেও তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ুতে নারিকেল তৈল খাদ্য হিসাবে ও অন্যত্র কেশ তৈল হিসাবে ও সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভারত বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন হইতে নারিকেল তৈল আমদানি করিতেছে। ভারত হইতে ( প্রধানতঃ কোচিন হইতে ) নারিকেল দড়ি, কাতার মাদুর প্রভৃতি ইউরোপে রপ্তানি হয়।

**ভারত কয়েক বৎসর পূর্বেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভেষজ তৈল ও তৈলবীজ রপ্তানিকারক দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল**। ১৯৫৫ সালে ভারত মোট ৩১ কোটি টাকার তৈল ও তৈলবীজ রপ্তানি করে। কিন্তু বর্তমানে আর্জেন্টিনা, পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। তাহা ছাড়া, বর্তমানে ভারত হইতে অবাধে তৈলবীজ রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে। কারণ তৈল একটি পুষ্টিকর খাদ্য ; খইল উৎকৃষ্ট পশু খাদ্য এবং জমির সার। সুতরাং, তৈলবীজ রপ্তানি করা খাদ্য সমস্যার দিনে সঙ্গত নহে। বর্তমানে কেবল তিসি, রেড়ী প্রভৃতি কয়েক প্রকার অখাদ্য তৈল ও খইল রপ্তানি হয়। এদেশের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, তৈলবীজ রপ্তানি না করিয়া ভারতে তৈল-শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন এবং কেবলমাত্র তৈলই রপ্তানি করা উচিত। গত কয়েক বৎসরে সমগ্র ভারতে শত শত তৈলের কল ও ঘানি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভারত বর্তমানে প্রধানতঃ অখাদ্য তৈল ও খইল রপ্তানি করিতেছে। খাদ্য তৈলের অভাবে এদেশের সাবান শিল্প বিদেশ হইতে ট্যালো আমদানি করিতেছে।

**প্রাণিজ পণ্য—**

**Q. 36. What do you know of sericulture and the silk industry of India ?**

**[ ভারতে রেশম কীট পালন এবং রেশম শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ]**

**রেশম** ( Silk )—তুঁতগাছের পাতা খাওয়াইয়া কুটীর শিল্প হিসাবে গুটিপোকা পালন ( sericulture ) করা হয়। ঐ গুটিপোকা হইতে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়। এই রেশমের অনেকগুলি সূক্ষ্ম আঁশ একত্রে পাকাইয়া সূতা তৈয়ারির পর কলে বা তাঁতে বোনা হয় ( silk industry )। রেশম উৎপাদনকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যথা—(১) উপযুক্ত স্থানে তুঁতগাছ চাষ করা, (২) গুটিপোকা ও উহার ডিম উৎপাদন করা, (৩) পোকাকে কাঁচা পাতা খাওয়াইয়া গুটি ( cocoon ) উৎপন্ন করা এবং (৪) গুটি হইতে রেশম সূতা প্রস্তুত করা ( reeling )। তাহা ছাড়া, অরণ্যের গাছ হইতেও ( বন্য পোকা দ্বারা উৎপন্ন ) রেশম পাওয়া যায়। আসামেই ইহা অধিক পাওয়া যায়। এণ্ডি ও মুগা এই জাতীয় রেশম। ভারতের রেশম উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা—

(১) তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলা ও মহীশূরের দক্ষিণাঞ্চল (২) পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম এবং বাঁকুড়া (৩) কাশ্মীর ও জম্মু। তাহা ছাড়া, বিহারের ভাগলপুর অঞ্চল ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলও রেশম উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিখ্যাত; তসর, গরদ, এণ্ডি, মুগা, মট্‌কা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রেশম এখানে উৎপন্ন হয়। প্রকৃত রেশম উৎপাদনে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর ও কাশ্মীরের স্থান সর্বোচ্চে। ভাগলপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঙ্গালোর, বারাণসী, সুরাট ও অমৃতসরে প্রধান রেশম-শিল্প কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

ইদানিং ভারতে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশে ভারতীয় রেশম বস্ত্রের বেশ চাহিদা আছে। কিছু পরিমাণ রেশমজাত সৌখীন দ্রব্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানিও হয়। ভারতের জলবায়ু তুঁতগাছ চাষ ও গুটিপোকা ( silk worm ) পালনের উপযোগী। ভারতে প্রচুর সুলভ শ্রম শক্তির অভাব নাই। সুতরাং, ভারতে রেশম উৎপাদনের প্রসার অনায়াসেই সম্ভব। ভারতে রেশম কীট পালন ( sericulture ) ও রেশম শিল্পের প্রসার হইলে মাথা পিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

**কৃত্রিম রেশম**—বর্তমানে কৃত্রিম রেশম বা রেঁয় উৎপাদনের অনেকগুলি কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃত্রিম রেশমও বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ফলে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হইতেছে। মহারাষ্ট্র,

পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্যে কৃত্রিম রেশমের কারখানাগুলি অবস্থিত। ইহার প্রধান কাঁচামাল বাঁশ ঐ রাজ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

**Q. 37. Write short informative account on the following :—(a) Cattle rearing and Dairy farming. (b) Importance of Sericulture in India. ( B. Com. 1953 )**

**[ নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে ক্ষুদ্রাকার তথ্যমূলক টীকা লিখ—(ক) ভারতে গোপালন ও দুগ্ধশিল্প (খ) ভারতে রেশম চাষের গুরুত্ব। ]**

(a) **গো-পালন ও দুগ্ধশিল্প**—একজন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য দৈনিক অন্ততঃ ১৫ আউন্স দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়া দরকার। ভারতের নিরামিষভোজী ( ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নিরামিষ ভোজী ) জনসাধারণের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি দুধ খাওয়া উচিত। অথচ ভারতে মাথাপিছু দুগ্ধ সরবরাহ মাত্র ৫ আউন্স। সুতরাং, আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যবান লোক খুব কম দেখা যায়। ভারতীয়দের গড় জীবনকাল মাত্র ৫০ বৎসর ( নিউজিল্যাণ্ডে ৬০ বৎসরের বেশি )। পৃথিবীতে মোট গরুর সংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি ; তাহার মধ্যে প্রায় ২০ কোটি গরু ও মহিষ ভারতে রহিয়াছে। ভারত পৃথিবীর মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে গো-সম্পদে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ হইলেও সাধারণ ভারতীয় গরু অতি অল্পমাত্র দুগ্ধ দান করে। পৃথিবীতে গো-জাতি উন্নয়নে নিউজিল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। নিউজিল্যাণ্ডে গড়ে একটি গরু তাহার দুগ্ধদানকালে ৭০ মণ দুগ্ধ দান করে ( কয়েক মাসে )। ভাল জাতের ভারতীয় গরু এক সালের সমগ্র দুগ্ধদানকালে ( per lactation ) মাত্র ১৯ মণ দুগ্ধ দান করে। সাধারণ গরু ইহা অপেক্ষা অনেক কম দুধ দেয়। ভারতে গো-মহিষাদির দুগ্ধ উৎপাদন ২৩০ লক্ষ টন, উহার মধ্যে গোদুগ্ধ ১১০ ও মহিষ দুগ্ধ ১২০ লক্ষ টন। ভারত বিভাগের ফলে কেবলমাত্র পাঞ্জাবের বিখ্যাত **হরিয়ানা গরু** এখন কিছু সংখ্যায় ভারতে দেখা যায়। অন্যান্য বিখ্যাত গো-জাতি পশ্চিম পাকিস্তানে রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর এবং নেলোরেও ভাল গরু দেখা যায়।

ভারতে গরুর ( বা বলদ ) প্রধান প্রয়োজন চাষের কাজের জন্য। গাড়ি টানা, ঘানি টানা, কূপ হইতে সেচের জল তোলা প্রভৃতি কাজে এখন পর্যন্ত গরুই মানুষের প্রধান অবলম্বন। ভারতীয় গরু যে পরিমাণ দুগ্ধ দান করে তাহা নগণ্য।

ভারতের অধিকাংশ স্থানেই গরু স্বাস্থ্যহীন এবং ব্যাধির আক্রমণে বৎসরে লক্ষ লক্ষ গরু অকালে প্রাণত্যাগ করে। গ্রামাঞ্চলে গো-চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। গরু কেবলমাত্র ঘাস খাইয়া অধিক দুগ্ধ দান করিতে পারে না। নানাপ্রকার পুষ্টিকর খাদ্য উহাদের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ভারতে লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষের

জমি এতই কম যে বর্তমান অবস্থায় গরুর খাদ্য ফসল ও ঘাস উৎপাদন করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং, দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি করা সহজ নহে। তবে জমির বিঘা প্রতি উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে অনায়াসে গরুর খাদ্য ফসল যথেষ্ট উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিখ্যাত গো-দুগ্ধবিশারদ অধ্যাপক রিডেটকে ( Riddet ) এ দেশের গো-শিল্পের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করিতে বলেন। অধ্যাপক রিডেটের মতে শহরাঞ্চলে গরু রাখা উচিত নহে। ইহাতে গরুর দুধের গুণ কমিয়া যায় এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষিজমি সারের অভাবে অনুর্বর হইয়া পড়ে।

ভারতে এ পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে দুগ্ধশিল্প গঠন করিবার প্রচেষ্টা মাত্র কয়েকটি সরকারী খামার ভিন্ন অন্যত্র হয় নাই। কলিকাতার নিকট হরিণঘাটা এবং বোম্বাইয়ের নিকটস্থ অঞ্চলে আধুনিক গো-পালন কেন্দ্র ও দুগ্ধশিল্প স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতে দুগ্ধের অভাবের জন্য বর্তমানে সহস্র সহস্র টন গুঁড়া ও জমাট দুগ্ধ অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করা হইতেছে। বৎসরে কয়েক কোটি টাকার দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ভারতে জমাট দুগ্ধ মাখন উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পগুলি অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। দেশে দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এই শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব নহে। কারণ টাট্‌কা দুগ্ধ শহর ও গ্রামবাসীগণ মোটেই যথেষ্ট পরিমাণে পান না। সুতরাং, বাড়তি দুগ্ধ পাওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমদানিকৃত গুঁড়া দুধের সাহায্যে যে সকল দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডের সাহায্যে ভারতে কয়েকটি দুগ্ধশিল্পকেন্দ্র গঠন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। গুজরাট এবং পাঞ্জাবে কয়েকটি গুঁড়া দুধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

(b) রেশম শিল্প—[ পূর্ববর্তী 36 প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ]

**Q. 38. Describe the fishing industry of India with special reference to sea fishing.**

**[ ভারতের মৎস্য শিল্পের, বিশেষতঃ সমুদ্রে মাছধরার বর্ণনা দাও। ]**

**ভারতের মৎস্য শিল্প**—ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়। ইহার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই ধরা হয় সমুদ্র-উপকুলের মৎস্যক্ষেত্র হইতে। স্বাদু জলের মাছ সুখাদ্য বটে কিন্তু ইহার সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। এদেশে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পুকুর ও বিলে মৎস্য চাষ এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। ভারতের মধ্যে মৎস্যের অভাব পশ্চিম বঙ্গেই সবচেয়ে বেশি। এই রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি মৎস্যপ্রিয় এবং এখানকার অধিবাসীরা সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করে না। উত্তর ভারতে স্বাদুজলের মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, মহাশোল

ইত্যাদি প্রধান। উত্তর ভারতে মাছের চাহিদা কম; কারণ সেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিরামিষ আহার পছন্দ করেন। পূর্ব ভারতে মাছের চাহিদা খুব বেশি কারণ বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় প্রায় সকলেই মৎস্য প্রিয়। এই অঞ্চলে নদী ও পুকুরে রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, আড়, গলদা ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গে ইলিশ ও ভেটকি পাওয়া যায়। ইদানিং পশ্চিমবঙ্গে তেলাপিয়া মাছ খুব ব্যাপক ভাবে চাষ হইতেছে। তবুও পূর্ব ভারতে মাছের খুব অভাব। সমুদ্রের মাছ ভিন্ন এই অভাব মিটাইবার আর কোন উপায় নাই।

ভারতের উপকূলভাগে বিরাট মহীসোপান মৎস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতে যত মাছ ধরা হয় তাহার ⅘ ভাগ সমুদ্রতট হইতে পাওয়া যায়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কেরলের উপকূলে সুপ্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হয়। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও উড়িষ্যার উপকূলেও কিছু পরিমাণ মাছ ধরা হয়। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে পমফ্রেট, ম্যাকরেল, স্যামন প্রভৃতি মাছ সুস্বাদু। আরব সাগর তটে গলদা চিংড়ি মাছ ধরার জন্য কেরল ও মহীশূর উপকূলে কোচিন হইতে গোয়া পর্যন্ত শত শত যন্ত্রসজ্জিত ট্রলার মাছ ধরে। কোচিন হইতে ১৯৬৯ সালে প্রায় ১০ কোটি টাকার চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানি হয়। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের উপকূলে প্রচুর হাঙরও শিকার করা হয়। হাঙরের লিভারের তৈল পুষ্টিকর ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। ভারতেও ব-দ্বীপগুলি মৎস্য-উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। সুন্দরবনের ব-দ্বীপ এবিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। উপকূলভাগে চিল্কা প্রভৃতি উপ-হ্রদগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য সর্বত্রই নদীতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশের জলাশয়গুলিতে শীতপ্রধান দেশের মাছ ট্রাউট প্রভৃতি চাষ করা হয়। বোম্বাই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গভীর সমুদ্রে ট্রলার প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্র-সজ্জিত জাহাজের সাহায্যে মাছ ধরা হইতেছে। মাছ চালান দেওয়া এক বিরাট সমস্যা কারণ এদেশে মাছ শীঘ্রই পচিয়া যায়। এইজন্য প্রচুর লবণ, বরফ, ঠাণ্ডাঘর ও দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা দরকার। বর্তমানে নানাস্থানে ঠাণ্ডাঘর নির্মাণ করা হইয়াছে। কেরল হইতে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার সামুদ্রিক মাছ বিদেশে চালান দেওয়া হয় অথচ কলিকাতা মাছের জন্য প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর নির্ভর করে। ভারতীয়েরা গড়ে বৎসরে মাত্র ৩ সের মাছ খায়। জাপানীরা খায় ২০ গুণ বেশি।

## খনিজ সম্পদ

### MINING INDUSTRIES

**Q. 39. Comment on the distribution of coal in India. What measures have been adopted in India for conservation of coal?**

**[ভারতে কয়লাখনিগুলির অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য কর। ভারতে কয়লা সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?]**

**ভারতের কয়লা সম্পদ** প্রধানতঃ দেশের মধ্য-পূর্বভাগে অবস্থিত। প্রাচীনকালে গণ্ডোয়ানা যুগে দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পূর্ব অংশে দামোদর, মহানদী, গোদাবরী প্রভৃতি নদী উপত্যকাগুলিতে কয়লার স্তরগুলি সঞ্চিত হইয়াছিল। দামোদর ও তাহার উপনদীগুলির উপত্যকায় ভারতের মোট কয়লা সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক সঞ্চিত রহিয়াছে। এখানেই ভারতের যা কিছু ভাল কয়লা পাওয়া যায়। ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, বোকারো এবং করণপুরা এই অঞ্চলের প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল। মহানদীর অববাহিকায় রামপুর ও তালচরের কয়লাখনি অবস্থিত। গোদাবরী ও তাহার উপনদীগুলির উপত্যকায় সিঙ্গারেণী প্রভৃতি বহু কয়লাখনি আছে। মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের চান্দা অঞ্চলেও কয়লা খনি আছে।

ভারতীয় কয়লাখনিগুলির উপরিউক্ত প্রকার অবস্থানের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে; যথা—(১) বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনিগুলি হইতে রেলপথে বহুদূর দূরান্তে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রান্তীয় অঞ্চলে কয়লার পরিবহণ-ব্যয় অত্যধিক হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করার নানা অসুবিধা আছে, তাহার মধ্যে নিয়মিতভাবে কয়লা পাওয়ার সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুতর। (২) রেল ওয়াগনগুলি বহুদূরে কয়লা লইয়া যায় বলিয়া ঐগুলি ফিরিতে অনেক দেরী হয় এবং ওয়াগনের অভাবে কয়লা খনির মুখে কয়লা জমিয়া যায়। (৩) কলিকাতা বন্দরে সম্প্রতি আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐ বন্দর মারফত বিদেশে এবং ভারতের বন্দরগুলিতে রাণীগঞ্জ-ঝরিয়ার কয়লা সরবরাহ করা ব্যয়সাধ্য। সুতরাং, ভারতের নানাস্থানে যে সকল কৃষিজ, বনজ ও খনিজ কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে তাহা সস্তা কয়লার অভাবে যথাযথভাবে কাজে লাগিতেছে না। অবশ্য বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রসারে কয়লাখনিগুলি খুব সাহায্য করিয়াছে। বিহারের দক্ষিণভাগে এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহ-শিলার ভাণ্ডার ও কয়লার খনি কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় ঐ সকল স্থানে ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। ইস্পাতশিল্পের কেন্দ্র হিসাবে জামসেদপুর

তাহার ভৌগোলিক অবস্থানজনিত যত সুবিধা ভোগ করে পৃথিবীর আর কোন ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র তত সুবিধা ভোগ করে না। হুগলী উপত্যকার শিল্পগুলি সম্পর্কেও ঐ কথাই বলা চলে।

ভারতের কয়লাখনিগুলি দেশের পূর্বভাগে অবস্থিত হওয়ার ফলে দেশের অন্যান্য অংশের যে অসুবিধা রহিয়াছে, তাহা লাঘব করার জন্য ভারত সরকার ঠিক করিয়াছেন যে, অতঃপর ভারতের মধ্য ও দক্ষিণভাগের কয়লাখনিগুলির উৎপাদন যতদূর সম্ভব বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রদেশের ভিলাই ইস্পাত কারখানার একশত মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত করবা কয়লাখনিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে। মাদ্রাজের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নেয়াভেলির বিরাট লিগনাইট কয়লাক্ষেত্রটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়া ২½ লক্ষ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইয়াছে। সিঙ্গারেণীর উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

**কয়লা সংরক্ষণ** (conservation)—ভারতে মাঝারি ও খারাপ কয়লার অভাব নাই। ঐ শ্রেণীর কয়লা আরও পাঁচ শতাধিক বৎসর চলিতে পারে। কিন্তু ভাল কোক প্রস্তুতের উপযুক্ত কয়লার মোট ভাণ্ডার ৩০ হইতে ৫০ কোটি টন মাত্র (সর্বপ্রকার কোক কয়লা উহার দুই তিন গুণ হইতে পারে)। সুতরাং, ঐ উৎকৃষ্ট কয়লা ক্রমশঃ বর্ধিত হারে খরচ হইলে ৮০ বৎসরও চলিবে না বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে নূতন কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং শক্তির জন্য পারমাণবিক মহাশক্তি ব্যবহৃত হইলে কয়লার প্রয়োজন কতদূর থাকিবে তাহাও বলা যায় না। তবু আমাদের কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। বিগত শতাব্দীতে বিদেশীদের হাতে আমাদের কয়লা সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়া বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। এখনও ভাল কয়লার অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। এজন্য বর্তমানে সরকারের তত্ত্বাবধানে যে সকল সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা হইল—

(১) উচ্চ শ্রেণীর কয়লা কম থাকায় বর্তমানে নিম্নশ্রেণীর কয়লা অধিক পরিমাণে উত্তোলনের চেষ্টা চলিতেছে।

(২) কয়লার খনিতে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া শ্রমিকের অসুবিধা ও কয়লার অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। কয়লা উত্তোলনের পর খনি গহ্বর বালি দিয়া ভরাট করা হইতেছে।

(৩) খারাপ কয়লা যন্ত্রের সাহায্যে ধৌত করিয়া উহার ছাইয়ের ভাগ কমাইয়া অল্প পরিমাণ ভাল কয়লার সঙ্গে মিশাইয়া উহা ধাতুশিল্পে ব্যবহার করা হইতেছে।

(৪) ভারতীয় রেলপথগুলি যাহাতে অধিক পরিমাণে ভাল কয়লা ব্যবহার না করে, সেজন্য খারাপ কয়লা হইতে উৎপন্ন তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে অনেক স্থানে রেলপথ চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৫) ধানবাদের নিকট অবস্থিত Fuel Research Institute নিকৃষ্ট কয়লা হইতে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় দাহ্যপদার্থ উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে।

(৬) নানাস্থানে বহু কোক চুল্লী স্থাপন করিয়া কয়লার মধ্যস্থ জলীয় অঙ্গার ও গ্যাস কাজে লাগানো হইতেছে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে অবলম্বন করিলে ভারতের কয়লা সম্পদ দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতির শিল্পগঠনের কাজে লাগিবে।

**Q. 40. Examine the distribution of coalfields in India and explain the nature and degree of utilization of these for the development of local industries.**

**[ভারতে কয়লাখনির বিন্যাস পর্যালোচনা কর এবং স্থানীয় শিল্পের উন্নয়নে এগুলির ব্যবহারের বিষয় ব্যাখ্যা কর।]**

ভারত কয়লা সম্পদে মোটামুটি রকম সমৃদ্ধ। ভূনিম্নে ২০০০ ফুট পর্যন্ত মোট ব্যবহারযোগ্য কয়লার পরিমাণ ২০০০ কোটি টনের বেশি। পরিকল্পনা কমিশনের ১৯৬১ সালের বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতে চার ফুটের অধিক চওড়া কয়লার স্তর আছে মোট ৫০০০ কোটি টনের মত। ইহার মধ্যে মাত্র ২৮০ কোটি টন কয়লা কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযুক্ত। পৃথিবীর কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের কয়লা সম্পদ ও উহার উৎপাদন অধিক নহে, তবে মধ্যম শ্রেণীর কয়লার প্রায় অফুরন্ত সংস্থান ভারতের নানাস্থানে রহিয়াছে। কেবল মাত্র দামোদর উপত্যকাতেই বিপুল পরিমাণে কয়লা রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস-এর অনুসন্ধান প্রচেষ্টার ফলে সম্প্রতি এই অঞ্চলে আরও বহু কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নূতন আবিষ্কৃত খনিগুলির কোন কোন কয়লার স্তর শতাধিক ফুট পুরু এবং বহু বর্গমাইল বিস্তৃত।

**ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৭ কোটি টনের মত কয়লা উৎপন্ন হয়।** মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর কয়লা অদূর ভবিষ্যতেও নিঃশেষিত হইবার কোন আশংকা নাই। তবে রাণীগঞ্জ প্রভৃতি পুরাতন খনি এলাকাগুলির কোন কোন খনি ইতিমধ্যেই ২০০০ ফুটের অধিক গভীর হইয়াছে। ফলে কয়লা উৎপাদন ক্রমশঃ ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ভারতে এ্যানথ্রাসাইট কয়লা নাই বলিলেই হয়, কোক প্রস্তুতের উপযুক্ত যে বিটুমিনাস কয়লা মাটি হইতে ২০০০ ফুট নিম্ন পর্যন্ত স্তরে স্তরে রহিয়াছে (কেবল মাত্র রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, করণপুরা ও বোকারো অঞ্চলে) তাহার সংস্থান অধিক নহে; উহা ৮০ বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়া যাইতে পারে, কারণ বর্তমানে ভারতে প্রধানতঃ ভাল কয়লাই তোলা হইতেছে। রেল ইঞ্জিনগুলি উহার অনেকটা

এখনও ব্যবহার করে—তবে এই ব্যবহার হ্রাস পাইতেছে। ভারত সরকার দেশের কয়লা সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সম্প্রতি আইন করিতেছেন যে, খারাপ কয়লা অধিক পরিমাণে উত্তোলন করিতে হইবে এবং বালুকা দ্বারা খনিগর্ভ ভরাট করিতে হইবে।

ভারতের অধিকাংশ কয়লার স্তর গণ্ডোয়ানা যুগে নদী ও হ্রদের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল। কঠিন শিলার আবরণে উহা যুগ যুগ ধরিয়া ভূ-পৃষ্ঠের সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে স্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, ভারতে কয়লা উত্তোলন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেবল হিমালয়ের পাদদেশে ও আসামে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লাখনি আছে উহাদের কয়লাস্তরগুলি ভাঁজ হওয়ার ফলে স্থানে স্থানে গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। আসামের কয়লার সঙ্গে অধিক পরিমাণে গন্ধক মেশানো আছে। বোকারোর কয়লায় ছাই বেশি। অনেক স্থানেই কয়লার মধ্যে জল, গ্যাস ও ছাই খুব বেশি আছে। ভারতের প্রধান কয়লাখনিগুলির নাম :—

**গণ্ডোয়ানা কয়লা বলয় ঃ—**

(১) **রাণীগঞ্জে** ( পশ্চিমবঙ্গ ) ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক কয়লা উৎপন্ন হয়। এখানকার কয়লা উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর। (২) **ঝরিয়ায়** ( বিহার ) ভারতের মোট উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কয়লা উৎপন্ন হয়। এই কয়লা খুব উচ্চশ্রেণীর। (৩) **বোকারোর** ( বিহার ) কয়লা প্রধানতঃ রেলওয়ে এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কয়লায় ছাই বেশি বলিয়া ধুইয়া তবে ইস্পাত কারখানায় ব্যবহার করা যায়। (৪) **করণপুরার** ( বিহার ) বিপুল ভাণ্ডার সম্প্রতি ব্যবহৃত হইতেছে। (৫) **গিরিডির** ( বিহার ) খনি ক্ষুদ্র হইলেও কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। (৬) **তালচর ও রামপুরের** ( উড়িষ্যা ) কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, উৎপাদনও কম। (৭) **উমারিয়া** ( মধ্যপ্রদেশ ) মধ্যম শ্রেণীর কয়লা উৎপাদন করে। (৮) **করবা** ( Korba ) মধ্যপ্রদেশের নূতন বৃহৎ খনি সম্প্রতি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ভিলাই ইস্পাত কারখানা হইতে খুব বেশি দূরে নহে এবং এখানকার কয়লাও মধ্যম শ্রেণীর। (৯) **চান্দা** মহারাষ্ট্র রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি। (১০) **সিঙ্গারেনিতে** ( অন্ধ্র ) প্রচুর মধ্যমশ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হয়।

**টারসিয়ারি কয়লা বলয়—**

**মাদ্রাজ রাজ্যের নেয়াভেলিতে** নিম্নশ্রেণীর লিগনাইট কয়লার বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কয়লার সাহায্যে নেভেলিতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে এবং এখানেই লক্ষ লক্ষ টন ব্রিকেট এবং ইউরিয়া নামক রাসায়নিক সার উৎপন্ন হইতেছে। অপরাপর টারসিয়ারি খনি-গুলির মধ্যে রাজস্থানের বিকানির ও কাশ্মীরের রায়াসি খনি উল্লেখযোগ্য। আসামে

মাকুম ও মিকির পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা রহিয়াছে। কিন্তু রেল ব্যবস্থার অভাব থাকায় এখানে উৎপাদন কম।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে পাওয়া যায়। ভারতের খনিগুলি হইতে আধুনিক প্রথায় কয়লা উত্তোলন সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। বালি দ্বারা খনি ভরাট, ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা কাটা, ব্রিকেট প্রস্তুত ও কোক চুল্লি ( coke oven ) প্রস্তুত কার্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে জামসেদপুর, কুলটি, সিন্ধ্রি প্রভৃতি স্থানের কয়লা পোড়াইবার চুল্লি হইতে আলকাতরা, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। বর্তমানে দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে আরও বহু আধুনিক কোক চুল্লি ও কয়লা ধৌতাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

**কয়লা ও শিল্পের একদেশতা**—ভারতের শিল্পগুলি নানাস্থানে কেন্দ্রীভূত। কলিকাতার পাট, কার্পাস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্প, বোম্বাই ও গুজরাটের

কার্পাস শিল্প, কানপুরের কার্পাস ও চর্ম শিল্প, মাদ্রাজের কার্পাস এবং জামসেদপুর ও আসানসোলের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ শিল্পপ্রধান স্থানগুলির মধ্যে বোম্বাই শহর অনেকাংশে জলবিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং উহার কয়লার প্রয়োজন কম। মাদ্রাজ অংশতঃ কয়লার উপর নির্ভর করে এবং ঐ কয়লা কলিকাতা হইতে জলপথে ও রেলপথে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট সকল শিল্পপ্রধান স্থানের অধিকাংশ শিল্পই ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি গণ্ডোয়ানা কয়লা বলয়ের খনি হইতে কয়লা লইয়া থাকে। এই কয়লা বহনের জন্য রেলপথকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। ভারতে উৎপন্ন কয়লার মধ্যে রপ্তানি বাবদ প্রায় কয়েক লক্ষ টন বাদে অবশিষ্ট সকল কয়লাই ভারতে ব্যবহার করা হয়। কয়লা রেলপথ ও ইস্পাত শিল্পেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

কয়লাখনি অঞ্চলে যে সকল বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, গ্যাস, বিদ্যুৎ, কাঁচ, ভারীযন্ত্রপাতি এবং মিশ্র ইস্পাত কারখানা সর্বপ্রধান। তাহা ছাড়া সিন্ধ্রির সারের কারখানা, কুলটী ও বার্ণপুরের বড় বড় ইস্পাতের কারখানা, আসানসোলের অদূরে বৃহৎ এ্যালুমিনিয়ামের কারখানা, সাইকেলের কারখানা, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা এবং জামসেদপুরের বিশাল ইস্পাতের কারখানার নাম করা যাইতে পারে। কয়লার সহজ লভ্যতার জন্যই এই অঞ্চলে দ্রুত শিল্পের প্রসার হইতেছে। এই প্রসঙ্গে রাণীগঞ্জের কাগজের কল ও কুমারধুবীর ফায়ার ব্রিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, কয়লা পোড়াইয়া উপজাত দ্রব্য বাহির করার বহু কারখানা ধানবাদ, রাউরকেলা, কুলটী, ঝরিয়া, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে আছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কয়লাখনিগুলি ছোট হওয়ায় শিল্প গঠনের পক্ষে তেমন সহায়ক হয় নাই। আসামের কয়লায় সিমেণ্ট ও চায়ের কারখানা চলে। মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের কয়লায় রেলগাড়ি, কাঁচ, সিমেণ্ট ও বস্ত্রের কারখানা চলে।

**Q. 41. Mention the important uses of coal. Discuss the defects and problems of coal mining industry of India. Is conservation of coal necessary in India ? ( B. Com. 1962 )**

**[ কয়লার প্রধান প্রধান ব্যবহার কি ? ভারতের কয়লাখনি শিল্পের ত্রুটিগুলি এবং সমস্যাগুলি পর্যালোচনা কর। ভারতে কয়লা সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে কি ? ]**

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতে প্রায় ৭০ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপন্ন হয়। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও কয়লা উত্তাপ উৎপাদন ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। কয়লার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—(১) রেল ইঞ্জিন,

জাহাজ, কারখানার বয়লার ইত্যাদির জন্য (২) গৃহের রন্ধন কার্যের জন্য। কয়লার পরোক্ষ ব্যবহার হইল—(ক) তাপ-বিদ্যুৎ ( thermal power ) উৎপাদনের জন্য এবং (খ) গ্যাস, কৃত্রিম তৈল, পোকামারার ঔষধ, রাসায়নিক সার, রং প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য। বর্তমান জগতে ইঞ্জিন ও রন্ধনের জন্য কয়লার বদলে তৈল ও বৈদ্যুতিক শক্তি অথবা কয়লা-গ্যাস বা স্বাভাবিক গ্যাস ক্রমশঃ অধিক ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতেও কয়লার ব্যবহার পরিবর্তনের এই ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

**কয়লা সংরক্ষণ** ( Conservation )—ভারতের কয়লা খনিগুলি দেশের পূর্বাংশে অবস্থিত। এই খনিগুলির মধ্যে রাণীগঞ্জে ১৮১৪ সালে প্রথম কয়লা উত্তোলন আরম্ভ হয়। খনিগুলির বেশির ভাগ প্রাচীন ধরনের। ভারতীয় কয়লাখনি শিল্পের ত্রুটি এবং অসুবিধাগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :—(১) যান্ত্রিক ত্রুটি ও পরিবহণের অসুবিধা এবং (২) সংগঠনের ত্রুটি।

যান্ত্রিক ত্রুটির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল—(ক) আধুনিক কয়লা কাটা যন্ত্রের অভাব। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে এগুলি আমদানি করার অসুবিধা আছে। দুর্গাপুরে যন্ত্রনির্মাণের যে কারখানা স্থাপিত হইয়াছে উহা অবশ্য এ অভাব মিটাইতেছে। (খ) খনির গহ্বরে বালি ভর্তি করার (sand stowing) নানা অসুবিধা এবং তাহার ফলে ক্ষয়-ক্ষতি হয়। (গ) বহু দুর্ঘটনা ঘটে এবং ফলে কয়লা ও মানুষ উভয়ই বিপদগ্রস্ত হয়। ইহা অসাবধানতার ও যন্ত্রের অভাবের জন্যই ঘটে। (ঘ) রেল ওয়াগনের গুরুতর অভাবে কয়লা জমিয়া যায় অথচ কারখানা কয়লা পায় না। বর্তমানে এই অবস্থার উন্নতি হইলেও কয়লা শিল্পের ইহাই সবচেয়ে বড় বিপদ। সংগঠনের ত্রুটির মধ্যে ছোট খনিগুলির দুর্বল অবস্থা, খনিশিল্পে বিদেশী স্বার্থ, সরকারি কয়লা খনি সংস্থার (NCDC) অপ্রচুর ক্ষমতা ও মন্থর অগ্রগতি এবং শ্রমিক বিক্ষোভ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে কয়লা সংরক্ষণ (conservation) ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ভাল কয়লা খুব বেশি নাই। সর্বোৎকৃষ্ট কোক প্রস্তুতের উপযুক্ত কয়লা মাটির নীচে আন্দাজ ২৮০ কোটি টনের মত আছে। সুতরাং, ভাল কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা, রপ্তানি বন্ধ করা এবং বিকল্প ইন্ধন ব্যবহারের চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে ভারতে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন হইয়াছে, কিন্তু আরও প্রয়োজন। সংরক্ষণের প্রধান বিষয় হইল বর্তমানে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা। ভারতে ইহা একান্ত প্রয়োজন কারণ ভারত সবেমাত্র শিল্প যুগের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং, সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।

**Q. 42. Give an account of the power resources in India and state their present uses and future possibilities.**

**[ ভারতে শক্তির উৎসগুলির বর্ণনা দাও এবং উহাদের বর্তমান ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর। ]**

ভারতের শক্তি সম্পদের ভিতরে **কয়লা, খনিজ তৈল** এবং **জলবিদ্যুৎ** উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া জ্বালানী কাষ্ঠ, গোবর হইতে ঘুঁটে, প্রাকৃতিক গ্যাস, চিনির কল হইতে উৎপন্ন সুরাসার (alcohol) এবং কৃত্রিম তৈল হইতে শক্তি উৎপন্ন করিয়া নানা শিল্পে ও নানা প্রয়োজনে নিয়োগ করা যাইতে পারে। ভারতে পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত অনেকগুলি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে। বর্তমানে তারাপুর ও ট্রম্বেতে দুইটি বড় এ্যাটমিক রিয়াক্টর রহিয়াছে। ঐ দুই স্থানে যথাক্রমে ৩০০ এবং ৪০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

**ভারতের খনিজ তৈল** (Petroleum industry of India)—ভারতে উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ খুব কম। ইহা ভারতের দুইটি অঞ্চলে মাত্র পাওয়া যায়।—(১) **আসামের পূর্বপ্রান্ত** এবং (২) **গুজরাটের** ক্যাম্বে উপসাগরের তট-ভাগ। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আসামের অন্তর্গত **ডিগবয়, নাহোর-কাটিয়া, লাকোয়া, শিবসাগর, মোরাণ** ও **রুদ্রসাগর** অঞ্চলে কিছু খনিজ তৈল পাওয়া যায়। আসামের খনিগুলি হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, (৩০ লক্ষ টনে) তাহা অংশতঃ ডিগবয়ের শোধনাগারে এবং অংশতঃ গৌহাটির নিকট অবস্থিত "অয়েল ইণ্ডিয়ার" নূনমাটি শোধনাগারে শোধন করা হয়। ঐ দুইটি শোধনাগারে পেট্রোল, কলকব্জা পরিষ্কার করিবার উপযোগী তৈল, কেরোসিন তৈল, মোম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আসামে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ তৈল পরিশোধনের জন্য বিহারের বারাউনিতেও নূতন তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। নলযোগে কাঁচা তৈল (crude oil) নাহোরকাটিয়া ও মোরাণের তৈলকূপগুলি হইতে বারাউনিতে (গঙ্গাতীরে মোকামার "রাজেন্দ্রপুলের" উত্তর প্রান্তে) সরবরাহ করা হইতেছে। সেখান হইতে তৈলবাহী নল গিয়াছে পশ্চিম বাংলার হলদিয়ায়। এখানেও একটি শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে।

(২) **গুজরাট রাজ্যের** ক্যাম্বে উপসাগরের তটভাগে **অঙ্কলেশ্বরের** নিকট কয়েকটি তৈলকূপ হইতে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া গিয়াছে। এই রাজ্যে লুনেজ ও কালোলেও অল্প তৈল আছে। অঙ্কলেশ্বর হইতে তৈল উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টন তৈল এখানে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ট্রম্বের একটি শোধনাগার এই তৈল পরিশোধন করিতেছে। গুজরাট রাজ্যে কয়ালিতে একটি বিরাটাকার সরকারি শোধনাগার নির্মাণ করা হইয়াছে।

ভারতে খনিজ তৈলের অভাব প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে দূর করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে ; প্রথমতঃ, ইরাণ, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া এবং সোভিয়েট রাশিয়া হইতে খনিজ তৈল আমদানি করিয়া ; দ্বিতীয়তঃ, দেশের অভ্যন্তরে নূতন নূতন খনি আবিষ্কার করিয়া।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে বিমান হইতে জরিপ করিয়া এবং মাটিতে গর্ত করিয়া অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ছাড়া, হিমাচলের জ্বালামুখীতে ও রাজস্থানে বিশেষজ্ঞগণ তৈল অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। জ্বালামুখীতে প্রচুর স্বাভাবিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভারতে ১৯৬৮ সালে প্রায় ৬০ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ লক্ষ টনে হইবে। তবুও বৎসরে আমদানির পরিমাণ একশত কোটি টাকার কম হইবে না।

**তৈল শোধন শিল্প** ( Oil refining industry )—ভারত তাহার প্রয়োজনীয় তৈলের বেশির ভাগ আমদানি করিয়া থাকে। পূর্বে এই তৈল ইরাণ বা আরব হইতে ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রে পরিশোধনের জন্য লইয়া যাওয়া হইত। সেই তৈলই পরিশোধিত হইয়া অনেক বেশি দামে ভারতে রপ্তানি করা হইত। বর্তমানে আরব ও অন্যান্য দেশের ক্রুড অয়েল বা কাঁচা তৈল ভারতের ট্রম্বে ও বিশাখাপতনমে পরিশোধন করা হয়। বোম্বাইয়ের অদূরে ট্রম্বেতে দুইটি বিদেশী কোম্পানী ভারত সরকারের সহযোগিতায় দুইটি অতিবৃহৎ তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে। এখানে মধ্য প্রাচ্যের ক্রুড অয়েল শোধন করা হইতেছে। বিশাখাপতনমের তৈলশোধনাগারটিতেও তাহাই হইতেছে। বর্তমানে আসামের তৈল উৎপাদন খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য আসামের গৌহাটি এবং বিহারের বারাউনিতে ভারত সরকার দুইটি শোধনাগার নির্মাণ করিয়াছেন। নাহোরকাটিয়া ও মোরাণ তৈলক্ষেত্র হইতে নলযোগে গৌহাটি ( নুনমাটির ) ও বারাউনি শোধনাগার দুটিতেও তৈল সরবরাহ করা হইতেছে। গুজরাটের কয়ালি শোধনাগারও তৈল পরিশোধন করিতেছে। কোচিন এবং মাদ্রাজের শোধনাগার দুইটিতে বিদেশের—প্রধানতঃ ইরাণের—কাঁচা তৈল পরিশোধন করা হয়। ভারতে পরিশোধিত তৈল ধরিলে ভারত এখন সমস্ত প্রকার খনিজ তৈল সম্পর্কে স্বয়ংনির্ভরশীল। এমন কি কিছু পেট্রোল রপ্তানিও হয়। কিন্তু প্রায় অর্ধেক কাঁচা তৈল বিদেশ হইতে আসে। বাকীটা আসে আসাম ও গুজরাটের তৈলকূপগুলি হইতে।

ভারতে খনিজ তৈলের চাহিদা একটু বিচিত্র ধরণের। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার অধিক। গ্রামাঞ্চলে উহাই আলো জ্বালাইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু ভারতে মোটর গাড়ির

সংখ্যা মাত্র কয়েক লক্ষ ( যুক্তরাষ্ট্র ৫২ কোটি ) এবং কলকারখানাও কম। সুতরাং, এদেশে পেট্রোলের চাহিদা কম।

ভারতে পেট্রোল প্রভৃতির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ আসাম ও ক্যাম্বে ছাড়া অন্যত্র নূতন কোন তৈলকূপ পাওয়া যাইতেছে না। ফলে, পরিবর্তদ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে না। ভারতে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুতের সময় কোন কোন আধুনিক কারখানায় প্রচুর শক্তি উৎপাদনকারী অ্যালকোহল প্রস্তুত হইতেছে।

**ভারতে খনিজ তৈলের উৎপাদন ও চাহিদা**

| সাল | উৎপাদন | চাহিদা | ( লক্ষ টনে ) |
|---|---|---|---|
| ১৯৪৮ | ২ | ২০ | |
| ১৯৬৮ | ৬০ | ১২০ | |

*** ভারতের প্রধান প্রধান শক্তির উৎস**

**ব্যবসাভিত্তিক শক্তি সরবরাহ**
( Commercial energy )

ব্যবসাভিত্তিক শক্তি সরবরাহের ( মোট সরবরাহের নহে ) ৮৪ শতাংশ কয়লা হইতে ১৪ শতাংশ পেট্রোল-জাতদ্রব্য হইতে এবং ১'৪ শতাংশ জলশক্তি হইতে পাওয়া যায়।

**গৃহের প্রয়োজনে শক্তি সরবরাহ**
( Non-commercial energy )

ঘুঁটে, কাঠ, কাঠ কয়লা } দেশে মোট উৎপন্ন শক্তির ৬১ শতাংশ

[ কয়লা—৪০নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য, জলবিদ্যুৎশক্তি—২৬নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ]

**সুরাসারিক শক্তি ( Alcohol ) প্রভৃতি**—বর্তমানে গুড় হইতে সুরাসার ( Alcohol ) প্রস্তুত করা হইতেছে। দক্ষিণ ভারতে ও বিহারে ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতে সমস্ত চিনির কল হইতে এই জাতীয় শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে খনিজ তৈলের জন্য বৈদেশিক আমদানির উপর ভারতের নির্ভরশীলতার পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। তাহার সহিত জলবৈদ্যুতিক শক্তির সম্ভাবনাগুলিকে কার্যকরী করিতে পারিলে এই নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইতে পারে। ইহা ছাড়াও কাঠকয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। যুদ্ধের সময় পেট্রোলের অভাবে কাঠকয়লার সাহায্যে অনেক স্থানে মোটর চালানো হইয়াছে। বর্তমানে কাঠকয়লার সাহায্যে মহীশূরের ভদ্রাবতীতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের কাজ চলিতেছে। কাঠ কয়লার সাহায্যে প্রস্তুত ইস্পাত খুব উচ্চস্তরের হয়।

* Source—Third Five Year Plan,

**Q. 43. Describe the present position of petroleum mining and refining industries in India, and discuss their future prospects. (C U. 1960)**

**Or, Q. Give an account of the oilfields of India and discuss the progress of petroleum refining in the country. (C U. B. Com. 1969)**

**[ভারতের তৈলখনিগুলির বর্ণনা দাও এবং এদেশে তৈলশোধন শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা কর।]**

[ পূর্ববর্তী ৪২নং প্রশ্নোত্তরের খনিজ তৈল দ্রষ্টব্য ]

**Q. 44. Where are the important iron ore deposits found in India? Should India export iron ore?**

**[ভারতে প্রধান প্রধান লৌহ আকরিকের সংস্থানগুলি কোথায় অবস্থিত? ভারতের কি লৌহ আকরিক রপ্তানি করা উচিত?]**

**লৌহশিলা** ( **Iron ore** )—ভারত পৃথিবীর মধ্যে লৌহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ। ভারতের নানা স্থানে মোট ২১০০ কোটি টন উচ্চশ্রেণীর লৌহ আছে।* নিম্নমানের লৌহশিলা উহার চার গুণ হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে লৌহ উৎপাদনে রাশিয়া, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, এবং চীনের পরেই ভারতের স্থান।

ভারতের লৌহখনিগুলি প্রধানতঃ বিহার, উড়িষ্যা, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ এবং মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। বিহারের **সিংভুম** জেলায়, উড়িষ্যার **কেওনঝর**, **বোনাই**, এবং **মহীশূরের বাবাবুধান** পাহাড়ে, **গোয়ায়**, মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণপ্রান্তে **কিরিবুরু ও বায়লডিলা** ( ইহা ভারতের বৃহত্তম লৌহ খনি ), অন্ধ্রের কাড্ডাপ্পা এবং কারনুলে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আকরীয় লৌহ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে **দুর্গ জেলা** এবং মাদ্রাজের সালেমে ( সেলম ) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহশিলা আছে। ঐ লৌহ ভাণ্ডারগুলি এখনও পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয় নাই। তবে লৌহ আকরিক উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৭ সালের লৌহশিলা উৎপাদনে গোয়া প্রথম, উড়িষ্যা দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয় ও মধ্যপ্রদেশ চতুর্থ স্থান অধিকার করে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের শেষ হইতে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগের বড় বড় খনিগুলির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিলে ২।৪ বৎসরের মধ্যেই ঐ রাজ্যই ভারতের মধ্যে লৌহশিলা উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিবে। ভিলাই, দুর্গাপুর ও রাউরকেলার ইস্পাত কারখানাগুলির জন্য কতকগুলি নূতন খনি হইতে লৌহ আকরিক সরবরাহ করা হইতেছে। ভিলাইয়ের

* ডাঃ কৃষ্ণান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্তৃক প্রমাণিত। সর্বশ্রেণীর লৌহ আকরিকের ভাণ্ডার ৮২০০ কোটি টনের মত—সমগ্র পৃথিবীর লৌহ ভাণ্ডারের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ।

জন্য দুর্গ জেলার রাজহারা খনি, রাউরকেলার জন্য বারসুয়া এবং কিরিবুরু খনিতে কাজ চলিতেছে।

ভারতের উৎকৃষ্ট লৌহ-আকরিকের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগেরও অধিক লৌহধাতু রহিয়াছে। ভারতে ১৯৬৮ সালে মোট প্রায় দুই কোটি ৪০ লক্ষ টন আকরীয় লৌহ উৎপন্ন হয়। উহাতে ভারতের প্রয়োজন মিটিয়াও বাড়তি থাকে। ঐ বৎসর ভারত নিজ প্রয়োজনে ১ কোটি টনের বেশি লৌহশিলা ব্যবহার করে। অবশিষ্টাংশের বেশির ভাগই বিদেশে রপ্তানি করে। কিছুকাল যাবৎ জাপান ভারত হইতে বৎসরে প্রচুর লৌহশিলা আমদানি করিতেছে। ভারতের লৌহশিলা কলিকাতা হইতেও রপ্তানি হয়। মধ্যপ্রদেশের দুর্গ প্রভৃতি বড় বড় লৌহের আকরগুলি বন্দর হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় রপ্তানি-বাণিজ্য গড়িয়া তোলার নানা অসুবিধা। সম্প্রতি লৌহ রপ্তানির সুবিধার জন্য উড়িষ্যা তটে পরদ্বীপ নামক স্থানে একটি বন্দর গঠন করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি, গোয়া ( মার্মাগাও ) এবং অন্ধ্রের বিশাখাপতনম্ বন্দর মারফতও প্রচুর লৌহশিলা রপ্তানি করা হইতেছে। জাপানের যান্ত্রিক সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে নূতন রেলপথ স্থাপন করিয়া ঐ সমস্ত অঞ্চল হইতে জাপানে রপ্তানির জন্য অধিক পরিমাণে লৌহশিলা খননের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের লৌহশিলা পশ্চিম জার্মানী, ইটালি, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতেও যাইতেছে। ১৯৬৮ সালে প্রায় ৭০ কোটি টাকা এইভাবে অর্জন করা হয়। ভারতে উৎকৃষ্ট লৌহশিলা সুপ্রচুর। সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সময় অধিক লৌহশিলা রপ্তানি করা দেশের পক্ষে ভাল। আশা করা যায় চতুর্থ পরিকল্পনাকালের শেষে প্রতি বৎসর ১৫ মিলিয়ন ( নিযুত ) টন লৌহশিলা রপ্তানি করা সম্ভব হইবে। এইজন্য ভারতের কতকগুলি বন্দরকে উন্নত করা হইবে। এগুলি হইল—পরদ্বীপ, হলদিয়া, কাকিনাদা, কুড্ডালোর, ম্যাঙ্গালোর ও কারোয়ার বন্দর। চতুর্থ পরিকল্পনাকালের শেষে লৌহশিলা ভারতের রপ্তানি-তালিকায় চা, বস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্যের পরেই স্থান পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**Q. 45. Where are the following minerals found in India—(a) Mica, (b) Manganese, (c) Copper and (d) Gold. Give an idea of the export trade of India in mica and manganese.**

[ ভারতের (ক) অভ্র, (খ) ম্যাঙ্গানীজ, (গ) তাম্র ও (ঘ) স্বর্ণ খনিজগুলি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। ]

**(a) অভ্র (Mica)**—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভ্র পাওয়া যায়। কিন্তু ভারত,

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন অভ্র ছাড়া অন্য দেশের অভ্র উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। স্বচ্ছতা ও দৈর্ঘ্যের উপর অভ্রের মূল্য নির্ভর করে। নিখুঁত স্বচ্ছ অভ্রই শিল্পবাণিজ্যের উপযোগী। এরূপ অভ্র কেবলমাত্র এই কয়টি দেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভারতই ইহার প্রধানতম উৎপাদক। পৃথিবীর মোট শিট (sheet) অভ্র উৎপাদনের ৭০ ভাগেরও বেশি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যায়। অবশ্য নিকৃষ্ট অভ্র ভারত অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। অভ্র রপ্তানিতে পৃথিবীর মধ্যে **ভারতই প্রধান**। যুক্তরাষ্ট্রই অধিক অভ্র আমদানি করে। ইহা ছাড়া বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, জার্মানী এবং ফ্রান্স ভারত হইতে প্রচুর অভ্র আমদানি করে। আধুনিক যুগে প্লাষ্টিকের ব্যাপক প্রচলনের ফলে অভ্রের ব্যবহার অনেক দেশেই হ্রাস পাইতেছে। প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক শিল্পেই অভ্রের চাহিদা অধিক।

বিহারের **গয়া, হাজারিবাগ, রাজস্থানের** কতকাংশ এবং অন্ধ্রের **নেলোরে** ভারতের প্রধান অভ্রখনিগুলি অবস্থিত। মহীশূর এবং কেরলে সামান্য পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়। ভারতের সকল খনিতেই যথেষ্ট অভ্র সঞ্চিত রহিয়াছে। সুতরাং, ভারতে অদূর ভবিষ্যতে অভ্রের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের অভ্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র বিহারের **কোদারমা** এবং প্রধান বাজার **কলিকাতা**। ভারতের অভ্রখনিগুলি অত্যন্ত অনুন্নত ধরণের। কলিকাতা বন্দর হইতে অধিক অভ্র রপ্তানি হয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ হইতেও ইহা রপ্তানি হয়। ব্রেজিল, দঃ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, কানাডা, রোডেশিয়া এবং মাদাগাস্কারে অভ্রশিল্পের উন্নতি হওয়ায় এবং নানাপ্রকার কৃত্রিম দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ভারতের অভ্র রপ্তানির পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

**(b) ম্যাঙ্গানীজ (Manganese)**—ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারত উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের ম্যাঙ্গানীজ খনিগুলির প্রায় সবগুলিই মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশে ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত **ছিন্দওয়ারা, ভাণ্ডারা, বালাঘাট**, পঞ্চমহল, **রত্নগিরি**, মহীশূরের অন্তর্গত চিতালদ্রাগ, অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত **বিশাখাপত্তনম্**, সান্দুর ও **বেলারি**, উড়িষ্যার কেওনঝর প্রভৃতি স্থানে এবং বিহারের অন্তর্গত সিংভূমে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ভারতে সাধারণতঃ ১২।১৪ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ শিলা উৎপাদিত হয়। উহার মধ্যে ভারতে ইস্পাত ও রাসায়নিক শিল্পের জন্য প্রয়োজন বাদে অবশিষ্টাংশ রপ্তানি করা হয়। ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ ইউরোপ, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানি-বাণিজ্য সাধারণতঃ বিশাখাপত্তনম্ বন্দর দ্বারা পরিচালিত হয়। কলিকাতা এবং বোম্বাই বন্দর মারফতও কিছু ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি

হয়। সম্প্রতি ভারত হইতে ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে; ইহার কারণ ভারতের প্রধান খরিদ্দার আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে নিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছে এবং ঘানা, ব্রেজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাঙ্গানীজ অধিক কিনিতেছে। জাপান চীন হইতে ম্যাঙ্গানীজ ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে। ভারতের বর্তমান নীতি হইল ম্যাঙ্গানীজ আকরিক গালাইয়া ফেরোম্যাঙ্গানীজ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা এবং ক্রমবর্ধমান স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাই বিদেশে রপ্তানি করা। বিহার ও উড়িষ্যায় এইরূপ কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর ম্যাঙ্গানীজ ভারতে খুব বেশি নাই। সুতরাং, ভারত সরকার ভারতের ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া ভারত হইতে ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

(c) তাম্র (Copper)—ভারতে প্রাচীনকাল হইতে মুদ্রা, বাসন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য তাম্র ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ভারতের নানাস্থানে বহু প্রাচীন তামার খনি দেখা যায়। দুঃখের বিষয় বর্তমান ভারতে তামার সংস্থান খুব কম। বিহারের ঘাটশিলার নিকট ভারতের বৃহত্তম তামার খনি হইতে বৎসরে মাত্র ৯০০০ টন তাম্র পাওয়া যায়। রাজস্থান রাজ্যের ক্ষেত্রিতে কিছু তাম্র উৎপাদন হয়। ক্ষেত্রিতে যে ব্যাপক খননকার্য ও কারখানা স্থাপনের কার্য চলিতেছে তাহা শেষ হইলে সম্ভবতঃ ১৯৭০ সাল হইতে ঐ খনি হইতে বৎসরে ৩০ হাজার টনে তাম্র ধাতু পাওয়া যাইবে। অন্ধ্র ও সিকিম হইতেও অল্প তামা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতের প্রয়োজন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ্যালুমিনিয়ম ধাতু তামার বদলে বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহার সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতের বৎসরে ৮০ হাজার টন তাম্রের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে (ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাম্বিয়া) প্রচুর তাম্র আমদানি করিতে হয়। বৎসরে ৩০।৪০ কোটি টাকার বেশি এইভাবে বিদেশে চলিয়া যায়। তাম্র যন্ত্রাদিও (বৈদ্যুতিক) আমদানি করিতে হয়। বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে ও সিকিমে তাম্রের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। কয়েকটি পুরাতন পরিত্যক্ত খনিতে পুনরায় কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয় তাম্র আকরিকে মাত্র ২% এর মত তাম্র পাওয়া যায়।

(d) স্বর্ণ (Gold)—প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে সোনা পাওয়া যায়। বর্তমানে মোট মূল্যের দিক দিয়া ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণ আমাদের দেশের খনিজগুলির মধ্যে তৃতীয়। কিন্তু ভারত মাত্র পৃথিবীর ২ ভাগ স্বর্ণ উৎপন্ন করে (২ লক্ষ আউন্স)। এই উৎপাদনের ৯৯ ভাগ মহীশূরের কোলার স্বর্ণখনি হইতে পাওয়া যায়। খনিগুলি অত্যন্ত গভীর (৮০০০।৯০০০ ফুট) হওয়ায় উৎপাদনের খরচ বেশি। উৎপাদনও ক্রমশঃ কমিতেছে। অন্ধ্ররাজ্যে সামান্য স্বর্ণ পাওয়া যায়।

**Q. 46 Write short notes on the production of the following minerals in India—(a) Aluminium, (b) Gypsum and (c) Salt.**

**[ ভারতের (ক) এ্যালুমিনিয়াম, (খ) জিপসাম এবং (গ) লবণ উৎপাদন সম্পর্কে টিকা লিখ। ]**

(a) **এ্যালুমিনিয়াম ( Aluminium )**—ভারতে ২৫ কোটি টনের মত উচ্চ শ্রেণীর এ্যালুমিনিয়াম খনিজ ( বক্সাইট ) রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১৯৬৮ সালে এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া লক্ষাধিক টনের বেশি হয় এবং এই ধাতুর ব্যাপক ব্যবহারের দ্বারা এদেশের তাম্র ধাতুর যে অভাব রহিয়াছে তাহাও কিছু পরিমাণে মিটিয়াছে, কারণ উভয় ধাতুই বৈদ্যুতিক শিল্পে প্রায় একই কাজে ব্যবহার করা চলে। ভারতীয় বক্সাইটের মধ্যে ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ পর্যন্ত এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সিলিকন, লৌহ এবং টিটানিয়ামও থাকে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও কাশ্মীরে প্রচুর বক্সাইট আকরিক রহিয়াছে। বিহারের রাঁচি অঞ্চলে লোহারডাগায় ভারতের প্রধান বক্সাইটের খনি অবস্থিত এবং এ্যালুমিনিয়ামের কারখানাগুলি সম্বলপুর ( সবচেয়ে বড় কারখানা ), হিরাকুদ, আসানসোল, মাদ্রাজের মেতুর, বিহারের মুরি ( রাঁচির নিকট এই কারখানাটিতে অন্যান্য এ্যালুমিনিয়াম কারখানার জন্য এ্যালুমিনা বা গুঁড়া এ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করা হয় ) ও কেরলের আলোয়েতে অবস্থিত। বৈদ্যুতিক ও বিমান শিল্পের জন্য এ্যালুমিনিয়াম একান্ত প্রয়োজন। ইহার অন্যান্য বহু প্রকার ব্যবহারও আছে। ইহার চাহিদা আমাদের দেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(b) **জিপসাম ( Gypsum )**—সিন্ধ্রির সারের কারখানা স্থাপনের পর ভারতে জিপসামের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ গন্ধক ও চুনজাতীয় খনিজ পাওয়া যায়।

ভারতে ২০ কোটি টনের মত জিপসাম আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজস্থানের বিকানীর হইতেই অধিকাংশ জিপসাম পাওয়া যায় ( সিন্ধ্রির কারখানা এখান হইতে জিপসাম গ্রহণ করে )। তাহার পরে মাদ্রাজের তিরুচিরাপল্লীর জিপসাম খনি বিখ্যাত। সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছেও জিপসাম পাওয়া যায়। রাসায়নিক সার, সিমেণ্ট, সালফিউরিক এ্যাসিড ও প্লাষ্টার প্রস্তুত করিতে ইহা একান্ত প্রয়োজন।

(c) **লবণ (Salt)**—লবণ কেবল খাদ্য হিসাবেই যে অপরিহার্য বস্তু তাহাই নহে, শিল্পেও ইহা অতি প্রয়োজনীয়। ভারী রাসায়নিক শিল্পের ইহা সর্বপ্রধান কাঁচা মাল এবং মৎস্য শিল্পের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। ভারতে ১৯৫৮ সালে মোট ৪২ লক্ষ টন সামুদ্রিক ও হ্রদ লবণ উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রয়োজন প্রায় ৩০ লক্ষ টন তাহার

মধ্যে মাত্র এক দশমাংশের কম লবণ লাগে শিল্পের জন্য। অবশিষ্টাংশ প্রধানতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতে লবণের তিনটি সংস্থান আছে ; যথা—

(১) **সামুদ্রিক লবণ**—ইহা ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ চাহিদা মিটায়। সমুদ্র-তীরের জল সূর্যতেজের সাহায্যে শুকাইয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়। কারখানায় ইহা পরিশোধন করা হয়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য এই লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র মাদ্রাজের সমুদ্রতটেও প্রচুর লবণ উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে লবণ উৎপাদন নগণ্য। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় জাহাজযোগে লবণ আমদানি হয়।

(২) **রাজস্থানের হ্রদ লবণ**—রাজস্থানের সম্বর প্রভৃতি লবণ হ্রদের তীরে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। এই লবণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা কচ্ছ অঞ্চল হইতে বাহিত বলিয়া অনুমান করা হয়।

(৩) পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশে পার্বত্য লবণ ( Rock salt ) পাওয়া যায়। মণ্ডি ইহার প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। বর্তমানে উৎপাদন খুব কম।

# ভারতের শিল্প

## INDUSTRIES OF INDIA

**Q. 47. Explain the locations of iron and steel industries in India. Suggest, giving reasons, a future site other than Bokaro. ( C. U. B. Com. 1969 )**

**[ ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানগুলি বর্ণনা কর। বোকারো ভিন্ন ভবিষ্যতে কোথায় ইহা স্থাপিত হইতে পারে তাহা যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দাও। ]**

( উত্তরের জন্য Q. 49 দ্রষ্টব্য )

**Q. 48. Mention the places where iron deposits occur in India. What other raw materials are necessary for making steel ? Where are they available in India ?**

**[ ভারতের কোথায় কোথায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায় উল্লেখ কর। ইস্পাতের জন্য আর কি কি কাঁচামাল লাগে ? ভারতে কোথায় কোথায় ঐগুলি পাওয়া যায় ? ]**

**লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল**—ভারতে আকরিক লৌহের সংস্থান পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ( উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ২১০০ কোটি টন )। বর্তমানে উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ, **কেওনঝর**, পশ্চিমতটে **গোয়া**, মধ্যপ্রদেশের **দুর্গ** এবং বিহারের **সিংভূম জেলাতেই** অধিকাংশ উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই লৌহ আকরিক হেমাটাইট জাতীয় এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগের মত লৌহ থাকে। ফস্ফরাস প্রভৃতি হানিকর দ্রব্যের পরিমাণও উহাতে কম থাকে। মধ্যপ্রদেশের ভিলাইএর নিকটে, দুর্গের রাজহারাতে খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিকের বিপুল সংস্থান রহিয়াছে। উত্তর উড়িষ্যায় রাউরকেলার নিকটে বারসুয়াতে লৌহ-আকরিক এবং নিকটেই ম্যাঙ্গানীজ ও চুনা পাথর রহিয়াছে। মাদ্রাজের সালেম জেলা, মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি এবং মহীশূরের বাবাবুধান পাহাড়ের বড় বড় লৌহ-আকরিকের ভাণ্ডার রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারতের নানা স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিকের অপরিমেয় ভাণ্ডার রহিয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য অনেকগুলি কাঁচা মালের প্রয়োজন হয়। এক টন ইস্পাত তাল ( ingot ) প্রস্তুত করিতে কাঁচামালের গুণাগুণ অনুসারে মোটামুটি প্রয়োজন হয় :—(১) ২ টন লৌহ আকরিক, (২) ১$\frac{১}{২}$ টন ভাল কোক কয়লা, (৩) $\frac{৩}{৪}$ টন ভাল চুনা পাথর, (৪) প্রয়োজনমত ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি (৫) ফায়ার ব্রিক ও ক্লে, প্রচুর জল উপরিউক্ত কাঁচামালগুলি সাধারণতঃ

একত্র পাওয়া যায় না। যেখানে সবগুলি নাই সেখানে সর্বাপেক্ষা ভারী কাঁচামালের নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। যতদূর সম্ভব অল্প ব্যয়ে অন্যান্য কাঁচামাল দেশের অন্যত্র হইতে বা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ভারতে লৌহশিলা সুপ্রচুর অথচ কয়লা সম্পদ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় ইস্পাত শিল্পগুলি কয়লা খনিগুলির নিকট গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কম কয়লায় অধিক লৌহশিলা গালাইবার পদ্ধতি আবিষ্কার করা হইয়াছে। ফলে অন্যান্য দেশের ইস্পাত শিল্পগুলি এখন ক্রমশঃ লৌহশিলা ভাণ্ডারের নিকট অথবা সমুদ্রতটে যেখানে সস্তায় লৌহ ও কয়লা আমদানি করা যায় সেখানে গড়িয়া উঠিতেছে। লৌহশিল্পের দিক দিয়া ভারতের মত ভাগ্যবান দেশ খুব কমই আছে। প্রায় সকল প্রকার কাঁচামাল উত্তর উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। তবে কোক কয়লা তেমন ভাল নয়—উৎপাদনও কম।

**Q. 49. Analyse critically the locational set-up of the iron and steel industry of India. Indicate the present position of this industry.** ( B. Com. 1962. Also Burdwan 1965 )

*Or,* **Write an account of the iron and steel manufacturing industries of India and comment on their development during the five-year plan periods.** ( B. Com. 1964 )

**[ ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের বিষয় সমালোচনামূলক আলোচনা কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দাও। ]**

**ইস্পাত শিল্পের অবস্থান**—ভারতের প্রধান ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি মধ্য-পূর্ব ভারতে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা কয়লা বলয়ের সীমার মধ্যে বড় বড় ছয়টি কারখানা জামসেদপুর, কুলটি ও বার্ণপুর, রাউরকেলা, দুর্গাপুর এবং ভিলাইয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লাখনিগুলির অনতিদূরে লৌহশিলাও সুপ্রচুর। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও মহীশূরে প্রচুর লৌহশিলা আছে; কিন্তু লৌহশিল্পের উপযুক্ত কয়লা নাই। সুতরাং, এই অঞ্চলে কেবলমাত্র ভদ্রাবতীতে একটি ছোট ইস্পাতের কারখানা ছাড়া অন্য কোন কারখানা গড়িয়া ওঠে নাই। উত্তর ভারতে কয়লা নাই তবে হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলে লৌহশিলা আছে। এই অঞ্চলে একটিও ইস্পাতের কারখানা নাই।

নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির অবস্থান জনিত সুবিধা-অসুবিধা ও উহাদের উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা করা হইল:

(১) **জামসেদপুর** ( Tata Iron & Steel Co. )—এই কারখানাটি দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত। ১৯১১ সাল হইতে এই কারখানায় লৌহ ও কিছু পরে ইস্পাত প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইহা ভারতের অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত তৈয়ারির

কারখানা। এই কারখানা হইতে বর্তমানে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহা ছাড়া, জামসেদপুর কারখানায় প্রয়োজনীয় কোক কয়লা প্রস্তুত করার মত কোক অভেন (Oven) রহিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই কারখানায় যথেষ্ট উন্নতি করা হয়। বিশেষ ধরণের ইস্পাতও প্রস্তুত হয়। টাটার লৌহ কারখানার চারিদিকে রেল ইঞ্জিন, ট্রাক, মালগাড়ি, গাড়ির চাকা ও ফ্রেম প্রস্তুতের কারখানা আছে। ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন; যথা—ইন্ধন, কাঁচামাল, মূলধন, শ্রমিক, জলসরবরাহ প্রভৃতি সমস্তই জামসেদপুরে সহজলভ্য। জামসেদপুরের নিকটে খরকাই ও স্মবর্ণরেখা নদী এবং ডিমনা জলাধার আছে। আদিবাসী শ্রমিক ঐ অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে কাঁচামাল জামসেদপুরে সরবরাহ করা হয়:—

| কাঁচামালের নাম | স্থান (প্রধানতঃ) | জামসেদপুর হইতে দূরত্ব | পরিবহণ |
|---|---|---|---|
| লৌহ আকরিক | ময়ূরভঞ্জ ও সিংভূম | ১০০ কিলোমিটার | S. E. R. |
| কয়লা | ঝরিয়া | ১৭০ কিঃ মিঃ | S. E. R. |
| চুনাপাথর | গাংপুর | ১৭০ ” | S. E. R. |
| ম্যাঙ্গানীজ | ” | ” ” | S. E. R. |

(২) **কুলটি—বার্ণপুর** (Indian Iron & Steel Co.)—ইহাই ভারতের প্রাচীনতম লৌহ কারখানা। এখানে দুইটি কারখানা কাছাকাছি অবস্থিত। কারখানা দুইটি আসানসোলের অদূরে বরাকর কয়লাখনির উপর অবস্থিত। সিংভূমের লৌহশিলা এখানে গলানো হয়। নিকটেই রিফ্রাক্টরী ইট পাওয়া যায়। এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও আধুনিক কোক প্রস্তুতের চুল্লী আছে। পুরাতন ব্লাষ্ট ফার্নেস দুইটি বাতিল করিয়া দুইটি অতিকায় এবং অতি আধুনিক ফার্ণেস চালু করা হইয়াছে। এদুটিতে দৈনিক তিন হাজার টনের মত লৌহ প্রস্তুত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মোট ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে দশ লক্ষ টন; বার, রড ও প্লেটই প্রধানতঃ এই কারখানায় প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া এখানে লোহার পাইপও প্রস্তুত হয়।

(৩) **ভদ্রাবতী** (Mysore Iron & Steel Co.)—এই কারখানাটি আকারে ছোট। বাবাবুধান পাহাড়ের উৎকৃষ্ট লৌহশিলা, পশ্চিমঘাটের অরণ্যের কাঠ হইতে কাঠকয়লা, যোগ জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহায্য লইয়া এখানে বৎসরে দেড় লক্ষ টনের মত উৎকৃষ্ট ইস্পাত, শঙ্কর ইস্পাত ও ফেরোসিলিকন প্রস্তুত হয়। এখানে বিদ্যুৎচালিত চুল্লী রহিয়াছে। এখানকার বিশেষ প্রকার ইস্পাতের উপর নির্ভর করিয়া নিকটেই মেসিনটুল শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারখানায় উৎপন্ন

ফেরোসিলিকন দ্বারা ভারতের সমগ্র ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজন মিটান হয়। এখানেও লোহার পাইপ প্রস্তুত হয়। এটি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

(৪) **হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ**—ভারতসরকারের মালিকানায় এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে (ক) রাউরকেলা, (খ) দুর্গাপুর ও (গ) ভিলাইয়ে তিনটি ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং **বোকারোতে** চতুর্থ কারখানাটি চতুর্থ পরিকল্পনার গোড়ার দিকে চালু হইবে।

(ক) **রাউরকেলা** ( Rourkela )—উড়িষ্যায় সম্বলপুরের হীরাকুঁদ বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের অদূরে কলিকাতা-বোম্বাই রেলপথের উপরে রাউরকেলায় ভারত সরকার ( জার্মান কোম্পানীদ্বয় ক্র্যাপ ও ডেমাগের যান্ত্রিক সহযোগিতায় ) একটি বিশাল ইস্পাতের কারখানা নির্মাণ করিয়াছেন। নিকটেই সিংভূম জেলায় ও বারস্য়াতে লৌহ আকরিকের বিপুল সংস্থান আছে। উড়িষ্যার বীরমিত্রপুরের নিকট ম্যাঙ্গানীজ ও চুনাপাথরের অভাব নাই। অভাব কোক কয়লার। কয়লার জন্য সুদূর ঝরিয়া এবং বোকারোর উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। অবশ্য ইহার জন্য বোকারো হইতে রাঁচি হইয়া একটি নূতন রেলপথ গঠন করা হইয়াছে। (জল সরবরাহের জন্য নিকটেই কোইল নামক এক ছোট নদীতে একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে) এই কারখানায় ১৯৫৯ সালের প্রথমে লৌহ ও পরে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়। এখানে বৎসরে ১৮ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়।

(খ) **দুর্গাপুর** ( Durgapur )—এই কারখানাটি রাণীগঞ্জ কয়লাখনির পূর্বপ্রান্তে এবং দামোদরের সেচ বাঁধের নিকট অবস্থিত। কলিকাতা ও আসানসোলের শিল্পাঞ্চল এখান হইতে অধিক দূরে নহে। লৌহশিলা বিহারের সিংভূম হইতে পাওয়া যায়। কয়লা নিকটস্থ খনিগুলি হইতে এবং চুনাপাথর উড়িষ্যার বীরমিত্রপুর হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই কারখানাটি কয়েকটি ব্রিটিশ ইস্পাত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ইস্পাত উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ লক্ষ টন হইয়াছে।

(গ) **ভিলাইয়ের** ( Bhilai ) কারখানাটি মধ্যপ্রদেশে রায়পুরের নিকট এবং দুরূগ অঞ্চলের বিখ্যাত ধাল্লি-রাজহারা লৌহ আকরিক ভাণ্ডারের অদূরে অবস্থিত। করবা কয়লা খনি বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহ করে। ঝরিয়া ও বোকারো হইতে কয়লা গ্রহণ করা হইতেছে। খুব কাছেই নন্দিনী হইতে চুনাপাথর আসে। এই কারখানাটি রুশ যান্ত্রিক সহায়তায় নির্মাণ করা হইয়াছে। এখানেও ১৯৫৯ সালের প্রারম্ভে লৌহ ও পরে ইস্পাতের উৎপাদন আরম্ভ হয়। ইহার বার্ষিক ইস্পাত উৎপাদনক্ষমতা ১৯৬৯ সালে ২৫ লক্ষ টন হয়। এই কারখানাটি ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে বৃহত্তম।

(ঘ) বোকারো ( Bokaro )—বিহারের বোকারো কয়লাখনির নিকটে দামোদর নদীর অদূরে ১৭ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনক্ষম এই কারখানাটির নির্মাণ কার্য ১৯৭০-৭১ সালে শেষ হইবে। রাশিয়ানরা এই কারখানাটির ৫০ ভাগ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছে; অবশিষ্ট ৬০ ভাগ বাঁচিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭৪ সালে শেষ হইবে। তখন ইহা সমগ্র দেশের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা হইবে। কারখানাটি বোকারো কয়লা খনির উপরে অবস্থিত এবং জল সরবরাহের জন্য দামোদরের উপরে তেনুঘাট বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। লৌহ আকরিকের জন্য বোকারো উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের উপরে নির্ভর করিবে।

ইহা ছাড়া বিশাখাপতনম্‌, গোয়া, সালেম প্রভৃতি স্থানেও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে। বিদেশের ভাল কয়লার উপরে এই ভাবী কারখানাগুলি নির্ভর করিবে।

ভারতে বর্তমানে ( ১৯৬৯ ) বৎসরে প্রায় ৭০ লক্ষ টনের মত হারে ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। পুরাদমে চলিলে ৯০ লক্ষ টনের বেশি হইতে পারে। ১৯৬৭-৬৮ সালের মন্দার সময় সাময়িক ভাবে ভারতের বাজারে ইস্পাতের চাহিদা হ্রাস পায়। ঐ সময় ভারত প্রচুর পরিমাণে ইস্পাত রপ্তানি করিয়া বৎসরে ৬০।৭০ কোটি টাকা অর্জন করিতে থাকে। কিন্তু ১৯৬৯ সাল হইতে মন্দা কাটিয়া যাওয়ায় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের রপ্তানি অসাধারণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে আবার ইস্পাতের অভাব দেখা দেয়।

লৌহ আকরিক, কাঁচা লৌহ, ইস্পাত ও ইস্পাতের তৈরি ওয়াগন, রেল, ডিজেল ইঞ্জিন, সেলাইকল, সাইকেল, পাখা ইত্যাদি সকল প্রকার লৌহজদ্রব্য ব্যাপকভাবে পৃথিবীর নানাদেশে ( যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াতেও ) রপ্তানি করিয়া ভারত বৎসরে ৫।২৬ কোটী টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিবৎসর অর্জন করিতেছে ( যথা—১৯৬৯ )। এই বাণিজ্য আরও অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে।

ভারতে শংকর ইস্পাত (alloy steel) প্রস্তুতের দুটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। একটি দুর্গাপুরে এবং অপরটি ভদ্রাবতীতে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের যাবতীয় চাহিদা এই কারখানা দুইটি মিটাইতে সক্ষম। দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ইস্পাতও ভারতেই প্রস্তুত হয়। তবে এখনও ২।১ শ্রেণীর বিশেষ ধরণের ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়।

**Q. 50. What do you know of the engineering industry of India ?**

**[ ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ]**

**ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প**—ইস্পাতকে ও কয়েক প্রকার অলৌহ ধাতুকে কাঁচামাল-রূপে ব্যবহার করিয়া যে সকল যন্ত্রশিল্প গঠিত হয় তাহাদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলে।

ভারতে ইস্পাতের অভাব থাকায় পূর্বে এই শিল্পটিও খুব উন্নত ছিল না। ভারী যন্ত্রাদি এখানে কম উৎপন্ন হইত। এখন অবস্থা অন্যরূপ। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে প্রথমেই প্রয়োজন হইল রেলব্যবস্থা চালু রাখার জন্য রেল ইঞ্জিনের। ভারত সরকার **চিত্তরঞ্জন-এ লোকোমোটিভ**-এর কারখানা (ভারতের বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন কারখানা) স্থাপন করেন। চিত্তরঞ্জন কারখানায় স্টীম ও ইলেট্রিক ইঞ্জিন বৎসরে প্রায় ২০০ প্রস্তুত হয়। এই কারখানার নিজস্ব ইস্পাত ঢালাই ইউনিটও স্থাপিত হইয়াছে। জামসেদপুরের ইঞ্জিন কারখানারও (TELCO) বৎসরে ৫০টির বেশি মিটার গেজ ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতেছে। বারাণসীতে ডিসেল রেল ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়।

ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রধানতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভালভাবে গঠিত হইতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রায় কিছুই উৎপন্ন হইত না। বর্তমানে প্রধান প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি জামসেদপুর, আসানসোল, কলিকাতা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারখানায় রেলইঞ্জিন, বয়লার, ডিজেল ইঞ্জিন, ইলেকট্রিক মোটর, বস্ত্র, পাট ও চা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আরও ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। ভারত সরকার রাঁচির নিকট রুশ ও চেক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে একটি বিরাট যন্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানায় উৎপন্ন যন্ত্রাদির সাহায্যে বড় বড় ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। আর একটি ভারী যন্ত্রাদির কারখানা মধ্যপ্রদেশের ভুপালে স্থাপিত হইয়াছে। হরিদ্বার, হায়দ্রাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি বহু স্থানেও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

**Q. 51. Give an account of India's shipbuilding industry.**
**[ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিবরণ দাও।]**

**জাহাজ নির্মাণ শিল্পের** ক্ষেত্রে ভারত নিতান্ত অনুন্নত। উন্নততর এবং শক্তিশালী নৌবহর এবং অধিকতর মালবাহী জাহাজ নির্মাণ দেশের রাষ্ট্রীক ও অর্থনৈতিক উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ একদিকে যেমন শক্তিশালী নৌবহর ব্যতীত বর্তমান যুগে জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকা চলে না, অপরদিকে তেমনি নিজস্ব জাহাজ ব্যতীত রপ্তানি-বাণিজ্যেও তেমন উন্নতিলাভ করা যায় না। জাপানের নিজস্ব জাহাজ বেশি থাকায় ১৯৪৫—৬০ সালে জাপান তাহার এক টন মাল মাত্র ১৬০ টাকা ভাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক প্রভৃতি বন্দরে প্রেরণ করিতে পারিত। কিন্তু ভারতের নিজের জাহাজ কম থাকায় ঐ সময় বিদেশী জাহাজ কোম্পানীগুলি ১ টন মাল ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে বহন করিতে ৩০০ টাকার মত

ভাড়া লইত। এই ভাবে প্রতিবৎসর আমাদের দেশ হইতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইতেছিল ; এখন অবশ্য অবস্থার একটু পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং, জাহাজ নির্মাণ করা দরকার। ভারতে জাহাজ নির্মাণের মত কাঁচা মালের মোটেই অভাব নাই এবং উহা প্রয়োজন মত কাজে লাগাইতে পারিলে ভবিষ্যতে ভারত যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের উপকূল বাণিজ্য ও মহাসামুদ্রিক বাণিজ্যে ( GRT ) যেখানে ভারতীয় জাহাজ লিপ্ত ছিল—১৯৪৯ সালে ছিল মাত্র দেড় লক্ষ টন, এখন ১৯৬৯ সালে প্রায় ২২ লক্ষ টন।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন :—(১) গভীর জলযুক্ত প্রাকৃতিক বন্দর, (২) সহজলভ্য কাঁচা মাল ( যথা—ইস্পাত ও কাঠ ), (৩) জাহাজ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত প্রাঙ্গণ, (৪) সস্তা শ্রমশক্তি ও (৫) প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ নৌকর্মী ( naval engineer ) প্রভৃতি। এই সকল দিক দিয়া কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যবর্তী উপকূলবন্দর বিশাখাপতনমের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপতনম্ একটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। উহার জলের গভীরতা ৩৫ ফুটের বেশি। এই কারণে এখানে নির্মিত জাহাজগুলি ভাসাইবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। রাউরকেলার কারখানা হইতে রায়পুর-ভিজিয়ানাগ্রাম রেলপথে বিশাখাপতনমের জাহাজ কারখানায় সস্তায় ইস্পাত সরবরাহ করা যায়। বিহার ও উড়িষ্যার গণ্ডোয়ানা কয়লা বেষ্টনী হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা কলিকাতা বন্দর হইতে জলপথে সরবরাহ করিবার সুবিধাও এখানে রহিয়াছে। বিশাখাপতনমে তৈল শোধনাগার আছে। কেরল, আন্দামান এবং মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে জাহাজের ডেক ও কেবিন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠেরও অভাব নাই। আন্দামান হইতে জলপথে কাঠ আমদানি করা যায়। তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলটি কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত এত জনবহুল না হওয়ায় এখানে কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে ইস্পাতের কারখানাগুলি হইতে বিশাখাপতনমের দূরত্ব বেশি হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের খরচ অধিক হয়। এখানে কোন বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা না থাকায় যন্ত্রাদি এবং দক্ষ শ্রমিক পাওয়া সহজ নয়।

ইহার পরেই জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার নাম উল্লেখযোগ্য। জনবহুল কলিকাতা বন্দর সমুদ্রের তীরবর্তী নহে। বাস্তবিক পক্ষে হুগলী নদীর বালুচরই এখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের প্রধান অন্তরায়। কিন্তু, কয়লা সরবরাহ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের নৈকট্য, পরিবহণ ব্যবস্থা ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার দিক হইতে এত সুবিধা ভারতের আর কোন বন্দরেই নাই। কলিকাতা বন্দরের খিদিরপুর জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র হিসাবে খুব বিখ্যাত। এখানে ছোট ছোট

সমুদ্রগামী ও নদীচর জাহাজও নির্মাণ করা হয়। ছোট যুদ্ধজাহাজও নির্মাণ করা হয়। এখন এখানে মাঝারি আকারের জাহাজ ও জাহাজের ইঞ্জিন প্রস্তুত হয়।

দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ও নৌঘাঁটি কোচিন জাহাজ নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। ইহার পোতাশ্রয়টি ভাল এবং মহীশূরের ইস্পাত কারখানাও এখান হইতে খুব দূরে নহে। এইস্থানে ভারতের দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানায় ৬০০০০ টনের অতিকায় জাহাজগুলি নির্মাণ করা হইবে। বোম্বাইয়ের নিকটে মাজগাঁও (এখানে বেশ বড় সমুদ্রগামী জাহাজও নির্মাণ করা হয়) এবং গোয়াতে ছোট জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করা হয় এবং ট্রম্বেতেও জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, কারণ ভিলাই কারখানার উন্নতির ফলে বোম্বাইয়ে জাহাজশিল্প স্থাপনের যে প্রধান অন্তরায় তাহা কতকটা দূর হইয়াছে। গোয়ায় মাছ ধরা ট্রলার জাহাজ নির্মাণ করা হয়।

গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী বিশাখাপতনমে জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি স্থাপন করেন। বর্তমানে এই কারখানাটি ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ৮০০০ হাজার টনের মালবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ "জলউষা" ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে স্বাধীন ভারতের পতাকা বহন করিয়া জলযাত্রা করে। উহার পর হইতে এই কারখানায় বৎসরে তিন চারিটি বড় জাহাজ নির্মাণ করা হইতেছে। বর্তমানে এখানে এক একটি ১২৫০০ টনের মত মালবাহী জাহাজ নির্মাণ করা হইতেছে। উহাদের ইঞ্জিন ব্যতীত বেশির ভাগ অংশই বিশাখাপতনমের কারখানায় প্রস্তুত। ইঞ্জিন অংশতঃ খিদিরপুর এবং অংশতঃ রাঁচিতে প্রস্তুত হয়। যদিও বর্তমানে জাহাজ নির্মাণ করিতে ব্যয় কিছু বেশি পড়িতেছে, তবু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য ইস্পাত শিল্পের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ আরও কয়েকটি নূতন ষ্টিল প্লেট মিল স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। ইস্পাত সরবরাহের বিলম্ব ও অনিশ্চয়তার জন্যই শিল্পটি এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

**Q. 52. Do you think that India possesses all the advantages for the development of automobile industry? Where are the plants located?**

**[ ভারতে মোটরগাড়ি শিল্প গড়িয়া তুলিবার মত সকল প্রকার সুবিধাই রহিয়াছে মনে কর কি? কারখানাগুলি কোথায় অবস্থিত? ]**

**মোটরগাড়ী-শিল্প**—কিছুদিন পূর্বেও ভারতে মোটর গাড়ীনির্মাণের কোন কারখানা ছিল না। ভারত তাহার প্রয়োজনীয় মোটরগাড়ী, ট্রাক ও যাবতীয়

সাজসরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানি করিত। ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ীর চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। ভারতে মোট ২ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা আছে এবং ঐ সকল রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মোটর যাতায়াত করে। সুতরাং, ভারতের নিজস্ব বাজারেই তাহার শিল্পিত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, মোটরগাড়ী প্রস্তুতের উপযোগী লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি কাঁচা মাল প্রস্তুত করিবার অসুবিধাও ভারতে নাই। নূতন ইস্পাতের কারখানাগুলি স্থাপিত হওয়ার ফলে ইস্পাতের অভাবে শিল্পটির উন্নতি ব্যাহত হইবার আশংকা নাই। প্রায় সকল প্রকার মিশ্র ইস্পাতও এদেশেই এখন প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের মোটর গাড়ী শিল্পের ভবিষ্যৎ বিরাট সম্ভাবনায় পূর্ণ।

বোম্বাইয়ের নিকট মাতুঙ্গায় এবং কলিকাতার নিকট কোন্নগরে প্রথমে মোটর গাড়ী জোড়া দিয়া কাজ আরম্ভ হয়। মাদ্রাজের নিকটেও এই ধরণের কারখানা আছে। কোন্নগরের কারখানায় অবশ্য বর্তমানে মোটরের ইঞ্জিনসহ প্রায় সকল অংশই প্রস্তুত হইতেছে। অন্যান্য কারখানাতেও ৮০।৯০ ভাগ দেশী যন্ত্রাংশসহ গাড়ি ও ট্রাক প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের সন্নিকটে স্থাপিত হওয়ায় প্রথম প্রয়োজনে এই কারখানাগুলি যন্ত্রাদি আমদানি করিবার সুবিধা পাইতেছে এবং প্রস্তুত গাড়ী বিক্রয় করিবার বাজারেরও সুবিধা সেখানে রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের ক্রেতাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই অধিক, সুতরাং সস্তা দামের ছোট গাড়ী নির্মাণের সম্ভাব্যতা বর্তমানে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। ভারতে বর্তমানে মোটর ট্রাক প্রস্তুতের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। জামসেদপুর ও জব্বলপুরে হাজার হাজার ট্রাক নির্মাণ করা হইতেছে।

ভারতে জীপ ও স্কুটার প্রস্তুত হইতেছে এবং এদেশী অ্যাম্বাসাডার ছাড়াও দুটি বিদেশী গাড়ী—স্ট্যাণ্ডার্ড ও ফিয়াট ভারতে নির্মাণ করা হইতেছে। ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৩৮ হাজার মোটর গাড়ি, ১৫ হাজার বাস, ২৫ হাজার মোটরট্রাক, ৮ হাজার জীপ এবং তাছাড়া টেম্পো ইত্যাদি অন্যান্য গাড়িও কয়েক হাজার প্রস্তুত হয়। দেশের চাহিদা সম্পূর্ণভাবেই এদেশের কারখানাগুলি মিটাইতে সমর্থ। বিদেশেও টাটার ট্রাক ও বাস বৎসরে বহু শত রপ্তানি করা হয়। সামরিক বাহিনীর জন্যও সকল প্রকার মোটর গাড়ি জব্বলপুরে প্রস্তুত হয়। অত্যন্ত জোরালো ট্রাক "শক্তিমান" জীপ "জোঙ্গা" এবং ছোট ট্রাক "নিসান" জব্বলপুরে প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজ ও দিল্লীতে প্রতি বৎসর ১০।১৫ হাজার ট্রাক্টরও নির্মাণ করা হয়। এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। মোটর সাইকেল এবং স্কুটারও এদেশে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রস্তুত হয়। ভারত এখন এই সকল গাড়ি রপ্তানি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে।

ভারতের মোটর গাড়ি শিল্পের প্রধান অসুবিধা হইল এই যে, ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র এবং রাস্তাঘাটেরও অত্যন্ত অভাব। তবে সম্প্রতি বহু পাকা রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় মোটর ট্রাকের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। খুব বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যের পক্ষে মোটর নির্মাণ শিল্প চালানো লাভজনক নয়। সুতরাং, দেখা যাইতেছে মোটর নির্মাণ শিল্পের নানা সমস্যা বর্তমান। তবু এই শিল্পটি ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

**Q. 53 Give an account of the principal types of cottage industries in different parts of India. What steps are being taken for their development ? ( C. U 1959 )**

**[ ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রধান কুটীর শিল্পগুলির বিবরণ দাও। এগুলির উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে ? ]**

**কুটীর-শিল্প**—ভারতের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে কুটীর-শিল্পের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। সাধারণতঃ চাষীরা মাঠে ছয় মাস কাজ করে আর বাকী ছয় মাস ঘরে বসিয়া অবসর সময় কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে। বর্তমানে ভারতের ২ কোটির বেশি লোক কুটীর শিল্পের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। কেবল খাদি ও তাঁত শিল্পেই ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে।

অতীতে আমাদের দেশে কুটীর-শিল্পের অবনতির জন্য যদিও প্রধানতঃ বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ই দায়ী, তথাপি জনসাধারণের উপেক্ষাও উহার অন্যতম কারণ একথা অস্বীকার করা চলে না। দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা, তদুপরি সমবায় প্রথায় কার্য করিবার উপযোগী শিক্ষা ও মনোবৃত্তির অভাব, সরকারী ঔদাসীন্য এবং ধনীদের ব্যবসা-বিমুখতা প্রভৃতি নানা কারণে ভারতে কুটীরশিল্প তেমন প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। এই দেশে কুটীরশিল্পের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কুটির শিল্পের পক্ষে খুবই অনুকূল, কিন্তু ব্যাপক প্রচেষ্টা ও সংগঠন এবং শিক্ষার বড়ই অভাব ; স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয় জনজাগরণের ফলে কুটীর-শিল্পের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়। কুটীর-শিল্পের পুনর্জীবনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর নাম জড়িত।

ভারতের কুটির-শিল্পগুলির মধ্যে **বস্ত্র শিল্পই** প্রধান। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এই শিল্প-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাঁতবস্ত্র উৎপাদন প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫১ সালে ৭৪.২ কোটি গজ তাঁতবস্ত্র ভারতে উৎপন্ন হয়। ১৯৬৮ সালে ঐ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৩২০০০ কোটি গজ হয়। অম্বর চরকাজাত সূতায় প্রস্তুত খাদি বস্ত্রের উৎপাদন ১৯৫৬ সালে ১.৯ কোটি বর্গগজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৬ সালে প্রায় ৩ কোটি বর্গগজ হয়। যদিও বৃহদাকার বস্ত্রের কারখানা

এখন ভারতের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বস্ত্রই উৎপাদন করিয়া থাকে, তথাপি তাঁত শিল্প যে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহা কম কথা নয়।

রেশম ও পশমের উপর নির্ভরশীল তাঁতশিল্পে এক সময় ভারত উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল; ব্রিটেন, চীন, জাপান ও অন্যান্য কতকগুলি দেশের প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের রেশম ও পশম শিল্প এক সময় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বর্তমানে ভারতীয় রেশম ও পশমের আন্তর্জাতিক চাহিদা রহিয়াছে। ভারতে প্রায় ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত দুগ্ধজাত ও ফলজাত দ্রব্যশিল্পও ভারতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। কেরল রাজ্যে নারিকেল দড়ি শিল্প এবং মাদ্রাজ রাজ্যে কাজুবাদাম ও ক্যাসাভা (নকল সাগুদানা) প্রস্তুত অন্যতম প্রধান শিল্প। এ সকল ছাড়া পিতল ও কাঁসার বাসন তৈরি, ছুরি ও কাঁচি তৈরি, জুতা ও ব্যাগ তৈরি, হাতে গড়া কাগজ, গুড় প্রস্তুত, ধান ভানা এবং মৃৎপাত্রাদি নির্মাণ শিল্প কুটীর-শিল্প হিসাবে ভারতীয়দের অন্ন সংস্থান করিয়া থাকে। বর্তমানে বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে শাঁখের কাজ, অলঙ্কার শিল্প ও হস্তীদন্তের কাজ ভারতের কুটীর শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, বেতের কাজ, ঝিনুকের কাজ, দেশলাই, সাবান প্রস্তুত, তৈল ও গন্ধদ্রব্য, পাউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি তৈয়ারিও ভারতের কুটীর শিল্পের অন্তর্গত। বর্তমানে উন্নত ধরণের প্রস্তুত প্রণালী ও সরকারী সাহায্য ব্যতীত কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যগুলি কলে প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই সরকারের এই সকল কুটীরশিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা প্রয়োজন। যন্ত্রশিল্প প্রসারলাভ করিলেও কতকগুলি বিষয়ে কুটীর শিল্পের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। তাছাড়া **কুটীরশিল্প ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্প** পরস্পর পরস্পরের প্রসারের পরিপন্থী নয়; বরং বৃহদায়তন শিল্পের সাহায্যকারী শিল্প হিসাবে কুটীর-শিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে যেমন কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতিসাধন প্রয়োজন তেমন শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইলে ভারতকে বৃহদায়তন শিল্প ও কুটীর শিল্প উভয়কেই উন্নত করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী স্বাবলম্বন ভিত্তিক কুটীর শিল্পের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটীর শিল্পখাতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তাহার মধ্যে বস্ত্র বয়ন শিল্প ৫৯ কোটি টাকা এবং খাদি সূতা প্রস্তুত (অম্বর চরকা) শিল্প ১৬ কোটি টাকা সাহায্য পায়।

## তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটীর ও গ্রাম শিল্প খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ

| | ( কোটি টাকা ) | | ( কোটি টাকা ) |
|---|---|---|---|
| হস্তচালিত তাঁত | ৩৪ | রেশম উৎপাদন ও শিল্প | ৭ |
| শক্তিচালিত তাঁত ( ক্ষুদ্র শিল্প ) | ৪ | অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প | ৮৪.৬ |
| খাদি ও গ্রাম শিল্প | ৯২'৪ | নারিকেল কাতা | ৩'২ |

বর্তমানে ভারতে কুটীর-শিল্পের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিশেষতঃ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কুটীর শিল্পের একান্ত প্রয়োজন। তবে শিল্পগুলি অত্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা কম ও খরচ বেশি হয়। কুটীর শিল্পকে যতদূর সম্ভব আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে পারিলে ইহা বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের নৈতিক কুপ্রভাব হইতে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে পারিবে। শ্রমের জন্য কোন খরচ না থাকায় কুটীরশিল্পের মাল খুবই সস্তা হওয়া স্বাভাবিক। একমাত্র বৃহৎ ধাতুজাত-শিল্প ছাড়া সকল শিল্প কুটীর-শিল্পে পরিণত করিতে পারিলে পল্লী-উন্নয়নের জন্য কোন স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। শিল্পকেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ আজ সকল দেশেই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিকেন্দ্রীকরণের একমাত্র সহায়ক-কুটীর-শিল্প ; সুতরাং কুটীর-শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারের ( Kerve Committee, 1955 ) কুটীর শিল্প নীতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—(১) যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে গ্রামে যাহাতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করা। (২) যত অধিক সংখ্যক লোক গ্রামীণ কুটীর শিল্পে নিয়োজিত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। (৩) শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ( decentralisation ) ব্যবস্থা করা। কুটীরশিল্প প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য ঋণদান এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য বাজার সৃষ্টিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় ভারতীয় হাতের কাজের বেশ সুনাম আছে এবং সিল্কের শাড়ী প্রভৃতির বিরাট চাহিদা আছে।

কুটীর শিল্পগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য সরকার 'ন্যাশন্যাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন' নামক সংস্থা গঠন করিয়াছে। নানাপ্রকার প্রচেষ্টার ফলে কুটীর শিল্পগুলির উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫২ সালে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার খাদি বস্ত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দশ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তাঁত শিল্পের উৎপাদনও ঐ সময়ের মধ্যে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সংক্রান্ত নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধানের উপর ভারতের কুটীর শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

**Q. 54. Describe the present position and future prospects of cotton textile industry in India. Describe and account for the conditions that have led to the concentration of this industry in certain parts of India.**

*Or* **Analyse critically the locational setup of the cotton textile industry of India. Discuss the current problem of this industry. ( C. U. B. Com. 1966 )**

**[ ভারতের কার্পাস বস্ত্র শিল্পের অবস্থান ও সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। ]**

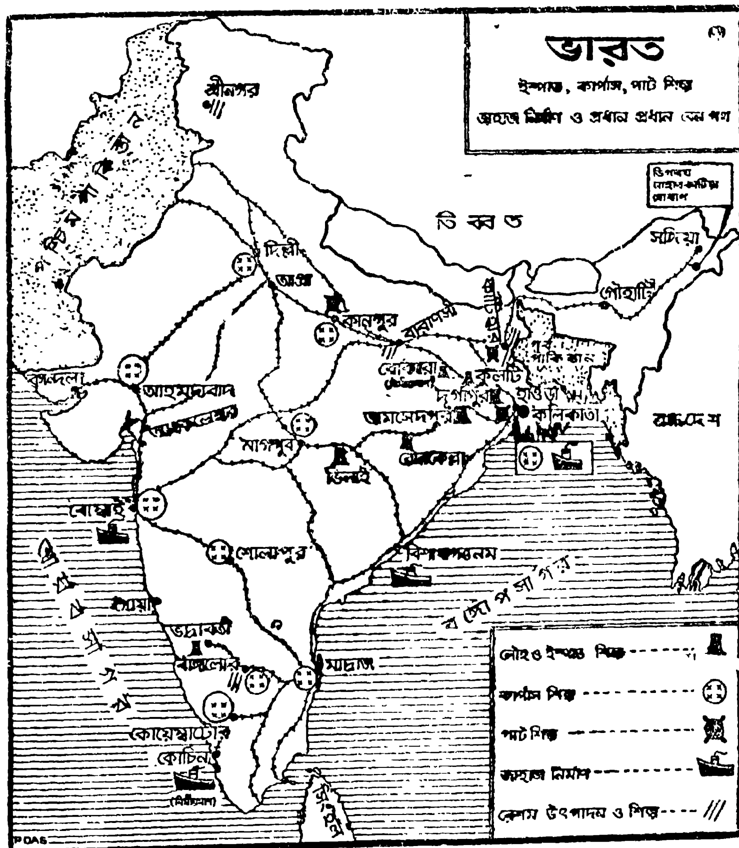
**কার্পাস শিল্প**—অতি প্রাচীনকালেও ভারতে তাঁতবস্ত্র তৈয়ারি হইত। এক সময় ঢাকা ( মসলিন ) ও কালিকটের ( 'ক্যালিকো' ) কার্পাস দ্রব্য বিশ্ববিখ্যাত ছিল। বিগত শতকের শেষার্ধে ভারতে কাপড়ের আধুনিক বৃহদাকার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এখনো ভারতের প্রয়োজন ও রুচির দিক দিয়া তাঁতের কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

ইংরাজ শাসনের মধ্যভাগে ভারতের তাঁতশিল্প ল্যাঙ্কাশায়ারের সস্তা বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে একদিকে ভারতের তাঁত ও খাদি বস্ত্রশিল্প যেমন অংশতঃ রক্ষা পাইল তেমনই ভারতীয় বৃহদাকার বস্ত্রশিল্প এক বিরাট রপ্তানি বাজার অধিকার করিয়া লইল। আজ পরিস্থিতির এতই পরিবর্তন হইয়াছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ারকে ( ব্রিটেন ) এখন ভারতের বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমানে ভারত সমগ্র পৃথিবীর বস্ত্র উৎপাদনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপন্ন করে। **যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এবং চীনের সমশ্রেণীতে ( রাশিয়ার উপরে ) বিশ্বের বস্ত্র-শিল্পে আজ ভারতের স্থান।** মোটামুটি উৎপাদন, কোটি বর্গমিটারে এইরূপ—যুক্তরাষ্ট্র ৭৫০, ভারত ও চীন প্রত্যেকে ৭৩০, রাশিয়া ৬৫০।

বর্তমানে ভারতে **সার্ধ চারি শতাধিক** ( ৪৮০টি ) কাপড়ের কল আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্থাপিত হইয়াছে। এগুলির যন্ত্রাদি খুব আধুনিক ধরণের। ভারতে বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রাদি ( যথা—Powerloom, ringframe ) প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়ায় যন্ত্রপাতির বিজ্ঞানসম্মত পুনর্বিন্যাসের কাজ অনেক সহজ হইয়াছে। কলিকাতার নিকট টেক্সম্যাকো প্রভৃতি কারখানায় এই যন্ত্রাদি এখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

**অবস্থানের বৈশিষ্ট্য**—কাপড় এবং সুতা প্রস্তুতের জন্য **বোম্বাই** এবং **আমেদাবাদ** শহর বিশেষ প্রসিদ্ধ। উভয় শহরে ৬৫ হইতে ৭০টির মত কাপড়ের কল আছে। তাহা ছাড়া, মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর, নাগপুর, পুণা এবং গুজরাটের সুরাটে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে; এই অঞ্চলে সুবিধা অনেক। যথা—সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও মারাঠা-ওয়াদা অঞ্চলের উৎপন্ন তুলার নৈকট্য। (২) টাটার

ও কয়লার জলবৈদ্যুতিক কেন্দ্র (পশ্চিমঘাট পর্বতে,—ভীরা, ভীভপুরী, খোপোলী) হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ (ট্রম্বের তৈলশোধনাগার ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় শক্তিসরবরাহের আরও সুবিধা হইয়াছে)। (৩) বোম্বাই বন্দরের সুবিধা। এই বন্দর মারফৎ দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করা হয় (মিশর, সুদান ও যুক্তরাষ্ট্র




হইতে) এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে প্রচুর বস্ত্র রপ্তানি করা হয়। (৪) দক্ষ কারিগর ও মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা। (৫) আর্দ্র জলবায়ুর সুবিধা। তামিলনাডুতেও বস্ত্রশিল্পের জন্য উক্ত সুবিধাগুলি রহিয়াছে। মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও মাদুরাই শহরে বহু কাপড়ের কল আছে। কোয়েম্বাটোর দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। তামিলনাডুর তুলা মধ্যম আঁশযুক্ত বলিয়া এখানে সূক্ষ্ম

বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় বস্ত্রশিল্পের প্রধান সুবিধা বাজার সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প তেমন উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। মোট প্রায় ৪০টি কাপড়ের কল আছে। অধিকাংশ কারখানাই ছোট এবং উহাদের সম্মিলিত উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। শীঘ্রই কয়েকটি বড় বড় কারখানা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কারখানাগুলিতে নূতন স্বয়ংক্রিয় তাঁত ও টাকু সংযোজন করা হইতেছে। কলিকাতার জলবায়ু, শ্রমিক, মূলধনের সরবরাহ এবং কয়লার সরবরাহ শিল্পগঠনে সাহায্য করিয়াছে বটে কিন্তু কার্পাস তুলা পশ্চিম ও উত্তর ভারত হইতে আনিতে হয়। ইহাতে খরচ অধিক পড়ে। ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যে উত্তর প্রদেশের কানপুর এবং মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর এবং দিল্লী অঞ্চল বস্ত্র-শিল্পের বড় কেন্দ্র। এখন দেশের নানা স্থানে কাপড়ের কল স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের মিলগুলি হইতে ১৯৬৮ সালে প্রায় ৫০০ কোটি মিটার (প্রায় ৩০০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র বাদে) কাপড় প্রস্তুত হয়। পৃথিবীতে জাপানের পরেই ভারত দ্বিতীয় বস্ত্ররপ্তানিকারক দেশ হিসাবে স্থান লাভ করে। কিছুকাল যাবত চীন খুব সস্তায় প্রচুর বস্ত্র রপ্তানি করিতে থাকায় এবং ভারতীয় কাপড়ের আভ্যন্তরীণ শুল্কের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কে মহা সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। ১৯৬০ সালে মাত্র ৬৪ কোটি টাকা মূল্যের কার্পাস বস্ত্র ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু এখন অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

তুলার সরবরাহের দিক হইতে বর্তমানে ভারতের অবস্থার খুব উন্নতি হইয়াছে। ভারতের বহু স্থানেই এখন দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। ১৯৬৮ সালে ভারতে প্রায় ৬০ লক্ষ গাঁট তুলা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ভারত, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু পরিমাণ তুলা আমদানি করিয়া তাহার বস্ত্রশিল্প চালাইতে সক্ষম। ভাল দীর্ঘ আঁশ তুলা আমদানি করার প্রয়োজন অবশ্য থাকিবে।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা মোটের উপর ভাল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বাজারে চাহিদাও ভাল। তবে ক্রমশঃ এদেশে ও বিদেশে কৃত্রিম তন্তুর প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় না।

**ভারতের বৃহৎ বস্ত্র শিল্পকেন্দ্র ও বৃহদাকার কলের মোটামুটি সংখ্যা**

| | | | |
|---|---|---|---|
| আমেদাবাদ | ৭৪টি কল | কোয়েম্বাটোর | ৪০টি কল |
| বোম্বাই শহর | ৬৫টি „ | সমগ্র তামিলনাড়ু রাজ্য | ৯৩টি „ |
| গুজরাট ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর, পুণা, সুরাট প্রভৃতি শহর | ৬১টি „ | পশ্চিমবঙ্গ | ৪০টি „ |
| | | উত্তর প্রদেশ | ২৯টি „ |

**Q. 55. What factors are responsible for the localisation of cotton textile industry in Southern India ?**

**[ দক্ষিণ ভারতে কার্পাস বস্ত্র শিল্প একদেশীভূত হওয়ার কারণ কি ? ]**

**দক্ষিণ ভারতের বস্ত্রশিল্প**—বস্ত্রশিল্প ভারতের প্রাচীন শিল্প। প্রাচীনকাল হইতেই বস্ত্রশিল্পে ভারতের সুনাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বস্ত্রশিল্প বলিতে বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানাগুলিকেই বুঝায়। সস্তা বিলাতী কাপড়ের আমদানির ফলে যখন দেশীয় কুটীর শিল্প হিসাবে বস্ত্রশিল্প বিপন্ন হইয়া পড়িল, তখন একদল ভারতীয় ব্যবসায়ী বোম্বাই নগরে আধুনিক বস্ত্রশিল্পের বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কালক্রমে এই শিল্প সমগ্র বোম্বাই হইতে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ও দাক্ষিণাত্যের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িল এবং বিলাতী কাপড় আমদানিও প্রায় বন্ধ হইল। বহু কোটি টাকার ভারতীয় মিলে প্রস্তুত বস্ত্র ও সুতা এখন বিদেশে রপ্তানি হয়। এ বিষয়ে দাক্ষিণাত্যের অবদান সর্বাধিক। ভারতে মোট প্রায় ৫০০টি বড় কাপড়ের কল আছে, তার মধ্যে তিন শতেরও অধিক কল দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের কার্পাস শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নিম্নরূপ :—(১) বোম্বাই অঞ্চল [ ৬৫টি কল ], (২) আমেদাবাদ অঞ্চল [ ৭৮টি কল ], (৩) নাগপুর, (৪) দক্ষিণ বোম্বাইয়ের সোলাপুর বেলগাঁও অঞ্চল ও (৫) মাদ্রাজ-মাদুরা-কোয়েম্বাটোর-মহীশূর অঞ্চল।

নিম্নলিখিত কারণে উপরিউক্ত স্থানগুলিতে বস্ত্রশিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে :—

(১) **বোম্বাই** বন্দর কাঁচা তুলা রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র ছিল, এখনও আছে, তবে তুলা রপ্তানির পরিমাণ কম বরং আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি। আফ্রিকা হইতে উৎকৃষ্ট তুলাও আমদানি করা যায়। টাটা হাইড্রোইলেকট্রিক কোম্পানীর কেন্দ্র হইতে অত্যন্ত সস্তায় প্রচুর জলবিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায়। সুদক্ষ শ্রমিক, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মালিক এবং যথেষ্ট মূলধন এখানে পাওয়া যায়। বন্দরের সুবিধাও রহিয়াছে। (২) **আমেদাবাদ** তুলা উৎপাদক অঞ্চলের সর্ব-প্রধান কেন্দ্র। উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা, মূলধন, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতিরও অভাব নাই। বোম্বাই বন্দরও নিকটেই অবস্থিত। (৩) **মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের** কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল তুলা উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। নিকটেই মহারাষ্ট্রের চান্দা জেলায় অনেকগুলি ছোট ছোট কয়লাখনি রহিয়াছে। প্রচুর সস্তা শ্রমিক পাওয়া যায়। কলগুলি বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া রহিয়াছে। (৪) মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে **শোলাপুর** অঞ্চলে ভাল তুলা জন্মে। (৫) মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণভাগে প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা জন্মে। লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় বাজারও নিকটেই। মেথুর বাঁধের বিদ্যুৎশক্তি ও কলিকাতা হইতে ট্রেন ও জাহাজ যোগে

আনা কয়লা ব্যবহার করা যায়। মাদ্রাজ বন্দর দিয়া বস্ত্র রপ্তানিও করা যায়। মূলধনও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাদ্রাজ, মাদুরাই, কোয়েম্বাটোর প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। কোয়েম্বাটোর সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।

পূর্বাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম বলিয়া এখানে উৎপন্ন সূতা ও বস্ত্র উভয়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সুতরাং মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও গুজরাটের বন্দরগুলি মারফৎ প্রচুর কার্পাস দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ভারতের অপরাপর অংশেও দাক্ষিণাত্যের বস্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা আছে। অবশ্য বর্তমানে ভারতের অপরাপর অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প দ্রুততর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে কার্পাস শিল্পগুলি ক্রমশঃ কাঁচামাল হইতে দূরে এবং বাজারের নিকটে স্থাপিত হইতে দেখা যাইতেছে।

**Q. 56. Give an account of the distribution and present condition of the jute industry of India and indicate its future prospects.**

**[ ভারতে পাটশিল্পের অবস্থান এবং উহার বর্তমান অবস্থার বর্ণনা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দাও। ]**

**পাটশিল্প**—ভারতে প্রথম চটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের সন্নিকটে রিষড়া নামক স্থানে। ইউরোপীয় মূলধনের সাহায্যেই এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক চটকল ভারতে অবস্থিত। ভারতে মোট ১১২টি পাট কল আছে। পশ্চিম বাংলায় ৯০টির বেশী বড় পাটকলের মধ্যে সবগুলিই বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখন অবশ্য কয়েকটি পুরাতন ধরণের কারখানা বন্ধ আছে। ভারতের অন্যান্য পাটকলগুলি বিহারের পুর্ণিয়া জেলায়, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, মধ্য এবং উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। অন্ধ্রে ৩টি, বিহারে ৩টি, উত্তর প্রদেশে ৩টি, এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি চটকল আছে। পাটশিল্প আয়তনের দিক দিয়া কেবলমাত্র কার্পাস, ইস্পাত ও কয়লা শিল্পের পরেই ভারতের চতুর্থ বৃহৎ শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে প্রায় দুই লক্ষ ব্যক্তি কাজ করে। অধিকাংশ শ্রমিক উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের অধিবাসী।

**পাট রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা**—পাটশিল্প ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিকমুদ্রা অর্জনক্ষম শিল্প। ভারত বিভাগের ফলে ভারতের পাটশিল্প যে সংকটের সম্মুখীন হয় তাহা এখন কতক পরিমাণে দূর হইয়াছে। তবে পৃথিবীর বাজারে কাগজের ব্যাগ, রোজেল, রেমি, সিসাল প্রভৃতি তন্তুর আবির্ভাবে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৬৮ সালে. ভারত হইতে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা মূল্যের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়। ইহা প্রধানতঃ কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি হয়। বর্তমানে পাকিস্তান তাহার কাঁচা পাটের অধিকাংশ চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর মারফত ইটালি, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ভারত সরকার পাট দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন।

কিন্তু ভারতীয় পাট শিল্পের সবচেয়ে বড় বিপদের কথা এই যে, পাকিস্তান সরকারের সহায়তায় চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় ১৫টির বেশী সুবৃহৎ পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার ফলে পাকিস্তানে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা নাই। এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বাজারেও ভারতের পাটজাত দ্রব্য পাকিস্তানের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতীয় পাটশিল্পের পক্ষে ইহা খুবই বিপদের কথা। ভারতের পাটদ্রব্য রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতীয় পাট কলগুলিতে প্রধানতঃ হেসিয়ান, গানি, বস্তা, দড়ি, ব্যাগ, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্র কার্পেট ও হেসিয়ানের সর্বপ্রধান ক্রেতা। ইহা প্রস্তুত করিতে ভাল পাট দরকার হয়। এই পাটের কতকাংশ এখনও পাকিস্তান হইতে সিঙ্গাপুর মারফত আমদানি করিতে হয়। ভারতের চটকলগুলিতে উৎপন্ন পাটজাত দ্রব্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। পূর্বে অধিকাংশ. পাটকলই ছিল ইউরোপীয়দের। এখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পাটকলগুলি ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ভারত বিভাগের ফলে চটকলগুলি কাঁচামালের অভাবে খুব ক্ষতিগ্রস্ত [redacted] সুতরাং, ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পাটচাষ বাড়াইয়া হুগলী নদীর তীরবর্তী কলগুলির কাঁচামালের চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালেই প্রথম ভারত আপন কলগুলির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পাট ও ম্যাসতা (রোজেল) উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ১৯৬১-৬২ সালের পাট ফসল ভালই হয় এবং অবস্থার আরও উন্নতি দেখা যায়। ১৯৬৮ সালে ৬৫ লক্ষ গাঁট পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হয়। উহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে। ১৯৬৯ সালে অবস্থার উন্নতি হয়। ঐ বৎসর উৎপাদন ৭৫ লক্ষ টনের বেশি হয়।

বর্তমানে ভারতীয় চটকলের মালিকেরা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির দ্বারা পুরাতন কলগুলিকে কার্যোপযোগী করিতেছেন। ইহাতে একদিকে যেমন শ্রমিকের কর্মচ্যুতির আশংকা বিদ্যমান অপরদিকে তেমন পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ও চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ভারতের পাটকলগুলিতে মোট পাটের চাহিদা প্রায় ৭২ লক্ষ গাঁট। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে মেস্তা অল্প

পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। এই মেস্তার আঁশ পাট অপেক্ষা কর্কশ হইলেও উহা দড়ি ও থলি প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের সংগে মিশানো যায়। এই গাছ কম বৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ডাঙ্গা জমিতেও জন্মে। ইহার মূল্যও কম এবং বিঘা প্রতি উৎপাদন পাট অপেক্ষা বেশি। ইহা ভারতের পাটশিল্পকে অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়াছে। পাকিস্তানের ভাল পাট আমদানির উপায় নাই। কিছু "কটিং" আমদানি হয়। থাইল্যাণ্ড হইতেও মেস্তা আমদানি করা হয়।

**Q. 57. "Jute is a highly centralised industry in India." Do you agree ? Give reasons. (C. U. 1957)**

**[ "ভারতে পাটশিল্প অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত শিল্প"—তোমার মতামত কি ? কারণ দেখাও। ]**

**অবস্থান**—ভারতের পাটশিল্প কলিকাতার উপকণ্ঠেই প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। হুগলী নদীর দুই তটে কলিকাতার ২৫ মাইল উত্তর হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত স্থান লইয়া শিল্পগুলি অবস্থিত। সর্বাপেক্ষা উত্তরের পাটকল বংশবাটীতে এবং সর্বাপেক্ষা দক্ষিণের পাটকল বিড়লাপুরে অবস্থিত। ২।৩টি ছাড়া প্রায় সমস্ত পাটকলগুলি হুগলী নদীর দুইতটে অবস্থিত। IJMA-র সদস্য ৮৫টি বড় পাটকল এখানে অবস্থিত। কয়েকটি দড়ির কলও আছে। মোট কলসংখ্যা ৯৫-এর মত। কিন্তু অনেকগুলি কারখানা নিয়মিত চলে না। ভারতে পূর্বে যত পাটের তাঁত ছিল এখন আর তত নাই কিন্তু অতি আধুনিক স্বয়ংচালিত ( automatic looms ) যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে পাট বস্ত্রের উৎপাদন কমে নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট কথা, ভারতের পাটশিল্পের কথা বলিতে গেলে বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলের কথাই বলিতে হয়। এই অঞ্চলের বাহিরে উত্তরবিহারে, উত্তরপ্রদেশের কানপুরে, অন্ধ্রের উপকূলভাগে ও মধ্যপ্রদেশে যা দু'চারটি পাটকল আছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজনই উহারা মিটাইয়া থাকে। এখন দেখা যাক যে হুগলী নদী-তীরে পাটশিল্প কেন কেন্দ্রীভূত হইল।

**প্রথমতঃ**, পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে। ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী জেলার পাট হুগলী নদীপথে ও রেলপথে কলিকাতায় আসে। সুন্দরবনের পথে সুদূর আসাম ও পূর্বপাকিস্তানের পাট ষ্টিমার যোগে অল্প খরচে হুগলী নদী অববাহিকায় চালান দেওয়া যায়। তবে এই পথ এখন বন্ধ।

**দ্বিতীয়তঃ**, কলিকাতায় সমগ্র পূর্বভারতের রেলপথগুলি একত্রিত হইয়াছে। রেলযোগে উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পাটও কলিকাতায় সরবরাহ করার সুবিধা আছে।

তৃতীয়তঃ, হুগলী নদীর জল পাট ধুইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নৌকা ও ষ্টিমারের সাহায্যে পাটজাত দ্রব্য মিল হইতে জাহাজ ঘাটে কম খরচে পাঠানো যায়।

চতুর্থতঃ, পাটজাত দ্রব্যের অর্ধেকের বেশি কলিকাতা বন্দর হইতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়; সুতরাং শিল্পগুলি বন্দরের নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় রপ্তানির সুবিধা হয়। কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য এই শিল্পের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে বলিয়া প্রচুর কয়লা ও তাপ-বিদ্যুৎশক্তি হুগলী নদী অঞ্চলে অল্প খরচে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠতঃ, কলিকাতায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাটশিল্প প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই অঞ্চলে বংশপরম্পরায় সুদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, কলিকাতায় প্রচুর মূলধন এবং ব্যাঙ্কের সুবিধা প্রভৃতিও রহিয়াছে। সুতরাং, কলিকাতা অঞ্চল যে পাটশিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা খুবই স্বাভাবিক এবং এই সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল চলিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

**Q. 58 Give a short sketch of the sugar industry of India and suggest methods of its improvement.**

[ভারতের চিনি শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং ইহার উন্নতির উপায় কি লিখ।]

**চিনি-শিল্প**—ভারতের ইক্ষু হইতেই প্রধানতঃ চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এদেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে। ভারতের প্রধান ও বৃহৎ শিল্পগুলি[redacted] চিনিশিল্পের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ সালে সরকারী সংরক্ষণ পাইবার পর হইতেই চিনিশিল্প বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে। ইক্ষু ক্ষেত্রের নিকটেই চিনির কলগুলি অবস্থিত কারণ ইক্ষু অধিক দূরে বহন করিলে উহার রস শুকাইয়া যায় এবং চিনির পরিমাণ হ্রাস পায়। ভারতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পাঞ্জাবেই সর্বাপেক্ষা বেশি ইক্ষু চাষ হয়। এখানে অধিক ইক্ষু চাষ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, এই অঞ্চলে তুলা, পাট বা তৈল বীজের মত কোন ভাল আর্থিক ফসল (Cash crop) সর্বত্র উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, খুব সুবিধাজনক প্রাকৃতিক অবস্থা না হইলেও বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ইক্ষু চাষ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অন্ধ্র, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রে ইক্ষু চাষের উপযোগী সর্বোৎকৃষ্ট জলবায়ু ও মাটী আছে। এই সমস্ত স্থানে ইক্ষুর চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার সুযোগ-সুবিধাও কম নয়। তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের উপকূলভাগে যথেষ্ট ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। **ভারতে মোট প্রায় ২০০টি চিনির কারখানা আছে।** উত্তরপ্রদেশ ইক্ষু ও চিনি উৎপাদনে

ভারতের মধ্যে সর্বপ্রধান। বিগত কয়েক বৎসরে দক্ষিণ-ভারতে অনেক বেশি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। এখন মহারাষ্ট্রের স্থান উত্তর প্রদেশের পরেই। অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ুতেও ইক্ষুর একর-প্রতি উৎপাদন খুব বেশি।

ভারতের চিনি শিল্প পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম (কিউবা ও ব্রেজিলের পরে)। কিন্তু গুড় ও খান্দসরি ধরিলে ভারতই পৃথিবীতে প্রথম। ভারতে চিনি উৎপাদনের বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতবাসী মাথা-পিছু যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে (ভারতে মাথাপিছু চিনির খরচ ১১ পাউণ্ড—সেই তুলনায় ব্রিটেনে মাথাপিছু ১০৩ পাউণ্ড চিনি খরচ হয়) তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। ভারতবাসীর জীবনধারণের মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদাও বাড়িয়া যাইবে।

১৯৫৭ সালে চিনি সম্পর্কে ভারত স্বয়ংপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে দেশে চিনির অভাব দেখা দেয়। আবার ১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে ভারতে প্রায় ৩৮ লক্ষ টন চিনি এবং প্রায় ৪০ লক্ষ টন গুড় ও খান্দসরি চিনি উৎপন্ন হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে বেশ কিছু পরিমাণ চিনি রপ্তানি করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। কারণ কিউবার সহিত রাজনৈতিক কলহের ফলে যুক্তরাষ্ট্র চিনি আমদানির জন্য অংশতঃ ভারতের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা ব্যতীত বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চিনির ক্রেতা মেলা সহজ নহে; কারণ ভারতীয় চিনির উৎপাদন-ব্যয় ও উহার উপর আবগারী শুল্ক অধিক। তবুও ভারত বহু কোটি টাকার চিনি রপ্তানি করিতেছে।

ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অতি অল্প পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে পলাশী, বেলডাঙ্গা ও আমেদপুরে মোট তিনটি চিনির কারখানা আছে। এই রাজ্যে পাট চাষ অধিক হয় বলিয়া ইক্ষু চাষ এবং চিনি শিল্প এখানে প্রসার লাভ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকার চিনি বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হইতে আমদানি করা হয়। উত্তরপ্রদেশই ভারতের মধ্যে চিনি উৎপাদনে অগ্রগণ্য। কিন্তু দক্ষিণ ভারতেই চিনি উৎপাদন বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে চিনি শিল্প অধিক লাভজনক; সুতরাং ঐ অঞ্চলে ভবিষ্যতে অধিক চিনির কারখানা স্থাপিত হওয়া সম্ভব। ভারতে চিনির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং দেশে আরও বহু চিনির কারখানা গড়িয়া তোলা দরকার।

ভারতে চিনি শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন ইক্ষুর জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া। একর প্রতি উৎপাদন কম হওয়ায় ইক্ষুর মূল্য অধিক হয়। দ্বিতীয়তঃ, চিনির কলে ইক্ষু খুব শীঘ্র পৌঁছান প্রয়োজন, কারণ, শুকনো ইক্ষু হইতে খুব অল্পই চিনি উৎপন্ন হয়। ভাল পাকা রাস্তা থাকিলে ক্ষেত হইতে ইক্ষু শীঘ্র কারখানায় পৌঁছিতে পারে। বড় বড় জমিতে ইক্ষু চাষ করিলে ঐ জমির

ইক্ষুতেই এক-একটি চিনির কল চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ, গুড় হইতে সুরাসার বাহির করিয়া লইয়া উহা হইতে চিনি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাহাতে পেট্রোলের যোগান তো হইবেই উপরন্তু চিনির দামও সস্তা হইবে। চতুর্থতঃ, চিনির কলগুলির অবস্থান উহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের নিকট হওয়া প্রয়োজন। কলগুলি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত হওয়ায় কয়লা সরবরাহের খুব অসুবিধা। অনেক কারখানায় ইক্ষুর ছিপড়া ( বাগাসী ) জ্বালাইয়া বয়লার চালান হয়—কিন্তু ঐ ছিপড়া হইতে অনায়াসে কাগজশিল্প গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। পঞ্চমতঃ, ভারতের চিনির কলগুলি বারমাস চালু রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। বর্তমানে উহারা মাত্র পাঁচ মাস চলে এবং অবশিষ্ট সময় বন্ধ থাকে; কারণ, জলবায়ুর অসুবিধার জন্য সকল সময় ইক্ষু পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই অসুবিধা হয়। ভারতে তাল ও খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের মিষ্টি রস হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে গুড় তৈয়ারি হয়। তালগুড় উৎপাদনে বাংলা, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্র রাজ্য বিশেষ অগ্রণী।

**Q. 59. What essential raw materials are required for the manufacture of cement? State the places where the industry is at present located in India and discuss its possibilties.**

**[ সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ কি কি কাঁচামাল লাগে? কোন্ কোন্ স্থানে শিল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে? ইহার ভবিষ্যৎই বা কি? ]**

**ভারতের সিমেণ্ট শিল্প**—ভারতে সিমেণ্ট শিল্পের সূত্রপাত হয় ১৯০৪ সালে। এই সময় মাদ্রাজে একটি ক্ষুদ্র সিমেণ্টের কল খোলা হয়। ভারতে সিমেণ্টের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িতে থাকে এবং রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সিমেণ্ট প্রস্তুত কারখানার সময় সমস্ত কাঁচা মালও ভারতের নানাস্থানে খুব সহজলভ্য হইয়া উঠে।

প্রধানতঃ, **চুনাপাথর, মৃৎপ্রস্তর** (shale) **ও জিপসাম** সহযোগে সিমেণ্ট প্রস্তুত করা হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমির প্রায় সর্বত্রই এগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাজস্থানে ও মহীশূরে যথেষ্ট জিপসাম পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন কয়লার প্রয়োজনও আছে; তবে সিমেণ্টের কারখানায় সাধারণ কয়লাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবুও কয়লা পাওয়ার অসুবিধাই ভারতের সিমেণ্ট শিল্পে প্রধান অন্তরায়। দক্ষিণ ভারতের সিমেণ্টের কারখানাগুলি জলবৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে।

তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে ভারতের অধিকাংশ সিমেণ্ট কারখানা অবস্থিত। ভারতে মোট প্রায় ৪০-টির মত কারখানা আছে। ভারতের সিমেণ্ট শিল্প বিক্ষিপ্তভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ সিমেণ্ট শিল্পের জন্ত

প্রয়োজনীয় প্রধান কাঁচামাল, চুনাপাথর ভারতের অনেক স্থানেই আছে এবং সিমেণ্টের চাহিদাও সমগ্র ভারতেই রহিয়াছে। বিকানীর ও মহীশূর রাজ্যে জিপসামের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দিক দিয়া ভারতের কোন অসুবিধা আর নাই। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত প্রায় সকল রাজ্যেই সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের হিমালয় অঞ্চলে এবং পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচুর চুনাপাথর রহিয়াছে। ভবিষ্যতে ঐ সকল অঞ্চলে সিমেণ্ট কারখানা স্থাপিত হইবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের কয়েকটি সিমেণ্টের কল রহিয়াছে। বিহারের শোন নদীর উপত্যকা, বিশেষতঃ ডালমিয়ানগর সিমেণ্ট উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। রাজগঙ্গাপুর, সিন্ধ্রি, উত্তর প্রদেশের রিহান্দ বাঁধের নিকট ও পাঞ্জাবের কয়েকটি স্থানে সিমেণ্টের কারখানা চালু হইয়াছে। কেরল রাজ্যে কয়েক প্রকার বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু চাহিদাও ততোধিক দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান গৃহ সমস্যার দিনে সিমেণ্টের প্রয়োজন সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ কনক্রিটের বাঁধ, সেতু, পথ, গৃহ, শ্রমিকদের আবাস, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কারখানা প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে। নিম্নে কয়েক বৎসরের সিমেণ্ট উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল :—

ভারতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৬ লক্ষ টন, ১৯৬০-৬১ সালে ৮৫ লক্ষ টন এবং ১৯৬৪ সালে ৯২ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১২০ লক্ষ টনের মত সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়।

বর্তমানে কয়েকপ্রকার বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট বাদে সাধারণ পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ভারতীয় কারখানাগুলি মিটাইতে সক্ষম। ভারত বর্তমানে কিছু পরিমাণ সিমেণ্ট রপ্তানি করে। এদেশে সিমেণ্ট উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে সিমেণ্টের প্রধান গ্রাহক (১) নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি, (২) গৃহস্থের জন্য ও শ্রমিক কল্যাণের জন্য গৃহাদি নির্মাণের প্রতিষ্ঠানগুলি ও (৩) সামরিক ও জাতীয় পথ পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার স্বয়ং। সুতরাং, সিমেণ্টের চাহিদা ও উৎপাদন উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৬ সালে ভারতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। ১৯৬৬-৬৮র মন্দা ইহার জন্য দায়ী।

পৃথিবীর সিমেণ্ট শিল্পে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু জার্মানী ও ব্রিটেনের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের মত বৃহৎ দেশের বর্তমান সিমেণ্ট উৎপাদন খুবই কম। এমন কি, জাপান এবং ইটালিও ভারতের প্রায় দ্বিগুণ সিমেণ্ট উৎপাদন করে। সিমেণ্ট উৎপাদনকে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি বলা চলে। সুতরাং, দেশের উন্নতি করিতে হইলে আরও

সিমেণ্ট চাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভূ-তত্ত্ব সমীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদনের কাঁচা মাল অর্থাৎ চুন, কাদামাটি, জিপসাম ও কয়লার অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

**Q. 60. Describe the present position of India's aluminium industry.**

**[ ভারতের এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর। ]**

**এ্যালুমিনিয়াম** বর্তমান জগতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহা শক্ত, হাল্কা ও মরিচাহীন থাকে বলিয়া বাসন, বিমান ও বৈদ্যুতিক শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভারতে এ্যালুমিনিয়াম খনিজের অর্থাৎ বক্সাইট শিলার বিপুল সংস্থান রহিয়াছে। বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে ইহার খনি বিদ্যমান। বর্তমানে ভারতে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ টনের মত বক্সাইট উৎপন্ন হয়।

বিহারের মুরিতে, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের নিকট, মাদ্রাজের মেথুরে ও কেরল রাজ্যের আলোয়েতে এ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়া অর্থাৎ এ্যালুমিনা ও ধাতু প্রস্তুতের কারখানা আছে। সস্তা তড়িৎ-শক্তির অভাবে ভারতের এই শিল্প এখনও তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। ১৯৪৯ সালে ৫ হাজার টনের তুলনায় বর্তমানে ( ১৯৬৯ ) বৎসরে একলক্ষ টনের বেশি এ্যালুমিনিয়ম ধাতু ভারতে প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যার হিরাকুঁদে এবং রিহান্দ বাঁধের নিকটে দুইটি খুব বড় এ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, মহারাষ্ট্রের কয়না এবং মধ্যপ্রদেশের করবাতে দুটি বিরাট আকারের এ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হইতেছে। এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন পাঁচগুণ বাড়াইবারএক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারত এই ধাতু বিষয়ে স্বাবলম্বী ; রপ্তানিও করা হয়।

**Q. 61. What do you know of India's aircraft industry ?**

**[ ভারতের বিমানশিল্প সম্পর্কে কি জান ? ]**

**বিমান শিল্প**—ভারতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিমান প্রয়োজন। এইজন্য বর্তমানে, বাঙ্গালোর কানপুর, নাসিক ও কোরাপুটের ( বিমান ইঞ্জিন ) কারখানাগুলিতে সামরিক বিমান নির্মাণ করা হইতেছে। বাঙ্গালোরে প্রস্তুত HT-2 নামক সম্পূর্ণ ভারতীয় বিমান শিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা খুব উৎকৃষ্ট বিমান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। পুষ্পক ও কৃষক নামক হাল্কা বিমানও এখানে প্রস্তুত করা হয়। এখানে বিমানের ইঞ্জিনও প্রস্তুত হইয়াছে। মরুত ও কিরণ নামক জেট চালিত জঙ্গী বিমানও এই কারখানায় নির্মাণ করা হইতেছে। বেসামরিক বিমান মেরামতের কাজে এই কারখানা খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। ভারতে জেট ইঞ্জিনও প্রস্তুত হয়। কোরাপুটে রুশ সহযোগিতায়

MIG-21 নামক দ্রুতগামী বিমান-এর ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে। ভারতে বর্তমানে কয়েকটি গ্লাইডার বিমানও প্রস্তুত করা হইয়াছে। কানপুরেও বিমান প্রস্তুত হয়। এখানে প্রস্তুত Kanpur-2 বেশ ভাল বিমান। এখানে যাত্রীবাহী H. S. 748 নামক বিমানও প্রস্তুত হইতেছে।

**Q. 62. What materials are needed for the development of paper industry in India and where are they found? Locate the centres of paper manufacturing in India. (C U. 1960)**

**[ভারতে কাগজ শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য কি কি কাঁচামাল দরকার হয়? এগুলি কোথায় পাওয়া যায়? ভারতে কাগজ শিল্পের কেন্দ্রগুলির উল্লেখ কর।]**

***Or,*** **Account for the location of the paper mills of India and discuss critically the present position and future scope of the paper industry. (C. U. B. Com. 1965)**

**কাগজ-শিল্প**—ভারতে প্রথম কলে প্রস্তুত কাগজ-শিল্প স্থাপিত হয় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে হুগলী নদীর তীরে বালীতে সর্বপ্রথম কাগজের কল "রয়াল পেপার মিল" প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর টিটাগড়, নৈহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে কাগজের কল গড়িয়া উঠিতে থাকে। বর্তমানে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ কাগজ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি ও স্থানীয় শিক্ষিত সমাজে কাগজের চাহিদাই ইহার কারণ। অন্যান্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও উত্তর-প্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার কোরাপুট অঞ্চলেও বেশ বড় বড় কাগজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এদেশে মোট ২০টির বেশি কাগজের কল আছে।

সংরক্ষণের সুবিধার আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের কাগজ-শিল্প উপযুক্ত নরম কাঠ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির অভাবে এপর্যন্ত আশানুযায়ী উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কাগজের মণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় নরমকাঠের অভাব ভারতের সর্বত্র অনুভূত হয়। এই সকল কাষ্ঠ বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া চালানো যায় বটে, তবে তাহাতে বিশেষ লাভবান হওয়া যায় না। কেবলমাত্র হিমালয় পর্বত অঞ্চলে প্রচুর পাইন ও ফার নামক কাগজ প্রস্তুতের উপযুক্ত কাঠ রহিয়াছে। অবশ্য মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র রাজ্যের দণ্ডকারণ্যেও নরম ও শক্ত কাঠ রহিয়াছে এবং উহার সাহায্যে মধ্য প্রদেশের নেপানগরে ভারতের একমাত্র নিউজপ্রিন্ট কারখানা চলিতেছে। আসামের জঙ্গলেও কিছু নরম কাঠ ও প্রচুর বাঁশ রহিয়াছে।

হিমালয়ের পাদদেশে পাইন, ফার, লার্চ প্রভৃতি সরলবর্গীয় গাছ যদিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে কিন্তু যানবাহনের অসুবিধার জন্য তাহাদের সুবিধামত কাজে লাগানো সম্ভব হইতেছে না। দেরাদুনের 'বন বিজ্ঞান গবেষণাগারে' সহজলভ্য

কাগজের উপাদান আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ইহা সাফল্যলাভ করিলে ভারতের কারখানাগুলির কাঁচামালের অভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। ভারতে প্রধানতঃ বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্তুত হয়। আসাম ও কেরলের অরণ্যে প্রচুর বাঁশ পাওয়া যায়। বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গেও বাঁশ উৎপন্ন হয়। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই বাঁশ যথেষ্ট নহে। সাবাই ঘাস হইতেই ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়। সাবাই (Sabai) ঘাস মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং চেষ্টা করিলে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো চলিতে পারে। নৈহাটি অঞ্চলের কাগজের কলে কাগজ প্রস্তুতের জন্য বাঁশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টিটাগড়ের কাগজ প্রধানতঃ বাঁশের মণ্ড হইতেই প্রস্তুত হয়। কাগজ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অগ্রগণ্য। এখানে টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটী, রাণীগঞ্জ ও কুন্তীঘাটে (ত্রিবেণী) কাগজের কল আছে। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার বাঁশ ও ঘাস পশ্চিমবঙ্গের কলগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের ক্রমবর্ধমান কাগজ শিল্পের জন্য প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন। কষ্টিকসোডা, ব্লিচিংপাউডার, সল্টকেক্ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য এখন এদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইলেও বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা এখনও রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, যানবাহনের অসুবিধা এবং বিদ্যুৎশক্তির অভাবও বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। ভারত সরকারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ-নীতির ফলে ভারতীয় কাগজের চাহিদা দেশে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে বর্তমানে যথেষ্ট নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হয় না। তবে উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের হিমালয়াঞ্চলের নিকটে সস্তায় খবরের কাগজ ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার জন্য স্প্রুস ও ফার গাছের কাঠ লাগে। দেবদারু কাঠ এবং আখের ছিপড়া লইয়াও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি-বৎসরে যে বিপুল পরিমাণ পাটকাঠি উৎপন্ন হয় তাহাও কাগজ শিল্পে ব্যবহার করার চেষ্টা চলিতেছে। ফেলিয়া দেওয়া তুলা ও কাপড় হইতে ভাল কাগজ ও হাতে প্রস্তুত কাগজ হইতে পারে। নানাস্থানে কুটীরশিল্পের অন্তর্গত এরূপ কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

**Q. 63. Write a brief account of Indian glass industry.**
**[ ভারতের কাঁচশিল্পের বর্ণনা দাও। ]**

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের উত্তর প্রদেশে কাঁচের চুড়ি ও শিশি বোতল প্রস্তুত একটি সুবিখ্যাত গৃহশিল্পরূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতে আধুনিক উন্নত ধরণের কাঁচশিল্পের প্রতিষ্ঠা অল্পদিন হইয়াছে। এখন ভারত কাঁচ সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চশমার কাঁচ, জানালার কাঁচ প্রভৃতি জার্মানী, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম হইতে কিছু পরিমাণে আমদানি করা হইত।

কাঁচ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বালুকা এবং বহু প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, সুদক্ষ কারিগর ও আধুনিক যন্ত্রাদি। কলিকাতার নিকটে যাদবপুরে কাঁচ ও চীনামাটির দ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। যাদবপুরে ও দুর্গাপুরে চশমার কাঁচ প্রস্তুত হইতেছে। ভারতে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের কাঁচ, "শিট কাঁচ" প্রভৃতি উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমদানিও কমিতেছে। আসানসোলের নিকট "শিট কাঁচের" একটি বিরাট কারখানা চালু হইয়াছে। দুর্গাপুরে একটি বীক্ষণ কাঁচের কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ভারতে মাইক্রস্কোপ প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। কাঁচশিল্পের কাচামালের সহজ লভ্যতার জন্য বড় বড় কারখানাগুলি কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের নিকটস্থ অঞ্চলে এবং বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর-প্রদেশের প্রাচীন "ব্যাঙ্গেল" শিল্পকেও ক্রমশঃ উন্নত করা হইতেছে। বর্তমানে ভারতের কাঁচ দ্রব্য প্রস্তুতের ২২৫টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারখানা আছে। উহাদের মোট উৎপাদন এক লক্ষ টনের অধিক এবং মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১০ কোটি টাকার অধিক।

**Q. 64. Write short notes on the following industries of India—(1) Woollen industry and (2) Leather industry.**

**[ ভারতের নিম্নলিখিত শিল্পগুলি সম্পর্কে ক্ষুদ্র টীকা লিখ—(১) পশম-শিল্প (২) চর্মশিল্প।]**

(১) **পশমশিল্প**—ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মেষ আছে এবং বৎসরে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়। ভারতীয় পশম দৈর্ঘ্যে ছোট বলিয়া ইহাতে কেবল কম্বল ও কার্পেট প্রস্তুত হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে কিছু পরিমাণে দীর্ঘ তন্তু পশম উৎপন্ন হয়। উহা হইতে শাল ও জামার কাপড় প্রস্তুত হয়। তবে ভারতে যে ২৪টি আধুনিক ছোট বড় পশমের কারখানা আছে তাহাদের জন্য ভাল জাতের পশম প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি করা হয়। ভারতের পশমের কারখানাগুলি বেশিরভাগই কানপুরে এবং ধারিওয়ালে অবস্থিত। পাঞ্জাবে মোট ২৬টি পশমের কারখানা আছে; কুটীর শিল্প হিসাবে এই শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারত হইতে কার্পেট, শাল ও কম্বল নানা দেশে রপ্তানি হয়, আবার উচ্চশ্রেণীর পশমজাত দ্রব্য আমদানিও করা হয়।

(২) **চর্মশিল্প**—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গরু ভারতেই আছে। প্রতি বৎসর এদেশে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ গরুর চামড়া, পঞ্চাশ লক্ষ মোষের চামড়া, এবং প্রায় আটত্রিশ লক্ষ ভেড়া ও ছাগলের চামড়া পাওয়া যায়। ভারতের চর্মশিল্প দুই প্রকারের; যথা—(১) গ্রামের চামাররা নানা প্রকার উদ্ভিদের

রসের সাহায্যে আধা পাকানো (Semi-Tanned) চামড়া প্রস্তুত করে। (২) কানপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানের আধুনিক বড় বড় কারখানায় বাবলার ছাল এবং হরিতকীর রসের সাহায্যে এবং ক্রোমিয়াম ও এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সাহায্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাকা চামড়া প্রস্তুত করা হয়। ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০।৫০ কোটি টাকার চামড়া এবং চামড়ার জুতা প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। ভারতীয় ছাগচর্ম বিশ্ববিখ্যাত। ভারতে বৎসরে প্রায় দশ কোটি জোড়া জুতা এবং লক্ষ লক্ষ ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ভারতীয় চর্মজাত দ্রব্য ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে।

**Q. 65. What raw materials are required for the chemical industry of India? Where and to what extent are they found in India? Also, give the present position of these industries.**

[ ভারতে রাসায়নিক শিল্পে কি কি কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়? ভারতে এগুলি কোথায় কতটা পাওয়া যায়? এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা কিরূপ? ]

**রাসায়নিক শিল্প**—বিভিন্ন শিল্পের জন্য বহু প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন হয়। ঐগুলি না হইলে কোন শিল্প চলিতে পারে না। সুতরাং, রসায়ন শিল্প ভারতের এক মূল শিল্প ( basic industry ) হিসাবে পরিগণিত। বিগত দশ বৎসরে ভারতে রসায়ন শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে। রসায়নশিল্পকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) ভারী রসায়ন ও (২) হাল্কা রসায়ন। প্রথম শ্রেণীতে সালফিউরিক প্রভৃতি এ্যাসিড, ব্লিচিং পাউডার, কসটিক সোডা, সোডাএ্যাস, অন্যান্য নানা প্রকার এ্যালক্যালি, ক্লোরিণ প্রভৃতি রহিয়াছে। এগুলি প্রচুর পরিমাণে ও সস্তা দামে উৎপন্ন করা প্রয়োজন। কারণ, এগুলির সস্তা মূল্য ও সহজ লভ্যতার উপর কাগজ, রং, সিমেণ্ট, ঔষধ, কার্পাস, রেয়ন, সাবান, কাঁচ প্রভৃতি প্রায় সকল শিল্পেরই উন্নতি নির্ভর করে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঔষধ, রং, ফটোগ্রাফারের দ্রব্য প্রভৃতি রহিয়াছে। এগুলি প্রস্তুত করিতে অধিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়। নিম্নে কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের বিষয় আলোচনা করা হইল :—

**সালফিউরিক এ্যাসিড** শিল্প রসায়ন শিল্পগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। ভারতে খনিজ গন্ধক পাওয়া যায় না। সুতরাং, এই শিল্পটি কাঁচামালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। প্রায় ৪০টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারখানায় ইহা প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ কারখানাই পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত। লৌহ ও তাম্র শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবেও সামান্য সালফিউরিক এ্যাসিড উদ্ধার করা হয়। রসায়নের মধ্যে ইহাই প্রধানতম এবং যে কোন শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য। অপর

**দুই প্রকার ভারী রসায়ন হইল এ্যালক্যালি** ( যথা—সোডাএ্যাস ও কষ্টিক সোডা ) এবং **সার** ( যথা—সালফেট অফ এমোনিয়া প্রভৃতি )। ভারতে ভারী রসায়ন প্রস্তুতের উপকরণের অভাব নাই। এদেশে প্রচুর লবণ, চুন ও জিপসাম রহিয়াছে।

ভারতে প্রয়োজনীয় রসায়নের অধিকাংশই এখন এদেশে প্রস্তুত হয়। এইগুলির উৎপাদন খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গুজরাট উপকূলে লবণের উপর নির্ভর করিয়া বিখ্যাত **টাটা কেমিক্যালস্** গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার **বেঙ্গল কেমিক্যালস্**ও বিখ্যাত। তাহা ছাড়া বরোদা, পুণা, দিল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানেও অনেকগুলি ছোট বড় রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা আছে। দিল্লীতে একটি বড় **ডি. ডি. টির** কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কেরলে একটি এইরূপ কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

তাহা ছাড়া, ভারতে ইলেকট্রো কেমিক্যাল দ্রব্য ( যথা—কার্বাইড, ব্যাটারি ), খনিজ তৈল এবং কয়লা হইতেও রসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ট্রম্বে পেট্রো কেমিক্যাল শিল্পের বড় কেন্দ্র।

**লঘু রসায়ন শিল্প** ( Light Chemicals ) ভারতে অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। নানা প্রকার ঔষধের বিষয়ে ভারত বর্তমানে যে কেবল স্বয়ংপূর্ণ তাহাই নহে, প্রচুর রপ্তানিও করিতেছে। U. N. O-র আনুকূল্যে পুণার নিকট পেনিসলিন ও ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। হৃষিকেশ এবং বরোদায় বড় বড় ঔষধের কারখানা আছে। ভারতে রংশিল্প এখনও আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। তবে ইদানিং বহুপ্রকার রং ভারতেই প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতার নিকট বহু রং এর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা খনি অঞ্চলে এই শিল্প গড়িয়া উঠার খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতে সম্প্রতি খনিজ তৈল হইতে বহুপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই কারখানাগুলি বোম্বাইয়ের নিকট ট্রম্বেতে এবং ডিগবয় ও বিশাখাপত্তনমে অবস্থিত। ভারতে বর্তমানে ক্যালসিয়াম্ কারবাইড এবং বহু প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য ( বিহারের গোমিয়াতে ) প্রস্তুত হইতেছে।

**Q. 66. What do you know of the fertilizer industry of India ?**

**[ ভারতের সারশিল্প সম্পর্কে কি জান ? ]**

**খনিজ সারশিল্প** ( Fertilizer industry )—ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ভারতে স্বাভাবিক খনিজ সার ( যথা—নাইট্রেট, পটাস প্রভৃতি ) নাই বলিলেই চলে। সুতরাং, নানা প্রকার খনিজ হইতে কৃত্রিম সার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কেরলের আলোয়েতে প্রথম সারের কারখানাটি

স্থাপিত হয়। পরে বিহারের সিন্ধ্রিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজস্থানের জিপসাম ও বিহারের কয়লার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ এ্যামোনিয়াম-সালফেট, সুপার সালফেট প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কারখানায় প্রত্যহ ১০০০ টন সার ও প্রচুর গ্যাস প্রস্তুত হয়। এখানে কোক ব্যাটারিও আছে এবং নিকটেই সার শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবে সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতেছে। এই কারখানাটিকে আরও বড় করার কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। ইউরিয়া, ডবল সল্ট প্রভৃতি কয়েকপ্রকার নূতন সারও উৎপন্ন হইতেছে। এপাটাইট নামক খনিজ হইতে ও জন্তুর হাড় হইতে ফসফেট প্রস্তুতের চেষ্টাও হইয়াছে। ভারতে জমির ফসল বাড়াইতে হইলে প্রচুর পরিমাণে সারের প্রয়োজন হইবে। পাঞ্জাবের নাঙ্গালে আর একটি খুব বড় সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রাউরকেলায় এবং তামিলনাড়ুর নেভেলিতেও দুইটি খুব সারের বড় কারখানা সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। রাউরকেলার কারখানাটি ১৯৬২ সেপ্টেম্বরে চালু হয়। ইহার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০০ টন। এই কারখানা রাউরকেলা ইস্পাত কারখানার উপজাত গ্যাস ও অক্সিজেন হইতে এ্যামোনিয়া নাইট্রেট সার প্রস্তুত করে। পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরেও সারের কারখানা আছে। ইহা ছাড়া ট্রম্বে, নাহারকাটিয়া, গোরক্ষপুর এবং সিন্ধারেণীতেও বড় বড় সারের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ইরাণ হইতে তরল ন্যাপথা (পেট্রোলজাত) আমদানি করিয়া পশ্চিম ভারতের তটভাগে অনেকগুলি বড় বড় সারের কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। বর্তমানে ভারতে যত রাসায়নিক সার দরকার হয় তাহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভারতে উৎপন্ন হয়—অবশিষ্টাংশ আমদানি করিতে হয়। বৎসরে ১৫০ কোটি টাকার [illegible] এইভাবে বিদেশে চলিয়া যায়। তবে নূতন কারখানাগুলি চলিতে থাকিলে অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয়। এদেশে সারের চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং শিল্পটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

---

# পরিবহণ, নগর ও বন্দর

## TRANSPORT, CITIES AND PORTS

**Q. 67. Give an account of the railways of India. What are the benefits of the zonal arrangement of the Indian Railways ?**

[ ভারতের রেলপথ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। ভারতের রেল-ব্যবস্থার আঞ্চলিকরণের কি সুফল হইয়াছে ? ]

**রেলপথ** ( Railways )—১৮৫৩ সাল হইতে ক্রমশঃ ভারতের সর্বত্র রেলপথ স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে ভারতের রেল-ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ। বর্তমান ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বেশির ভাগই রেলপথের উপর নির্ভর করিয়া চলিয়াছে। প্রথমে সামরিক প্রয়োজনেই ভারতে রেলপথ তৈয়ারি করা হয়। কিন্তু ক্রমশঃ অর্থনৈতিক দিক দিয়া রেলপথগুলি লাভজনক হইয়া উঠে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে ভারতে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটারের মত।

**পুনর্বিন্যাস** (Regrouping) —১৯৫২ সালে ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রেলপথকে একত্র করিয়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হইয়াছে :—

| রেলপথের বিভাগ | সদর দপ্তর |
|---|---|
| ১। উত্তরাঞ্চলীয় রেলপথ—N. Rly. ( পাঞ্জাব, উঃ প্রদেশ ) | দিল্লী |
| ২। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ—N. E. Rly. (উঃ বিহার, পূর্ব উঃপ্রদেশ) | গোরক্ষপুর |
| ৩। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ—N. E. F. R. ( আসাম, উঃ বঙ্গ ) | পাণ্ডু |
| ৪। পূর্ব রেলপথ—E. Rly ( পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ) | কলিকাতা |
| ৫। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ—S. E. Rly. (পঃ বঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র) | ঐ |
| ৬। দক্ষিণাঞ্চলীয় রেলপথ—S. Rly. (মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কেরল, মহীশূর) | মাদ্রাজ |
| ৭। পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথ—W. Rly. ( গুজরাট, রাজস্থান ) | বোম্বাই |
| ৮। মধ্যাঞ্চলীয় রেলপথ—C. Rly. ( মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ) | ঐ |
| ৯। মধ্য-দক্ষিণাঞ্চলীয় রেলপথ—S. C. Rly ( মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ) | সেকেন্দ্রাবাদ। |

এছাড়া আজমীড়কে কেন্দ্র করিয়া দশম রেল অঞ্চলটি গঠিত হইবে।

ভারতীয় রেলপথগুলির বিজ্ঞানসম্মত আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস জাতীয় জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ দুইটি কারণে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশীয় রাজ্যগুলির স্বয়ংশাসন ব্যবস্থার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন রেলপথ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসায় এক নূতন সমস্যার সূত্রপাত হয়। ইহার সমাধানের জন্য পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণের মতে ভারতীয় রেলপথগুলিকে অন্যান্য উন্নত দেশের রেল-ব্যবস্থার মত আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করা হইলে গাড়ী চলাচল অধিক কার্যকরী করা যাইতে পারে এবং নানাদিক দিয়া ব্যয় হ্রাস এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে। এই সকল উদ্দেশ্য লইয়াই পুনর্বিন্যাস করা হয়। তাহা ছাড়া ভারতীয় রেলপথগুলিতে তিনপ্রকার গেজ (broad, meter and narrow gauge) আছে। ইহাতে নানা অসুবিধা হয়। প্রচলিত নূতন ব্যবস্থায় কোন কোন অঞ্চলকে এক এক প্রকার গেজের রেলপথ পৃথক দেওয়া হইয়াছে। ইষ্টার্ণ রেলপথে প্রায়ই সবই ব্রডগেজ লাইন; অপর পক্ষে নর্থ ইষ্টার্ণ রেলপথ এবং নর্থ ইষ্ট ফ্রন্টিয়ার রেলপথ প্রধানতঃ মিটার গেজ লইয়া গঠিত। এই ব্যবস্থার ফলে মালগাড়ি চলাচল দ্রুততর হয় এবং রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কম হয়। বর্তমানে ভারত সরকারের নীতি হইল ন্যারো গেজ রেলপথগুলিকে ক্রমশঃ মিটার বা ব্রড গেজে পরিণত করা। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতীয় ইউনিয়নের রেলপথের মোট পরিমাণ নিতান্তই কম। সুতরাং, ভারতে বর্তমানে আরও অধিক রেলপথ স্থাপন করা প্রয়োজন।

**Q. 68. Give an account of India's Railway zones. Mention the chief industries of each zone.**

[ভারতের রেলপথ অঞ্চলগুলির বর্ণনা দাও। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান শিল্পগুলির বিবরণ দাও।]

(পূর্ববর্তী ৬৭নং প্রশ্নোত্তর লিখিয়া পরে নিম্নাংশ যোগ কর)

ভারতে বর্তমানে মোট নয়টি রেল-অঞ্চল আছে। আর একটি গঠিত হইতেছে।

(১) উত্তরাঞ্চলীয় রেলপথ (N. Rly.)—এই রেলপথের উপর নির্ভর করিয়া পাঞ্জাব ও দিল্লীর বস্ত্র, পশম প্রভৃতি শিল্পগুলি গঠিত হইয়াছে। শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে অমৃতসর, লুধিয়ানা ও দিল্লী অন্যতম। কানপুর এই অঞ্চলের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র। দিল্লী এই রেলপথের সদর দফতর।

(২) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ (N. E R.)—উত্তর-পূর্ব রেলপথের প্রধান শিল্প হইল উত্তর বিহারের চিনিশিল্প। তরাই, নেপাল ও কুমায়ুন অঞ্চলের বনজ সম্পদ বহনের ইহাই উল্লেখযোগ্য পথ। গোরক্ষপুর ইহার সদর দফতর।

(৩) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (N E. F. R.)—এই রেলপথটি আসাম ও উত্তরবঙ্গের আর্থিক সম্পদ সংগ্রহ ও উন্নয়নের কার্যে সাহায্য করিতেছে। প্রধান

শিল্প চা ও পেট্রোলিয়াম শিল্প। জলপাইগুড়ি, ডিব্রুগড়, গৌহাটি ও ডিগবয় এই পথের প্রধান শহর।

(৪) পূর্ব রেলপথ (E. R.)—এই রেলপথটি ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্য দিয়া গিয়াছে। আসানসোলকে কেন্দ্র করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং, এ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি শিল্প গঠিত হইয়াছে। কুলটি, বার্ণপুর, কুমারধুবি, রূপনারায়ণপুর, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে নানা প্রকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা ও হাওড়ার সুবিশাল শিল্পাঞ্চল পূর্বরেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে পাট, কার্পাস, রসায়ন, কাগজ, চর্ম, রবার, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, ছোটনাগপুরের খনিজ সম্পদ পরিবহণের ইহা অন্যতম পথ। সদর দপ্তর কলিকাতা।

(৫) দক্ষিণ পূর্ব-রেলপথ (S. E. R.)—এই রেলপথের উপর ভারতের প্রধান ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র জামসেদপুর এবং নূতন ইস্পাত কারখানা রাউরকেলা ও ভিলাই অবস্থিত। তাহা ছাড়া এই রেলপথ বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ বহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহা কলিকাতার সঙ্গেও যুক্ত। কলিকাতা সদর কার্যালয়।

(৬) দক্ষিণাঞ্চলীয় রেলপথ (S R.)—এই রেলপথের উপরে বহু শিল্প আছে। তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও মাদুরাইয়ের কার্পাসশিল্প, বাঙ্গালোরের বৈদ্যুতিক যন্ত্র, মেশিনটুলস ও বিমান শিল্প এবং ভদ্রাবতীর ইস্পাত কারখানা প্রধান। মাদ্রাজ ইহার সদর কেন্দ্র।

(৭) মধ্যাঞ্চলীয় রেলপথ (C. R.)—এই রেলপথের উপর মহারাষ্ট্রের অনেকগুলি কার্পাস বয়ন কারখানা অবস্থিত। তাহা ছাড়া ইহা চামড়া, তৈলবীজ, সিমেন্ট প্রভৃতিও বহন করে। এই অঞ্চলের কাঁচামাল ও শিল্পিত পণ্যের আদান-প্রদানের কার্য ইহার উপরই ন্যস্ত। বোম্বাই ইহার সদর কার্যালয়।

(৮) পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথ (W. R.)—এই রেলপথ গুজরাট ও রাজস্থানের মধ্যেই প্রধানতঃ অবস্থিত। ইহার উপর আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প অবস্থিত। তাহা ছাড়া ওখা বন্দরে রাসায়নিক শিল্প, এবং লবণ শিল্পও এই রেলপথের আওতায় পড়ে। বোম্বাই ইহার কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

(৯) মধ্য-দক্ষিণ রেলপথ (S. C. Rly)—মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের কতকাংশ লইয়া ইহা গঠিত। প্রধান শিল্প কার্পাস ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। ইহার সদর কেন্দ্র সেকেন্দ্রাবাদ।

কলিকাতার পাটশিল্প, বোম্বাইয়ের কার্পাসশিল্প, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ শিল্প, দিল্লীর বস্ত্রশিল্প ও নাগপুরের বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি একাধিক রেল অঞ্চলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

**Q 69. Describe the Assam Link Railway. What are its economic potentialities ?**

[ আসাম-সংযোগ রেলপথের বর্ণনা দাও। ইহার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কিরূপ ? ]

**আসাম রেল সংযোগ**—ভারত বিভাগের ফলে যে সকল গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছিল আসাম ও পশ্চিম বাংলার একদা খণ্ডিত উত্তরাংশের (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলা) সহিত ভারতের মূল অংশের যোগাযোগ রক্ষা ছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া একটি অপ্রশস্ত "করিডর"ই আসাম ও ভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে একমাত্র স্থল সংযোগ। এই অপ্রশস্ত অংশ আবার হিমালয় পর্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদ-পর্বতমালা দ্বারা দুর্গম ও দুরতিক্রম্য হইয়াছে। পূর্বে ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আসামে যাইতে হইলে রেলপথে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া যাইতে হইত। বর্তমানে ভারত সরকার নিজ এলাকার মধ্য দিয়া আসাম সংযোগ রেলপথ নির্মাণ করিয়াছেন। মাল ও যাত্রীবাহী ট্রেণগুলি এখন নিয়মিতভাবে এই পথে যাতায়াত করিতেছে। ১৯৫৮ সালে রেল-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের ফলে ইহা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে এই রেলপথটি শুরু হইয়াছে। আসামগামী ট্রেণ শিয়ালদহ হইতে বোলপুর হইয়া ফারাক্কা যায়। সেখানে স্টিমারে গঙ্গা পার হইয়া ওপারে খেজুরিয়াতে ব্রডগেজ ট্রেনে চাপিতে হয়। ট্রেন বদলাইয়া এই পথে নিউজলপাইগুড়ি হইয়া আসামে বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই রেলপথের প্রায় সমান্তরাল একটি মিটার গেজ রেলপথও কাটিহার ও শিলিগুড়ি হইয়া গৌহাটি গিয়াছে। ব্রডগেজে কলিকাতা হইতে গাড়ি বদল না করিয়াই ১৯৭০-৭১ সালে গৌহাটি যাওয়া যাইবে।

বর্তমানে ফারাক্কা ও খেজুরিয়াঘাট হইয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত ব্রডগেজ ট্রেন চলিতেছে। এই পথে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি যাইতে অনেক কম সময় লাগে ; ফারাক্কায় পুল হইলে সময় আরও কম লাগিবে। শিলিগুড়ি হইতে বাগরাকোট পর্যন্ত নূতন মিটারগেজ লাইন বসান হইয়াছে। এই পথে তিস্তার উপর একটি বিরাট সেতু নির্মাণ করিতে হয়। বাগরাকোট হইতে মাদারিহাট পর্যন্ত আর একটি মিটারগেজ লাইন বসান হইয়াছে ; উহার পর হাসিমারা পর্যন্ত নূতন রেলপথ তৈয়ারি হইয়াছে। হাসিমারা হইতে আলিপুর দুয়ার পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ পূর্বেই ছিল। আলিপুরদুয়ার হইতে ফকিরাগ্রাম পর্যন্ত মিটারগেজ রেলপথ তৈয়ারি হইয়াছে। ফকিরাগ্রাম হইতে রঙ্গিয়া হইয়া আমিনগাঁওএ ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পাণ্ডু পৌছাইলে ( এখানে ব্রহ্মপুত্র সেতুর উপর দিয়া ট্রেন চলে ) আসামের এই অঞ্চলে যাতায়াত করিতে আর কোন গাড়ী বদল করিতে হয় না।

এই রেলপথ সম্পূর্ণ হওয়াতে দার্জিলিং ও আসামের চা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া কলিকাতায় আসিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, আসামের বিপুল কৃষিজ সম্পদ ও খনিজ তৈল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিনা বাধায় আসিতে পারে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন ছাড়াও অর্থ নৈতিক দিক হইতেও এই রেলপথ আজ একান্ত প্রয়োজনে লাগিতেছে। ভারত বিভাগের সময় আসামের অধিবাসীদের মনে যে আতংকের সঞ্চার হইয়াছিল, এই রেলপথ দ্রুত সমাপ্ত হওয়ায় তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে। সুতরাং, এই রেলপথকে আমরা আসামের অর্থ নৈতিক মুক্তির পথ বলিতে পারি। দুঃখের বিষয় বর্ষাকালে কয়েক মাস প্রবল বন্যার আঘাতে এই অতি প্রয়োজনীয় যাতায়াত ব্যবস্থা বারে বারে ব্যাহত হয়।

**Q. 70 How far Indian Railways are responsible for the economic development of the country? Do you think more attention should now be paid towards the development of road and river transport in India?**

[ভারতের আর্থিক উন্নয়নে রেলপথের অবদান কত দূর? এখন রাস্তা এবং জলপথ উন্নয়নের উপরে অধিক জোর দেওয়া উচিত মনে কর কি?]

ভারতে রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে দেশের এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের প্রায় কোন যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আর্থিক সম্পদগুলিকে একত্রিত করিবার কোন উপায়ও ছিল না। এমন কি, বর্তমান যুগের জাতীয়তাবোধের উন্মেষও রেলপথ স্থাপনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং রেলপথকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নবযুগের প্রবর্তক বলিয়া গণ্য করা যায়।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার রেলপথ রহিয়াছে। কিন্তু দেশের বিশাল আয়তনের তুলনায় ইহা মোটেই যথেষ্ট নহে। এখনও মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও হিমালয় পর্বতমালার অনেক স্থানে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র রেলপথের প্রসারের অভাবেই ব্যবহৃত হইতেছে না। শিল্পাঞ্চলগুলিতেও রেলপথ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় রেলপথগুলির কতকগুলি অসুবিধার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বহুস্থানেই যথাযথ জল নিকাশের পথ না থাকায় বন্যায় রেলপথ ডুবিয়া যায়। তিন প্রকার 'গেজ' থাকায় দ্রব্যাদির স্থানান্তর অনেক ক্ষেত্রেই সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে।

ভারতের নানাস্থানে খাদ্য ঘাটতির সময় ভারতীয় রেলপথগুলির উপযোগিতা বুঝা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে অনাবৃষ্টির ফলে পর্যায়ক্রমে উত্তর বিহার, পূর্ব-

উত্তরপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, রায়লসীমা ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে যে খাদ্যাভাব হইয়াছিল তাহা কেবলমাত্র রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতার জন্যই বৃহত্তর বিপর্যয়ে পরিণত হয় নাই। সুতরাং, বর্তমানে রেলপথই যে ভারতের প্রধানতম যোগাযোগ ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন উন্নত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কেবলমাত্র রেলপথের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। এক জাতীয় পরিবহণের উপর নির্ভর করা কেবল যে বিপজ্জনক তাহাই নহে উহা এক প্রকার অসম্ভব।

ভারতে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য বর্তমানে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারের বেশি। লক্ষ লক্ষ মোটর যান এই সকল রাস্তায় চলাচল করিতে পারিবে। ভারতের প্রধান অভাব দীর্ঘ পথের ( Trunk Road ) এবং শাখা পথের (Feeder Road)। এগুলি দেশরক্ষার জন্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে জাতীয় রাজপথ পরিকল্পনা ( National Highway Scheme ) গ্রহণ করা হইয়াছে। উহা কাজে পরিণত হওয়ার ফলে এখন কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী ও নাগপুর পরস্পর পরস্পরের সহিত রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও বহু নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ করিতেছেন। এগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(১) রাজ্যগুলির নিজস্ব রাজপথ ( State highway ) এবং (২) যোগাযোগ রক্ষাকারী রাজপথ ( feeder road )। শেষোক্ত পথগুলি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক-গুলিতে নির্মিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কয়েক বৎসরে ভারতে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় অসাধারণ প্রসার হইয়াছে।

ভারতে প্রথম শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ জলপথের একান্ত অভাব। উত্তর ভারতের নদীগুলি স্থানে স্থানে বারমাসই ছোট ছোট নৌকা ও ষ্টীমার চলাচলের উপযোগী থাকিলেও পূর্বের মত নদীপথে এখন আর অধিক দূর যাওয়া যায় না। কারণ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদীতে এত বালুচর পড়িয়াছে যে, নৌবাহন ক্রমশঃ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই নদীগুলিকে জলযান যাতায়াতের উপযোগী করিতে হইলে বহু অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন। সম্প্রতি এক পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা হইতে কানপুর পর্যন্ত নৌচালন প্রবর্তনের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা কার্যকারী হইলে ভারতের রেলপথের উপর ন্যস্ত গুরুভার কিছু পরিমাণে লাঘব হইবে এবং সস্তায় পণ্য চলাচলেরও ব্যবস্থা হইবে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিতে বারমাস জল থাকে না। সুতরাং, ঐগুলি নৌবাহনযোগ্য করিয়া তোলা অধিক ব্যয়সাধ্য। বর্তমানে মহানদী, নর্মদা, গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর নিম্নপ্রবাহ অঞ্চলে নৌচলাচল ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বটে

কিন্তু তাহা অত্যন্ত নগণ্য। অথচ ঐ সকল নদীর উচ্চ প্রবাহ নানা প্রকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কেবলমাত্র সুলভ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবেই উহাদের কাজে লাগানো সম্ভব হইতেছে।

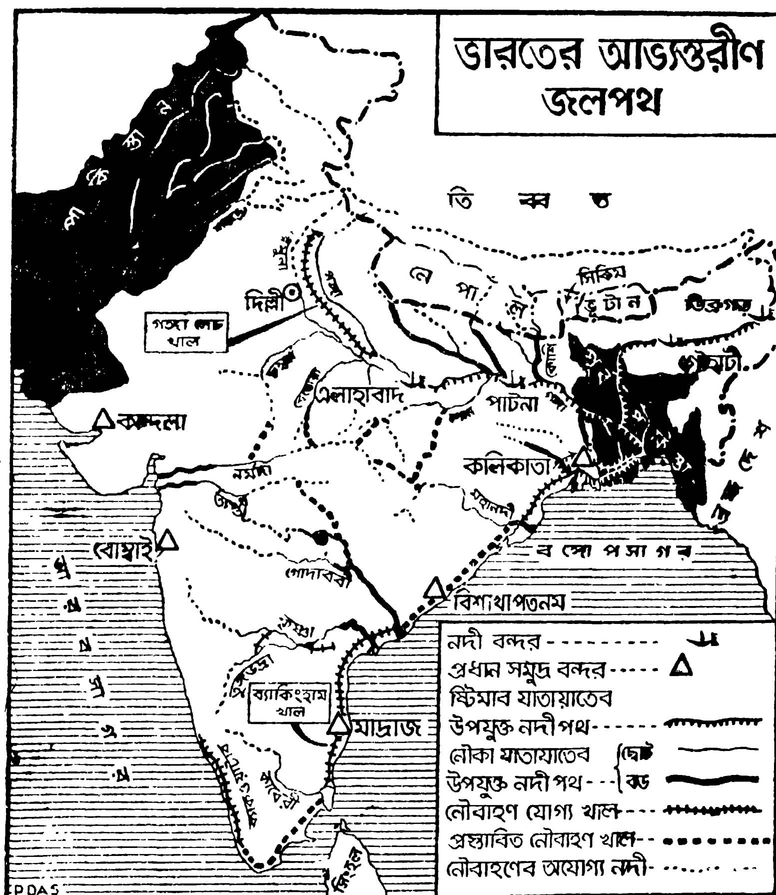
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতে রেলপথের যে উন্নতি হইয়াছে নদীপথের সেইরূপ উন্নতি হয় নাই। অবশ্য বর্তমানে রাস্তা প্রস্তুতের কাজ খুব দ্রুতহারে অগ্রসর হইতেছে। বর্তমান যুগে ঐ তিন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়েই আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে। কৃষিজ দ্রব্য পরিবেষণের জন্যও এই তিন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থার জন্য বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভারতের মত বিশাল দেশের বণ্টন ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

**Q 71. What do you know of the inland navigation system in India? Do you think more attention should be paid to the development of the inland waterways of India?**

**[ ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান? ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের জন্য এখন অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত মনে কর কি? ]**

**আভ্যন্তরীণ জলপথ** ( Inland Waterways )—ভারতের রেলপথের পরেই বর্তমানে নদী ও খালপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভারতের নাব্য নদী-পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬০০০ মাইল। নদীপথের অধিকাংশই উত্তর ভারতে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি নদীই বেশ গভীর ও বার মাস জল থাকায় বড় বড় নৌকা ও নদীর উপযোগী জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। গঙ্গা প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলার পরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সহিত গঙ্গানদীর মিলন ঘটায়, বাংলা, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের সহিত নদীপথে আসামের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতের শ্রেষ্ঠ নৌবাহনযোগ্য নদী। পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে আসাম যাইবার ইহাই উৎকৃষ্ট নদীপথ। দুঃখের বিষয় এখন এই পথ বন্ধ। বিভিন্ন নদীর সহিত খালগুলি মিশিয়া জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি খুব গভীর না হওয়ায় কেবলমাত্র নিম্নাংশেই নৌচালন সম্ভব হয়। ভারতের নদীপথগুলির উন্নতি সাধন করা এবং নদী ও খালগুলির মজিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার নৌবাহন সমস্যা চরমে পৌছিয়াছে। নদীগুলি ক্রমশঃ মজিয়া যাওয়ায় ষ্টিমার কোম্পানীগুলি আর তাহাদের দীর্ঘকালের সার্ভিসগুলি চালু রাখিতে পারিতেছে না।

বর্তমানে ভারত সরকার গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীকে নৌবাহনযোগ্য করিয়া তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে গঙ্গার উপর কয়েকটি আধুনিক নদীবন্দর গঠন করা হয়। ফরাক্কায় বাঁধ নির্মাণ ও ভাগীরথীর উৎস উন্নয়ন কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে।




দক্ষিণ ভারতের তটভাগে বহু উপহ্রদ ও স্বাভাবিক খাল (backwater) থাকায় মাদ্রাজ, কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ সকল খাল দ্বারা সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতে আধুনিক নৌবাহনযোগ্য খাল খুব কম। পশ্চিমবঙ্গ ও

উড়িষ্যার মধ্যে প্রাচীন চাঁদবালি খাল ও মাদ্রাজের বাকিংহাম খাল উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার উপকণ্ঠেও কতকগুলি নৌবাহনযোগ্য খাল আছে। ভারত সরকার সম্প্রতি ভারতের জলপথ উন্নয়নের এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উপকূল বরাবর চাঁদবালি খাল, বাকিংহাম খাল ও ব্যাকওয়াটার-গুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে। ফলে মাদ্রাজ, কোচিন ও কলিকাতার মধ্যে খাল মারফত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মধ্য ভারতের মালভূমির উপর দিয়া কতকগুলি খাল খনন করার পরিকল্পনাও রহিয়াছে। শোন ও নর্মদা নদীদ্বয়কে যুক্ত করার পরিকল্পনা রহিয়াছে। মহানদী ও নর্মদা সংযোজক খাল বঙ্গোপসাগর হইতে খালপথে আরব সাগরে যাইবার সুনাব্য পথ সৃষ্টি করিবে। অবশ্য এজন্য বহু-লকগেট স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার জন্য অর্থের সংস্থান হওয়াও সহজ নহে। এই পরিকল্পনা কখনও কার্যে পরিণত করা হইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ভারতীয় নদীগুলির জল নৌবাহনের জন্য ব্যবহার করা অপেক্ষা সেচের জন্য ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

**Q. 72. What do you know of the present condition of road transport in India? What is meant by National Highway Scheme?**

**[ভারতে পথ পরিবহণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ? জাতীয় রাজপথ পরিকল্পনা কাহাকে বলে?]**

**স্থলপথ** (Road System)—ভারতে মোট ৫½ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা আছে। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ কিলোমিটারের কিছু বেশি (সর্ব প্রকার রাস্তা ধরিয়া) পাকা রাস্তা। গ্রামীণ এলাকায় ভারত প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান; সুতরাং ঐ অঞ্চলের পক্ষে স্থলপথের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু নানাকারণে স্থলপথের তেমন কোন উন্নতি হইতে পারে নাই, তাহার উপর আবার স্থানে স্থানে রেলপথের পাশাপাশি পাকা রাস্তা অবস্থিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে রেলপথ ও স্থলপথ পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায় দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারে। বর্তমানে অনেক স্থানে ন্যারোগেজ রেলপথের পরিবর্তে ভাল পাকা রাস্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

**জাতীয় রাজপথ পরিকল্পনা** (National Highways)—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অন্তর্গত জাতীয় ও রাজ্য-রাজপথ পরিকল্পনা (National and State Highway Scheme) অনুসারে কার্য চলিতেছে। জাতীয় রাজপথ

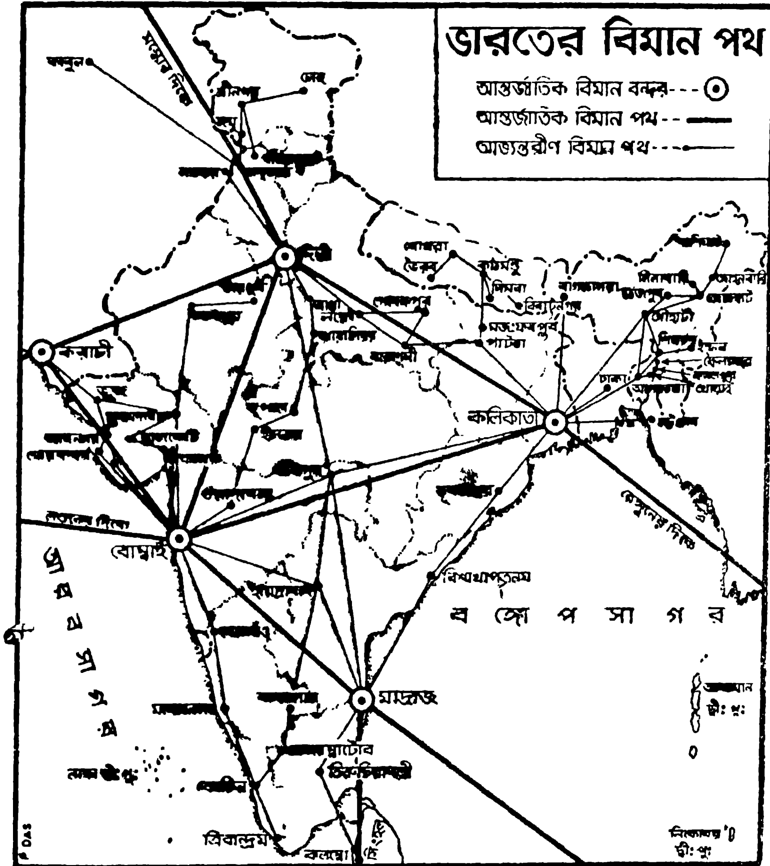
পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও নাগপুর রাজপথ দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু পাকা রাস্তা ( State Highways ) প্রস্তুত হইয়াছে। এইগুলি হইতে আবার বহু শাখা পথ ( feeder roads ) গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও বহু নূতন নূতন সড়ক প্রস্তুত হইতেছে। গ্রাম্য জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিতে রাস্তার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। রেলপথ স্থাপন অধিক ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া গ্রামাঞ্চলে উহা অধিক কার্যকরী হইতে পারে না। দেশরক্ষার জন্যও ভাল পথ থাকার একান্ত দরকার। এই জন্যই পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের মধ্যে পাঠানকোট-জম্মু রোড নির্মাণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার ও নেপালের মধ্যে এবং নেফা, কুমায়ুন ও লাদাক এলাকায় ভারত ও তিব্বত সীমান্তেও পথ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আসাম ও ত্রিপুরার মধ্যে পার্বত্য পথের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথে মাত্র ২১১টি সেতু নির্মাণ বাকী আছে। নতুন নতুন পথ নির্মাণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বহু পশ্চাৎপদ অঞ্চল বাণিজ্য জগতের সংস্পর্শে আসিতেছে। গ্রামাঞ্চলে পাকা রাস্তা প্রসারিত হইলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের উপর তাহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইবে সন্দেহ নাই।

**Q. 73. Describe the air transport system of India. Do you think that India has all the necessary conditions for the development of air traffic.**

**[ ভারতের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সকল সুবিধা এদেশে আছে কি ? ]**

**আকাশপথ** ( Airways )—ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে ভারতে বিমান চলাচল ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। যদিও ভারতের বিমান চলাচল ব্যবস্থা আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার মত উন্নত ধরণের নহে, তবুও বর্তমানে ইহা সমগ্র পরিবহণ ব্যবস্থার যে একটি প্রধান অংশ হিসাবে কাজ করে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানে কলিকাতা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বিমান বন্দর। তাহাছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কলিকাতা, দিল্লী ও বোম্বাই মারফত ব্রিটিশ, ফরাসী, আমেরিকান, ডাচ, জাপান, জার্মান, ইটালিয়ান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান প্রভৃতি বিমানগুলি দূরদূরান্তে যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত করে। এয়ার ইণ্ডিয়া নামক ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বিমান কলিকাতা, বোম্বাই-কায়রো, জেনেভা ও লণ্ডনের পথে নিউইয়র্ক পর্যন্ত যায়, কলিকাতা-ব্যাঙ্কক-হংকং-টোকিওর পথে, দিল্লী-টাসখেন্ট-মস্কো-লণ্ডন পথে

এবং সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, কলম্বো, নাইরোবি, কাবুল, প্রভৃতি শহরের পথে আধুনিক জেট বিমানগুলি নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতেছে। "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন" নামক ভারতীয় আভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থার বিমানগুলি নিয়মিতভাবে




ভারতের প্রত্যেকটি বড় ও মাঝারি শহরের মধ্যে আকাশ-পথে যাতায়াত করে। বিমানপথে বর্তমানে পণ্যদ্রব্যও প্রেরণ করা হইতেছে। ইহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গ ও ত্রিপুরা হইতে নানাপ্রকার বাণিজ্যদ্রব্য এবং মালদহের আম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসাম হইতে কলিকাতায় বিমানযোগে কমলালেবু ও চা আমদানির ব্যবস্থা বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

ভারতের পরিষ্কার আবহাওয়া বিমান চলাচলের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব অধিক হওয়ায় ভবিষ্যতে বিমানপথে মাল বহনেরও যথেষ্ট সুবিধা ও সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভারতে বিমানপথের প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ দরিদ্র বলিয়া বিমানপথের উন্নতির কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে। পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে বিমানই দ্রুততম হওয়ায় কর্মব্যস্ত ব্যক্তিরা এখন অধিক পরিমাণে বিমান ব্যবহার করিতেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে বিমান চলাচলের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আকাশ পথে আজ ভারতের প্রত্যেকটি বৃহৎ নগরে যাওয়া যায়। প্রায় ৫০।৬০টি ভাইকাউন্ট, স্কাইমাষ্টার, ফ্রেণ্ডশিপ, কারাভেল, ভারতে তৈরী HS 748 প্রভৃতি ছোট ও বড় বিমান যাত্রীবহন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বে (১৯৫০ দশকে) যেখানে একটি বিমান ভারতে মাত্র ২৫ জন যাত্রী বহন করিত এখন সেখানে অধিকাংশ বিমান ৭০।৮০ জন যাত্রী ঘণ্টায় ৪০০।৫৫০ মাইল বেগে বহন করে। তাই বিমানের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে না। "এয়ার ইণ্ডিয়া" এখন কলিকাতা-লণ্ডন, নিউইয়র্ক ও মস্কোর পথে বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমান "বুইং-৭০৭" ব্যবহার করিতেছে। জাম্বো নামক অতিকায় যাত্রীবাহী বিমানও ব্যবহার করা হইবে।

**Q 74, What is the importance of air transport to Assam and Kashmir?**

**[ আসাম ও কাশ্মীরে বিমান পরিবহণের গুরুত্ব কতদূর ? ]**

ভারতের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করায় কাশ্মীর, আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্য এবং নেফা অঞ্চল অধিকতর উপকৃত হইয়াছে।

**আসাম**—আসাম লিঙ্ক রেলওয়ে ও রাস্তা ছাড়া কলিকাতা বন্দরের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া আসামের আর কোন যোগাযোগ নাই। এই রেলপথও আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গেজের এবং ইহা প্রায় প্রতিবৎসর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই রেলপথ অনেক ঘুরিয়া ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া স্থাপিত হওয়ায় পরিবহণ কার্যে অনেক সময় লাগে ও ব্যয়ও হয় অধিক। এইজন্যই বিমান পরিবহণ আসামের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মধ্যে আসামের চা ও কমলালেবু কলিকাতায় প্রেরণ ও কলিকাতা হইতে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। আসাম রাজ্যের পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি রাজ্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অবস্থাও একই প্রকার ভাবে বিমান পরিবহণের উপর নির্ভরশীল।

**কাশ্মীর**—একমাত্র বানিহাল সুড়ঙ্গ-সড়ক ছাড়া ভারতের মূল-ভূখণ্ডের সহিত এই রাজ্যের কোন যোগাযোগ নাই। এই সড়কও আবার অতিরিক্ত বারিপাত

এবং তুষারপাতের ফলে সময় সময় বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই বিমান পরিবহণ এই রাজ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। এখানকার বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মধ্যে পশমজাত দ্রব্য, ফল ও কাঠের শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রেরণ ও খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

**Q. 75. Name the important coastal ports of India and discuss the importance of coastal trade on India's internal economy.**

**[ ভারতের উল্লেখযোগ্য উপকূল বন্দরগুলির নাম দাও এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উপকূল বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর? ]**

**ভারতের উপকূল বন্দর ও উপকূল বাণিজ্য** ( Coastwise Trade )—

ভারতের মূল ভূখণ্ডের তটরেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭০০ কিলোমিটার। আন্দামান ও নিকোবরের তটরেখাও খুব দীর্ঘ। ভারতের তটরেখা কিন্তু অধিক ভগ্ন নহে।

পশ্চিম উপকূলে অর্থাৎ আরব সাগরের তটভাগে কেবল দুইটি উপসাগর আছে। উত্তরেরটি কচ্ছ ও দক্ষিণেরটি ক্যাম্বে উপসাগর। মধ্যে সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ। কচ্ছ উপসাগর অগভীর এবং ইহার অধিকাংশই "রাণ" বা লবণ জলায় পরিণত হইয়াছে। এই উপসাগরের একটি খাড়িতে আধুনিক **কান্দলা** বন্দর গঠন করা হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র বা কাথিওয়াড় উপদ্বীপে ওখা ও ভাবনগর বন্দর প্রধান বাণিজ্যস্থান। ওখাতে জাহাজের জন্য জেটি আছে। পোরবন্দরকে আধুনিক ভাবে সজ্জিত করা হইবে। ক্যাম্বে উপসাগরও অগভীর। **সুরাট ও ব্রোচ** বন্দর নদীর মুখে অবস্থিত। এগুলি আধুনিক জাহাজের পক্ষে নিতান্ত অগভীর। ক্যাম্বে উপসাগরের দক্ষিণে একটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত দ্বীপ-বন্দর **বোম্বাইয়ে** অতি সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। ইহা বিরাট বন্দর। ইহা মূল ভূ-খণ্ডের সহিত রেলপথে যুক্ত। বোম্বাইয়ের দক্ষিণে তটভাগ এতই সরল যে একমাত্র **মার্মাগাও** এবং কেরলের বিখ্যাত **কোচিন** বন্দর ব্যতীত আর কোন পোতাশ্রয় নাই। **রত্নগিরি, ভাটকল, কারোয়ার, কালিকট** ও **ম্যাঙ্গালোর** আরব সাগর তটে অবস্থিত অরক্ষিত বন্দর। বড় জাহাজ বহু দূরে দাঁড়ায়। নৌকাগুলি ঢেউয়ে দুলিতে দুলিতে মাল উঠাইয়া ও নামাইয়া দেয়। ঝড়ের সময় কোন জাহাজ বন্দরে আসে না। ম্যাঙ্গালোর বন্দরটিকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত করা হইতেছে।

ভারতের পূর্ব উপকূলে **বিশাখাপত্তনমে** স্বাভাবিক এবং **মাদ্রাজে** কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। চাঁদবালি, কাকিনাদা, কুড্ডালোর, তিউতিকোরিণ, নাগাপতনম্ প্রভৃতি তটবন্দর অগভীর ও অরক্ষিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব অসুবিধা হয়। তামিলনাড়ুর তিউতিকোরিণ বন্দরটিকে আধুনিক ভাবে সজ্জিত করা

হইতেছে। পূর্ব-উপকূলের অধিকাংশ বন্দরেই কোন পোতাশ্রয় নাই অথবা থাকিলেও আধুনিক বড় জাহাজ সেখানে ভিড়িতে পারে না। মহানদীর ব-দ্বীপের পারদীপ বন্দরকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

যদিও ভারতের তটভাগ বন্দর গঠনের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে তবু আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে অবস্থার বহু উন্নতি করা যাইতে পারে। ভাটকল, কারোয়ার, ভাবনগর, হলদিয়া প্রভৃতি বন্দরগুলির জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই ইহাদিগকে আধুনিক পোতাশ্রয়যুক্ত বন্দরে পরিণত করা যায়। প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র বন্দর উন্নয়ন, নূতন লাইট হাউস স্থাপন এবং বৃহৎ বন্দরগুলির যান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে।

ভারতের উপকূল বাণিজ্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা হইতে প্রচুর কয়লা জাহাজে মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যায়। বোম্বাই হইতে কার্পাস ও পেট্রোলিয়াম কলিকাতায় আসে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ হইতে কলিকাতায় প্রচুর লবণ আসে। উড়িষ্যার চাউল কলিকাতার বাজারে জাহাজেও আসে। এই বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বহুগুণ বাড়িতে পারে যদি ক্ষুদ্র বন্দরগুলিতে জেটি, রেলপথ ও কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য উপকূল বাণিজ্যের প্রয়োজন খুব বেশি। বস্তুতঃ ভারতের পূর্ব-উপকূলভাগে রেলপথ ব্যবস্থা প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং পশ্চিম উপকূলে পার্বত্য প্রকৃতির জন্য রেলপথ স্থাপন করা ব্যয়সাধ্য। সুতরাং বাণিজ্যের জন্য ঐ সকল অঞ্চলে উপকূল পথই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। তাহা ছাড়া, পরিকল্পনাগুলির কার্য আরম্ভ হওয়ার ফলে ভারতীয় রেলব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। সুতরাং ব্যয় অধিক হইলেও উপকূল পথে অধিক মাল বহন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে উপকূল বাণিজ্যে নিয়োজিত আধুনিক জাহাজের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাহা ছাড়া, বন্দরগুলিতে মাল উঠাইবার ব্যবস্থাও সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। সুতরাং অনেক স্থলেই রেলপথ অপেক্ষা উপকূল পথে খরচ অধিক হয়। কিন্তু বন্দরে আধুনিক যন্ত্রাদি বসাইলে এই খরচ অনেক কম হইতে পারে।

উপকূল বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার ১৯৫০ সাল হইতে একচেটিয়া অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের—বিশেষতঃ তৈলবাহী জাহাজের একান্ত অভাব। বর্তমানে সরকার আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে পালতোলা জাহাজগুলিতে ইঞ্জিন জুড়িয়া আপাততঃ অবস্থার কতকটা উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। বর্তমানে বিদেশ হইতে বহু জাহাজ ক্রয় করা হইতেছে এবং বিশাখাপত্তনমেও জাহাজ নির্মাণ করা হইতেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ভারতের ৩০ লক্ষ টন বা ততোধিক জাহাজ থাকিবে। জাহাজ সম্পর্কে স্বাবলম্বী

হইতে হইলে ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অন্ততঃ ৩৫।৪০ লক্ষ টন জাহাজ থাকা দরকার। কিন্তু বর্তমানে ( ১৯৬৯ ) আছে মাত্র ২০ লক্ষ টনের মত।

যদিও ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ( যথা, SCI, SSN, ISS ) অনেক বড় বড় জাহাজ আছে তবুও বর্তমানে বোম্বাই ও বিশাখাপতনমের তৈলশোধনাগারগুলি হইতে ভারতের অন্যান্য বন্দরে পেট্রোল বহন করিবার জন্য অংশতঃ বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহা যে কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়া ক্ষতিকর তাহাই নহে, বিপজ্জনকও বটে।

**Q. 76 What are the major and minor ports in India? Give some examples of each. What steps are proposed to be taken for the development of ports in India?**

**[ ভারতে প্রধান এবং অপ্রধান বন্দর কোন্‌গুলি? প্রত্যেকটিরই উদাহরণ দাও। ভারতের বন্দর উন্নয়নের কি পরিকল্পনা করা হইয়াছে? ]**

**ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দর**—ভারতের আয়তনের তুলনায় তটরেখার দৈর্ঘ্য অধিক নহে। ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের ( আন্দামান, নিকোবর বাদে ) তটভাগ প্রায় ৪৬০০ কিলোমিটার। এই তটভাগ অধিকাংশ স্থানেই সরল। কেবল বঙ্গোপসাগরে পতিত গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর মুখে কয়েকটি ক্রমবর্ধমান ব-দ্বীপের অগ্রভাগ ভিন্ন অন্যত্র তটভাগ প্রায় কোথাও ভগ্ন নহে। তটভাগে জল খুব কম এবং ঢেউ বেশি বলিয়া বন্দর গঠন করা সহজ নহে। আরব সাগর তটে বোম্বাই, কোচিন, মার্মাগাও এবং কান্দলা বন্দরের নিকট তটভাগ ভগ্ন হওয়ায় ঐ বন্দরগুলি গঠন করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই পোতাশ্রয়টি বেশ গভীর এবং বৃহৎ।

ভারতের তটভাগে মোট প্রায় ১৫০টি ক্ষুদ্র বন্দর রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে মাত্র ১৮টি উল্লেখযোগ্য। ভারতের বঙ্গোপসাগর তটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দরগুলির মধ্যে উড়িষ্যার চাঁদবালি, অন্ধ্রের মসুলিপতনম্‌ ও কাকিনাদা, তামিলনাড়ুর নাগাপতনম, তিউতিকোরিণ ( মান্নার উপসাগর তটে ) ও কুড্ডালোর এবং পণ্ডিচেরির নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে পোতাশ্রয় নাই ; সুতরাং জাহাজ দূর সমুদ্রে দাঁড়ায় এবং নৌকাগুলি ঢেউয়ে দুলিতে দুলিতে মাল তুলে ও নামায়। অনেক বন্দরে কোন রেল সংযোগ নাই। সুতরাং বাণিজ্য কমই হয়। এই বন্দরগুলির কোন কোনটিতে কৃত্রিম পোতাশ্রয়, রেলপথ, মালগুদাম এবং মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমগৃহ প্রস্তুত করা প্রয়োজন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঐগুলির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কয়েকটি বন্দরে অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেটি এবং লাইট হাউস নির্মাণ করা হইতেছে।

আরব সাগর তটে মহীশূরের ম্যাঙ্গালোর, মহারাষ্ট্র রাজ্যের রত্নগিরি এবং গুজরাটের পোরবন্দর এবং মহীশূর ও কেরল রাজ্যের কতকগুলি বন্দর উপরিউক্ত শ্রেণীর পোতাশ্রয়হীন বন্দর। এগুলিতে পালতোলা জাহাজ ভিড়িতে পারে। ওখার বন্দরটিতে কিছু কিছু বড় জাহাজ যাতায়াত করে।

ভারতের **বৃহৎ বন্দর** ( Major ports ) বলিতে (১) কলিকাতা, (২) বোম্বাই, (৩) মাদ্রাজ (৪) কান্দলা (৫) বিশাখাপত্তনম্ (৬) মার্মাগাও এবং (৭) কোচিনকে বুঝায়। মাঙ্গালোর, তুতিকোরিণ, হলদিয়া এবং পরদীপও এই শ্রেণীভুক্ত হইবে। কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দর মারফৎ বৎসরে যথাক্রমে ৯৯ লক্ষ টন ও ১৪০ লক্ষ টনের অধিক জাহাজ যাতায়াত করে। মাদ্রাজ ভারতের তৃতীয় বন্দর। কিন্তু মার্মাগাও-এর রপ্তানি-বাণিজ্য অনেক বেশি। অন্যান্য বন্দরের বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশাখাপত্তনম বহির্বন্দর প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। জাপানের সহায়তায় এই কাজ শেষ হইলে একলক্ষ টনের অতিকায় জাহাজগুলি এখানে অনায়াসে লৌহশিলা লইতে এবং কাঁচা পেট্রোল খালাস করিতে পারিবে।

[ পরবর্তী প্রশ্নোত্তর হইতে কয়েকটি বন্দরের বিষয় যোগ করিতে হইবে। ]

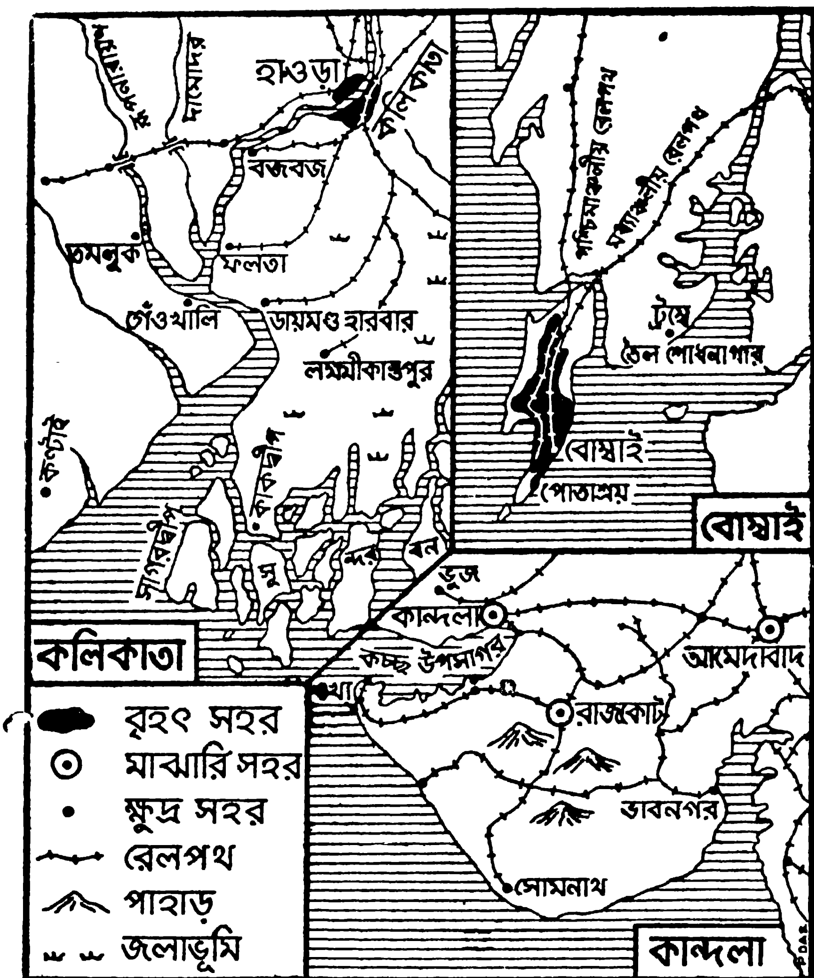
**Q. 77. Give the location of the following ports of India and mention their functions :- (a) Calcutta, (b) Bombay (c) Kandla, (d) Visakapatnam, (e) Madras, (f) Cochin, and (g) Murmagao**

**[ নিম্নলিখিত বন্দরগুলির অবস্থান এবং কার্যকলাপ বর্ণনা কর। ]**

(a) **কলিকাতা**—ইহা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। হুগলী নদীর এই অংশ বালুচরে পূর্ণ বলিয়া দক্ষ পাইলটের সাহায্যে খুব সাবধানে জাহাজগুলি বন্দরে প্রবেশ করে। কলিকাতা নগরী ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের বৃহত্তম শহর এবং অন্যতম প্রধান বন্দর। এই বন্দর দিয়া আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের কতকাংশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এই বন্দর দিয়া রপ্তানির মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, চা, অভ্র কয়লা এবং ইস্পাত-দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। আমদানির মধ্যে রাসায়নিক সার, পেট্রোল, গম, কাগজ, লবণ, যন্ত্রাদি, তুলা, পাট ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতা এবং ইহার বহু বিস্তৃত শহরতলীর পাটকল, কাগজের কল, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানায় উৎপাদিত পণ্যাদি এই বন্দর দিয়াই রপ্তানি হয়।

(b) **বোম্বাই**—ইহা ভারতীয় ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং সর্বপ্রধান বন্দর। আরব সাগরতটে একটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত হওয়ায় বোম্বাইয়ের পোতাশ্রয়ও খুব সুন্দর ও নিরাপদ। জল গভীর হওয়ায় বড় বড় জাহাজ এই বন্দরে

আসিতে পারে। বোম্বাই হইতে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে প্রবেশ করিবার জন্য থলঘাট ও ভোরঘাট নামে দুইটি গিরিপথ থাকায় পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে বন্দরটির ঘনিষ্ঠ




ভারতের প্রধান তিনটি বন্দরের অবস্থান

যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই মধ্য ও পশ্চিম রেলপথের কেন্দ্র। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, রাজস্থানের পূর্বাংশ ও মধ্যপ্রদেশের বাণিজ্য

এই বন্দর দিয়া পরিচালিত হয়। এই বন্দর দিয়া প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ, কার্পাসদ্রব্য, চর্ম এবং ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রব্যের ভিতর কার্পাস তুলা, যন্ত্রপাতি, ক্রুড অয়েল, বিভিন্ন প্রকার রং, কয়লা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা ও বোম্বাই প্রায় সমশ্রেণীর বন্দর। তবে বোম্বাই সুয়েজ পথের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্যবাহী জাহাজগুলি আগে বোম্বাইয়ের সুন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ে লাগে এবং পরে কলিকাতায় আসে। সুতরাং, বোম্বাই বন্দরের আমদানি বাণিজ্য কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু বোম্বাইয়ের বিশাল পশ্চাদ্‌ভূমি প্রধানতঃ পার্বত্য ও মরুপ্রায় হওয়ায় উহার রপ্তানি-বাণিজ্য কলিকাতার তুলনায় খুবই কম। বোম্বাই হইতে তিনটি রেলপথ উত্তর-পূর্ব দিকে যথাক্রমে উপকূলের সমভূমি হইয়া আমেদাবাদ ও দিল্লী এবং থলঘাট ও ভোরঘাট গিরিপথে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ পার হইয়া কলিকাতা ও মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়াছে। এই তিনটি রেলপথেই বোম্বাই বন্দরের পণ্য চলাচল করে। বোম্বাই শহর ভারতের অন্যতম বৃহৎ কার্পাস শিল্পের কেন্দ্র। সম্প্রতি এখানে দুইটি সুবিশাল তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে।

(c) **কান্দলা**—ইহা ভারতের নূতন বন্দর। এই বন্দরটি গুজরাটের কচ্ছ উপসাগর তটে অবস্থিত। ইহার অবস্থান স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের মত, কিন্তু উপসাগর ও খাঁড়িতে জল কম থাকায় বর্তমানে ভারত সরকার বহু অর্থ ব্যয়ে এখানে একটি আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত প্রধান বন্দর ( major port ) গঠন করিয়াছেন। এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি অনুর্বর, মরুময় এবং লবণাক্ত জলাভূমিতে পূর্ণ হইলেও বর্তমানে রেলপথে বন্দরটি রাজস্থান ও গুজরাটের উন্নতিশীল অঞ্চলগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ইহার বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা করাচীর অভাব পূরণ করিয়াছে। বন্দরটির নিকটে প্রচুর লবণ ও জিপসাম পাওয়া যায়। সুতরাং, এখানে রাসায়নিক শিল্প গঠন করার সুবিধা রহিয়াছে।

(d) **বিশাখাপত্তনম্**—ইহা বঙ্গোপসাগরতটে এবং কলিকাতা ও মাদ্রাজের প্রায় মধ্যস্থলে ( অন্ধ্র রাজ্যে ) অবস্থিত। এই বন্দরটি পর্বতের আশ্রয়ে অবস্থিত এবং সুন্দর ও স্বাভাবিক হওয়ায় ফলে এই বন্দর দিয়া উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের বাণিজ্য চালাইবার সুবিধা কলিকাতা অপেক্ষা অধিক। ম্যাঙ্গানীজ, চীনাবাদাম, লৌহশিলা প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। আমদানি পণ্যের ভিতর লৌহ যন্ত্রাদি, কাষ্ঠ ও ধান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইহা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই কারখানার নাম হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড। এখানে একটি বৃহৎ তৈল শোধনাগারও আছে। আমদানি করা খনিজ তৈল এখানে পরিশোধন করা হয়। ইহা একটি নৌঘাঁটি।

(e) **মাদ্রাজ**—মাদ্রাজ ভারতের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। এই বন্দরটি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় কৃত্রিম। অল্পসংখ্যক জাহাজ উহার মধ্যে এককালে অবস্থান করিতে পারে ; বন্দরটির উন্নতির জন্য ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সমগ্র তামিলনাড়ু, মহীশূর ও অন্ধ্ররাজ্যের কতকাংশ এই বন্দরের উপর নির্ভরশীল। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য চা, চামড়া. কার্পাস দ্রব্য, তৈলবীজ প্রভৃতি। আমদানি দ্রব্য যন্ত্রাদি, চাউল, গম, কয়লা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

(f) **কোচিন**—এই বন্দরটি কেরল রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা বোম্বাই এবং কলম্বোর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য গোলমরিচ ও অন্যান্য মসলা। কাজুবাদাম, নারিকেল দড়ি. কফি. চা. নারিকেলের ছোবড়া ( coir ), কাঠ প্রভৃতিও এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। ধান, যন্ত্রাদি ও খনিজ তৈল আমদানি হয়। বর্তমানে ইহা ভারতের প্রধান নৌঘাঁটি।

(g) **মার্মাগাও**—ইহা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুন্দর পোতাশ্রয়। এখান হইতে প্রচুর লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হয়। আমদানির পরিমাণ কম।

**Q. 78. Name some of the important towns and ports of India and mention their importance.**

**[ ভারতের কয়েকটি প্রধান নগর ও বন্দরের নাম কর এবং তাহাদের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ]**

**জামসেদপুর**—বিহারের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বৃহৎ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। ইহার অপর নাম টাটানগর। এখানে ৩ লক্ষাধিক লোকের বাস। ইস্পাতের কারখানা ছাড়াও রেলইঞ্জিন, ট্রাক, বাস, মালগাড়ি, কাঁটা তার, রোলার, টিনপ্লেট প্রভৃতি শিল্পও এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের একটি কেন্দ্র। অদূরে ময়ূরভঞ্জ ও সিংভূমে লৌহখনি থাকায় এবং কয়লা, চুনাপাথর প্রভৃতি সহজলভ্য হওয়ায় স্থানটি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

**কানপুর**—উত্তরপ্রদেশের বৃহত্তম নগর ও শিল্পকেন্দ্র (লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ)। ইহার উন্নতি খুব দ্রুত হইয়াছে। এখানে বহু কাপড়ের কল, তেলের কল, পাট কল, রেশম ও পশমের কল এবং বিমান নির্মাণের কারখানা আছে। চামড়া ও তুলার ব্যবসাই ইহার উন্নতির কারণ। ইহা একটি প্রধান রেলকেন্দ্র। তাহা ছাড়া নদীপথের সুবিধাও আছে।

**বাঙ্গালোর**—ইহা মহীশূর রাজ্যের প্রধান নগর ও দক্ষিণ ভারতের উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এখানকার বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে এয়ারক্রাফট, টেলিফোন, রেডিও এবং মেসিনটুলস্ এর নাম উল্লেখযোগ্য। শহরটি স্বাস্থ্যকর।

**তিউতিকোরিণ**—ইহা দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত তামিলনাড়ুর

একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। তুলা এবং চা এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য। ইহা মান্নার উপসাগর হইতে মুক্তা সংগ্রহেরও উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

**কালিকট** (কোজিকোডা)—ইহা কোচিন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন ক্ষুদ্র তটবন্দর। নারিকেলের কাতা ও ছোবড়া, নারিকেলের শাঁস, কফি, চা ও মাছ প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়।

**সিন্ধ্রি**—ইহা বিহারে অবস্থিত নূতন শহর। এখানে সুবৃহৎ এ্যামোনিয়া সারের কারখানাও অবস্থিত। এখানে সিমেন্টের কারখানাও আছে। নিকটেই কয়লা খনি অঞ্চল ও দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকায় শহরটির আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

**চিত্তরঞ্জন**—ইহা পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমান্তে অবস্থিত নূতন শিল্পকেন্দ্র। এখানে এক বৃহৎ রেল ইঞ্জিনের কারখানা আছে। এই কারখানায় বৎসরে দুই শতাধিক বড় বড় ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে। নিকটেই টেলিফোনের তার ও অন্যান্য তার নির্মাণের একটি বৃহৎ কারখানা আছে।

**ডিগবয়**—এই ক্ষুদ্র শহরটি ভারতের পূর্বসীমায় আসাম রাজ্যে অবস্থিত ভারতের সর্বপ্রাচীন খনিজ তৈল উৎপাদক স্থান। শহরের নিকটে বহু তৈলকূপ ও একটি তৈল শোধনাগার আছে। ইহার নিকটস্থ অঞ্চলে নাহোরকাটিয়া প্রভৃতি স্থানে নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থানটি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

**বারাণসী**—ইহা উত্তরপ্রদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন হিন্দু তীর্থস্থান। এখানকার রেশম শিল্প ও নানাপ্রকার কুটীরশিল্পে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখানে ডিসেল রেল-ইঞ্জিনের কারখানা আছে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে ইহার খ্যাতি অধিক।

**কটক**—উড়িষ্যার ভূতপূর্ব রাজধানী ও প্রধান শহর হইলেও শহরটি স্বাস্থ্যকর নহে। বর্তমানে রাজধানী ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; অদূরে মহানদী ও কাঁটজুরি নদী। এখানে কার্পাস প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

**দিল্লী**—অতি প্রাচীনকাল হইতেই শহরটিতে ভারতের রাজধানী অবস্থিত। বর্তমান রাজধানীর নাম নয়াদিল্লী। ইহা একটি আধুনিক শহর। অধিবাসীরা অধিকাংশই সরকারী চাকুরে। পুরাতন দিল্লী একটি শিল্পপ্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থান। কাপড়ের কল, চামড়ার কল প্রভৃতি এখানে অবস্থিত। দিল্লী উত্তর ভারতের প্রধান রেলজংশন। লোকসংখ্যা ২১ লক্ষেরও অধিক।

**বরোদা**—ইহা প্রাচীন বরোদা রাজ্যের রাজধানী ছিল, বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের একটি শিল্পপ্রধান নগর। ইহা রাসায়নিক শিল্পের একটি বৃহৎ কেন্দ্র। বোম্বাই ও আমেদাবাদের সঙ্গে ইহা রেলপথে যুক্ত।

**আমেদাবাদ**—ইহা গুজরাট রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতের অন্যতম বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। এখানে প্রায় ৭০টি বড় বড় কাপড়ের কল আছে। পূর্বে তুলা উৎপাদন ও রপ্তানি করা এই অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায় ছিল; কিন্তু আমেদাবাদের কার্পাস শিল্প এখন এতই বৃহৎ হইয়াছে যে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাধ্যম আঁশযুক্ত তুলায় এখন আর কুলায় না। বিদেশ হইতে বোম্বাই ও সুরাট বন্দর মারফত প্রচুর উচ্চশ্রেণীর কাঁচা তুলা আমদানি করিতে হয়। এই শিল্পাঞ্চলটি ক্রমবর্ধমান। লোকসংখ্যা দশ লক্ষের বেশি।

**জব্বলপুর**—মধ্যপ্রদেশে নর্মদা জলপ্রপাতের নিকট এই শিল্পশহরটি অবস্থিত। নিকটেই কার্পাস শিল্প, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে মিলিটারি লরী প্রস্তুত হয়।

**ত্রিবান্দ্রম্**—এই সুন্দর শহরটি কেরলের রাজধানী। ইহা একটি ক্ষুদ্র তটবন্দরও বটে। ইহা মাদ্রাজের সঙ্গে রেলপথে সংযুক্ত।

**হাপুর**—এই বাজার-শহরটি উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলায় অবস্থিত। এখানে গম প্রভৃতি কৃষিপণ্যের বিরাট পাইকারী কারবার চলে। এখানে একটি প্রকাণ্ড অতি আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত শস্যগোলা আছে।

**ডিব্রুগড়**—ইহা উত্তর-পূর্ব আসামের একটি বাণিজ্য-প্রধান শহর। ব্রহ্মপুত্র নদী মারফত চা, পাট, খনিজ তৈল প্রভৃতি পাঠানো এখানকার প্রধান ব্যবসা। নিকটে বহু চা-বাগান আছে। ডিগবয়ের তৈলক্ষেত্রও দূরে নয়। স্থানটি অত্যন্ত ভূমিকম্প-প্রবণ।

**অমৃতসর**—অমৃতসর পাঞ্জাবের সর্বপ্রধান নগর ও ভূতপূর্ব রাজধানী। ইহা কার্পাস ও পশম শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহা শিখ তীর্থস্থান।

**ইন্দোর**—ইন্দোর ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য হোলকারের রাজধানী ছিল। ইহা বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বেশ বড় বড় বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ নিকটে কার্পাস তুলা উৎপন্ন হয়। ইহা একটি সুন্দর শহর।

**নাগপুর**—ইহা মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্যতম প্রধান শহর। এখানকার শিল্পের মধ্যে কার্পাস, কাঁচ ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য। এই শহরটির বাণিজ্যিক খ্যাতি যথেষ্ট।

**ভুপাল**—ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী। রেলপথ ও স্থলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এখানে একটি ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

**শ্রীনগর**—প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও মনোরম জলবায়ুর জন্য প্রসিদ্ধ এই পার্বত্য শহরটি কাশ্মীরের রাজধানী। শাল, কম্বল, কাঠের কাজ ইত্যাদি কুটীর শিল্প এবং ফলের জন্য ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

**আসানসোল**—ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার একটি বৃহৎ শহর ও বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। শহরটির নিকট কয়লাখনি অঞ্চল থাকায় আশেপাশে বহু সুবৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কুলটি ও বার্ণপুরের ইস্পাতের কারখানা, এ্যালুমিনিয়াম কারখানা ও সেন-র‍্যালের বিখ্যাত সাইকেল কারখানা ও কাঁচের কারখানার নাম উল্লেখযোগ্য।

**খড়গপুর**—এই বৃহৎ রেলকলোনিটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রেল শহর। এখানে গাড়ি এবং ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা আছে। ইহা একটি বড় রেলজংশন ষ্টেশনও বটে। এখানকার প্লাটফর্ম ভারতের মধ্যে দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয়।

**আগরতলা**—এই শহরটি পর্বতময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বিমানবন্দর।

**পরাদীপ** ( পারদীপ )—এই নূতন বন্দরটি উড়িষ্যার সমুদ্রতটের নিকট অবস্থিত। এখানে বড় বড় জাহাজ আসিতে পারে। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য লৌহ আকরিক।

**হলদিয়া**—এই স্থানটি মেদিনীপুর জেলায় হলদি নদীর মোহানায় অবস্থিত একটি নোঙরঘাঁটি। এখানে একটি বৃহৎ বন্দর গঠনের কাজ চলিয়াছে। উহা কলিকাতার বহির্বন্দর হইবে।

# ভারতের বহির্বাণিজ্য

## FOREIGN TRADE OF INDIA

**Q. 79. Do you think that the foreign trade of India requires reconstruction ? If so on what lines ?**

**[ ভারতের বহির্বাণিজ্য কি নূতনভাবে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন ? যদি প্রয়োজন হয় তো কোন্ পথে ? ]**

ভারতের বহির্বাণিজ্যে ১৯৬৮ সালে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি ঘাটতি পড়ে। দীর্ঘকাল এরূপ চলিতে থাকিলে ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে পণ্যাদি ক্রয় করিবার মত বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের একটি মাত্র পথ আছে ; তাহা হইল রপ্তানি বৃদ্ধি করা ; কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধা অনেক। এই সকল বাধা দূর করিয়া রপ্তানি-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা অংশতঃ অপূর্ণ রাখিয়া অথবা রপ্তানি দ্রব্যের উপর Subsidy দিয়া রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কাঁচামাল ও খাদ্য সম্পর্কে দেশকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংপূর্ণ করিতে পারিলে আমদানির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস করা যাইতে পারে। বহির্বাণিজ্যের বর্তমান আশঙ্কাজনক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের এইগুলিই প্রধান উপায়। সুখের কথা ১৯৬৯ সালে রপ্তানি অনেক বৃদ্ধি এবং আমদানি অনেক হ্রাস পায়।

**Q. 80. Discuss the characteristic features of India's foreign trade. ( C. U. B. Com. 1969 )**

**[ ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ] Or,**

**Q Give a picture of India's foreign trade with particular reference to the markets for India's exports and the possiblity of securing new markets for Indian goods.**

**( C. U. B. Com. 1965 )**

**ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠন ও গতিপ্রকৃতি—**

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত নানাদেশের সঙ্গে বহির্বাণিজে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ হইয়াছে ; ফলে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের বহির্বাণিজ্যকে তিন যুগে ভাগ করা যায় ; যথা—(১) প্রাচীন যুগ যখন পালতোলা জাহাজে আরব ও চীন দেশের সঙ্গেই অধিক বাণিজ্য চলিত এবং ইহার পরে পোর্তুগীজ, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতিদের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত। এই যুগে ভারত রপ্তানি করিত উচ্চশ্রেণীর কার্পাসজাত ও রেশম বস্ত্র, নানা প্রকার মশলা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি। (২) ইংরাজ শাসনের যুগ যে সময় ভারতের কুটীর শিল্পগুলি বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে ভাঙিয়া পড়ে এবং ভারত প্রচুর

পরিমাণে বস্ত্রাদি, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য ও অন্যান্য শিল্পজাতদ্রব্য আমদানি এবং পাট, তুলা, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানীজ, চর্ম, অভ্র প্রভৃতি কাঁচামাল রপ্তানি করিতে থাকে। এই সময় আধুনিক বাষ্পীয় পোতের প্রচলন হওয়ায় বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বাড়িয়া যায়। ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগে ভারতে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে ভারত পাট ও কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি এবং কাঁচা তুলা আমদানি করিতে থাকে। খাদ্যশস্য আমদানিও বৃদ্ধি পায়। (৩) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের আকার ও গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশগঠনের কাজ আরম্ভ হওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা দেয়; যথা—

(ক) ভারতে দ্রুত শিল্পের প্রসার হওয়ায় ভোগ্যপণ্যের আমদানি কমিয়াছে কিন্তু নানাপ্রকার যন্ত্রাদির আমদানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল যন্ত্রের দাম খুব বেশি। তাই ভারত বিদেশে যত টাকার পণ্য বিক্রয় করিতে পারিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি টাকার যন্ত্রাদি, কাঁচামাল, খাদ্যশস্য প্রভৃতি বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইতেছে। ইহাতে ভারতের দেনা বাড়িতেছে।

(খ) ভারতে পাট, তুলা, চর্ম, প্রভৃতি যে সকল কাঁচামাল উৎপন্ন হয়, তাহা এদেশেই কলকারখানায় কাজে লাগিতেছে; সুতরাং কাঁচামালের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। তৈলবীজ রপ্তানি এখন খুব কম। অপরপক্ষে, ভারত বিভাগের পর হইতে ভারত নানা দেশ হইতে কাঁচা পাট ও কাঁচা তুলা আমদানি করিতেছে।

(গ) ভারতে নূতন শিল্পগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে এবং ঐ সকল শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য; যথা—সেলাইকল, টিউব, সাইকেল, ডিজেল ইঞ্জিন, ওয়াগন, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি এখন প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। পাট ও কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানির ক্ষেত্রে এখন তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যাইতেছে। চর্মদ্রব্য, লৌহআকরিক এবং ইস্পাত দ্রব্যাদি এখন অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হইয়াছে।

(ঘ) ভারতের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে (বৎসরে ১০০ জনে ২.৩ জন হারে) সুতরাং খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থা এখনও খুব অনগ্রসর। ইদানিং অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে।

(ঙ) ইংরাজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হওয়ায় এখন অনেক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়।

**আমদানি-রপ্তানির গতি (direction of foreign trade)**—নিম্নলিখিত তালিকায় ভারতের বাণিজ্যের গতি অর্থাৎ কোন্ কোন্ দেশে কি কি ভারতীয়

পণ্য রপ্তানি হয় এবং কোথা হইতে কি কি দ্রব্য ভারত আমদানি করে তাহা দেওয়া হইল :—

## আমদানি বাণিজ্য

| ভারত কি কি আমদানি করে | কোথা হইতে আমদানি করে |
|---|---|
| ১। লৌহ ও ইস্পাত যন্ত্রাদি, কাগজ, মোটর গাড়ি ও যন্ত্রাংশ, জাহাজ, বিমান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি। | ১। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, দুই জার্মানী, রাশিয়া, জাপান, কানাডা, সুইডেন, ফ্রান্স, ইটালী, চেকোশ্লোভাকিয়া। |
| ২। অপরিশোধিত খনিজ তৈল। | ২। ইরাণ, আরব, ইরাক, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। |
| ৩। খাদ্যশস্য (প্রধানতঃ গম ও ধান) ও ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি। | ৩। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ড। |
| ৪। তুলা, পাট, খনিজ, পশম প্রভৃতি কাঁচামাল। | ৪। যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, পূর্ব-আফ্রিকা, থাইল্যাণ্ড। |
| ৫। ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য। | ৫। পঃ জার্মানী, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান। |

## রপ্তানি-বাণিজ্য

| ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের নাম | কোথায় রপ্তানি করা হয় |
|---|---|
| ১। পাটজাত দ্রব্য (মাঝে মাঝে অল্প কাঁচা পাট রপ্তানি হয়।) | ১। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, মিশর ও কানাডা। |
| ২। চা। | ২। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর। |
| ৩। সূতা, কার্পাস বস্ত্রাদি। | ৩। ব্রিটেন, দঃ পূঃ এশিয়া, পূঃ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য। |
| ৪। কয়লা, লৌহশিলা, ম্যাঙ্গানীজ, আকরিক, অভ্র, ক্রোমাইট প্রভৃতি। | ৪। জাপান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য পূঃ ইউরোপের দেশ। |
| ৫। তামাক, পশম, লাক্ষা ও চামড়া, মশলা, কাজুবাদাম। | ৫। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপ। |
| ৬। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য। | ৬। আফ্রিকা, পূর্বইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র। |

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্র ২৩৪ কোটি টাকার, ব্রিটেন ২০১, জাপান ১৫৮, রাশিয়া ১৪৩ এবং ECM দেশগুলি ১১১ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি করে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে। আমাদের সঙ্গে পূর্বে যে সকল দেশের বাণিজ্য প্রায় ছিলই না—রুমাণিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, উগাণ্ডা, টানজানিয়া—তাহাদের সঙ্গে এখন ব্যাপক ভাবে লেনদেন সুরু হইয়াছে। ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজ এখন সুদূর দক্ষিণ আমেরিকাতেও পাড়ি দিতেছে। নূতন ধরণের পণ্য, যথা সেলাইকল, পাখা, রেলওয়াগন, ইঞ্জিন প্রভৃতি রপ্তানি হইতেছে।

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য।

মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ১৩৫৩ কোটি টাকা। মোট রপ্তানির শতকরা ৫২ ভাগ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য, যথা, ইস্পাত দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, পাটবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি।

ঐ বৎসর আমদানি খাতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল খাদ্য শস্যের আমদানি অনেকটা হ্রাস এবং রাসায়নিক সার আমদানি অনেকটা বৃদ্ধি।

**Q. 81. Give a brief account of the foreign trade between (a) India and U. K. and (b) India and the U. S. A.**

[ এই দেশগুলির মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত হিসাব দাও। ]

(ক) **ভারত-ব্রিটেন বহির্বাণিজ্য**—ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পরেই সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতীয় চায়ের সর্বপ্রধান ক্রেতা ব্রিটেন। ভারতে উৎপন্ন পাটজাত বস্ত্রাদি, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য এবং কার্পাস বস্ত্রেরও অন্যতম প্রধান ক্রেতা ব্রিটেন। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে ব্রিটেন তামাক, ভেষজ তৈল, লাক্ষা, গালিচা, কাজুবাদাম, অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে। ভারতও ব্রিটেন হইতে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। নানা প্রকার যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ির অংশ, লৌহজাত দ্রব্য, পশম বস্ত্র, বহুপ্রকার ঔষধ, কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্রাদি প্রভৃতি ব্রিটেন হইতে ভারতে আমদানি করা হয়। তাহা ছাড়া, ভারত ব্রিটেনে নির্মিত বিমানপোতের অন্যতম প্রধান ক্রেতা। সম্প্রতি ব্রিটেন ইউরোপীয় **কমন মার্কেট** প্রবেশ লাভের চেষ্টা করায় ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য সম্পর্ক কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে।

**(খ) ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বহির্বাণিজ্য**—ভারতের বহির্বাণিজ্যের তালিকায় সাধারণতঃ সকলের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের সর্বপ্রধান ক্রেতা। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ম্যাঙ্গানীজ, চা, কাজুবাদাম, মশলা, চর্ম, লাক্ষা, রেড়ীর তেল, গালিচা, ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতিও ভারত হইতে আমদানি করিয়া থাকে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে সাধারণতঃ কাঁচা তুলা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, নানা প্রকার ঔষধ, গন্ধক প্রভৃতি আমদানি করে। তাহাছাড়া, স্বাভাবিক বহির্বাণিজ্যের বাহিরে বিশেষ চুক্তির ( P. L. 480 ) বলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য ইত্যাদিও আমদানি করে।

# প্রশ্নপত্র ও নির্দেশ

## PART—II Examination

### Group A.

1 What is the scope of economic geography ? Illustrate your answer with suitable examples. (See Q 2, Part I)

2. Discuss how the distribution of resources is related to the endowments of nature. (See Q. 10, Part I)

3. Discuss the role of Petroleum in the developing countries and influencing world affairs. (See Q. 77, Part I)

4 Why is the cultivation of rice considered as a subsistence agriculture ? What particular geographical factors have contributed to this farming practice ? ( See Q. 44(b) & 46, Part I)

5. Bring out the significance of transport in relation to the world distribution of productive activities. (See Q. 97 & 98, Part I)

6. Write an essay on Forests and their utilisation. (See Q. 38, Part I)

### Group B

7. Divide U. S. A. into economic zones giving reasons for such demarcation. (See Q. 14 & 15, Part II)

8. What are the basic geographical facts for the industrial development in Japan, despite her lack of raw materials ? ( See Q 34. Part II)

9. Give an account of the textile industry of Great Britain (See Q. 21, Part II)

10. Explain the location of Iron and Steel industries in India. Suggest, giving reasons, a future site other than Bokaro. (See Q 49, Part III)

11. Discuss the agricultural possibilities of cereal cultivation in India in the light of attaining self-sufficiency in a reasonable period. (See Q. 30, Part III)

12. Write short notes on *any two* of the following :
   (*a*) Foreign trade of India. (See Q 80 Part III)
   (*b*) Development of Indian shipping in recent years (See Q. 51, Part I)
   (*c*) Demarcation of India into economic regions.

PART—I Examination

## Group A

1. What are the different sources of inanimate energy? Describe the relative advantages and disadvantages of using coal, oil and hydro-electricity. (See Q 12 & 82, Part I)

2. Why is rice cultivation mainly confined to the deltas and river valleys of southern and south-eastern Asia? Name the major producers and the important exporters and importers of the cereal. (See Q 46, Part I)

3. What is the industrial importance of copper? Give an idea of the distribution of copper ores of the world. *Name three* countries which export copper. (See Q 85(b), Part I)

4. Discuss the characteristics of the different types of farming. (See Q. 43 & 44, Part I)

5. Explain why commercial fishing is undeveloped in the tropics whereas all the important fishing grounds of the world are located in middle latitudes (See Q. 66 & 67, Part I)

6. Examine the basic factors for the location of large scale manufacturing industries, confining your attention to *any two* of the following :

Iron and Steel ; Engineering ; Textiles.

(See Q 90, 91 & 95, Part I)

## Group B

7. Give an account of the manufacturing industries in the different industrial regions of the Soviet Union.

(See Q. 29, Part II)

8. Indicate the crops cultivated in Japan with reference to the physical and climatic conditions of the country. What are the methods of farming whereby the Japanese farmers are able to derive high yield of crops? (See Q. 38, Part II)

9 Write a systemetic account of the economic geography of *one* of the following : Canada ; Egypt ; Argentina. (O/S.)

10. Analyse the reasons for the variation of population density in the different parts of India. (See Q. 12, Part III)

11. Give the factors for the location of the ports of Bombay and Calcutta and discuss their main exports and imports.
(See Q. 77 A & B, Part III)

12. Write notes on *any two* of the following :—

(*a*) The development of coastal shipping in India.
(See Q. 75, Part III)

(*b*) Mineral oil production in India.
(See Q. 42, Part III—খনিজ তৈল )

(*c*) Types of forests in India and their economic products.
(See Q. 15, Part III)

(*d*) Importance of cottage industries in the Indian economy and the problems of their development.
(See Q. 53 Part III)

Q. 13 Discuss how the distribution of resources is related to the endowment of nature. Or,

What is the difference between physical presence and actual availabilities of resources ? Is the distribution of natural endowment uniform all over the world (See Q. 10, Part I)

Group—A

1. Discuss cultivability of land with special reference to conditions in exchange economy. (See Q. 15, Part I)

2. How do you justify the development of marine fishing in restricted regions ? Discuss the economic significance of this restricted development.
(See Q. 67, Part I & Q. 38, Part III)

3. Give the pattern of the distribution of oil resources of the world and discuss its economic consequences.
(See Q. 76 & 77, Part I)

. Discuss the factors responsible for the concentration of Jute and Rubber cultivation in certain regions of the world. Indicate the nature of the world trade in these products. (See Q. 59 & 61, Part I)

5. Give a brief account of the geographical background behind the development of different farming practices.
(See Q. 43 & 44, Part I)

## Group—B

6. Analyse critically the locational set up of the cotton textile industry of India. Discuss the current problems of this industry. (See Q. 54, Part III)

7. Examine the circumstances necessitating the adoption of the multipurpose technique of development for the Damodar Valley project. (See Q. 23, Part III)

8. Discuss fully the problems of agricultural production in India with particular reference to the food crops (See Q. 30, Part III)

9. What are the main industrial regions of the U.S.S.R.? Describe the industrial development in any one of these regions. (See Q. 29, Part II)

10. Give an account of the agricultural developments in Argentina or the pastoral industry in Australia. (See Q. 7, Part II).

## Group A

1. What is the scope of Economic Geography? Discuss how its knowledge is utilised. (See Q. 2, Part I)

2. Explain the basic principles which govern the utilisation of natural resources. (See Q. 4 & 6, Part I)

3. "Coal is a prime factor of modern industry." Discuss. (See Q. 73, Part I)

4 Give an account of the fisheries of the world. (See Q 67, Part I)

5. Discuss the role of transport in the development of any particular economy of the world. (See Q. 97 & 98, Part I)

6. Write an essay on soils and their utilisation. (See Q. 41, Part I)

## Group B

7. Give a brief account of the geographical location, climate and principal economic products of any country in Europe. (See Q. 22, Part II)

8. Draw a comparison between the economic background of industry in Japan with that of the U. K. (See Q. 40, Part II)

9. To what extent do the physical features and climate influence economic activities in different parts of India ? Give suitable examples. (See Q. 2, Part III)

10. Mention three important ports of India and define their hinterlands. What are their main exports and imports ? (See Q. 77, Part III)

11. Discuss the geographical conditions favourable for the growth of rice. Give the world distribution of the main rice producing areas How is rice utilised ? (See Q. 46, Part II)

12. Give a brief account of the foreign trade of India. ( See Q. 80, Part )III

1. Define "Economic Geography" and explain its scope and importance. (See Q. 2, Part I)

2. Explain in what senses Nature can be considered to be constant as well as changing in character. (See Q. 11, Part I)

3. Classify forest-belts of the world on the basis of climate. Describe the differences between the tropical evergreen forest and temperate soft-wood forest with respect to their commercial products and their utilization. (See Q 37, Part I)

4. What is the difference between Spring wheat and winter wheat ? Under what geographical conditions and in what areas of the world is spring wheat cultivated ? (See Q. 47, Part I)

5. Describe the physical and climatic conditions for the successful cultivation of tea. Name the principal producers of tea and give an idea about the international trade in India. (See Q. 53, Part I)

6. What are the various types of coal ? State the uses of coal and mention its by-products. Indicate the distribution of the productive coalfield in the U. S. A. or the U. S. S. R. (See Q. 71 & 74, Part I)

7. Discuss the factors governing the location of cotton textile industry with particular reference to raw materials and markets. Indicate the important regions of cotton textile manufacture in the world. ( See Q, 91, Part I)

8. Give an idea of the evolution of transport. What are the different types of transport ? Examine the importance of co-ordination in the transport system in India. (See Q. 96, Part I)

9. Describe the geographical factors necessary for the growth and prosperity of a sea-port. • ( See Q. 114, Part I)

10. What are the bases of International trade ? Discuss the nature of India's foreign trade, indicating the main items of import and export. ( See Q. 119, Part I & Q. 80, Part III)

## Group A

1. Discuss in what respects Economic Geography may be considered to be a dynamic science. ( See Q 1, Part I)

2. Discuss the variations of man-land ratio in agricultural practices and their consequence (See Q 18 & 43, Part I)

3. Give an account of the distribution of Copper and Aluminium ores and mention how the metals are utilised. (See Q. 85 (a) & (b), Part I)

4. Give an account of the distribution of Petroleum and discuss its importance in world affairs. (See Q. 76 & 77, Part I)

5. Discuss how the pattern of international trade is influenced by the difference in available resources as conditioned by geography. (See Q. 119, Part I)

6. Give an account of the important fisheries of the world and analyse the factors of commercial development (See Q. 67, Part I)

## Group B

7. Draw a comparison between the industrialization in Japan and the U.S.A. (See Q. 16, Part II)

8. Give an account of the industrial developments in Pakistan *or* Burma. (See Q. 46 & 43, Part II)

9. What conditions give U.S.S.R. its peculiarities in agriculture and industry ? (See Q. 27 & 29, Part II)

10. Discuss critically the progress made in the field of industrialisation in India since Independence. ( See Extract of Industry Chap. Part III)

11. What role do the Railways and Roadways play in the internal transport system of India? Discuss their relative contributions and drawbacks. (See Q. 70, Part III)

12. Explain critically the distribution of population in India in the light of geographical resources. (See Q. 12, Part III)

1. Define resources and explain how it is affected by the inter action of nature, man and culture. (See Q. 3, Part I)

2. Critically examine the correlation between nature and human economic activities. (See 26, Part I)

3. Discuss the importance of petroleum in the modern world. Describe the oil-fields of the Middle East and India mentioning the trade of oil produced in those fields. (See Q. 77 & 75, Part I)

4. Briefly describe the Features of Subsistence and Commer cial and Mixed farming with examples of areas and crops under them in India. (See Q. 44, Part I)

5. Describe the commercial sheep grazing areas of the world mentioning their physical background. Justify why commercial grazing is specially developed in a few countries of the Southern Hemisphere. (See Q. 70, Part I)

6. Describe the physical and other conditions under which natural rubber or tobacco is produced on Commercial scales in a few countries of the world. Mention the names of exporting and importing countries of such products. [See Q. 61 & 55 (b), Pt I]

7. Name the important steel producing centres of the U.S.A. and indicate their locational advantages. (See Q. 15, Part II)

8. What are heavy chemicals? State their uses and importance in the modern industrial world. Give a brief account of the heavy chemical industries in India. (See Q 65, Part III)

9. What is an industrial region? Describe the physical factors for the growth of industrial regions of the U.S.S.R. (See Q. 29, Part II)

10. (a) Justify with supporting examples that transport-development leads to regional specialization. (See Q. 97 & 98, Part I)

(b) Briefly discuss the relation between industrialisation and foreign trade of a Country. (See Extract of Trade Chap. Part I)

## Group A

1 What are the phy ical human and cultural limitations of the cultivability of land? How is cultivability of land determined in an exchange economy? (See Q. 14, Part I)

2. Discuss with examples how speed and cost of transport determine the regional specialisation of industries (See Q. 98, Part I)

3. Indicate the geographical location of the coniferous forests of the world and describe the commercial uses of the products of these forests, (See Q 39, Part I)

4 Describe the natural and economic factors necessary for the development of hydro-electric power. Name the countries that are well developed in the production of hydro-electric power. (See Q. 80 Part I)

5 What are the countries in which and what are the geographical environment under which sheep-rearing is practised on a commercial basis? (See Q. 70, Part I)

6. Discuss the role of heavy chemicals in modern economic development and describe briefly the principal regions of the world well-developed in heavy chemical industries. (See Q. 93, Part I)

## Group B

7. Describe the influence of relief and climate of Burma or Australia on the features of agriculture and the crops produced there (Q. 3 & 42, Part II)

8 Write a concise account of the mineral wealth of the Soviet Union and show how it is utilized for the development of manufacturing industry. (See Q. 28, Part II)

9. Analyse the reasons for the great development of iron and steel industry in the U.S.A. and locate the major centres of production in the country. (See Q. 15, Part II)

10. Give an account of the progress in the field of irrigation in India since independence. (See Q. 18, Part III)

11, Give an account of the oilfields of India and discuss the progress of petroleum refining in the country. (See Q. 43 Pt. III)

12. Discuss the characteristic features of India's foreign trade. (See Q. 80, Part III)

*Economic Resources & Utilisation*

[ New Syllabus ]

1. Explain how and why the use of inanimate energy helps the extension of cultivable land-area. (See Q. 12(2), & 24 Part I)

2. Discuss the comparative advantages and disadvantages of 'hydro-electricity' and 'coal' as sources of energy. Describe the physical conditions which favour the development of hydro-electricity. (See Q. 82 & 80, Part I)

3. Briefly describe and account for the growth and development of dairy industries in North-West Europe and North-East U.S.A. (See Q. 68, Part I and Also Q. 14(5) Part II)

4. Describe the 'lumbering activities' in the coniferous forest belts of Eurassia and North America. (See Q. 40, Part I)

5. Name four important soils of the world and broadly indicate their characteristics and uses. Briefly discuss the principles and methods of soil conservation. (See Q. 41 & 42, Part I)

6. Discuss the geographical conditions of 'tea production in India'. State the areas in which it is grown. (See Q. 33, Part III)

7. Describe the commercial and industrial uses of copper, aluminium and zinc State the world's distribution of copper-ores and mention the names of copper exporting and importing countries. [See Q 85 (a), (b) & (d)]

8. Describe the steel manufacturing industries in the Ruhr valley of West-Germany. State the economic importance of the steel producing area. (O/Syll.)

9. Briefly describe the cotton textile industry of India with reference to its new features in the field of production, its export trade and problems. (See Q. 54, Part III)

10. Describe fully two important industrial regions of the world selected from two different countries. (See Q. 29 & 36, Part II)